British Council Division, British Deputy High Commission
5, Shakespeare Sarani. Calcutta 700 071.
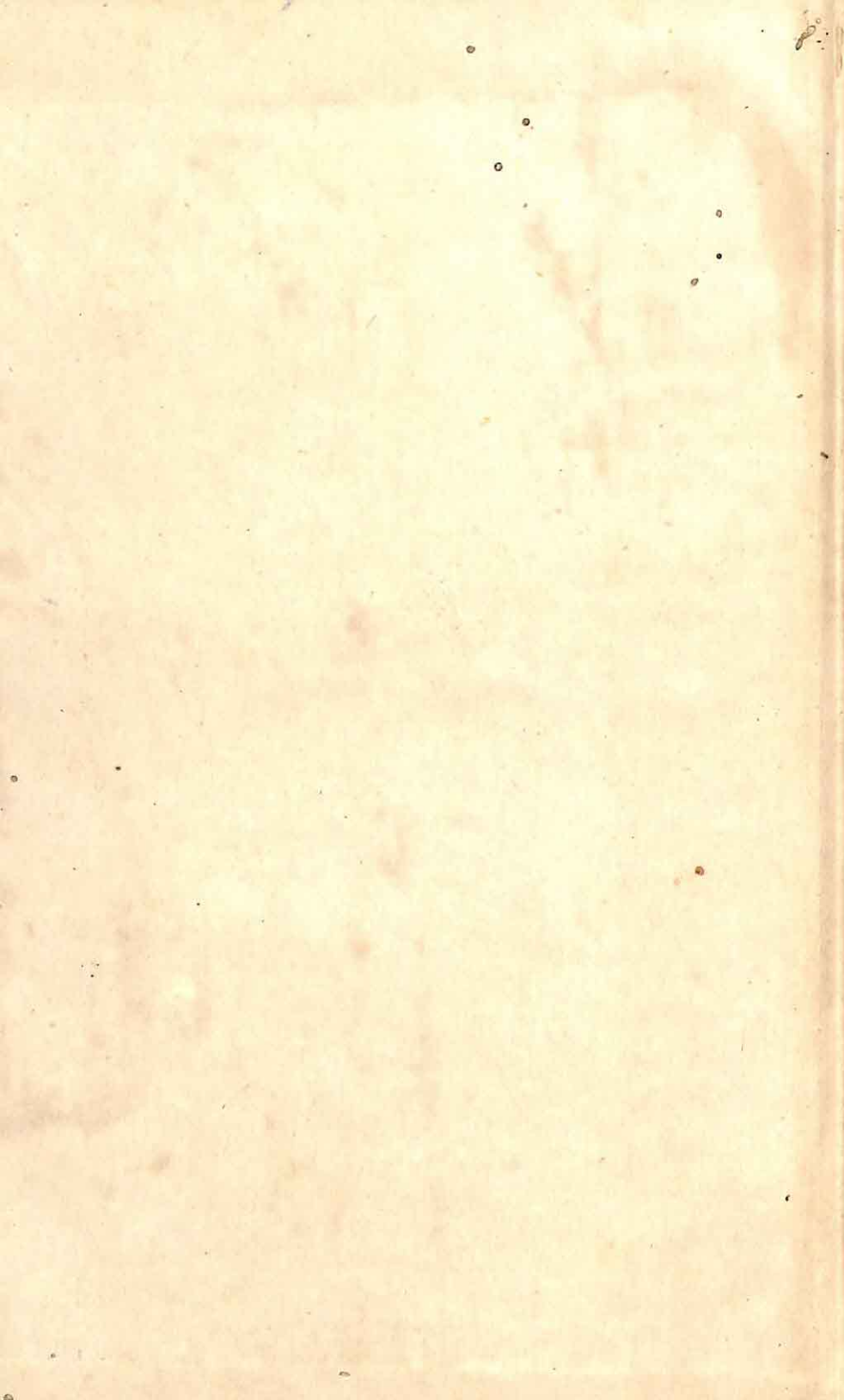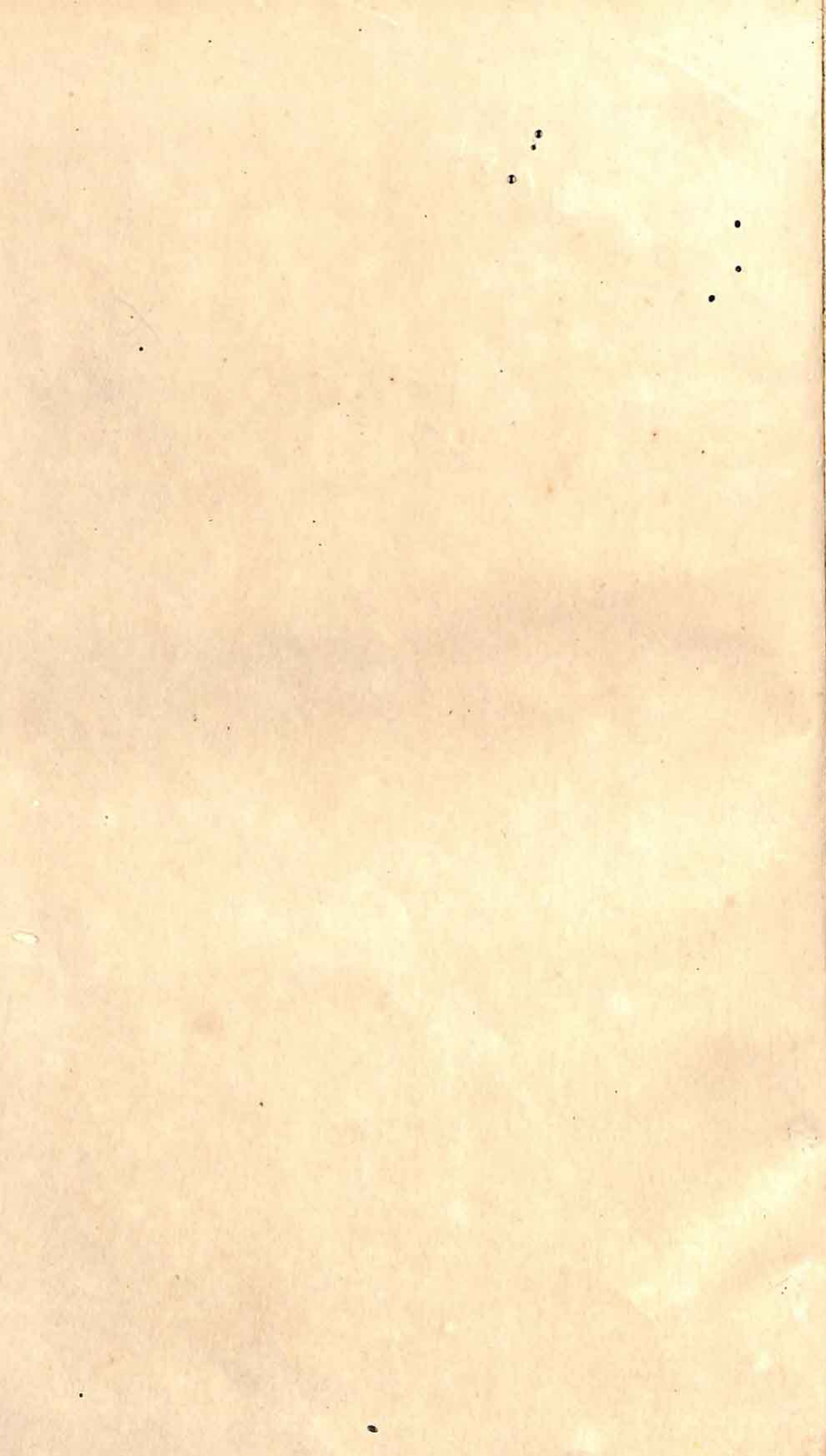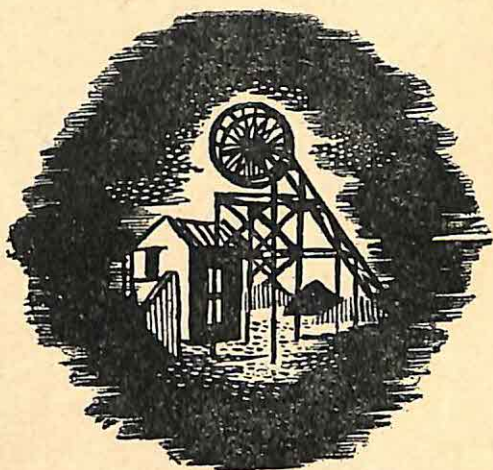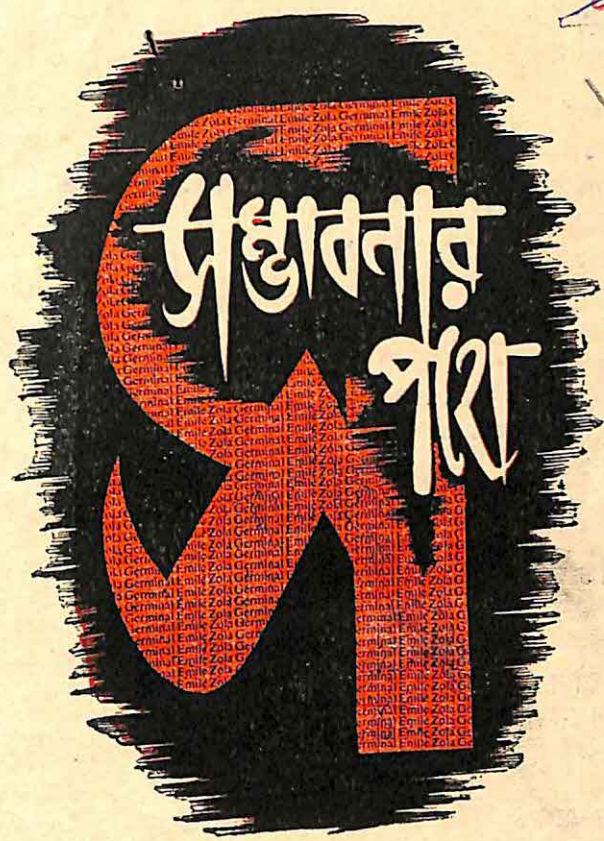
এমিল জোলা

Germinal-এর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ :

অশোক গুহ

৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৩৬২

প্রকাশক
বিপুল সাহা
ভারতী লাইব্রেরী
৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক
রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ
১৪১, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড
কলিকাতা-১৩

প্রচ্ছদপট
পূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য

বাঁধাই
ইস্ট এন্ড ট্রেডার্স
২০, কেশব সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

পাকিস্তান এজেন্ট
নওরোজ কিতাবিস্তান
৩৭, বাংলাবাজার
ঢাকা

চার টাকা আট আনা

এমিল জোলা

১৮৪০-১৯০২

প্রভেন্সে তাঁর জন্ম। শিক্ষা-দীক্ষা প্যারীতে। দারিদ্র্যের পাঠশালায় পাঠগ্রহণ করেন। সাংবাদিক হিসাবে শুরু হয় তাঁর জীবন। পরে ঔপন্যাসিক হিসাবে আবির্ভূত হন। প্রথমে তিনি ছিলেন রোমান্টিক গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত, পরে গোঁকুর-ভ্রাতৃদ্বয়ের দ্বারা প্রভাবিত হন। ন্যাচারিলিজম বা বস্তুতান্ত্রিকতার পথে এবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। রোমান্টিক-পর্যায়ের উপন্যাস-গুলির মধ্যে La confession de Claude (ক্লদের স্বীকৃতি), La vacu d'une morte (মৃতা নারীর কামনা), Les mysteries de marseille (মার্সাই-রহস্য) উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বস্তুতান্ত্রিক ধারায় প্রথম উপন্যাস Therese´ Raquin এটি ১৮৬৭ সালে প্রকাশিত হয়। তার বিখ্যাত রোগোঁ-মাকার্ত উপকথা শুরু হয় ১৮৭১ সালে। এই উপন্যাসমালার প্রথম উপন্যাস La fortune des Rougon (রোগোঁদের ভাগ্য) এবং সর্বশেষ উপন্যাস Le Docteur Pascal। এখানি প্রকাশিত হয় ১৮৯৩ সালে সুদীর্ঘ বাইশ বছর পরে। এই উপন্যাসগুলি একই বংশের জীবনী হলেও স্বয়ং-সম্পূর্ণ। এইগুলির মধ্যে La fortune des Rougon, L' Assomoir (ভ্রামের দোকান), La Debacle (বিপর্যয়), নানা, La Bete humane (আদিম) এবং Germinal (সম্ভাবনার পথে) উল্লেখযোগ্য। আবার এদের মধ্যে সকলের সেরা Germinal। এ ছাড়াও আরো কয়েকটি উপন্যাসমালারও তিনি স্রষ্টা। La Trois Villus (তিন নগরী) এবং Le qatre Evangiles (চারটি বাণী) তাদের নাম। শেষোক্তটির শেষ খণ্ড তিনি শেষ করে যেতে পারেননি।

রোগোঁ-মাকার্ত উপকথা সাঙ্গ হবার পরে তিনি রাজনীতি

চর্চায় মন দেন—সোশালিজমের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। বিজ্ঞানসম্মত না হোক এই সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা ছিল বিশ্বপ্রেমে ভরপুর। 'তিন নগরী' আর 'চারটি বাণী' তারই ফল। এ ছাড়া তিনি বহু ছোট গল্প এবং প্রবন্ধও রচনা করেন।

শেষ জীবনে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি ক্যাপ্টেন আলফ্রেড দ্রেফুসের পক্ষ সমর্থন (১৮৯৪ সাল)।

ফরাসী সেনাবাহিনীর এই ক্যাপ্টেনটি অন্যায়ভাবে কুখ্যাত 'শয়তানের দ্বীপে' অবরুদ্ধ হন। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ১৮৯৮ সালে জোলা এক অগ্নিগর্ভ খোলা চিঠি পেশ করেন জনগণের সম্মুখে। এই চিঠিখানির শিরোনামা—I accuse (আমি অভিযুক্ত করি)। এই অভিযোগের জন্যই জোলাকে তৃতীয় রিপাব্লিকের নির্যাতন ভোগ করতে হ'ল। তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ অপরাধের মামলা দায়ের হ'ল, তিনি ইংলন্ডে কিছুদিনের জন্য আত্মগোপন করলেন। কিন্তু জোলার সমর্থনে একদিন নির্দোষী দ্রেফুস মুক্তি পেলেন। জোলাও ফিরে এলেন স্বদেশে। অবশেষে ১৯০২ সালে শয়নগৃহে স্টোভের গ্যাসে নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু ঘটল।

4081

ভূমিকা

ফ্রান্স—১৮৮৫ সাল, বর্তমান ধনবাদী যুগেরই সে-এক মুহূর্ত। একটি ক্ষণ—একটি তারিখ। বুঝি বা লাল তারিখ।

এ-যুগের শুরু হয়েছিল প্রায় একশো বছর আগে ফরাসী বিপ্লবে (১৭৮৯)। জনগণের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার জিগিরে—বাস্তিল আক্রমণে তার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তাকে পুষ্ট করে তুলেছিল শিল্প-বিপ্লব। স্টীম-ইঞ্জিনের পিছনে বেঁধে সে যুগকে নিয়ে চলেছিল অগ্রগতির পথে; কিন্তু পথ তো মসৃণ ছিল না। চড়াই-উতরাই দেখা দিতে লাগল। সাম্রাজ্যবাদ বার বার চড়াও হতে লাগল গণতন্ত্রের উপর;. আবার ধনবাদী যুগের জঠরে বিবর্তনের চক্রপাকে বিরোধের বীজ উপ্ত হ'ল। সে-বীজকে পুষ্টি দিতে লাগল মার্কস-প্রমুখ মনীষীদের ভাবধারা। মহামহীরুহ হয়ে উঠল। সর্বহারা শ্রমিকের প্রথম আন্তর্জাতিক সংস্থা তারই ফল। ধনবাদী সমাজে তখন ধরেছে ভাঙন। হৃদয়হীন কাঞ্চন মূল্যের দাবিতে সে তখন সবকিছুকে অস্বীকার করছে, সুকুমার বৃত্তিগুলো ডুবিয়ে দিচ্ছে স্বার্থের বরফ-গলা জলে। সবকিছুই তখন তুলা-দণ্ডে তৌলিত। এমনি দিনে অকালে জন্ম পরিগ্রহ করল প্যারী কমিউন (১৮৭১)। নতুন সমাজের ভিত গাঁথা হ'ল—সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপ নব-জাতক জন্ম নিলে। কিন্তু ভিত তার বড়ই নড়বড়ে, জাতক বড়ই দুর্বল। তাই কমিউন নবরাষ্ট্রের জন্ম দিয়েও তার বিরাট ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য পালনে অক্ষম হ'ল। এই অক্ষমতায়ই সর্বহারা শ্রমিকের রক্তস্রোতে তার পরিসমাপ্তি ঘটল। কিন্তু তবু পলি পড়ল, রয়ে গেল রক্তের পলি। তারই উপর অঙ্কুর গজিয়ে উঠল বুর্জোয়া-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জেহাদের। এমনি করেই এসে গেল ১৮৮৫ সাল। সর্বহারার কমিউন গেছে, বসেছে গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী তৃতীয় রিপাব্লিক —এই সেদিন বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যার কুখ্যাত পরিণাম ঘটল। তারও তখন পনেরো বছর গত। এমনি দিনে সাহিত্যে এল লাল তারিখ। প্রকাশিত হ'ল 'জার্মিনাল' (সম্ভাবনার পথে)। লেখক এমিল জোলা।

নামটা তখন আর অজানা নয়। অনামী নন লেখক, বরং নামজাদা। রোগোঁ-মাকার্ত উপন্যাসরাজী তখন তাঁকে সাহিত্যের দরবারে ঠাঁই দিয়েছে। একটু

বা বিশেষ ঠাঁই—পহেলা আসনে না হোক, পহেলা সারে তো বটেই। একাদেমির শিরোপা না জুটুক, জুটেছে জনমনের শিরোপা। এইখানি সেই উপন্যাস-মালার ত্রয়োদশ গ্রন্থ। যশের ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে ধাপে ধাপে উঠছিলেন লেখক, হঠাৎ একেবারে সর্বোচ্চধাপে উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন। শক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। বিষয়-বিমুখ নয়, বিষয়-মুখ তাঁর দৃষ্টি। সেই দৃষ্টির সাহায্যে নতুন রূপে রূপায়িত করে তুললেন কয়লা-কুঠীর এলাকা। আড়াল-আবডাল রাখলেন না, মানুষের পাপের উপর তাঁর নির্মম কশাঘাত পড়ল, আবার যুগের অন্যায়ও ফুটে উঠল। দলিল-উপন্যাসের সেরা প্রমাণ দাখিল করলেন তিনি। আবার নির্যাতিত, উৎপীড়িত মানবতার প্রতি রইল সমবেদনা। উপন্যাসের ক্ষেত্রে বাস্তববোধ (রিয়ালিজম) তো কায়েম হয়ে গেলই, আবার বস্তু-তান্ত্রিকতারও (ন্যাচারিলিজম) আমদানি হ'ল। প্রগতিধর্মী, বিপ্লবী উপন্যাসেরও ঠাঁই মিলল।

বাস্তিল-পতনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন যুগ এসেছিল—বর্তমান যুগের গোড়া-পত্তন হয়েছিল। সাহিত্য তো যুগ ছাড়া নয়, তাই সাহিত্যেও নূতন বিধান দেখা দিলে। তবে সে ব্যক্তিগত কল্পনা-বিলাসের যুগ, যার নাম রোমান্টিকতা। এই রোমান্টিকতার তন্ত্রধারগণ যে নিছক ভাববিলাসী—শুধু যে প্রেমের পালারই গায়েন ছিলেন তা নয়। মানবতার কথাও তাঁদের রচনায় দেখা দিয়েছিল—সমকালীন বাস্তবতাও ফুট্ কেটেছিল। ওঁরাও কেউ কেউ ছিলেন বিষয়মুখ, বাস্তববোধে কিছুটা উদ্বুদ্ধ। কিন্তু তবু উপন্যাসের ক্ষেত্রে তার আদরা তেমন করে দেখা দেয়নি। কিন্তু এরই মধ্যে যুগ বদলাতে লাগল। 'আর্ট আর্টের জন্য' এ-দোহাই আর টিকল না। আর্টের মুরুব্বী সামন্ততন্ত্র আগেই উৎখাত হয়েছিল, মধ্যবিত্তই তখন আর্টের ধারক ও বাহক। তাদের রুচিও একেবারে নতুন। এরই উপরে শিল্প-বিপ্লবের ফলে আর-এক জাতের মুরুব্বীও এসে দেখা দিলে। এরা নাগরিক সর্বহারার দল। রোমান্টিক সস্তা প্রণয়লীলা আর পাপবোধ খোরাক হলেও তাদের নিজেদের জীবনধারা এক নতুন দিগন্ত খুলে দিলে। ঔপন্যাসিকদের উপজীব্য হ'ল তাদের জীবন, তাদের পরিবেশ। বাস্তবধর্মী উপন্যাসের সড়ক পড়ল। কিন্তু সাহিত্যে এ-সড়ক বাঁধার আগেই চিত্রকলায় এর প্রকাশ দেখা দিল। শিল্পী কুরবে এই জীবনধারা লিখলেন তুলি দিয়ে, ফুটিয়ে তুললেন (১৮৫০)। তারপর সাঁফ্লুয়েরী আমদানি করে বসলেন সে-ধারা উপন্যাসে। সাদামাঠা কথায় বাস্তববোধের ফতোয়াও জারি হ'ল—শিল্পী তার বিষয় নির্বাচনে স্ব-স্বাধীন। কিন্তু তার গণ্ডী হবে সমসাময়িক জীবন—আর নীচুতলার মানুষই হবে সে জীবনে তার লক্ষ্যস্থল। শিল্পসৃষ্টি হবে দলিলেরই শামিল নয়, একেবারে বিজ্ঞানসম্মত পাকা দলিল। শিল্পী হবেন রোমান্টিকতা-বিরোধী। যাহোক, সাহিত্যে রাজা-রাজড়ার জড়োয়ার জেল্লা গত হ'ল, মধ্যবিত্তের মোলায়েম রুচির বদলি হ'ল—এবার এল নীচুতলার জনগণের পালা। নোংরা, ছেঁড়া, পরিবেশে জীবনের পাঁচালি শুরু হ'ল—দুর্দশা আর কুশ্রীতা-কুরুচিতে কালো হয়ে উঠল।

সাঁফ্লুয়েরী প্রতিভাধর ছিলেন না, তাই বাস্তববোধ তেমন ফলাও করে প্রকাশ হ'ল না সাহিত্যে—সমালোচকদের কাছেও এ এক ধরতাই বুলি হয়ে রইল। যে-কোন উপন্যাসের উপরই তাঁরা বাস্তববোধের ছাপ মেরে দিতে লাগলেন।

কিন্তু আসল ছাপের তখনো হদিস নেই। পরীক্ষা চলতে লাগল। আত্ম-
জীবনীগত উপন্যাস তখন মৃত, ঐতিহাসিক রমন্যাস আর দুঃসাহসিক বৃত্তান্তও
তখন অবহেলিত; তাই বাস্তববোধই কায়েম হতে লাগল। শিল্প-বিপ্লব।
তার স্টীম দিয়ে তাকে সচল করে দিলে। অবহেলিত সর্বহারা সমাজের প্রতি
চোখ পড়ল, আবার বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধেও উথলে উঠল বিষম ঘৃণা। মার্কস-এর
কথায় সে-ঘৃণা সুপরিস্ফুট—সমস্ত সভ্যজগত ওদের অভিশাপের খেতাবে
বিভূষিত করছে, ওরা উপরওয়ালার দাস, আর অনুজীবীদের কাছে স্বেচ্ছাচারী
শাসক। ইংলন্ডে এই বুর্জোয়া সমাজের প্রতি ঘৃণা তখন ডিকেন্স, থ্যাকারে,
শার্লটি ব্রন্টী, মিসেস গ্যাসকেল প্রভৃতির উপন্যাসে ব্যক্ত—মনীষী মার্কস-এর
রচনায় তীব্রভাবে উচ্চারিত। বুর্জোয়া বিকৃতিতে ইংলন্ডের শিল্পী-মানসে
যে তীব্র বেদনা দেখা দিয়েছিল, উপসাগরের ওপারে ফ্রান্সেও তারই প্রকাশ মূর্ত
হয়ে উঠল। একজন, গুস্তাভ ফ্লবেয়ার তীব্রতায় অধীর হয়ে গেলেন, ফুঁসে
উঠলেন বুর্জোয়া-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। বন্ধুকে চিঠিতে জানালেন ঃ—বিরেচক,
জোঁক, উদরাময়, তিনরাত অনিদ্রা...আর আছে বুর্জোয়া সমাজের প্রতি দারুণ
ঘৃণা...। আবার বলে উঠলেন, আমার বমিতে আমি মানবতাকে ভাসিয়ে দেব।
এখানে মানবতা ধনবাদী সমাজের অর্থেই প্রযোজ্য। তিনি নিজেকে বুর্জোয়া-
ফিবাস বা বুর্জোয়া-বিরোধী বলে জাহির করলেন। এই প্রচন্ড ঘৃণা থেকেই
সৃষ্টি হ'ল তাঁর উপন্যাস। 'মাদাম বোভারী' প্রকাশিত হ'ল, প্রকাশিত হ'ল—
La Education Sentimental. সমালোচকেরা বাস্তববোধে উদ্দীপ্ত মহান
উপন্যাস বলে অভিনন্দন জানালেন। বাস্তববোধের 'সরকারী' তন্ত্রধারেরা
স্বীকৃতি দিতে নারাজ হলেও রোমান্টিক ফ্লবেয়ার হলেন সাহিত্যে রিয়ালিজমের
উদ্গাতা। সমকালীন জীবন ফুটে উঠল কলমের আঁচড়ে; তার ভিত্তি হ'ল
গবেষণা। জীবনীকার বা ঐতিহাসিক যেমন নথিপত্র ঘেঁটে তথ্য বার করেন,
ঔপন্যাসিকও হলেন সেই পথের পথিক।

কিন্তু সাহিত্যে রিয়ালিজমকে যিনি কায়েম করলেন, যুগের রূঢ় রুক্ষ
বাস্তব তাকে সে পথ থেকে বিচ্যুত করলে। বাস্তবের নিষ্ঠুর সংগ্রামে বিমুখ
হয়ে তিনি অন্য পথ ধরলেন। 'বিশুদ্ধ' শিল্পীর নিয়তি হ'ল তাঁর। তাঁর
সৃষ্টি একান্ত গঠনধর্মী বা ফর্ম্যাল হয়ে উঠল। তিনি গঠন আর
উপকরণের মিলন সাধনে অক্ষম হলেন। নাড়ি টিপে যুগের আসল রোগ
ঠিকই বার করেছিলেন, কিন্তু নিদান খুঁজে পেলেন না। তবু উত্তরাধিকার
দিয়ে গেলেন। শিল্পাদর্শের সঙ্গে যুক্ত হ'ল বিজ্ঞানসম্মত দলিলের ধারা।
গোঁকুর-ভ্রাতারা (এডমন্ড ও জুল) এই ধারাকে পেলেন ওয়ারিশানসূত্রে। কিন্তু
তাঁরা ক্ষমতা-সম্পন্ন হলেও প্রতিভাধর ছিলেন না—তাই বাস্তববোধকে ফোটো-
গ্রাফের আওতায় ফেলে দিলেন। কিন্তু ফোটো তো এখানে আসল নয়।
ফোটোর প্রকৃতিটা কি সেইটে বোঝা এবং বলতে পারাটাই বাস্তববোধে উদ্দীপ্ত
শিল্পীর কাজ। সেদিক থেকে ব্যাহত হলেন বিখ্যাত ভ্রাতৃদ্বয়। তবু বাস্তব-
বোধ থেকে নয়া-বাস্তববোধের হদিস পাওয়া গেল। এই নয়া-বাস্তববোধের
নাম হ'ল ন্যাচারিলিজম বা বস্তুতান্ত্রিকতা। গোঁকুররা হলেন এর প্রতিষ্ঠাতা।
তাঁদের উপন্যাসে সাহিত্যের এই নয়া ধর্ম ফুটে উঠল, কিন্তু শক্তির অভাবে

তেমন প্রচারিত হতে পারল না। তাই গোঁকুররা বস্তুতান্ত্রিকতার প্রথম উদ্গাতা হয়েই রইলেন, হোতা হতে পারলেন না।

এর কারণও ছিল। বুর্জোয়া সমাজের ভাঙন দেখে ফ্লবেয়ার অধীর, কিন্তু কারা নতুন সমাজ পত্তন করবে সে-বিষয়ে তিনি ছিলেন নিরুত্তর। গোঁকুররা অবশ্য শ্রমিকদের দেখিয়ে দিলেন, তাদের পুরাকালের বর্বর জাতির মতোই ধ্বংসের প্রতীক বলে মনে করলেন। এবং এই বর্বরতার আমদানিকেই সমাজ-বিপ্লব বলে জাহির করলেন। শ্রমিকরাই যে নতুন সমাজের পত্তন করবে—একথা তাঁদের মনে হ'ল না। কমিউনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরেও না।

ফরাসী সাহিত্যে এবার উদয় হলেন জোলা। বস্তুতান্ত্রিকতার ধারা বেয়েই এলেন। প্রভেন্সে তাঁর জন্ম, প্যারীতেই দারিদ্র্যের পাঠশালায় তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা। সাংবাদিক থেকে হলেন ঔপন্যাসিক। রোমান্টিক হিসেবেই তাঁর বিলম্বিত উদয় রিয়ালিজম—ন্যাচারিলিজম-এর যুগে। তাও আবার ধার-করা রোমান্টিকতা। কিন্তু গোঁকুরদের প্রভাব তাঁর উপরে পড়তে দেরি হ'ল না। তিনি হলেন তাঁদেরই গোষ্ঠিভুক্ত—স্বগোত্র। কিন্তু তাঁদের মতো মার্জিত রুচি-বোধ, গঠনের বিন্যাস, স্টাইলের কারি-পাউডারি তাঁর ছিল না। তবে উপকরণ বা মাল-মশলার অভাব ছিল না। আর ছিল মানবতার প্রতি গভীর সহানুভূতি। এই উপকরণ ও মানবতাবোধই তাঁকে শত ত্রুটি সত্ত্বেও ন্যাচারিলিজমের পুরোধা হিসাবে সাহিত্যক্ষেত্রে বহাল করে দিলে। নয়া সাহিত্যধর্মে উদ্বুদ্ধ তাঁর প্রথম উপন্যাসে Therese´ Raquin. বাস্তববোধ থেকে বস্তু-তান্ত্রিকতার নয়া সড়ক ধরে এগিয়ে চল উপন্যাস। এবার জোলা ফাঁদলেন তাঁর বিখ্যাত রোগোঁ-মাকার্ত উপকথা। একটি শ্রমিক পরিবারকে কেন্দ্র করে কুখ্যাত দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের ইতিকথা লিখে চললেন তিনি। ডারুইনী ক্রমিক বিকাশ আর বংশগতির বৈজ্ঞানিক তথ্য তখন য়ুরোপের আবহাওয়ায় তোলপাড় তুলেছে। বিজ্ঞান থেকে মনোবিজ্ঞানে চারিয়ে গেছে—Taine তাকে আমদানি করেছেন ফরাসী সাহিত্যে। La Race, La milleu, La moment (বংশগতি, পরিবেশ আর ঐতিহাসিক মুহূর্ত) তখন বাস্তববোধে-উদ্দীপ্ত সাহিত্যের এক-মাত্র জিগির। জোলাও পরিবেশ আর বংশগতিকে ব্যক্তিত্বের নির্ধারণের সূত্র মেনে নিয়ে উপন্যাস রচনায় ব্রতী হলেন। ল্যাবরেটরী আর কল্পনা-জগৎ একাকার হয়ে গেল। পড়তে লাগলেন, দেখতে লাগলেন জীবনের বিভিন্ন স্তরে, সমাজের শর্তগুলি বুঝলেন—তারপরে তাকে দলিল হিসাবে পেশ করলেন সাহিত্যের দরবারে। রোগোঁ-মাকার্ত উপকথায় তাঁর সেই পড়া, দেখা, বোঝার পরিচয় সম্যক ফুটে উঠল। প্যারী কমিউনের আগের বছর ১৮৭০ সাল থেকে শুরু হ'ল উপন্যাসমালা। শেষ হ'ল বাইশ বছর পরে ১৮৯৩ সালে।

এই ইতিকথায় বুর্জোয়া সমাজের প্রতি শুধুমাত্র তিক্ততাই দেখা দিল না—শুধু গঠনের কারিগরিই তার বড় কথা হয়ে রইল না। মানুষ এখানে ল্যাবরেটরীর গিনিপিগের শামিল হয়ে গেল না। লেখকের ঢালাও কল্পনা সেখানে ছড়িয়ে পড়ল। বস্তুতান্ত্রিকতার তন্ত্রধার জোলা হলেন জীবনের উপাসক—নিপীড়িত মানবতার দরদী—বিশ্বমানবতার পূজারী। বস্তু-তান্ত্রিক জোলাকে নিয়ে রসিকতা করলে জীবন, কিন্তু সেই তাঁকে জেরার্দ্যা নার্ভালের আত্মহত্যা থেকে বাঁচালে, প্যারী কমিউনের বিপ্লবী কবি

র্যাঁবোর মতো হতাশ হয়ে আবিসিনিয়ার খর রৌদ্রে তিনি পলাতক হলেন না। সেখানে অস্ত্র আর নারীদেহের বেচা-কেনা করে ঘৃণ্য বুর্জোয়া বনে গেলেন না। শিল্পী গগাঁর মতো তাহিতীর আদিম বর্বরতায় ডুবে গেলেন না, সেজানের মতো ছবি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন না খাদে, ভ্যান গগ্-এর মতো পাগলা গারদে তাঁর শোকাবহ পরিণতি হ'ল না। জোলা বন্ধুদের নিয়তি এড়িয়ে গেলেন। তাঁর সত্যদৃষ্টি এড়িয়ে যাবার শক্তি যোগালে। হাতড়ে বেড়াতে লাগলেন জীবনের মানে—মজুরশ্রেণীর দুঃখ-দারিদ্র্যে, চরম হতাশা আর ক্লেদাক্ত জীবনধারার মধ্যে খুঁজে পেলেন। ডারুইনী ক্রমবিকাশ, বংশগতি বুঝিবা যুগের পরিবেশে হার মানল। রোগোঁ-মাকার্ত উপকথার 'আদিম'-এর দলকে নতুন চোখ দিয়ে দেখলেন। যান্ত্রিক বস্তুতান্ত্রিকতা জোলার কাছে নতুন জীবনবেদ হয়ে দেখা দিলে। শুধু মানসিক বিকৃতিই আর বংশ পরম্পরার উপজীব্য হয়ে রইল না—বংশগতি শুধু চোর, জুয়াচোর, খুনে আর বেশ্যারই জন্ম দিলে না—এমন বংশধর দেখা দিলে—যে বংশগতির এই ধারা বেয়ে এসেও হ'ল সুস্থ মানুষ। তার পরিবেশ তাকে বদলে দিলে। 'জার্মিনালের' নায়ক এতিয়ে' এই সুস্থ মানুষ। ধনবাদ যে বিশ্বশিল্পের মহান বনিয়াদ গড়েছিল, যে শর্ত সৃষ্টি করেছিল—হয়তো তার সব শর্ত পূরণ হ'ল না—হয়তো জোলা এক 'মহান ব্যর্থতার' প্রমাণ হয়ে রইলেন—কিন্তু তবু তিনিই হলেন ক্রান্তিকারী উপন্যাসের প্রথম স্রষ্টা। 'জার্মিনাল' তাঁকে সে আসন দিলে—'জার্মিনাল' বেঁচে রইল। আজও আছে—থাকবেও।

'জার্মিনালে'র উপজীব্য কয়লা-কুঠীর দেশ খনি আর মজুর, আর কুলি-ধাওড়া। এরই রূপায়ণে জোলা হলেন মাধুকরী। ঘুরে ঘুরে বেড়ালেন ফ্রান্স আর বেলজিয়ামের খনি-এলাকায়। সেখানকার মজুরদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলেন। তাদের সুখ-দুঃখের ভাগীদার হলেন। তারা বলতে লাগল—কে জোলা ? ওঃ, ঐ যে যিনি শুধু জানতে চান—সেই ভদ্দর আদমী ? জোলা শুধু জানলেন না, বুঝলেন না; মাল-মশলা যোগাড় করলেন—টোক রাখলেন। দীর্ঘ ছ'মাস ধরে চলল মাধুকরী বৃত্তি। তাঁর টোক-বইয়ে সেদিনের কথা লেখা আছে। সঙ্গে সঙ্গে আছে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য :

ফল ব্যাপক হবে বলে দুই বিপরীত শিবিরকে যতদূর সম্ভব সুস্পষ্ট করে আমি ফুটিয়ে তুলব—তাদের নিয়ে যাব চরম সীমায়। এতে করে আমি খনির মজুরদের সমস্ত দুঃখ, তাদের নিয়তিকে রূপ দেব—সে-নিয়তি তো ওদের দলে-পিষে দিচ্ছে। আমি চাই তথ্য—ভাবাবেগের ওজুহাত নয়। খনির মজুরকে দেখাতে হবে দলিত-পিষ্ট, উপবাসী—অজ্ঞতার শিকার হিসাবে—দুনিয়ার নরকে তারা ছেলেমেয়ে নিয়ে দুঃখ সইছে—কিন্তু উপরওয়ালার দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছে না। উপরওয়ালাও তো এই বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থার দ্বারাই অভিভূত। আমি ওদের মানুষ করেই আঁকব—যতক্ষণ পর্যন্ত না ওদের স্বার্থহানির আশংকা দেখা দেয়। মজুর তো বর্তমান ব্যবস্থার শিকার—আর সে-ব্যবস্থা পুঁজি, প্রতিযোগিতা, শিল্পসংকটের দান...

এমনি করেই দুই শ্রেণীর সংঘাত দেখালেন। দুই পক্ষের কেউই এই হতাশাময় পরিস্থিতির জন্য দায়ী নয়—দায়ী সেই অজ্ঞাত ধনদেবতা—সে তো

তার রহস্যময় মন্দিরে ওত পেতে বসে আছে। তার পায়ে পড়ছে সর্বহারার মেদের অর্ঘ্য।

জোলা গঠনের ছক পেলেন, উপকরণ—মালমশলাও যোগাড় হ'ল—মতবাদও গড়ে উঠল। এবার কুখ্যাত দ্বিতীয় সাম্রাজ্যকে কেন্দ্র করে লিখলেন 'জার্মিনাল'। এই কুখ্যাত সাম্রাজ্যই নির্বাসন দিয়েছিল ভিক্তর হ্যুগোকে, এই সাম্রাজ্যই সেন্সরের নীল পেন্সিলকে খড়গের মতোই উঁচিয়ে ধরেছিল শিল্পী আর সাহিত্যিকদের উপর। কিন্তু তার সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন সমকালের ধনবাদ ও শ্রমের তীব্র দ্বন্দ্ব—আবার বিভিন্ন রাজনীতিক দলের সমাধানের প্রচেষ্টাগুলোকেও আমদানি করে বসলেন। মার্কস-প্রুধোঁ-বাকুনিনের মতবাদও ছত্রে ছত্রে দেখা দিলে। এককথায় দ্বিতীয় সাম্রাজ্য আর সমকালের মিলনে এক সংকর যুগ সৃষ্টি করলেন মঞ্চরূপে।

এই মঞ্চে আবির্ভূত হ'ল নায়ক এতিয়েং। সে কয়লা খনির মজুর নয়, কারখানার মিস্ত্রী। তার লেখাপড়া আছে, বুদ্ধিও নানা সংঘাতে তীক্ষ্ণ। বরখাস্ত মিস্ত্রী এল খনির গোলাম হতে। স্বাধীন শ্রমের অবমাননার সেও ভাগীদার, তাই আছে তার গভীর সমবেদনা—আবার এদের মূক আত্মসমর্পণেও আছে করুণা। খনি-জীবনের অন্ধকারে তলিয়ে সে দেখল এদের পশুর মত জীবন। এরাও শোষিত, বঞ্চিত, এদের দৈনন্দিন জীবন কাটে গোলামিতে—মজুরি যা পায় তাতে পেট ভরে না—ঋণ বাড়ে। কোন সুবিধে-সুযোগ নেই—নেই বিরাম মুহূর্তে কোন আনন্দ। তাই ওরা মদ খেয়ে পাঁড় মাতাল হয়—যৌনসম্ভোগে বিরাম উপভোগ করে। গির্জার প্রতি ওদের অচলা ভক্তি। কিন্তু গির্জা ধনবাদেরই দাস। তাই ধর্মযাজকরা খৃষ্টের অনুজ্ঞা ভুলে ধনবাদের তোষণে ব্যস্ত হয়ে থাকে। আবার মধ্যবিত্ত যাঁরা ওদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন—যেমন গ্রিগোয়েররা—তাঁরা দয়া-দাক্ষিণ্য ছাড়া কিছুই করেন না। সে-দয়ার আবার সুযোগ নেয় চতুরের দল। এমনি এই খনির গোলামদের হাল—তবু এরই মধ্যে আশার অংকুর দেখতে পেল এতিয়েং। সে হ'ল ওদের নেতা। সংঘাত শুরু হয়ে গেল। কিন্তু এ সংঘাত তো সরল নয়, জটিল। বক্তৃতামঞ্চের জঙ্গী জিগির তো নয়। মজুর আর উপরওয়ালা দুই পক্ষই সমাজ-ব্যবস্থার ঘূর্ণিতে পড়েছে। এক দল চায় হকের দাবি—আর একদল নিজেদের স্বার্থে সে-দাবি দলে-পিষে মাড়িয়ে যেতে চায়—উপেক্ষা করতে চায়। অন্য কেউ হলে হয়তো অতি বামপন্থীসুলভ ভাবাবেগে মজুরদের চরিত্রই বড় করে দেখাতেন—কিন্তু জোলা বাস্তববোধে উদ্দীপ্ত। তাই তিনি দু' দলেরই দোষ-ত্রুটি, মায়া-দয়ার কথা এঁকেছেন। ফ্রবেয়ারীয় ঘৃণাই শুধু উপরওয়ালার খেতাব হয়নি, বরং গোটা ধনবাদী সমাজের প্রতিই ঘৃণা ফুটে উঠেছে।

মজুরদের দল ঠিক 'ধোয়া তুলসী পাতা' নয়। এদের মধ্যেও আছে পিয়েরোঁ, আছে লেভাকরা—আছে রাসেনাররা। এমন কি এতিয়েংও এ-ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। আর আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি প্লুচার্ত তো মজুরদের স্বার্থ বলি দিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ সংগঠনে ব্রতী। জোলার নির্মম কশাঘাত এদের উপর এসে পড়েছে, কাউকে তিনি রেয়াত করেননি। আবার ঢালের উলটো পিঠও আছে। সেখানে উপরওয়ালাদের ভিড়। সেখানেও ধনবাদী যুগের পাপ ঢুকেছে। হানাবুর জীবনই তো তার প্রমাণ। তাঁর

গৃহ ব্যভিচারের আগার হয়ে উঠেছে—মালিকের হুকুম তামিল করে তিনি তাঁর রুজির যোগাড় করছেন। তিনি ধনবাদের ক্রীতদাস। দেনেউলিঁও তাই। তিনি খনিতে উন্নতিপ্রণালী আমদানি করেছেন, মজুরদের দ্বারাও তিনি সম্মানিত। কিন্তু তবু তিনি ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন। এঁরাও মানুষ—এরা শয়তান নয়। কিন্তু এরাও সেই অজ্ঞাতশক্তির দাস—যার নামান্তর ধনবাদ। তাই হানাবু মালিক তোষণেই ব্যস্ত, আর দেনেউলিঁও ধর্মঘটে নিজের স্বার্থহানির ভয়ে শঙ্কিত। তবু যুগের বিরোধ সবচেয়ে বেশি ফুটে উঠল—ইঞ্জিনিয়ার নিগ্রেলের চরিত্রে। সে কামুক, ব্যভিচারী, মজুরের প্রতি দরদহীন—কিন্তু সে মজুরদের দুর্দশার ভিতরে অবশেষে খুঁজে পেল তার মানবতাবোধ। তার চিরশত্রু এতিয়েঁর উদ্ধারে মানবতা জয়যুক্ত হ'ল।

জোলা 'জার্মিনালের' উপসংহার টেনে দিলেন ধ্বংসে। খনির নীচে মজুরদের জীবন্ত সমাধি হ'ল। সেই ধ্বংসস্তূপে প্রাণ দিলে সাভাল, জাচারি ক্যাথেরিন আরো অনেকে। কিন্তু ক্যাথেরিন সেই মৃত্যুর মধ্যেও খুঁজে পেল তার হারানো প্রেম। আর এতিয়েঁ পেল এই পরাজয়, এই ধ্বংসের মধ্যে নতুন জীবনের সম্ভাবনা। মজুররা পরাজিত হ'ল বটে, কিন্তু মঁতসুর বিজয়ী মালিকের দলের তো তাতে শান্তি নেই। একদিন না একদিন তাদের পুঁজির এই প্রাকার ধসে পড়বেই, মিলিয়ে যাবেই—যেমন করে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল লা ভোরো। তাইত আশার বাণী উচ্চারিত হ'ল জোলার—মাভে!

মানুষ অংকুরিত হয়ে উঠছে—একদল বিপ্লবী সেনা লাঙলের খাতে-খাতে ধীরে ধীরে উদ্গত হচ্ছে—তাদের ফসল ফলবে আগামী যুগে—তাদের উদ্গমে মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

'জার্মিনাল' জোলার অমর সৃষ্টি। এখানে তিনি সে-যুগের মজুর জীবনের দুঃখের পাঁচালি গেয়েছেন, তাদের পশুর মতো জীবনধারা মূর্ত করে তুলেছেন—আবার সঙ্গে সঙ্গে শুনিয়েছেন আশার বাণী। আজ ধনতন্ত্রের যখন নাভিশ্বাস উঠছে, একালেও সে-জীবনী রূঢ় নিষ্ঠুর, ভয়াল সত্যধর্ম নিয়ে বেঁচে আছে, আজও ধনবাদী সভ্যতার মুখোশ খুলে দিচ্ছে। জোলার আসন সমসাময়িকতায়ও সে টিকিয়ে রেখেছে। শুধু টিকিয়েই রাখেনি, চিরস্থায়ী করে তুলেছে। একালের বিখ্যাত সমালোচক ও সাহিত্যিক আঁদ্রে জিদ তাঁর বিখ্যাত রোজনামচা জার্নালে 'জার্মিনালে'র উল্লেখ করেছেন—এ বই পড়ে তিনি বিস্মিত। তিনি তো বিশ্বাস করতেই পারেননি যে, এ বই ফরাসী ভাষায় লেখা—শুধু তা কেন—এ বই যে, কোন ভাষায় লেখা হতে পারে সে সম্বন্ধেই তাঁর ঘোর অবিশ্বাস। এযেন আন্তর্জাতিক ভাষায় বিশ্বের সমগ্র মানুষ জাতির জন্য রচিত এক মহাগ্রন্থ।

কিন্তু জোলা জীবিত অবস্থায় এ সম্মান পাননি। সে-কালের সমালোচকরা তাঁর জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও তাঁকে সাহিত্যে অপাংক্তেয় করে রেখেছিলেন। ব্রুনোতিয়েঁ তো তাঁকে আক্রমণের যুতসই কড়া ভাষা খুঁজে পাননি; সেরের তাঁর নাম উচ্চারণ করলেও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন। এমন কি তাঁর অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু আনাতোল ফ্রাঁসও একদা এই উক্তি করেছিলেন—জোলা না জন্মালেই ভাল ছিল। কিন্তু তবু সে-যুগেও 'জার্মিনাল' প্রকাশের পরে জোলা কারো

কারো অভিনন্দন লাভ করেছিলেন। ফরাসী সাহিত্য আকাদেমির দ্বারা স্বীকৃত সমালোচক ফাগে বলেছিলেন, জোলা যে কেন জনপ্রিয় একথা হয়তো আগামীর মানুষ বুঝতে পারবে না, কিন্তু তবু তারা 'জার্মিনালে' জোলাকে চিনবে গণতন্ত্রের বীরপ্রতীক রূপে। একালে একথা সত্য, বেশি করে সত্য। তাই জোলার জার্মিনালকে আজ ফরাসী—তথা বিশ্বসাহিত্যের দশখানির একখানি উপন্যাস বলে ফতোয়া দিয়েছেন আঁদ্রে জিদ। আর-একজন সমালোচক একে বলেছেন সমাজবোধের কাব্য। বিখ্যাত মনীষী হ্যাভলক এলিস, যিনি প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইংরাজী অনুবাদের দাবিদার—তাঁর কথায় এতো শুধু কাব্য নয়—এক মহা গদ্যকাব্য—এর সঙ্গে পৃথিবীর পদ্য মহাকাব্য ক'খানিরই একমাত্র তুলনা হতে পারে।

বাংলা সাহিত্যে জোলা অপরিচিত নন। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে তাঁর 'নানা'র সংক্ষিপ্ত অনুবাদ প্রকাশিত হয়। জোলা সেই থেকেই আমাদের সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু সে-পরিচয়ে তিনি ছিলেন সাহিত্যের জমাদারগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত। 'নর্দমা-পরিদর্শক' রেনল্ডেরই সমগোত্রীয়। তাঁর সত্য পরিচয় চেপে রেখে চমকপ্রদ বিজ্ঞাপনের ফুলঝুরিতে প্রকাশক সেদিন পাঠককে জোলার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর সত্য ধর্ম আড়ালে পড়ে গিয়েছিল, রিরংসারই ফলাও প্রকাশ দেখা দিয়েছিল। জোলা হয়ে উঠেছিলেন অপাংক্তেয়, অশ্লীল। এর কারণ যে না ছিল তাও নয়। তখন ইংরেজ ছিলেন আমাদের দৃষ্টির নেতা। তাঁদের ফরাসী-বিদ্বেষ রাজনৈতিক কারণে ছিল ধূমায়িত, বহ্নিমান। সেই বিদ্বেষের ফলেই ফরাসী-সাহিত্যকে তাঁরা রিরংসা-সাহিত্য বলে জাহির করেছিলেন—যদিও তাকে অপাংক্তেয় বলে বাতিল করে দিতে পারেননি। এর মূলে যে শুধু রাজনীতিক বিদ্বেষই কাজ করেছিল তা নয়, ভিক্টোরিয়া যুগের প্রুডারী হয়তো বা ছিল। আমরা তো তারই ওয়ারিশ। তাই ফরাসী সাহিত্যের সত্যধর্ম আমরা বুঝতে চাইনি—মিলিয়ে দেখতে চাইনি নিজেদের জীবনবোধের সঙ্গে। এবিষয়ে প্রথম বোধ হয় চোখ ফুটিয়ে দেন বীরবল—প্রমথ চৌধুরী মহাশয়। মোপাসাঁর শিল্প-কৌশলের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ঘটকালি করেন। ন্যাচারিলিজম বা বস্তুতান্ত্রিকতার জৈব থেকে অন্য দিকটার দিকে এইভাবেই আমাদের নজর পড়ে। কিন্তু জোলা তবু পাংক্তেয় হতে পারেননি। নানার 'পঙ্গু' সংস্করণই একমাত্র তাঁর নামের নিশানা হয়ে ছিল।

যাহোক, দেশের স্বাধীনতা লাভের পর দেখা যাচ্ছে জোলা আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছেন বাংলাসাহিত্যের দরবারে। এবং জোলার কয়েকখানি বইয়ের অনুবাদও পর-পর প্রকাশিত হয়েছে। আরো হবে। কিন্তু এই প্রকাশিত বইগুলি জোলার জীবনবাদের, বাস্তববোধের সম্পূর্ণ দলিল নয়। সে শর্তগুলি একমাত্র পূর্ণ করতে পারে 'জার্মিনাল'। তাই 'জার্মিনালের' পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ পাঠক-সমাজের কাছে পেশ করা গেল। আনাতোল ফ্রাঁস জোলার মৃত্যুর পরে বলেছিলেন—জোলা মানবজাতির বিবেকের একটি পরম মুহূর্ত—সেই পরিচয় তাঁরা জার্মিনালের এই অনুবাদ পড়ে পেলে শ্রম সার্থক মনে করব।

আর একটা কথা। এই বইয়ের একখানি অতি-সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেছিলেন স্বর্গত বিমল সেন। তিনি সংঘাতেরই পরিচয় দিয়েছিলেন মাত্র। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ এই প্রথম। অনুবাদ করতে গিয়ে খনিবিষয়ক পরিভাষা নিয়ে বিব্রত হতে হয়েছে। বহু জায়গায়ই ইংরেজি শব্দগুলি রাখতে হয়েছে—আবার সঙ্গে সঙ্গে পরিভাষাও বহু জায়গায় যোগ করা হয়েছে। এ-বিষয়ে বাংলা সাহিত্যে কয়লাকুঠীর জীবন যিনি প্রথম আমদানি করেন—সেই শ্রদ্ধেয় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে ঋণ স্বীকার না করে পারছি না। অতি বিস্তারেন অলং।

মে দিবস, ১৯৫৫ — অশোক গুহ
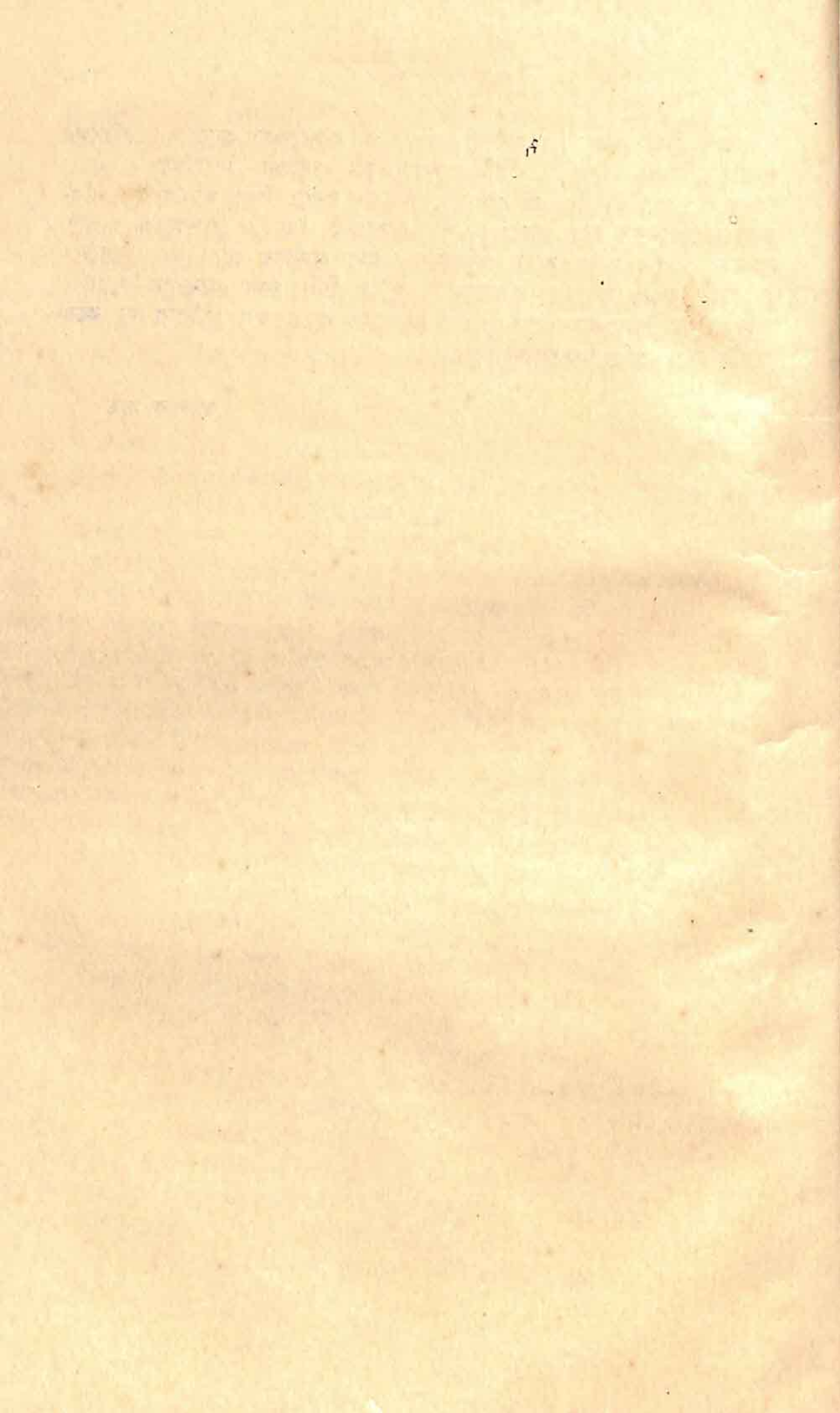
সম্ভাবনার পথে

প্রথম ভাগ

এক

নিকষ-কালো রাত; তারা নেই। মার্সিয়েনে থেকে মঁতসু পর্যন্ত যে দশ ক্রোশ বাঁধানো সড়ক খাঁখাঁ-মাঠ আর বীট খেতের ভিতর দিয়ে সোজা চলে গেছে, সেই পথে চলেছে একা একটি মানুষ। অন্ধকারে সুমুখের পথ ঠাহর হয় না। মার্চ মাসের জোরাল হাওয়া সমুদ্রে ঝড়ের মতো প্রচণ্ড বেগে বয়ে চলেছে, তারই অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ছে; আর আছে মাইলের পর মাইল জোড়া জলা আর নগ্ন রিক্ত প্রান্তর থেকে বয়ে আসা কনকনে ঠাণ্ডা—দুয়ে মিলে অসীম এক দিগন্তের চেতনা জাগিয়ে তুলছে তার মনে। কোথাও একটি গাছপালা নেই, আকাশ ঢেকে দেয়নি তার কালো ছায়ায়, আর বাঁধানো সড়ক কালো ছায়ার উত্তাল সাগরের ভিতর দিয়ে জাহাজঘাটার মতো বিছিয়ে পড়ছে।

মার্সিয়েনে থেকে লোকটি বেরিয়েছিল প্রায় বেলা দুটোয়, সেই থেকে হেঁটেই চলেছে। ছেঁড়া সুতী কোট আর করডুরয় ট্রাউসার তার পরনে। শীত মানে না, ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে চলেছে। ডুরে রুমালে বাঁধা ছোট্ট পুঁটলিটি নিয়েই ওর যত মুশকিল। একবার এ-কনুই দিয়ে বুকে চেপে ধরছে, আবার ও-কনুই দিয়ে। হাত পকেটে পুরে রাখতে হয়েছে বলেই এই ব্যবস্থা। হাত তো অবশ হয়ে গেছে, ফেটে গেছে। ও বেকার, গর্-ঠিকানিয়া। এখন শুধু মনে ওর এক ভাবনা—এক আশা—কখন ফুটবে দিনের আলো, কখন কমবে শীত। আরো ঘণ্টাখানেক এমনি করে চলে সে মঁতসুর দু ক্রোশের মধ্যে এসে গেল। এবার বাঁ দিকে দেখা দিল আগুনের লাল আভাস—মনে হয় যেন তিনটে বিরাট তাওয়া জ্বলছে শূন্যে। সে ভয়ে থেমে পড়ল, কিন্তু হাত-পা সেঁকে একটু চাঙ্গা হয়ে নেবে—এ লোভ তখন তার দুর্ণিবার হয়ে উঠেছে।

সোজা পথ এবার নামল গাড়ায়। আগুনের তাওয়া উধাও হয়ে গেছে। ডান ধারে এখন এক বেড়া দেখা যাচ্ছে। গাদা গাদা কাঠের দেয়াল—একটা রেললাইন

বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বাঁ দিকে দেখা যাচ্ছে খানিকটা সবুজের আভাস। উপরে ছাউনির চিহ্ন। গ্রাম বলে মনে হয়। লোকটি আরো কিছুটা এগিয়ে গেল, এবার বাঁক ঘুরল, আর হঠাৎ আলো আবার দেখা দিল। এবার যেন আরো কাছে। কিন্তু ও বুঝতে পারলে না কালো আকাশে কি করে জ্বলছে ঐ তাওয়া—কি করে ওরা ধোঁয়া-ঢাকা চাঁদের মতো ঝুলে আছে। কিন্তু চোখ সেদিকে নেই—মাটির দিকে। ঘন সন্নিবিষ্ট ছোট ছোট বাড়ির সার, তার উপরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে কারখানার চোঙের অস্পষ্ট আকৃতি। এখানে ওখানে জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে, আর বাইরে পাঁচটা কি ছ'টা লণ্ঠন মিয়নো আলো মেলে ঝুলছে এক বিরাট কালিঝুলপড়া কাঠের ভারায়। দেখে মনে হয় যেন সাঁকোর সারি সারি ফ্রেম দাঁড়িয়ে আছে। অদ্ভুত দৃশ্য—ধোঁয়ায় ধোঁয়াময়। আর সেখান থেকে ভেসে আসছে একটি মাত্র শব্দ। ভারী আওয়াজ—এক অদৃশ্য নিঃসরণ নলের ধুক্‌ধুকানি।

ও এবার বুঝতে পারল। এই পিট। অস্বস্তি বেড়ে গেছে। ফায়দা কি? ওখানে নিশ্চয়ই কাজ নেই। বাড়িগুলোর দিকে না গিয়ে ও এগিয়ে এল যেখানে পিটের জঞ্জাল জমা হয়ে আছে—সেখানে। সেখানে আগুনের তিনটি কুণ্ড জ্বলছে। মজুররা পাবে আলো আর তাই এ ব্যবস্থা। গাঁইতি-চালিয়েরা অনেকক্ষণ ধরে বোধহয় কাজ করেছে, এখনো জঞ্জাল আনা হচ্ছে। মজুররা বালতির পর বালতি কুণ্ডের কাছে কাছে উজাড় করে দিয়ে যাচ্ছে।

একটা কুণ্ডের কাছে সে পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে বললে, সেলাম!

বুড়ো গাড়োয়ান। গায়ে তার বেগুনে রঙের জামা, মাথায় ফেল্টের টুপি। আগুনের দিকে পিঠ ফিরে সে দাঁড়িয়ে আছে। ওর মস্ত পাঁশুটে রঙের ঘোড়াটা পাথুরে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে, ছ'টা বালতি সে বয়ে এনেছে। খালাসের প্রতীক্ষায় আছে। কিন্তু খালাসীর তাড়া নেই। রোগা লোকটা আধো ঘুমন্ত যেন, আস্তে আস্তে হাতল ধরে চাপছে। উপরে কনকনে হাওয়া জোরাল হয়ে উঠল, গতিবেগ তার বাড়ছে, কাস্তের মতো তার চোপ্।

সেলাম, বুড়ো জবাব দিলে।

ছেদ। বিরূপ চাউনি দেখে ও তাড়াতাড়ি নিজের পরিচয় দিলে।

এতিয়েঁ লাতিয়েঁ আমার নাম। আমি কলের কাজ জানি। এখানে কোন কাজ আছে?

কুণ্ডের আলোয় ওকে দেখা যায়। মনে হয় একুশ বছরখানেক বয়েস হবে। রং তামাটে, সুশ্রী, ছিপ্‌ছিপে গড়ন তবু দেখে মনে হয় তাকত আছে।

বুড়ো মাথা নাড়ল। নিশ্চিত সে, কাজ নেই।

কলের কাজ? না, কালই তো দুজন এল। না, নেই।

হাওয়ার ঝাপটায় ওর কথায় ছেদ পড়ল। এতিয়েঁ বাড়িগুলির দিকে দেখিয়ে বললে, পিট না?

বুড়ো কাশির দমকে চট্ করে জবাব দিতে পারলে না। এবার খানিকটা গয়ার ফেলে দিলে। আলোয় আলো মাটিতে গয়ার যেন কালো দাগ হয়ে ফুটে উঠল।

হুঁ, পিট তো বটি, লা ভোরো। ঐ তো ধাওড়া।

ও আঙুল দিয়ে অন্ধকারে দেখিয়ে দিলে ধাওড়ার দিকে। এতিয়েং আগেই আঁচ করেছিল। এবার ছ'টা টব খালাস হয়ে গেল। এবার গাড়ি চলেছে, ঘোড়া খেয়াল-খুশিতে চলেছে, রেলের লাইনের ভিতর দিয়ে। চাবুক হাঁকড়াবার দরকার নেই। ওর লোম খাড়া হয়ে উঠছে দমকা হাওয়ায়। বুড়ো চলেছে পেছনে বেতো পা টেনে টেনে।

অবশ ফাটা হাত সেঁকে নিচ্ছে আগুনে এতিয়েং, এদিকে লা ভোরো যেন জেগে উঠল স্বপ্ন থেকে। এখন তার প্রতিটি খুঁটিনাটি চোখে পড়ে। ত্রিপল-ঢাকা শেড, বিরাট কলঘর, পাম্প-ঘরের বুরুজ। ইঁটের বাড়িগুলো গাদাগাদি হয়ে ভিড় জমিয়ে বসেছে, আর চোঙটা যেন এক অশুভ নিনাদের শিঙা। পিট দেখেও অমঙ্গল ঘনিয়ে আসে মনে—এক ভূরিভোজী পশু যেন দুনিয়াকে গ্রাস করবার জন্য ওত পেতে আছে। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল আর ভাবছিল নিজের কথা। গত সপ্তাহে চাকরির খোঁজে হন্যে হয়ে সে ঘুরেছে, কাটিয়েছে ভবঘুরে জীবন। রেলের কারখানায় ফোরম্যানকে সে কয়েক ঘা লাগায়, লাথি খেয়ে লিল্ থেকে চলে এল, তারপরে তো সব জায়গায়ই পাওনা হয়েছে লাথি। শনিবার সে এসে পেঁছিয় মার্সিয়েনে—সেখানে শুনল ফোর্জে কাজকর্মের সুবিধে হতে পারে; কিন্তু ফোর্জে কাজকর্ম পেল না, সোনেভিলের কারখানায়ও না। রোববার দিনটা এক গাড়ির চাকাওয়ালার আঙিনার কাঠের গাদায় লুকিয়ে কেটেছে। তারপর রাত দুটোয় সেখান থেকে চৌকিদারের তাড়া খেয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়। সম্বল কিছু নেই—আধলাও না, এক টুকরো রুটিও না। এখন কি করবে? শুধু আছে পথ। কিন্তু গন্তব্যস্থান নেই—জানে না দমকা হাওয়া থেকে কোথায় মাথা গোঁজার ঠাঁই পাবে? হাঁ, খনি তো দেখতেই পাচ্ছে, এখানে ওখানে পড়ছে লণ্ঠনের আলো। একটা দরজা হঠাৎ খুলে গেল; অমনি জ্বলন্ত ফার্নেসের আলো ঝলক্ দিয়ে গেল। হাঁ, খনিই বটে। পাম্পের নিঃসরণ, দীর্ঘ একঘেয়ে ধুক্‌ধুকানি, সব টের পাচ্ছে। দানবের নিশ্বাসের মতো ওর শব্দ।

যে মাল খালাস করে নিচ্ছে, সে একবারও এতিয়েং-র দিকে তাকায়নি। এতিয়েং এবার তার পুঁটলিটা তুলে নিলে। আবার কাশির দমক। বোঝা গেল গাড়ি নিয়ে আসছে বুড়ো। আস্তে আস্তে ছায়ার ভিড় থেকে বেরিয়ে এল সেই পাঁশুটে রঙের ঘোড়া। এবার টেনে এনেছে ছ'টা ভর্তি গাড়ি।

মঁতসুতে কোন কারখানা আছে কত্তা? এতিয়েং শুধাল।

বুড়ো খানিকটা কালো গয়ার ফেলে চেঁচিয়ে বললে, কলকারখানার কি অন্ত আছে। তাতে ভুল নেই। দু-তিন বছর আগে এলে দেখতে কল চলছে তো চলছেই, কাজের মানুষের অভাব। আর মুনাফাও তখন জোর। কিন্তু এখন তো আমরা পেটে বেল্ট ক'ষে আছি। সারা তল্লাট খাঁখাঁ করছে। ফোঁত হয়ে গেছে। কারখানাগুলোর দরজা বন্ধ, আর হরদম লোক ছাঁটাই চলছে। কি জানি রাজার দোষ কি না। কিন্তু উনি কি বলে ইয়াঙ্কি মুলুকে লড়তে গেলেন! কলেরায় যে কত মানুষ আর গরু টাঁসলো তার কি ঠিক আছে!

ছোট ছোট কথায় ওরা বলে চলেছে, দমকা হাওয়া এসে দিচ্ছে দম্ আটকে। এতিয়েং বলে গেল এক হপ্তার ব্যর্থ ভবঘুরে জীবনের কথা? সে কি উপোস করে মরবে? পথে তো আর ক'দিন পরে ভিখারী ছাড়া আর কিছু থাকবে না।

বুড়োও সায় দিলে। হাঙ্গামা একটা বাঁধবেই, ভাল মানুষদের তো আর রাস্তায় ওদের ফেলে দিতে পারবে না!

—রোজ মাংস মেলে না।

—আরে মাংস রাখ, রুটিই কি রোজ মেলে...

—হাঁ, সাচ্ কথা! রুটিই যেন রোজ মেলে...

ওদের কথা ভেসে গেল দমকা হাওয়ায়। হাওয়ার গোঙানিতে মিশে এখন শুধু সে তো চীৎকার আর গোঙানি।

বুড়ো হঠাৎ দক্ষিণ দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, দেখ, দেখ, ঐ মংতসু দেখ! হাত বাড়িয়ে দিয়ে সে অন্ধকারের আড়ালে অদৃশ্য জায়গাগুলি দেখিয়ে দিলে, আর একে একে নাম বলতে লাগল। এই তো এদিকে ফবিলের চিনির কলে এখনো কাজ চলছে, কিন্তু হটনের চিনির কলে ছাঁটাই হয়ে গেছে—শুধু এখনো কিছু কাজ চালু আছে দুতেলিলের ময়দার কলে আর ব্লিউজের তারের কারখানায়। তারপরে সে হাত দিয়ে উত্তর দিক দেখিয়ে দিলে। সোনেভিলে আগের তিন ভাগের দু-ভাগও কাজ নেই—ফোর্জের কারখানায় তিনটে ব্লাস্ট ফার্নেসের মধ্যে দুটো এখন শুধু জ্বলে। গাইবোয়া কাচের কারখানায় ধর্মঘটের হুমকি দিয়েছে মজুররা—মজুরি কাটার কথা চলছে সেখানে।

এতিয়েং এক-একটা খবর শুনছে আর বলছে, জানি, আমি তো ওদিক থেকেই এলাম।

বুড়ো বললে, আমাদের এখানে এখন অবধি টিকে আছি। কিন্তু খনিতে এখন মাল উঠছে কম।

আবার থুথু ফেললে বুড়ো, তার পর চলে গেল শূন্য টবগুলির সঙ্গে জোতা ঘুমন্ত ঘোড়াটার কাছে।

এতিয়েং এবার সারা তল্লাটের পরিচয় পেয়ে গেল। এখনও অন্ধকার মিলিয়ে যায়নি—বেশ ঘনই আছে, কিন্তু বুড়ো সেই অন্ধকার ভরে দিয়ে গেছে দুঃসহ দুঃখে। এখন, তো এই অসীম বিস্তৃতিতে সে যেন তাকে ঘিরে ফেলেছে, ছেয়ে ফেলছে। এই যে মার্চের প্রবল বাতাস—সে কি এই রিক্ত দেশের উপর দিয়ে বয়ে নিয়ে এল না আকালের নিষ্ঠুর চীৎকার? হাওয়া প্রবল হয়ে উঠল, সে সমস্ত শ্রমের মৃত্যু বুঝি ঘনিয়ে নিয়ে এল—নিয়ে এল এক মহা বুভুক্ষা—মানুষ তো এই বুভুক্ষায় শত শত মরবে। ও চোখ চালিয়ে দিলে, এই আঁধারের পর্দা ছিঁড়ে ও দেখতে চায়। দেখার জন্যে অস্বস্তি যেমন আছে, তেমনি বুঝি আছে ভীতি। সব কিছু তলিয়ে যাচ্ছে অজানা অন্ধকারে, শুধু চোখে পড়ে দূরের ব্লাস্ট ফার্নেস আর কয়লার চুল্লিগুলো শুয়ে শুয়ে চোঙ উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—ঢালু হয়ে সারবন্দী চলে গেছে লাল আগুনের শিখা। বাঁদিকে দুটো ব্লাস্ট ফার্নেস দুই বিরাট মশালের মতো আকাশের নীলে জ্বলছে। দেখে মনে হতাশা ঘনিয়ে আসে—মনে হয় যেন বাড়িতে আগুন লেগেছে, তাই দেখছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠুঁটো মানুষ। এখানে শুভ কিছু নেই, সমতল নগ্ন দিগন্তে শুধু আছে ত্রাস, আর আছে এই কয়লা আর লোহার দেশের আকাশে একমাত্র তারা ব্লাস্ট ফার্নেস আর চুল্লির আলো।

বুড়ো আবার ফিরে এল। এসে শুধাল, তুমি বেলজিয়ামের লোক—তাই না?

এবার তিনটে টব নিয়ে এসেছে। খাঁচায় একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। একটা নাট না বল্টু ভেঙে গিয়ে সে এক ফ্যাসাদ। এখন তো মিনিট পনেরো কাজ বন্ধ; যাহোক তিনটে টব খালাস করতে সে এসেছে। সাড়াশব্দ নেই, সব সুনসান, মজুরদের আসা-যাওয়া বন্ধ। শুধু নীচে ধাতুর পাতের উপর উঠছে হাতুড়ির শব্দ।

না, আমি দোখ্‌নো মানুষ, এতিয়েং উত্তর দিলে।

টব খালাস করে দিয়ে সেই রোগা লোকটা এবার বসে পড়ল। দুর্ঘটনায় সে খুশী। এখনো মুখখানা তার গোমড়া, কথা নেই মুখে। বুড়োর দিকে সে বড় বড় ড্যাবডেবে চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। যেন ওদের আলাপে সে বিরক্ত। বুড়োও তেমন আলাপী নয়। বুঝি বা ছোকরার মুখ দেখে ভুলেছে বুড়ো, আর পেয়ে বসেছে নিজের কথা বলার অভ্যেস। এমনি ধারা তো বুড়ো-দের হামেশাই হয়। ওরা যখন একা থাকে, তখনো আপন মনে জোরে জোরে বকে যায়।

বুড়ো বললে, আমি মংতসুর মানুষ, নাম বনেমোর।

ঐটেই আসল নাম নাকি? এতিয়েং অবাক।

বুড়ো খুশীতে দাঁত বার করলে। লা ভোরোর দিকে দিলে দেখিয়ে।

হাঁ, হাঁ...তিন তিনবার ওখান থেকে টুকরো টাকরা হয়ে উঠে এনু। একবার তো গায়ের যত চামড়া একেবারে ভাজাভাজা হয়ে গেছল, একবার তো পেটের থলিতে মাটি ভর্তি হয়ে গেল—আর তিনের দফায় পেট ফুলে ব্যাঙের মতো ঢাউস হয়ে উঠল। ওরা যখন দেখলে, এতবারেও পটল তোলার আমার ইচ্ছে নেই, তাই ঠাট্টা করে আমার নাম দিলে বনেমোর।

বুড়োর রঙ আর ফুরোয় না, বাড়ছে তো বাড়ছেই। তেলের অভাবে কপি-কলে যেমন ক্যাঁচকোঁচ শব্দ হয় তেমনি কথা, শেষে আবার কাশির দমকে কথা থেমে গেল। তাওয়ার আগুনে ওর চেহারা দেখা যাচ্ছে। মস্ত বেঢপ মাথা, কয়গাছা চুল, তাও সাদা। বেঢপ গড়ন, ফ্যাকাশে রং, নীল শিরা জেগে আছে। বেঁটে খাটো মানুষটি, গর্দান বেশ মজবুত, গোদা পা, লম্বা দুখানি হাত। ঘোড়ার মতো সেও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, হাওয়ার বেগে খেয়াল নেই। মনে হয় যেন পাথরের মূর্তি—ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যাচ্ছে কানের পাশ দিয়ে শিস দিতে দিতে—সে খেয়াল ওর নেই। ঠাণ্ডায় ও বুঝি কাবু নয়। ও আবার কাশছে, মনে হয় এক বিরাট শকুনি যেন ডানা ঝাপটানি তুলেছে ওর শরীরে, ছিঁড়ে-খুঁড়েই বুঝি ফেলবে। এবার গয়ার ফেলল। কালো হয়ে গেল জমি।

এতিয়েং একবার ওর দিকে তাকাল, আর একবার গয়ার-কালো জমির দিকে।

বহুৎ দিন কাজ হ'ল বুঝি কর্তা?

বনেমোর হাত দুটো উপরে তুলে ঝাঁকুনি দিলে।

বহুৎ দিন? হাঁ, তা হ'ল বটে! আট বছরও বয়েস নয়, তখন খাদে নামলাম—আর এখন তো আটান্ন হ'ল। গুনে দেখ...সব কাম করেছি... প্রথম ছিলাম ফাই-ফরমায়েস খাটা ছোকরা, তার পরে জোয়ান বয়সে খাঁচা টেনেছি—তারপর আঠারো বচ্ছর গেল খনির ভিতরে কাজে। এবার পা অবশ হয়ে গেল, গাঁইতি-চালিয়ের দলে ভর্তি হলাম, মাল বোঝাই করলাম, মেরামতির

কাজ করলাম—তারপরে ওরা আমাকে নিয়ে এল উপরে। ডাক্তার বললে কিনা, আর বেশীদিন নীচে থাকলে ওখানেই গোরে যাব। সেও পাঁচ সন আগের কথা। এখন গাড়ি চালাই। পঞ্চাশ বচ্ছর খনির কাজ করছি—প'য়তাল্লিশ বচ্ছর ঝাড়া খনির মধ্যে কেটে গেল! খুব একটা খারাপ কাজ নয়—কি বল ছোকরা?

ও কথা বলছে, আর জ্বলন্ত এক-আধখানা কয়লা ঠিক্‌রে পড়ছে তাওয়া থেকে—ফ্যাকাশে মুখ রক্তের মতো লাল হয়ে উঠছে।

ও বলে চলল, ওরা বলে এবার নাকি জিরোবার পালা এল। কিন্তু আমি জিরোতে চাই না। ওরা আমাকে কি ঠাওরায়? আরো দু বচ্ছর টি'কে থাকব তাহলেই পাকা ষাট বচ্ছর পুরবে। তখন ১৮০ তন্কা ভাতা আমার মারে কে! আজ যদি চলে যাই, ওরা এখুনি দেড়শো তন্কা দিয়ে বিদেয় দেবে। ঐ পাজি-দের চাল আমি বুঝিনে! এখনো শক্ত আছি, তবে পা-খানা গেছে এই যা। জলে জলে সোঁত ধরে গেছে। মাঝে মাঝে পা-ই নাড়তে পারিনে!

আবার কাশির দমকে থেমে গেল কথা।

এতিয়েঁ বললে, আর তাই এত কাশি!

বুড়ো জোরে মাথা নাড়ল। একটু সুস্থ হয়ে আবার বললে, আরে কাশি তো গেল মাসে হ'ল। আর দেখ কান্ড—খালি থু থু করে গয়ার ফেলি ...আবার গলা খাঁকারি দিয়ে ও গয়ার ফেলল।

রক্ত নাকি? এতিয়েঁ সাহস করে শুধাল।

বনেমোর হাতের চেটোয় মুখখানা আস্তে আস্তে মুছে ফেলল।

রক্ত নয়, কয়লা। এত কয়লা খোলটায় ঢুকেছে যে শেষ দিন অবধি চাঙগা হয়েই থাকব। কিন্তু পাঁচ বচ্ছর তো খনির তলায় যাইনি। কি জানি, অনেক বুঝি পুঁজি করেছিলাম। যাহোক, ওতে ক্ষেতি নয়, তাকত ঠিক আছে।

বিরতি। পিটের ভিতরে থেকে ভেসে আসছে হাতুড়ির শব্দ। হাওয়া এখন গোঁঙিয়ে ফিরছে। এ যেন রাতের বুকের ক্লান্তি আর বুভুক্ষার কান্না। আগুনের শিখা দপ্‌ করে উঠছে জ্বলে, তারই আলোয় স্মৃতির রোমন্থন চলছে বুড়োর। সেদিনের কথা তো নয়, তারা শুরু করেছিল কাজ। শুরু থেকেই তার পরিবার ম'তসুর এই খনির কাজে লেগে গেছে। সেও বহুদিনের কথা। একশো ছ' বছর হয়ে গেল। বুড়ো দাদু গিয়োম মেয়ু তখন পনেরো বছরের ছোকরাটি। কোম্পানির প্রথম পিট রিকুইলারে সে পেল নরম কয়লার সন্ধান। সে পিট এখন ফাবিলের চিনির কলের কাছে পরিত্যক্ত পড়ে আছে। এ তল্লাটে সবাই তা জানে, তার প্রমাণও আছে। সবাই বলে ওটা গিয়োমের পিট—ওর দাদুর নামে তার নাম। সে নিজে তাকে দেখেনি। লোকে বলে মস্ত জোয়ান মরদ ছিল, ষাট বছর বয়সে মারা যায়। তার পরে তার বাপ নিকোলাস মেয়ু—ডাক নাম তার লালু। সে লা ভোরোর খনির তলায় চল্লিশ বছর বয়সে রয়ে গেল। ওরা খুঁড়ছিল, হঠাৎ ছাদ ধসে পড়ল, একেবারে চেপ্টে গেল নিকোলাস মেয়ু। ওখানকার কয়লা-পাথর চুষে খেল তার রক্ত, তার হাড় ক'খানাও গিলে ফেলল। তার পরে তার দুই খুড়ো আর তিন ভাই ওখানেই কাবার হয়ে গেল। আর সে ভিন্‌সেন্ট মেয়ু তো বুড়ো ঘুঘু, সে কিনা একেবারে আস্ত উঠে এসেছে, শুধু পা-খানায় ধরেছে সোঁত, কি করা যাবে বল?

মেহনতি তো করতেই হবে। বাপ থেকে ছেলে এই কাজ করে আসছে—এও এক পেশা। তার বেটা ত্সান্ত মেয়ুও তো নিজেকে এই কাজে তিলে তিলে নিঃশেষ করে দিচ্ছে—তার নাতিরা—তার পরিবারের সবাই তাই করছে। সবাই ঐ গাঁয়ে—ঐ ধাওড়াতে থাকে। একশো ছ'বছর খনির কাজ চলছে, বুড়োরা যাচ্ছে, আসছে বাচ্চারা—সবাই একই কোম্পানির গোলাম। অমন যে বাবু-ভায়ারা তারাও কি এমন কুলুজি আওড়াতে পারে!

এতিয়েং অস্ফুটস্বরে বললে, ভাল ভাল, যতদিন খাবার জোটে, ততদিনই ভাল।

আমিও তাই বলি। যতদিন খাবার জোটে ততদিন একরকম চলে যায়।

বনেমোর চুপ করে গেল। চোখ তার মজুর পাড়ার দিকে। একে একে জানালায় আলো দেখা দিচ্ছে। ম'তসু গির্জার মিনারের ঘড়িতে চারটে বেজে গেল। এখন আরো ঠাণ্ডা।

তোমাদের কোম্পানি কি পয়সাওয়ালা? এতিয়েং জিজ্ঞেস করলে।

বুড়ো ঘাড় উঁচিয়ে আবার নামিয়ে নিলে। মনে হ'ল অলীক টাকার ভারে সে নুয়ে পড়েছে।

হাঁ, হাঁ,...তবে আঁজি কোম্পানির মতো বোধ হয় অতটা নয়। ঐ তো আমাদের পাশেই রয়েছে। কিন্তু তাহলে কি হবে—লাখে লাখে টাকা! অগুনতি টাকা। উনিশটা পিট, তার মধ্যে তেরোটায় কাজ চলছে। ভোরো, লা ভিক্তার, ক্রোভকুয়োর, সিরু। সাঁ, তমাস, মসাদেলিন, ফিউৎরি—কাঁতেল আরো কত বলব। দশ হাজার লোক খাটছে, প'য়ষট্টিটা ধাওড়া। রোজ পাঁচশো টন মাল ওঠে—ফি-পিটের সঙ্গে রেললাইন পাতা। মাল দেখতে দেখতে কারখানায় চালান যায়...হুঁ—অঢেল টাকা।

লাইনের উপর দিয়ে টবের আসার শব্দ শুনে ঘোড়াটা কান খাড়া করলে। খাঁচা বোধহয় মেরামত হয়ে গেল, আবার কাজ শুরু হয়ে গেছে। সে এবার ঘোড়া জুত্‌তে গেল। বুড়ো ঘোড়াটাকে আদর করে বললে, ওরে বেটা কুঁড়ের ধাড়ী, তুই আবার গল্পে মাতিস নে। ম'সিয়ে হানাবু যদি জানতে পারেন, কি করে সময় কাটালি—তাহলে কি হবে!

এতিয়েং চারদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে, তাহলে এই কোম্পানির মালিক ম'সিয়ে হানাবু?

আরে না, না, বুড়ো বললে, উনি ম্যানেজার, আমাদেরই মতো মাইনে পান।

অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে সে বললে, তাহলে এসব কার?

এমনি সময় বুড়োর কাশির দমক উঠল; নিশ্বাস নিতে পারছে না। শেষে গয়ার ফেলে, ঠোঁটের কালো ফেনা মুছে সুস্থ হয়ে বললে। হাওয়ার গোঙানিতে ছড়িয়ে পড়ল ওর কথাঃ

কে মালিক...ভগবান জানেন...কেউ একজন হবেই।

রাতের গহ্বরে কোন এক অজানা ঠাঁই সে দেখিয়ে দিলে। সেখানে হয়তো থাকে তারা, যাদের জন্য মেয়ুরা কয়লার স্তরে একশো ছ' বছর ধরে গাঁইতি চালিয়েছে। তার স্বরে ফুটে উঠল ভক্তি আর শ্রদ্ধা। এ যেন বিহ্বলতা আর ভীতি মিশে আছে। সে যেন কোন মন্দিরের কথা বলছে, সেখানে তার প্রবেশ নিষেধ। সেখানে মেদস্ফীত এক অজানা দেবতা ওত পেতে অদৃশ্য হয়ে

আছে, তারা সবাই মেদের অর্ঘ্য এনে উজাড় করে দিচ্ছে তার পায়ে—কিন্তু কেউ তাকে দেখেনি।

এতিয়েং আবার বললে, পেট ভরলে আর কি চাই!

সাচ্চা জবান সাঙাৎ। যদি পেট ভরে, তখন আর কি চাই! নালিশ কে করে!

ঘোড়া চলতে শুরু করেছে, চালকও অদৃশ্য হয়ে গেল পা টেনে, টেনে। কিন্তু খালাসী এখনো নড়ছে চড়ছে না। একেবারে তালগোল পাকিয়ে বসে আছে। দু-হাঁটুর ভিতরে মুখ গোঁজা—ড্যাবডেবে চোখ শুধু চেয়ে।

এতিয়েং পুঁটলিটা তুলে নিলে, কিন্তু চলে যাবার নাম নেই। কনকনে হাওয়া এসে লাগছে পিঠে, বুকখানায় লাগছে আগুনের তাত। খনিতে একটা দরখাস্ত ঝেড়ে দিলেই হয়, বুড়ো হয়তো কিছু জানে না; তা ছাড়া জানবার দরকার কি! যে কাজ হয় করবে, যাবে কোথায়? বেকারে বেকারে দেশ ছেয়ে গেছে, উচ্ছন্নে যাচ্ছে—তার কি উপায়? শেষে কি পথের কুকুরের মতো ধুঁকতে ধুঁকতে কোন দেয়ালের আড়ালে শেষ হয়ে যাবে? তবু এই নগ্ন রিক্ত প্রান্তরে, এই ঘন অন্ধকারে—ওর দ্বিধা হ'ল। লা ভোরো ওকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে, হাওয়ার গতিবেগ বাড়ছে, ভীষণ হতে ভীষণতর হয়ে উঠছে—দূর দূরান্ত থেকে বয়ে আসছে হাওয়া। এখনো নেই ভোর হবার কোন লক্ষণ। মরা আকাশ; শুধু ফার্নেস আর চুল্লির দীপ্তি। লাল হয়ে গেছে ছায়া—কিন্তু এখনো ছায়ার রহস্য বিদ্ধ হয়নি আলোয়। লা-ভোরো এক ভীষণ জানোয়ারের মতো এখনো যেন জবুথবু হয়ে শুয়ে আছে তার গুহায়। নিশ্বাস এখনো থেমে থেমে পড়ছে; নরমেদের ভুরিভোজ হজম করতে বুঝি ও ব্যস্ত—তাই বুঝি ওর কষ্ট!

দুই

দুশো চল্লিশ নম্বর ধাওড়া বা মজুর পাড়ার চারদিকে শস্য আর বীটের খেত ঘেরা। এখন সেও নিকষ-কালো রাতের গভীরে ঘুমিয়ে আছে। চার চার সার বাড়ি। একটার গায়ে আর একটা হুটোপুটি খাচ্ছে। দেখে মালুম হওয়া সহজ নয়। ওরা আলাদা হ'লেও হাঁসপাতাল বা ব্যারাক বাড়ির মতো একেবারে লাগোয়া। শুধু সারের মাঝে মাঝে চওড়া খানিকটা জমি, তাতে আবার ফুলের কেয়ারী। এখন এই বাড়ির সার স্তব্ধ, শুধু বেড়ার ফাঁক দিয়ে হাওয়া বয়ে আসছে, গোঙানি তুলে ছুটে চলেছে।

দুই নম্বর সারে ১৬ নম্বর বাড়ি মেয়ুদের। এখনো সেখানে জাগেনি জীবনের সাড়া। দোতলার ঘর এখনো অন্ধকারে ঢাকা। অন্ধকার যেন ঘুমন্তদের বুকে চেপে বসেছে, ঘরে ওরা আছে বোঝা যায় না, শুধু অনুভব করা যায়। স্তূপের মতো গাদাগাদি ঠেসাঠেসি হয়ে পড়ে আছে। মুখ হাঁ করা, ক্লান্তিতে এলিয়ে পড়েছে। বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা হ'লেও, এখানে হাওয়া মানুষের নিশ্বাস প্রশ্বাসে ভারী—তাদের উষ্ণতায় বুঝি বা উষ্ণও।

ভাল শোবার ঘরও মানুষের ভিড়ে এমনি গুমোট হয়ে ওঠে—তা এত কুলি ধাওড়া।

নীচের তলায় কুহু-ডাকা, ঘড়িতে চারটে বাজল, কিন্তু এখনো উপর তলায় শুধু হাল্‌কা নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ উঠছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গত করছে দুটি নাকের নাক-ডাকানি। হঠাৎ এবার ক্যাথেরিন আড়ামোড়া ভেঙে জেগে উঠল। ঘুমের ভিতরেই অভ্যাস বশে সে ঘড়ির শব্দ শুনেছে; কিন্তু পুরোপুরি জাগবার শক্তি তার নেই। কোন রকমে পা দুখানা বিছানার বাইরে নিয়ে এল। দেশলাই হাতড়াচ্ছে। দেশলাই জেবলে মোম জ্বাললে, তবু ঠায় বসে রইল, মাথাটা এত ভার হয়ে আছে, এ-কাঁধ থেকে ও-কাঁধে ঝুলে ঝুলে যেন পড়ছে—কেমন এক দুর্দম ইচ্ছা চেপে বসেছে—আবার এলিয়ে পড়তে চায় বালিশে।

মোমের আলোয় চৌকো ঘরখানা আলো হয়েছে। দুটি জানালা ঘরে, তিনখানা বিছানায় ঘরখানা একরকম ভর্তি। একটা আছে বাসন-কোসন রাখবার আলমারী, দুখানা টেবিল, দুখানা পুরানো চেয়ার, ধূসর রঙের দেয়ালের পটে কালো কালো তাদের দেখা যাচ্ছে। এই-ই সব আসবাবপত্র। ব্র্যাকেটে ঝুলছে পোষাক, মেঝেয় মাটির লাল রঙের একটা গামলা। তার পাশে একটা বড় জগ্‌। বাঁ দিকের বিছানায় বাড়ির বড় ছেলে জাচারি শুয়ে আছে। একুশ বছর তার বয়েস; ছোট ভাই জালিনের সঙ্গে সে ঘুমুচ্ছে। তার বয়েস প্রায় এগারো। ডান দিকের বিছানায় দুটি বাচ্চা। লেনোর আর আঁরি, একজনের ছ' বছর আর একজনের চার বছর বয়েস। দুজনে জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে। ক্যাথেরিন ঘুমোয় তার বোন আলঝিরের সঙ্গে তিন নম্বর বিছানায়। ন' বছর বয়েস হলেও ভারি খুদে, ওর পাশে ওকে দেখাই যায় না। শুধু মাঝে মাঝে বেচারীর কুঁজটা ওর পাঁজরার হাড়ে এসে বেঁধে। খোলা কাঁচের দরজা দিয়ে দেখা যায় সিঁড়ির মুখটা—এটা কুঠরি নয়, গর্তও বলতে পারা যায়। এখানে চার নম্বর বিছানায় ঘুমোয় বাপ-মা। তারই পাশে তাদের সব শেষের বাচ্চার দোলনাটা খাটানো। নাম এস্তেল, এখনো তিনমাসও পোরেনি তার।

ক্যাথেরিন যেন মরিয়া হয়ে ওঠবার চেষ্টা করলে। পা দিলে সটান ছড়িয়ে, লাল চুলে হাত চালিয়ে দিলে। কপালে, গলায় পড়েছে এলো-মেলো চুল, পনেরো বছর বয়েস অনুপাতে বাড়ন্ত সে কম, রাতের আঁটো পোষাকে তার সারা গা ঢাকা, শুধু দেখা যায় পা দুখানি। কয়লার খনিতে কাজ করে করে নীলচে দাগ ধরে গেছে। তার হাত দুখানি দুধের মতো সাদা, গায়ের রঙ মেটে, সেই রং সস্তা সাবানে অনবরত ধোয়ার ফলে অমনি ফ্যাকাশে দাঁড়িয়ে গেছে। হাঁ করে শেষবারের মতো সে হাই তুলল। মুখখানা একটু বড়ো, চমৎকার দাঁতের সার মাড়ির নিষ্প্রভতায় দেখা যাচ্ছে। তার ধূসর চোখ দুটি ঘুমের সঙ্গে লড়াই করে করে সজল; ক্লান্তি আর বিষণ্ণতা চোয়াচ্ছে, সারা নগ্ন দেহে ছড়িয়ে পড়ছে।

সিঁড়ি থেকে ভেসে এল মেয়ুর হেঁড়ে গলা। স্বর নয়, ঘেউঘেউয়ানি।

ইস—সময় যে হ'ল! ক্যাথেরিন, তুই আলো জ্বাললি নাকি?

হাঁ, বাবা। এই তো সবে নীচে ঘড়ি বাজল। চারটে!

তাহলে ঠুঁটোর মতো বসে আছিস কেন? উঠে পড়্ জলদি! রোববারে

একটু কম করে নাচন-কোঁদন করলে তবে আমাদের তো তাড়াতাড়ি তুলে দিতে পারিস। কুঁড়েমি করে কাটছে তো বেশ!

গজর গজর শুরু হয়ে গেল, কিন্তু আবার ঘুমও পাচ্ছে। গালাগালগুলো জড়িয়ে যাচ্ছে, আবার নাক-ডাকানিতে একেবারে থেমে গেল।

মেয়েটি পা দুটো রেখেছে মেঝেয়, এবার সে উঠে পড়ে আঁরি আর লেনোরের খাটের কাছে গিয়ে চাদরটা টেনে দিলে। গা থেকে সরে গিছল। ওরা জাগল না, শিশুর গভীর ঘুমে ওরা বিভোর। আলঝির চোখ মেলেছে, কথা না বলে বড় বোনের গরম জায়গাটুকু সে দখল করে ফেলল।

দুই ভাইয়ের খাটের কাছে দাঁড়িয়ে ক্যাথেরিন বলে উঠল, জাচারি, জাঁলিন ওঠ। তারা চুপচাপ। বালিশে মুখ গুঁজে এখনো তারা এপাশ-ওপাশ করছে।

বড়র ঘাড় ধরে ঝাঁকুনি দিলে। গালাগাল দিচ্ছে। মাথায় তার ফন্দি এল, ওদের গায়ের চাদর সরিয়ে নেবে। ভারি মজা লাগছে। হাসিও পাচ্ছে! ওরা কেমন পা দাপাচ্ছে।

জাচারি খেঁকিয়ে উঠল, উঠে সে বসেছে। এই গাধা, আমি ওসব ভালবাসিনে! আরে! ওঠবার সময় হয়েছে নাকি?

রোগা, শরীরটা বেঢপ। লম্বাটে মুখ, চিবুকে দাড়ি গজাচ্ছে সবে। হলদে চুল, মুখে সারা পরিবারের রক্তহীনতার ছাপ।

সার্টটা পেটের কাছে উঠে এসেছিল, সেটা নামিয়ে দিলে। ঠাণ্ডা লাগছে বলেই দিলে, ভদ্রতাবোধে নয়। ক্যাথেরিন আবার বললে, নীচে ঘড়ি বেজে গেল, শীগ্‌গীর ওঠ, বাবা তো রেগে আছেন।

জাঁলিন একপাশে গড়িয়ে গিয়ে চোখ বুজল, যা, গলায় দড়ি দেগে যা! আমি এখন ঘুমোব।

ক্যাথেরিন হাসল, মধুর-স্বভাবা মেয়ের হাসি। জাঁলিন একেবারে খুদে, সরু সরু তার অংগ-প্রত্যংগ, হাত পায়ের গাঁট বেশ মোটা, গেঁটো বাতে অমনি হয়েছে। ক্যাথেরিন তাকে কোলে তুলে নিলে অবলীলাক্রমে। কিন্তু সেও পা ছুঁড়তে লাগল। তার বাঁদরের মতো মুখখানা ফ্যাকাশে, দাগী; সবুজ চোখ আর বড় বড় কান। এখন ফ্যাকাশে মুখ অক্ষম ক্রোধে আরো ম্লান হয়ে গেছে। কথা সে বললে না, ওর ডান দিকের মাইটায় কামড় বসিয়ে দিলে।

জানোয়ার কোথাকার! কান্না চেপে চীৎকার করে উঠল ক্যাথেরিন, তাকে মেঝেয় তাড়াতাড়ি নামিয়ে দিল।

আল্‌ঝির চুপচাপ; চাদরে চিবুক অবধি ঢেকে শুয়ে আছে, কিন্তু আর ঘুমিয়ে পড়েনি। তার বুদ্ধিদীপ্ত পংগুর চোখ দিয়ে অনুসরণ করছে বোন আর দুভাইকে। ওরা এখন পোষাক পরছে। গামলাটার কাছে ঝগড়া বেঁধেছে এবার। ক্যাথেরিন মুখ ধুতে বেশি সময় নিচ্ছে বলে ছোকরারা হামলা বাঁধিয়েছে। এদিক ওদিক তাল-গোল পাকানো সার্ট ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে, নির্লজ্জভাবে আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় মুত্‌ছে। এরা যেন কুকুর ছানার মতো, তেমনি আত্মতুষ্ট ভাব। এক সংগে বেড়ে উঠেছে বলে পরস্পরের কাছে লজ্জা-সরম নেই। ক্যাথেরিন প্রথমে তৈরী হয়ে নিল। খনির কুলির ব্যবহৃত ব্রীচেস পরেছে, গায়ে ক্যাম্‌বিসের কোর্তা, খোঁপা-করা চুলে নীল টুপি; এই

কাজের পোষাকে ওকে দেখে ছোটখাট একটি পুরুষ বলে মনে হয়। ওর নারীত্বের চিহ্ন রয়েছে শুধু পাছার ক্ষীণ দুলুনিতে।

জাচারি দুষ্টুমি করে বললে, বুড়ো ফিরে এসে এমনি বিছানা দেখলেই বেশ হবে। আমি তো বলব, তুমি করেছ।

বুড়ো ঠাকুর্দা বনেমোর। সে রাতে কাজ করে, দিনভোর ঘুমোয়। তাই বিছানা কখনো ঠাণ্ডা হয় না; কেউ না কেউ সেখানে নাক ডাকাচ্ছেই। জবাব না দিয়ে ক্যাথেরিন বিছানার চাদর ঠিক করে গুঁজে দিলে। বিরতি। হঠাৎ পাশের বাড়ির শব্দ শোনা গেল। খরচ বাঁচাবার জন্যে কোম্পানি দেয়াল তেমন দৃঢ় করে গড়েনি, তাই পাশের বাড়ির নিশ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজটিও এখান থেকে শোনা যায়। এই বাড়িখানাই এমনি তৈরি। এখানে বাসিন্দেরা ঘেঁষাঘেঁষি করে, ঠাসাঠাসি করে থাকে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত—এই তাদের রীতি। কোন পরিবারের কোন কথা লুকানো থাকে না, এমনকি ছেলেমানুষরাও তা জানে।

ভারী পায়ের শব্দ সিঁড়িতে বেজে উঠল, এবার লঘু হয়ে এল; একটা স্বস্তির দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল।

যাক! ক্যাথেরিন বললে, লেভাক্ চলে গেল, এবার বুতেলুপ এল লেভাকের বৌয়ের কাছে।

জাঁলিন মুখ-ভেঙচাল, এমনকি আলাঝিরের চোখও যেন চক্‌চক করছে। ফি-রোজ ভোরে ওরা পাশের বাড়ির গৃহস্থদের নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করে। তিনজন সেখানকার বাসিন্দে। বাড়িওয়ালা গেটে কাজ করে, সে একজন কাটারকে ঘরে ঠাঁই দিয়েছে। এতে করে বৌয়ের সুবিধে, রাতে একজন, দিনে একজন—দু'জন মানুষ পায়।

একটু কান পেতে শুনে ক্যাথেরিন বললে, ঐ যে ফিলোমেন কাশছে।

লেভাকের বড় মেয়ের কথা বলছে। উনিশ বছর তার বয়েস, সে জাচারির ভালবাসার মানুষ; জাচারির ঔরসে এরই মধ্যে তার দুটি সন্তান হয়েছে; তার বুক খারাপ বলে পিটে সিফ্‌টারের কাজ করে, নীচের কাজ তার তাকতে কুলোয় না।

আহা বেচারী ফিলোমেন, জাচারি জবাব দিলে, ওতো এখনো ঘুমিয়ে আছে। দু'টো পর্যন্ত যারা ঘুমোয় তারা তো শুয়োরের মাফিক মানুষ।

ব্রীচেস সে পরে নিয়েছে, এরই মধ্যে তার মগজে বুদ্ধি খেলে গেল, জানালাটা খুলে দিলে। বাইরে অন্ধকার, পাড়া জাগছে; শার্সির আড়ালে আলোর ঝিকিমিকি দেখা যাচ্ছে। আবার তর্ক বাঁধল। ও ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল, পিরোর বদলে ভোরো-র খনির সর্দারকে দেখা যায় কিনা। সে পিরোর বৌয়ের সঙ্গে শোয় বলে রটনা। তার বোন তাকে বললে, স্বামী এখন দিনের বেলার কাজ নিয়েছে পিটে, তাই দাঁসার নিশ্চয়ই আজ সারা রাত কাটাতে আসেনি। জানালা দিয়ে তুষারকণা বয়ে নিয়ে আসছে দমকা হাওয়া। দুজনেই তারা রেগে আছে, নিজেদের খবরের সত্যতা দাবি করছে। এবার হঠাৎ উঠল চীৎকার। কান্না শোনা গেল। এস্তেল তার দোলনায় ঠাণ্ডায় ফুঁপিয়ে উঠছে।

মেয়ুও জেগে গেল হঠাৎ। হাতে কি হয়েছে, আবার সে শুয়ে পড়বে।

সে এত জোরে বকুনি দিলে যে, ছেলেমেয়েরা চুপ করে গেল। জাচারি আর জাঁলিন গা ধোয়া শেষ করলে। ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে আছে তারা, তাই আস্তে আস্তে এতক্ষণ ধরে সাঙ্গ হয়েছে তাদের গা-ধোয়ার পাট। আলঝির বড় বড় চোখ চেয়ে তাকিয়েই আছে, আঁরি আর লেনোর দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে আছে, তারা একবারও জাগে নি, এত গোলমালের মধ্যেও তাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস একইভাবে পড়ছে।

মেয়ু এবার বললে, ক্যাথেরিন, মোমখানা দে তো!

কোর্তার বোতাম লাগানো সারা ক্যাথেরিনের, সে খুপরিতে মোমখানা নিয়ে গেল। দরজা দিয়ে যেটুকু আলোর চিল্‌তে এসে পড়ছে তাতেই ভাইরা পোষাক খুঁজে নিক। ওর বাবা এবার বিছানা থেকে উঠে পড়ল। ক্যাথেরিন খুপরিতে রইল না। মোটা পশমী মোজা তার পায়ে, সে আস্তে আস্তে হাতড়াতে হাতড়াতে নেমে এল নীচে, রান্নাঘরে এসে আর একখানা মোম জ্বালল। কফি তৈরি করতে হবে। তাকে আছে পরিবারের কাঠের জুতোগুলি।

এই খুদে পোকা, চুপ করবি কিনা? মেয়ু এস্তেলের কান্নায় চটে উঠল। কান্না এখনো অবিরাম।

বুড়ো বনেমোরের মতো সেও বেঁটেখাটো, তার সঙ্গে মাথার আকারে, চ্যাপটা মুখে মিলও আছে, হলদে চুল তার বেশ ছোট করে ছাঁটা। বাচ্চাটা আগের চেয়েও জোরে কেঁদে উঠল। বাপের পাকানো প্রকাণ্ড হাত দুখানা দেখে ওর ভয় যেন আরো বেশি।

বিছানার মাঝখানে শুয়েছে স্ত্রী, সে বললে, যাক, ওকে ছেড়ে দাও, জানো তো ও সহজে থামবে না।

সেও সবে জেগেছে, তার নালিশ, রাত পোয়াতে না পোয়াতেই কি হাঙ্গামা। ওরা কি আস্তেসুস্থে যেতে পারে না? কাপড়-চোপড় ঢেকে শুয়ে আছে সে, তার লম্বাটে মুখখানা দেখা যায়। গড়ন লম্বা-চওড়া—কেমন যেন এক সৌন্দর্য ছিল। দারিদ্র্যের, আর সাত-সাতটি সন্তান বিইয়ে উনচল্লিশ বছরেই বেঢপ হয়ে পড়েছে। কড়িকাঠের দিকে তাকিয়েই সে আস্তে আস্তে বলছে কথা। তার মরদ পরছে পোষাক। ওরা বাচ্চার চীৎকার আর শুনছে না, ঘরে সে তো চেঁচিয়ে অস্থির হয়ে যাচ্ছে।

শুনছ? ঘরে একটি আধলা নেই। এই তো সবে সোমবার, পনেরো দিন যেতে এখনো ছ-ছটা দিন বাকি। এমনি করে তো আর চলে না। সবাই তোমরা ন'টা ফ্রাঁ করে নিয়ে আস। তা দিয়ে কি করে আমি চালাব? বাড়িতে তো দশটা পেট।

ন'ফ্রাঁ! মেয়ু খিঁচিয়ে উঠল, আমি আর জাচারি তিনটে করে ছটা, ক্যাথেরিন আর বাবা দুটো করে চারটে। এতেই তো দশ ফ্রাঁ হয়; জাঁলিনের এক ফ্রাঁ ধরলে তো এগারো, হাঁ এগারোই হয়।

এগারোই হয়, কিন্তু রোববার আছে, ছুটিছাটা আছে। ন'ফ্রাঁর বেশি ঘরে আসে না।

জবাব নেই, চামড়ার কোমর-পেটি খুঁজছে মেয়ু। এবার মেঝে থেকে উঠে পড়ে বললে, তা নালিশ করে ফায়দা কি বল? আর আমার তো তবু এখনো তাকত আছে। বেয়াল্লিশ বছরের ক'টা মরদ নীচে কাজ করে!

তাতো হ'ল বাপু, কিন্তু তাতে তো রুটি জোটে না। আমি কোত্থেকে

পাব বল? কিছু আছে নাকি?

দুটো তামার পয়সা আছে।

ও তোমার আধ পাঁইটের বরাদ্দ। ভগবান, আমি কোত্থেকে টাকা পাব! ছ-ছটা দিন! না, এ ভোগান্তি আর যাবে না! মাইগ্রাত-এর কাছে তো ষাট ফ্রাঁ ধার করে বসে আছি, কাল তো আমাকে ও তাড়িয়েই দিলে। তা আর কি, আজও তার কাছেই হাত পাতব গিয়ে, কিন্তু আজও যদি ফিরিয়ে দেয়—

মেয়ু-গিন্নী একটানা বলে যাচ্ছে, স্বরে তার বিষণ্ণতা। মাথা নাড়ছে না, শুধু চোখ দুটো মাঝে মাঝে বুজে আসছে—আলো লেগে। সে জানালে, ভাঁড়ার শূন্য, ছেলেমেয়েরা চাইছে খাবার, কফিও নেই। আর ক'দিন বাঁধাকপির পাতা সেদ্ধ খেয়ে পেটকে জামিন দেওয়া চলবে? আস্তে আস্তে গলাও চড়ছে, এস্তেলের কান্নার জন্যে চড়ছে। এ কান্না তো অসহ্য। মেয়ুর আর সহ্য হ'ল না, সে বাচ্চাকে দোলনা থেকে নিয়ে মার বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে দিলে। রাগে এসেছে তোতলামি।

ওকে আমি নিকেশ করে দেব! গোল্লায় যাক অমন বাচ্চা! শুধু শুধু কাঁদে! মাই খাচ্ছে তবু কান্না খালি চড়ছে!

এস্তেল সত্যই মাই খাচ্ছে। পোষাকের নীচে বিছানার উষ্ণতায় কান্না থেমে গেছে, এখন উঠছে লোভার্ত ঠোঁটের মৃদু শব্দ।

বাবা কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করলে, পিয়োলে'রা তোমাকে দেখা করতে বলেছিল না?

মা ঠোঁট কামড়াল, মনে উৎসাহ পাচ্ছে না; আছে সন্দেহ-সংশয়।

হাঁ, দেখা হয়েছিল, গরীব-গুরবোদের ছেলেপুলেদের জন্যে ওরা পোষাক বিলোচ্ছে। হাঁ, আজই সকালে আমি লেনোর আর আঁরিকে নিয়ে যাব। দেখি, যদি দু-একটা মেলে।

আবার ছেদ।

মেয়ু তৈরী, এক মুহূর্ত সে স্থির হয়ে থেকে নিষ্প্রাণ স্বরে বললে,

কি চাও বলতো? যা হবার হবে, এখন গিয়ে সুরুয়াটা দেখ, কথা কাটাকাটি করে হবে কি, তার চেয়ে নীচে কাজে যাও।

মেয়ু-গিন্নী জবাব দিলে, এখন মোমটা নিবিয়ে দাও! ভাবনার জন্যে আলোর দরকার নেই।

ফুঁ দিয়ে আলো নিবিয়ে দিলে মেয়ু। জাচারি আর জুলিন এরই মধ্যে নীচে নেমে যাচ্ছে, সেও তাদের পিছনে পিছনে চলল। তাদের পায়ের চাপে মচ্‌মচ্‌ করে উঠছে কাঠের সিঁড়ি। তাদের পিছনে ঘর আর খুপরি আবার অন্ধকার হয়ে গেছে, ছেলেমেয়েরা ঘুমোচ্ছে, আলজিরের চোখের পাতাও এখন বোঁজা, কিন্তু মার চোখ খোলা, অন্ধকারে চেয়ে আছে মা। তার স্তন, স্খলিত স্তন টানছে এস্তেল, বিড়ালছানার মতো মিউমিউ করছে।

নীচে উনুন নিয়ে ব্যস্ত ক্যাথেরিন। আগুন জ্বলছে লোহার উনুনে, দুপাশে দুটো তুঁদুর। কোম্পানি কয়লা দেয় প্রতি মাসে, সেই কয়লা জমা থাকে গলি পথটায়। কয়লা জ্বলছে আস্তে আস্তে।

আস্তে আস্তে পোড়ে কয়লা। ও রোজ রাতেই উনুন সাজিয়ে রেখে যায়, শুধু ভোরে একটু ফুঁ দিয়ে দিলেই হ'ল, আর বেছে বেছে কয়েক টুকরো

ভাল, নরম গোছের কয়লা। তারপর উনুনে কেৎলি বসিয়ে সে তাকের সুমুখে বসে পড়ে।

বেশ বড় ঘর—সমস্ত নীচের তলাটা জুড়েই ঘরখানা। কাঁচা আপেলের রং দেয়ালে, ওলন্দাজদের পরিচ্ছন্নতা। বার্নিশ-করা তাক ছাড়া ঐ একই কাঠের তৈরি টেবিল আর চেয়ার। দেয়ালে ভীষণ রংচঙে ছবি—সম্রাট আর সম্রাজ্ঞীর প্রতিকৃতি—কোম্পানির উপহার; সৈনিক আর সন্তরাও আছেন। সোনালী রং দেওয়া ছবি যেন ঘরের সজ্জাবিহীনতার পরিপন্থী। বড় চোখেও লাগে। ঘরে আর কোন বাহুল্য অলঙ্কার নেই, শুধু গোলাপী রঙের একটা পিজবোর্ডের বাক্স রয়েছে তাকের উপর, আর আছে কালিঝুলি মাখা এক ঘড়ি, জোরে টিক্‌টিক করছে, ঘরের শূন্যতাকে ভরে দিচ্ছে। সিঁড়ির দরজার কাছে আর একটি দরজা আছে—সেখান দিয়ে সেলারে যাওয়া যায়। ঘরে পরিচ্ছন্নতা থাকলেও বাসি ভাজা-পেঁয়াজের গন্ধ রাত থেকে আটকা পড়েছিল বন্ধ ঘরে, এখন সে ঘরের গুমোট আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে তুলেছে। কয়লার তীব্র গন্ধ তো তার সংগে আছেই।

ক্যাথেরিন তাকের সুমুখে বসে বসে ভাবছিল। একখানা রুটির শেষটুকু রয়েছে, পনির আছে ঢের, কিন্তু একফোঁটা মাখন নেই; চারজনের জন্য মাখন আর রুটি তো এখনি যোগাড় করে দিতে হবে। এবার সে ঠিক করল কি করবে। রুটি কেটে একখানায় মাখালো পনির, আর একখানায় মাখন। দুখানা এবার জুড়ে দিলে। এই তো মাখন-রুটির স্যাণ্ডউইচ তৈরি হ'ল। রোজ ভোরে তারা পিটে এই খাবারই নিয়ে যায়। এগুলিকে ব্রিকেৎ বলে। চারখানা ব্রিকেৎ টেবিলে তাড়াতাড়ি সাজিয়ে রাখা হ'ল পরপর। খুব চুল-চেরা বিচার করে কাটা—বাপের টুকরোটা বড়, তার পরের টুকরোগুলো ছোট হয়ে এসেছে। সব চেয়ে ছোট টুকরো জাঁলিনের।

ক্যাথেরিন ঘর-গৃহস্থালীর কাজে মগ্ন বলেই তো মনে হচ্ছে, হাঁ তাই তো হওয়া উচিত, কিন্তু তবু সে ভাবছে জাচারির সেই পিয়েরোঁদের বৌ আর সর্দারের গল্পটা। সে সদর দরজাটা একটু খুলে বাইরে তাকাল। এখনো হাওয়া বইছে, শিস দিচ্ছে যেন। পাড়ার সুমুখের বাড়িগুলোতে আলোর বিন্দু দেখা যাচ্ছে। জাগরণের এক অস্পষ্ট কম্পন। দরজা এরই মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে, মজুরদের কালো সার চলেছে রাতের বুকে। ঠাণ্ডা লাগানো তো বোকামি। পিটের মুখের দারোয়ান এখন নিশ্চয়ই ঘুমে, ছ'টায় তার হাজরে। তবু সে দাঁড়িয়ে রইল, বাগিচার অন্যদিকের বাড়িগুলোর উপর তার নজর। দরজা খুলে গেছে, কৌতূহল জাগ্রত; হয়তো পিয়েরোঁদের কেউ হবে, লিদি হয়তো চলেছে খাতে।

বাষ্পের হিস্‌হিসানিতে সে ফিরে তাকাল। দরজা বন্ধ করে তাড়াতাড়ি ফিরে এল।

জল ফুটে গড়িয়ে পড়ছে। আগুন নিবিয়ে দিচ্ছে। কফি নেই। কাল রাতের তলানিটুকুতে জল ঢেলে যাহোক একটা ব্যবস্থা করলে, তারপর কফি-পটে ধূসর রঙের চিনি দিয়ে দিলে। এবার তার বাবা আর দুভাই নীচে নেমে এল।

জাচারি পাত্রটা নাক দিয়ে শুঁকে চেঁচিয়ে উঠল, সত্যি, এমন ফন্দি আমাদের

মাথায়ই আসত না।

মেয়ে কাঁধে ঝাঁকুনি দিলে। উপায় নেই এমনি তার ভাব।

আরে! গরমও আছে! ভালই হবে।

জাঁলিন রুটির টুকরো জড়ো করে কফিতে ভিজিয়ে নিলে। কফি-পর্ব শেষ হয়ে যেতে কফি-পটটা নিয়ে টিনের পাত্রের ভিতরে রাখলে। সবাই তাড়াতাড়ি গিলে নিল খাবার মোমের ধোঁয়াটে আলোয়।

বাবা বললে, কি, এই শেষ নাকি? আমাদের এখন দেখে লোকে ভাববে আমরা মস্ত লোক। সিঁড়ি থেকে স্বর ভেসে এল। এরই জন্যে দরজা তারা খোলা রেখেছে। মেয়ে-গিন্নীর স্বর, সে চেঁচিয়ে বলছে,

সব ক'টুকরো রুটি নিয়ে নাও, বাচ্চাদের জন্যে কিছুটা হালুয়া রেখেছি।

হাঁ, তাই-ই করেছি, ক্যাথেরিন জবাব দিলে।

উনুন সাজিয়ে রাখছে আবার, উনুনের এক কোণে সুরুয়ার পাত্রটা বসিয়ে দিলে। এখনো কিছুটা সুরুয়া আছে, ঠাকুর্দা ছ'টার সময় এসে দিব্যি গরমই পাবেন। প্রত্যেকে তাকের নীচে থেকে কাঠের গোড়ালিওলা জুতো বার করে নিলে, রুটিও নিয়েছে। এবার তারা বেরিয়ে পড়ল। প্রথমে পুরুষরা, সবার শেষে বাতি নিবিয়ে দিয়ে দরজায় চাবি লাগিয়ে বেরিয়ে এল মেয়েটি। বাড়ি আবার অন্ধকার হয়ে গেল।

পাশের বাড়ির দরজা বন্ধ করছিল কে একজন, সে বললে, চল একসঙ্গেই যাব। লেভাক আর তার ছেলে বেবর্ত। বারো বছরের ছোক্‌রা বেবর্ত জাঁলিনের পরম বন্ধু। ক্যাথেরিন হঠাৎ অবাক হয়ে গেল, জাচারির কানে কানে সে যেন কি হাসির কথা বললে,

কি ব্যাপার! সোয়ামীর চলে যাবার পরই এল! বুতলেপ-এর তর সইছে না গো!

পাড়ার আলো নিবে গেল, শেষ দরজাটি বন্ধ হবার শব্দ শোনা যাচ্ছে। আবার সবাই ঘুমে। চওড়া বিছানার মাঝখানে এবার ঘুমুচ্ছে স্ত্রীলোক আর তাদের বাচ্চারা। নির্বাপিত দীপ নিঃশব্দ গ্রাম থেকে গর্জমান ভোরোর দিকে চলেছে আস্তে আস্তে সারবন্দী ছায়া মিছিল; ঝোড়ো হাওয়া বইছে। খনির মানুষরা চলেছে কাজে, পিঠ কুঁজোনো, হাত বুকের উপর রাখা, রুটির পুঁটুলিটা পিঠের উপরে কুঁজের মতো উঁচু হয়ে আছে। পাতলা কোর্তা তাদের পরনে, শীতে থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে তারা। কিন্তু তাড়া তাদের নেই, আস্তে আস্তে চলেছে পথ বেয়ে ভেড়ার পালের মতো।

তিন

এতিয়েঁ নেমে এসে ভোরোতে ঢুকে পড়ল। যার সঙ্গে দেখা তাকেই সে শুধাল কাজ মিলবে কিনা। সবাই মাথা নাড়ছে। তবে সর্দার আসা অবধি অপেক্ষা করতেও বললে। বাড়িগুলির আলো তেমন জোরাল নয়, সে তারই ভিতরে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কালো কালো গর্ত হয়ে

গেছে এখানে ওখানে, কামরা আর একতলা-দোতলার জটিলতায় ঘাবড়ে যেতে হয়। একটা অন্ধকার-প্রায় ধসে-পড়া সিঁড়ি দিয়ে সে উঠে এল। পায়ের নীচে নড়বড় করছে তক্তা, তারপরেই গভীর অন্ধকার, হাত দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে সে চলতে লাগল। হঠাৎ দুই বিরাট হলদে চোখ তার সুমুখের অন্ধকার ছিঁড়েখুঁড়ে দিলে। সে সুড়ঙ্গের মুখে আফিস ঘরে এসে পড়েছে।

সর্দার রিসোম চলেছে অফিসে। মস্ত লম্বাচওড়া মানুষটি, মুখখানা যেন ভালমানুষ পুলিসের মতো, খাড়া খাড়া পাকা তার গোঁফ।

এতিয়েং জিজ্ঞেস করলে, কোন কাজ খালি আছে এখানে?

রিসোম না-ই বলতে চাইল, কিন্তু কি ভেবে যেতে যেতে অন্য সবার মতো বললে,

বড় সর্দার মঁসিয়ে দাঁসারের জন্য বসে থাক। দেখ কি হয়।

চারটে লণ্ঠন জ্বলছে। কাচের ভিতর দিয়ে আলো এসে পড়েছে সুড়ঙ্গের মুখে। লোহার রেল, সিগন্যালের দণ্ডগুলির থাম আর জয়েন্টের উপর এসে পড়েছে আলো। এইগুলির সঙ্গেই দুটি খাঁচা লাগানো। এই প্রকাণ্ড ঘরের বাকিটুকু গির্জার ভিতরের পথের মতো অন্ধকার, সঞ্চরমান বিরাট ছায়ায় ছায়াময়। এরই একেবারে প্রান্তে বাতিঘর। আফিসে একটা টিমটিমে আলো মিলিয়ে-যাওয়া তারার মতো জ্বলছে। কাজ এখুনি শুরু হবে। লোহা-বাঁধানো পথে অবিরাম প্রচণ্ড শব্দ উঠছে, গাড়ি গাড়ি কয়লা আসছে, যারা কয়লা খালাস করবে তাদের কুঁজিয়ে-যাওয়া পিঠ দেখা যাচ্ছে এই গোলমাল আর অন্ধকারে। চারদিকেই চলছে যেন সোরগোল, তার বিরাম নেই। শুধু গতি আর গতি।

এতিয়েং এক মুহূর্তের জন্য নিশ্চল হয়ে গেল। বধির হয়ে গেছে যেন কান, অন্ধ হয়ে গেছে দৃষ্টি। হাওয়ার স্রোতে হিম হয়ে যাচ্ছে শরীর, চারদিক থেকে আসছে হাওয়া। সে কয়েক পা এগিয়ে গেল, ইঞ্জিন তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, দেখা যাচ্ছে ঝকঝকে তামা আর ইস্পাতের দ্যুতি: সুড়ঙ্গ-মুখ থেকে বেশ উঁচুতে পঁচিশ হাত দূরে ইটের-পৈঠের উপর বসানো ইঞ্জিনটি। এমন দৃঢ়ভাবে বসানো যে চারশো ঘোড়ার শক্তি নিয়ে পূর্ণ বেগে চললেও দেয়াল একটুও কেঁপে উঠবে না। ইঞ্জিন-চালক তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, কান পেতে শুনছে সিগন্যালের বাজনা, কিন্তু ইন্ডিকেটর থেকে চোখ তুলছে না। কল যখন চলছে, তার দুটি বিরাট চাকা, মাপে পাঁচ মিটার হবে, তারই সাহায্যে ছোট ইস্পাতের তার একবার জড়িয়ে যাচ্ছে, আর একবার খুলে আসছে। এত জোরে চলছে যে মনে হচ্ছে তারা বুঝি তার নয়, ধূসর কোন চূর্ণ।

তিনজন মজুর একটা বিরাট মই টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, তারা চেঁচিয়ে উঠল, এই হুঁশিয়ার হো!

এতিয়েং চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। এবার চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তারগুলি শূন্যে চলে বেড়াচ্ছে—তা প্রায় তিরিশ মিটারের বেশি ইস্পাতের ফিতেই হবে, খাতের ফ্রেমের ভিতরে উড়ে গিয়ে পড়ছে, কপিকলের উপর দিয়ে সুড়ঙ্গের ভিতরে সোজা নেমে যাচ্ছে; সেখানে খাঁচার সঙ্গে ওরা সংলগ্ন। একটা লোহার ফ্রেম, ঘণ্টা-ঘরের উঁচু মাচার মতো উঠে গেছে, কপিকল দিয়ে তারা আটকানো। এ যেন পাখীর অবতরণের মতো, নিঃশব্দ, অপ্রতিহত গতি। এই প্রকাণ্ড ভারী এক তারের অবিরাম যাওয়া আসা চলছে, সে বারো হাজার

কিলোগ্রাম তুলতে পারে;—প্রতি অনুপলে পারে দশ মিটার।

বাঁ দিকের কপিকলটার কাছে যাবার জন্য মজুররা মইটাকে অন্য পাশে সরিয়ে দিতে দিতে বলে উঠল, এই হুঁশিয়ার ভাইয়ো, দোহাই তোমার! এতিয়েং আস্তে আস্তে অফিস ঘরে ফিরে এল। বিরাট এক দানব যেন তার মাথার উপরে উঠে যাচ্ছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে তার। হাওয়ার স্রোতে কেঁপে কেঁপে উঠছে, তবু দেখছে খাঁচার ওঠা-নামা, গাড়ির ঘড়ঘড়ানি কানে তালা লাগিয়ে দিচ্ছে। সুড়ঙ্গের মুখে সিগ্‌ন্যালের কাজ চলছে। নীচে থেকে এক বিরাট ভারী হাতুড়ি তার দিয়ে লাগানো সেটা একটা ধাতুর পিণ্ডের উপর গিয়ে ঘা হানছে। এক ঘায়ে থামা, দুইয়ে নীচে যাওয়া, তিনে উপরে ওঠা। বিরাম নেই। যেন গোলমাল থামাবার জন্য পড়ছে আঘাতের পর আঘাত। সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট ঘণ্টাধ্বনি; যে মজুর এটা চালাচ্ছে সে ইঞ্জিন-চালককে চোঙ্ দিয়ে নির্দেশ জানিয়ে আরো হৈচৈ বাড়িয়ে তুলছে। মাঝখানে ফাঁকা জায়গা। সেখানে খাঁচা দুটো একবার দেখা দিচ্ছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। এই লোক ভর্তি করছে, এই উগরে দিচ্ছে। এতিয়েং এই জটিল ব্যবস্থা বুঝতে পারল না।

একটা জিনিসই সে বুঝতে পারছে। ঐ সুড়ঙ্গ বিশজন ত্রিশজন করে মানুষকে গ্রাস করছে। এমন সহজভাবে গ্রাস করছে যে কিছুই যেন সে টের পাচ্ছে না।

ভোর চারটে থেকে মজুরদের নীচে নামা চলছে। ওরা খালি পায়ে আসছে শেডে, হাতে বাতি। যতক্ষণ না বেশী লোক আসে অপেক্ষা করছে। নিঃশব্দে নিশাচর জন্তুর মতো লাফ দিয়ে উঠে এল লোহার খাঁচা এবার—যেন রাতের গহ্বর থেকেই এল। বল্‌টু আটকানো, চারটে তার ডেক, এক একটা ডেকে গাড়ি ভর্তি কয়লা। খালাসীরা একে একে গাড়িগুলো নামিয়ে নিলে, অন্য গাড়ি আবার সেখানে তুলে দিলে। এগুলি খালি, নয় তো কাঠের চাঁছা ছোলা ঠেকনো দিয়ে ভর্তি। খালি গাড়িগুলিতে মজুররা পাঁচজন করে করে উঠে পড়ল। তা চল্লিশজনই হবে সবসুদ্ধ। সবগুলো গাড়ি ভর্তি, এবার চোঙার ভিতর দিয়ে হুকুম হ'ল—ফাঁপা অস্পষ্ট গর্জন। সিগন্যালের তারটায় নীচ থেকে চারবার টান পড়ল। এ হুঁশিয়ারি। একটু লাফিয়ে উঠে খাঁচা নিঃশব্দে তলিয়ে যাচ্ছে, যেন ঢিল পড়েছে জলে। শুধু পিছনে রইল তারের কম্পন।

খুব খাই নাকি? এতিয়েং একজন মজুরকে জিজ্ঞেস করলে। সে তারই পাশে দাঁড়িয়ে, ঘুমন্তভাব এখনো রয়েছে তার।

লোকটি উত্তর দিলে, পাঁচশো চুয়ান্ন মিটার। কিন্তু চারটে স্তর আছে, প্রথম স্তরটা মিলবে তিনশো বিশ মিটারে। এবার দুজনেই চুপচাপ। তারটা আবার উপরে উঠে এল—সেইদিকেই ওদের নজর। এতিয়েং আবার বললে,

যদি ছিঁড়ে যায়?

যদি ছিঁড়ে যায়—

মজুরটি একটা বিশেষ ভঙ্গীতে শেষ করল কথাটা। এবার তার পালা এসেছে। খাঁচাটা আবার দেখা দিয়েছে, স্বচ্ছন্দ অক্লান্ত তার গতি। সঙ্গীদের সঙ্গে সে চড়ে বসল। আবার নীচে যাচ্ছে, আবার চার মিনিট যেতে না যেতেই উঠে এল। আর এক বোঝা মানুষ সে গ্রাস করবে। এমনি করে

আধঘণ্টা ধরে গেলা চলল, তেমনি লোলুপ গ্রাসে গিলছে—স্তরভেদে বাড়ছে কমছে লোলুপতা। কিন্তু বিরাম নেই, সব সময়েই সে ক্ষুধার্ত। তার দানব জঠরে সে বুঝি একটা গোটা জাতিকে হজম করবার শক্তি রাখে। পুরছে আর পুরছে সে পেটে—অন্ধকার জুড়ে আছে চারদিকে, পড়ে আছে। তেমনি উদগ্র নীরবতার গহবর থেকে আসছে খাঁচা।

খাতের পারে চলতে চলতে যে হতাশা এসেছিল, এতিয়েঁর তেমনি হতাশা দেখা দিল। থাকবার আর দরকার কি? সর্দার আর সবার মতো তাকেও হাঁকিয়ে দেবে। কেমন যেন আবছা ভয় তাকে ঘিরে ফেলেছে। সে ঠিক করল, চলেই যাবে। শুধু একবার ইঞ্জিন ঘরের সুমুখে দাঁড়াল। খোলা দরজা দিয়ে সাতটা বয়লার আর দুটো ফার্নেস দেখা যাচ্ছে। সাদা বাষ্প আর তার নিঃসরণের মধ্যে একজন খালাসী একটা ফার্নেসে কয়লা দিচ্ছে, তার উত্তাপ উঠোন অবধি এসে পেঁছেছে। যুবকটি এগিয়ে গেল, উত্তাপ ভালই লাগছে। এবার এক নতুন মজুর দলের সঙ্গে দেখা, তারা সবে পিটে এসে পেঁছেছে। মেয়ে আর লেভাকের দল। ক্যাথেরিন সবার সম্মুখে, ছেলের মতো তার হাবভাব। কি জানি হঠাৎ সংস্কারবশেই সে আবার জিজ্ঞেস করে বসল,

সাঙাৎ, কোন কাজের জন্য এখানে লোক চাই?

ক্যাথেরিন অবাক, হঠাৎ আঁধারের ভিতর থেকে স্বর শুনে বুঝিবা ভয়ই পেল। মেয়ে তার পিছনে, সেও শুনেছে। এতিয়েঁর সঙ্গে একটু আলাপও করল। না, কাজ এখানে নেই। আহা বেচারী পথ হারিয়ে এখানে এসেছে! ওর সম্বন্ধে একটু কৌতূহলই হ'ল তার। ওকে বিদায় দিয়ে সে আর সবাইকে বললে,

এমনি তো সবারই হাল হতে পারে, নালিশ করারও উপায় নেই। সবাই তো হাড়ভাঙা মেহনতেরও ফুরসত পায় না।

দলটি এবার সোজা শেডে গিয়ে ঢুকেছে। বিরাট হল, যেমন তেমন করে তৈরি, সারি সারি দেরাজ, তাতে ঝুলছে তালা। মাঝখানে আগুনের কুণ্ড। একেবারে ঢাকা স্টোভটি, কোন দরজা নেই। আগুনের আভায় লাল। এত জলন্ত কয়লা ভর্তি যে স্ফুলিঙ্গ উড়ে উড়ে এসে পড়ছে মেঝেয়। হলে আলো নেই, স্টোভের আলোতেই যেটুকু আলো। তেলচিটে কাঠের দেয়াল থেকে কয়লার ধোঁয়ায় দাগ-ধরা ছাদ অবধি কত ছায়া নেচে বেড়াচ্ছে এই আলো-আঁধারিতে!

মেয়েরা ঢুকতেই শুনলে, হাসির হর্‌রা পড়ে গেল। প্রায় তিরিশজন মজুর আগুন পোয়াচ্ছে; উপভোগ করছে তাপ। পিটে ঢোকবার আগে এরা এখানে গায়ে একটু তাপ লাগিয়ে নেয়, পিটের স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া তো সইতে হবে। কিন্তু আজ যেন স্ফূর্তিটা একটু বেশি। মোকেকে নিয়ে ঠাট্টা করছে। আঠারো বছরের মেয়ে, ওর বিরাট স্তন আর মাংসল উরুর আভাস পুরনো কোর্তা আর ব্রীচেস ছিঁড়ে ফেটে পড়ছে। রিকুইলারে সে থাকে, তার বুড়ো বাবা কোচমান, ভাই মোকে খনিতে খালাসীগিরি করে। একই সময়ে তাদের কাজের পালা পড়ে। সে নিজেই পিটে যায়, আর গ্রীষ্মে গমের খেতের ভিতরে বা শীতে দেয়ালে ঠেস দিয়ে তার ফি-হপ্তার পিরিতের মানুষের সঙ্গে ফুর্তি

করে। খনির সবারই পালা পড়ে। অনবরত সঙ্গীদের পালা আসছে, যাচ্ছে, কিন্তু কোন পরিণামের বাধ্য-বাধ্যকতা নেই। একবার মার্সিয়ের এক পেরেক-তৈরি করা কামারকে নিয়ে ওকে সবাই মন্দই বলেছিল, ওতো রেগেই আগুন। চেঁচিয়ে বললে ওর নিজের উপর যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। মজুর ছাড়া আর কারো সঙ্গে ওকে দেখেছে, একথা কেউ বলুক তো দেখি—ও নিজের হাত কেটে ফেলবে না!

এক মজুর মুখ-ভঙ্গি করে বললে, এখন কার পালা? সাভালের না? না ওকে ছেড়ে দিয়েছ? এখন বুঝি ঐ বাঁটকুলের পালা? ও তোমাকে নিয়েছে? ওর তো মই লাগে নিশ্চয়ই। সেদিন রিকুইলারে দেখেছি তোমাদের। মাইলের পিলপের উপর দাঁড়িয়ে তবে তো তোমার নাগাল পেল।

মোকে হেসে উত্তর দিলে, তা তোমার কি গো? তোমাকে তো আর ডাকছি না। স্থূল, অশ্লীল ঠাট্টা, কিন্তু হুল নেই, তাই ওদের হাসি আরো বেড়ে গেল। কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে টান করে উত্তাপে চাঙ্গা হয়ে ওরা হেসে উঠল হো হো করে। মেয়েটাও হাসির দমকে কাঁপছে, ওর পোষাকের অশ্লীলতা আরো প্রকট হয়ে উঠছে। দেখে হাসিও পায় আবার বিব্রত হয়েও যেতে হয়। ওর দেহ মেদস্ফীত, মনে হয় যেন কোন রোগই আছে।

স্ফূর্তি থেমে গেল, মোকে মেয়ুকে বললে, জানো, ফ্লিউরাঁস, বড় ফ্লিউরাঁস আর কাজে আসবে না। তাকে বিছানায় কাল রাতে মরা পাওয়া গেছে। কেউ বলে বুকের দোষ, কেউ বলে এক পাঁট জিন তাড়াতাড়ি খেতে গিয়ে দমবন্ধ হয়ে এই কাণ্ড। মেয়ু বসে পড়ল; আবার এক মন্দ খবর, ওদের সবচেয়ে ভাল পুটার চলে গেছে, এখনি তার বদলি লোক পাওয়া ভার। জাচারি, লেভাক আর সাভাল এক কাটিংএ তার সঙ্গে কাজ করে। ক্যাথেরিনকে যদি একা চাকা ঘোরাতে হয় তাহলে তো কাজের ক্ষতি হবে।

হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠল,

পেয়েছি! একটা লোক কাজ খুঁজতে এসেছে বটে।

সেই মুহূর্তে দাঁসার শেডের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, মেয়ু তাকে ব্যাপারটা বলে লোক লাগাবার হুকুম চাইলে। কোম্পানি যে আঁজির মতোই মেয়ের বদলে পুরুষ রাখতে চায়, তাও জোর দিয়ে বললে। সর্দার শুনে হাসল। মেয়েমানুষদের খনি থেকে বাতিল করা খনির মজুররা ভাল ভাবে নেয় না, ওরা নিজেদের মেয়েদের সেখানে কাজে লাগাবার জন্যে তাগ্ করে থাকে, তারা নীতিবোধ বা স্বাস্থ্যের প্রশ্ন নিয়ে সেখানে মাথা ঘামায় না। একটু ইতস্তত করে সর্দার রাজী হ'ল, তবে ইঞ্জিনিয়ার মঁসিয়ে নিগ্রেলের মঞ্জুরি দরকার।

জাচারি বলে উঠল, তাতো যেন হ'ল, কিন্তু লোকটা বোধ হয় এতক্ষণে চলে গেছে।

ক্যাথেরিন বললে, না, আমি ওকে বয়লার ঘরের সামনে দেখেছি।

মেয়ু চিঁচিয়ে উঠল, যা ছুটে যা না ছুঁড়ি, ধরে নিয়ে আয়!

ক্যাথেরিন ছুটে চলে গেল। এবার সুড়ঙ্গের মুখে রওনা হ'ল একদল মজুর, আগুনের ধারটা ছেড়ে দিয়ে গেল আর এক দলকে।

জাঁলিন বাপের জন্যে বসে না থেকে নিজের বাতিটা আনতে চলে গেল বেবের্ত আর লিদির সঙ্গে। বেবের্ত হাবা ছেলে, বেশ মোটাসোটা আর লিদি

দশ বছরের বাচ্চা মেয়ে। মোকে ওদের আগে আগে যাচ্ছে, সে অন্ধকার পথে দাঁড়িয়ে ওদের গাল দিলে, চিমটি কাটলে, কানমলে দেবে বলে শাসালে।

বয়লার ঘরেই ছিল এতিয়েঁ। খালাসীর সঙ্গে কথা বলছিল। ফার্নেসে কয়লা দিচ্ছে খালাসী। রাতের কথা ভেবে এতিয়েঁ ভয় পাচ্ছে, রাতেই তো তাকে এখান থেকে ফিরে যেতে হবে। রওনা হবে বলে সে পা বাড়াল, এমন সময় তার কাঁধে কে হাত রাখলে।

ক্যাথেরিন বললে, এস, তোমার জন্য কাজ ঠিক হয়ে গেছে।

সে প্রথমে ঠিক বুঝতে পারল না। তারপর এল উল্লাস, মেয়েটির হাত সে চেপে ধরল।

বহুৎ খুশ খবর সাঙাৎ। ভারি ভালো তুমি!

ক্যাথেরিন হাসতে লাগল, ফার্নেসের লাল আলোয় তাকে দেখছে। ভারি মজাতো, তাকে ছোঁড়া বলে ঠাউরেছে লোকটা! হাঁ, ওতো ছিপছিপেই, বেণীটা তো এখন টুপির নীচে। এতিয়েঁ খুশীতে হাসছে। দুজনেই পরস্পরের আলো-ঝলা মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল।

শেডে নিজের বাক্সটার সুমুখে পা ছড়িয়ে বসেছে মেয়ু, কাঠের গোড়ালি-ওয়ালা জুতো আর পুরু পশমী মোজা খুলছে। এতিয়েঁ যখন এল, দু'চার কথায় সব ঠিক হয়ে গেল। তিরিশ সু করে দিনে মজুরি, খুব মেহনতির কাজ, কিন্তু কাজ খুব সহজেই সে শিখে নিতে পারবে, ভারি সহজ কাজ। মেয়ু এবার তাকে জুতো ছেড়ে ফেলতে বললে, মাথাটা বাঁচাবার জন্যে একটা চামড়ার টুপি দিলে। মেয়ু আর তার ছেলেমেয়েরা ও টুপি পরে না, ওর উপরে তাদের ঘৃণা। যন্ত্রপাতি বেরুল সিন্দুক থেকে, ফ্লিউরাঁসের শাবলখানাও পাওয়া গেল। এবার মেয়ু তার জুতো আর মোজা, এতিয়েঁর পুঁটলিটা টানায় রেখে বন্ধ করে অসহিষ্ণু হয়ে উঠল।

সাভাল-কুঁড়েটা করছে কি? আবার কি কোন ছুঁড়ির সঙ্গে দেয়ালের ধারে কি পাথরের গাদার উপরে লুটোপুটি খাচ্ছে নাকি? এরই মধ্যে তো আধঘন্টা দেরি হয়ে গেল।

জাচারি আর লেভাক আগুন পোয়াচ্ছে পেছন ফিরে। জাচারি বললে, সাভালের জন্যে বসে আছ নাকি। ওতো আমাদের আগে এসে নেমে গেছে।

কি; তুই জানিস, অথচ বলছিস না। আয় চলে আয়! জলদি!

ক্যাথেরিন হাত সেঁকছিল, দলের সঙ্গে তাকেও যেতে হ'ল। এতিয়েঁ তাকে আগে যেতে দিলে, নিজে রইল পিছনে। সিঁড়ি আর অন্ধকার বারান্দার গোলক ধাঁধার ভিতর দিয়ে তারা চলেছে, তাদের খালি পায়ের শব্দ উঠছে। এ যেন পুরনো জুতোর ঢপ্ ঢপ্। বাতিঘর ঝক ঝক করছে। কাচের ঘর, সারি সারি আঙ্টা, তাতে ঝুলছে শয়ে শয়ে ডেভি বাতি। কাল রাতে পরীক্ষা করে ধুয়ে মুছে রাখা হয়েছে। গির্জার মোমের সারি যেন। এবার প্রতিটি মজুর নিজের বাতিটি তুলে নিলে, তার নম্বরটি মারা আছে বাতির গায়ে। তারপর পরীক্ষা করে দেখে নিয়ে আবার বাতির দরজাটা বন্ধ করে দিলে। মার্কার বসে আছে টেবিলে, রেজিস্টারিতে সে কে কখন নাব্‌ছে লিখে রাখছে। মেয়ুকে তার নতুন পুটারের বাতির জন্য বলতে হ'ল। আরো পরীক্ষা বাকি। মজুররা সারবন্দী হয়ে দাঁড়াল পরীক্ষকের সামনে। সে ভাল

করে দেখে নিলে লণ্ঠনগুলির দরজা বন্ধ কিনা।

ক্যাথেরিন কাঁপতে কাঁপতে বিড়বিড় করে বললে, বরাত! এখানেও শীত!

এতিয়েঁ শুধু মাথা নাড়লে। সে সুড়ঙ্গের মুখোমুখি এই বিরাট হলঘরে দাঁড়িয়ে আছে। হাওয়ার ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। নিজেকে তার সাহসী বলে মনে হ'ল, কিন্তু বুকে কেমন এক অস্বস্তি। গাড়ির ঘড়ঘড়ানি, সিগন্যালের ফাঁপা শব্দ, শিঙার অস্ফুট ধ্বনি, তারের এলোপাথাড়ি ওঠা নামা। ইঞ্জিন একবার খুলে দিচ্ছে আবার জড়িয়ে যাচ্ছে। খাঁচা উঠছে আবার তলিয়ে যাচ্ছে, যেন এক নিশাচর জন্তু গুঁড়ি মেরে চলেছে, গ্রাস করছে মানুষগুলোকে, সুড়ঙ্গের মুখ যেন তাদের ঘাড় মটকে রক্ত চুষে শুষে নিচ্ছে। এবার তার পালা। ভারি ঠাণ্ডা লাগছে, কেমন যেন থম্‌থমে নীরবতা ঘনিয়ে আসছে মনে, বাইরেও তারই প্রকাশ। জাচারি আর লেভাকের ওর এই হাবভাব ভাল লাগছে না। হঠাৎ উট্‌কো একটা লোককে কাজে লাগানো তাদের ভাল লাগেনি। লেভাক তো একটু চটেই গেছে, একটিবার তার পরামর্শও নেওয়া হ'ল না। ক্যাথেরিন কিন্তু খুশী। তার বাবা ছোকরাকে সব বোঝাচ্ছে, আর ক্যাথেরিন তা শুনছে।

দেখ, খাঁচার উপরে একটা প্যারাচুট দড়ি বাঁধবার লোহার হুকে টাঙানো রয়েছে। যদি খাঁচা ভেঙে যায় তাই ব্যবস্থা। ওটা কাজে লাগে কিনা জিজ্ঞেস করছ? সব সময়ে লাগে না। সুড়ঙ্গটা তিন ভাগে ভাগ করা, আগাগোড়া কাঠ দিয়ে ঘেরা। মাঝখানে আছে খাঁচাগুলো। বাঁদিকে মই লাগাবার জায়গা—

কথা থামিয়ে গজর গজর সুরু করল মেয়ু, কিন্তু গলা যাতে না চড়ে সে সম্বন্ধে খুব হুঁশিয়ার।

এখানে আবার আটকে রাখল কেন, দুত্তোর! আমাদের এমনি শীতে জমিয়ে দেবার ওদের এখতিয়ার কি?

সর্দার রিসোম বাতিটা চামড়ার টুপির হুকে ঝুলিয়ে নীচে নামছিল, সে শুনে ফেললে।

হুঁশিয়ার সাঙাৎ, উপরালার কান খাড়া হয়ে আছে। মুরুব্বীর মতো বললে।

বুড়ো খনির মজুর সাঙাতের উপর তার মায়া আছে বৈ কি! মজুররা যা সাধ্যে কুলোয় করবে। চেপে যাও। এই যে এসে গেছে, খাঁচায় সাঙাৎদের নিয়ে ঢুকে পড়।

খাঁচায় লোহার তারের জাল দেওয়া, চারপাশে লোহার শিকে ঘেরা জায়গার ভিতরে খাঁচাটি তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। মেয়ু, জাচারি, ক্যাথেরিন নীচের একটা গাড়িতে ঢুকে পড়ল। পাঁচজনকেই ঢুকতে হবে, এতিয়েঁও ঢুকল, কিন্তু ভাল জায়গাগুলি এর মধ্যে দখল হয়ে গেছে। সে কোন রকমে ক্যাথেরিনের গা ঘেঁসে দাঁড়াল। ক্যাথেরিনের কনুই এসে ঠেকছে ওর পেটে, চাপ পড়ছে। বাতিটা নিয়ে হ'ল এতিয়েঁর বিপদ। ওর কোর্তার বোতামের ঘরে কেউ কেউ ওটা ঝুলিয়ে নিতে বললে। সে কিন্তু হাতেই রাখল। মানুষে ভর্তি হতে লাগল গাড়ি, উপরে নীচে গাদাগাদি, ঠাসাঠাসি। যেন কতগুলি গরু-ভেড়ার দল। কিন্তু খাঁচা এখনো ছাড়ছে না। কি ব্যাপার? অনেকক্ষণ সে ধৈর্য ধরেছে। এবার একটা ধাক্কা, আলো নিবু নিবু হয়ে এল।

সব কিছু যেন উড়ছে। এতিয়েং অনুভব করল ঘুরে ঘুরে সে নীচে পড়ছে, মাথা ঘুরছে, পাকস্থলিতে পাক দিচ্ছে। যতক্ষণ আলো দেখা যাচ্ছে ততক্ষণ। ঘূর্ণি, এবার ঘূর্ণি! পিটের অন্ধকারে এবার এসে পড়ল, মাথায় যেন ডান্ডা পড়ল, ইন্দ্রিয়ের চেতনাই আবছা।

এবার আমরা চলেছি, মেয়ু আস্তে আস্তে বলল।

সবাই এতক্ষণে স্বস্তি পেল। এতিয়েং ভাবছে মাঝে মাঝে, সে কি উপরে উঠছে, না নীচে নাব্‌ছে। খাঁচা যখন সোজা উঠছে, গতিবেগ বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু খানিক পরেই নাড়া লাগছে আচম্‌কা, জয়েস্টের ভিতরে এ যেন এক নাচন। দুর্ঘটনার আশঙ্কা হ'ল তার। জালের উপরে মুখ রেখে সে সুড়ঙ্গের দেয়াল দেখতে চেষ্টা করল, কিন্তু দেখা তো যায় না। তার পায়ের কাছে দেহের স্তূপ, মিয়নো আলো এসে পড়েছে সেখানে। শুধু পাশের গাড়িতে সর্দারের আ-ঢাকা আলোটা বাতিঘরের মতো জ্বলছে।

মেয়ু ওকে বোঝাচ্ছিল, এর ব্যাসটা হচ্ছে চার মিটার, কাঠের দেয়ালও সারানো দরকার, জল সব জায়গায় ঢোকে। হঠাৎ সে বলে উঠল, শুনছো সাঙাৎ, আমরা ওখানটায় এসে গেছি।

এতিয়েং বৃষ্টি পড়ার শব্দ শুনে নিজের মনে ভাবতে লাগল এর মানে কি? খাঁচার উপর কয়েক ফোঁটা পড়ার শব্দ শুনেছিল। বেশ বড় ফোঁটা; পসলার শুরু এমনি করেই হয়। এবার বৃষ্টি বাড়ছে, ধারায় ঝরছে, প্রলয় শুরু হ'ল। ছাদে নিশ্চয়ই বহু গর্ত, সুতোর মতো একটা জলের ধারা ওর কাঁধের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে, গা ভিজে গেল। বরফের মতো ঠান্ডা, কালো ভিজে অন্ধকারে তারা ঢাকা পড়েছে। হঠাৎ এক ঝলক আলো দেখা দিল, তার ভিতর দিয়ে যেতে যেতে ওরা একটা গুহা দেখতে পেল। সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে মানুষ। আবার অন্ধকার।

মেয়ু বললে,

এই হচ্ছে, পয়লা স্তর। আমরা তিনশো-বিশ মিটার পার হয়ে এলাম। দেখ না, কি জোরসে ছুটছে।

বাতিটা তুলে সে ধরল। জয়েস্টের উপর আলো চলকে পড়েছে, মনে হচ্ছে যেন রেললাইন। তার উপর দিয়ে চলেছে পূর্ণবেগে গাড়ি। আরো তিনটে স্তর তারা এক নিমেষে অতিক্রম করে এল। অন্ধকারে পড়ছে বৃষ্টি, শব্দে কানে তালা লাগে।

কি খাই! এতিয়েং বিড়বিড় করে বলল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তারা যেন নীচে নামছে। কোনরকমে দুইজনের মাঝামাঝি কুঁকড়ে আছে, হাত-পা নাড়বারও জো নেই। আর ক্যাথেরিনের কনুইয়ের গুঁতো তো আছেই। ক্যাথেরিন একটা কথা বলছে না, এতিয়েং শুধু তার দেহটা নিজের দেহের উপর অনুভব করছে, বেশ উত্তাপ সঞ্চারিত হচ্ছে। খাঁচা এবার এসে একেবারে তলায় থামল, পাঁচশো চুয়ান্ন মিটার তলায়। সে শুনে অবাক হয়ে গেল, নাব্‌তে নাকি ঠিক এক মিনিট লেগেছে। বল্টুর শব্দ। নীচের জমির কঠিন স্পর্শে হঠাৎ যেন খুশী হয়ে উঠল, ক্যাথেরিনকে সে ঠাট্টা করেই বললে,

তোমার জামার নীচে কি আছে সাঙাৎ যে অতো গরম লাগল? আমার

পেটে তো কনুই দিয়ে জোরসে গুঁতো মারছিলে।

ক্যাথেরিন হেসে উঠল। কি বোকা, এখনো ওকে ছেলে মনে করে! চোখ নেই নাকি!

তোমার চোখে আমার কনুয়ের গুঁতো লেগেছিল বুঝি! সে হাসির ঝড়ের ভিতরে জবাব দিলে। এতিয়েঁ কারণটা বুঝতে পারল না।

খাঁচা মজুরদের উগ্‌রে দিচ্ছে। তারা এবার একটা ঘরে এল। পাথর কেটে ঘর তৈরি, তিনটে বড় বড় বাতি জ্বলছে। লোহা-বাঁধানো মেঝের উপর দিয়ে কুলিরা জোরে ভর্তি গাড়িগুলো ঠেলে নিয়ে চলেছে। দেয়াল থেকে যেন কেমন গুহার ভিতরের ভ্যাপসা গন্ধ আসছে। এ যেন সোরার গন্ধের সঙ্গে মিশে আছে পাশের আস্তাবলের কটু গন্ধ। এইখানেই চারটে গ্যালারির মুখ।

মেয়ু এতিয়েঁকে বললে, এখনো পৌঁছায়নি, চার মাইল প্রায় বাকি।

মজুররা এবার ভাগ হয়ে পড়ল দলে দলে। কালো গর্তের কোটর তাদের গিলে ফেললে। বাঁদিকের গর্তে প্রায় পনেরো জন মানুষ চলে গেল। এতিয়েঁ মেয়ুর পেছনে চলেছে, তার আগে ক্যাথেরিন, জাচারি আর লেভাক। মালগাড়ি রাখবার গ্যালারি পাথর কেটে করা হয়েছে, এখানে ওখানে একটু আধটু দেয়াল গড়তে হয়েছে। এখনো তারা চলেছে নিঃশব্দে সারবন্দী হয়ে, ঠুলি-আঁটা আলোর ম্লান আলোয় পথ দেখছে।

এতিয়েঁ তো প্রতি পদে হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল। পা রেলে বেধে যাচ্ছিল। মুহূর্তের জন্য একটা ফাঁপা শব্দে সে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল, দূরাগত ঝড়ের শব্দ যেন, তার প্রচণ্ডতা ক্ষণে ক্ষণে বাড়ছে। মনে হচ্ছে, মাটির ভিতর থেকে উঠে আসছে। একি ধসের গর্জন, তাদের মাথার উপর কি ধসে পড়বে প্রকাণ্ড এক চাঙড়, আলো থেকে তারা কি পড়বে বিযুক্ত হয়ে? অন্ধকারে দাগ কেটে দিচ্ছে একটি আলোর শিখা, এতিয়েঁ অনুভব করল পাহাড় কাঁপছে। সাঙাৎদের মতো দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। একটা বিরাট সাদা ঘোড়া তার মুখের কাছে এসে গেছে। মালগাড়ির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে ঘোড়াটাকে। প্রথম গাড়িতে লাগাম ধরে বসে আছে বেবের্ত। জাঁলিন শেষ গাড়িটা ধরে খালি পায়ে ছুটে আসছে।

আবার চলা সুরু হ'ল। কতদূর গিয়ে আবার বাঁক। দুটি নতুন গ্যালারি দুদিকে গেছে। মজুরদের দলে আবার ভাগ হয়ে গেল। মজুররা খনিতে যে যার স্টলে ঢুকে যাচ্ছে।

গাড়ির গ্যালারি কাঠের তৈরি, খুঁটির উপরে ছাদ। ধস আটকাবার জন্যে কাঠের খুঁটির ঠেক্‌নো দেওয়া, তারই নীচে আছে বেলে পাথরের স্তূপ। টব নিয়ে গাড়ি চলছে অবিরাম। কখনো বা টবগুলো ভর্তি কখনো বা খালি। পরস্পরের পাশ দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে গর্জন করতে করতে। তাদের আলো আঁধারি ছায়ায় টেনে নিয়ে চলেছে বড় বড় ঘোড়াগুলি। তারাও যেন ছায়াময়, ছায়ার মতোই চলেছে। সান্টিং লাইনের দুই পথের মাঝখানে একখানা গাড়ি অচল হয়ে আছে—এক প্রকাণ্ড কালো সাপ যেন ঘুমিয়ে। ঘোড়াটার নাক ডাকছে, ওর পেছন দিকটা দেখে মনে হয় ছাদের খানিকটা বুঝি ধসে পড়েছে। ওরা নিশ্বাস-প্রশ্বাস নেবার দরজা আস্তে আস্তে খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে।

এগিয়ে চলল। গ্যালারি এবার সরু আরো নীচু হয়ে এসেছে, ছাদ কোথাও বা ঢালু, কোথাও বা উঁচু। বার বার তারা নুয়ে পড়ছে।

এতিয়েন'র মাথাটা জোরে ঠুকে গেল, চামড়ার টুপিটা না থাকলে খুলিই চৌচির হয়ে যেত। কিন্তু তবু মেয়ুর অনুসরণ করছে, আলোয় দেখা যাচ্ছে তার গম্ভীর মুখ। আর কারো মাথা ঠুকে যায়নি। গ্যালারির কোথায় কোন্ ধাতু বা কাঠের টুকরো উঁচিয়ে আছে, কোথায় বা পাথর ঢিবি হয়ে আছে তা তাদের জানা। পিছল পথে হাঁটতে এতিয়েন'রই একা কষ্ট হ'ল। যত যাচ্ছে, পথ ততই স্যাঁতসেঁতে আর পিছল হয়ে উঠছে। কখনো বা কাদা জলভরা গর্তে পা পড়ছে, কাদাজল ছিটকে উঠে জানিয়ে দিচ্ছে সেকথা। কিন্তু সবচেয়ে অবাক হ'ল সে তাপের পরিবর্তন দেখে। সুড়ঙ্গের নীচে বড় ঠান্ডা। গাড়ি রাখার গ্যালারি দিয়ে খনির যত হাওয়া বেরিয়ে যায়। সেখানে সরু দেয়ালের ভিতর দিয়ে হাওয়া বইছে ঝড়ের প্রচণ্ডতা নিয়ে। ওরা যত ভিতরের দিকে যেতে লাগল, হাওয়ার জোর ততো কমে এল। হাওয়া কমে গেছে, গরম বাড়ছে। সীসের মতো ভারী দম বন্ধ-করা গরম।

মেয়ু চুপচাপ, মুখ খুলছে না। ডান দিকে একটা গ্যালারির দিকে যেতে যেতে সে এতিয়েন'কে মুখ না ফিরিয়েই বললে,

গিয়োম স্তর।

এইখানেই তাদের কাটিং। প্রথমে পা দিতে গিয়েই মাথা আর কনুইয়ে আঘাত লাগল। ঢালু ছাদ, বিশ-ত্রিশ মিটার পথে কখনো কখনো এত নীচু হয়ে নেমে গেছে যে, তাকে একরকম গুঁড়ি মেরেই চলতে হ'ল। হাঁটু অবধি জল পথে। দুশো মিটার এমনি চলবার পর সে হঠাৎ দেখতে পেল জাচারি, লেভাক আর ক্যাথেরিন উবে গেছে। তার মনে হ'ল, তার সুমুখে যে ফাটল দেখা যাচ্ছে তারই ভিতরে তারা বুঝি ভাসতে ভাসতে চলে গেল।

মেয়ু বললে, উপরে উঠতে হবে। বোতামের ঘরে বাতিটা ঝুলিয়ে নাও, কাঠ ধরে ধরে চল। সে মিলিয়ে গেল, এতিয়েঁ চলল পিছনে। এই চিম্‌নি পথে স্তরে পেঁছিনো যায়, এটা খনির মজুরদের জন্য। এখান থেকে আর আর ফ্যাঁকড়া পথগুলিতেও যাওয়া যায়। খনির গর্ভের মতোই চওড়া পথ। ভাগ্য ভাল, এতিয়েঁ রোগা, সে কোন রকমে অনেক তাকত বৃথা খরচ করে শুধু হাতের সাহায্যে তক্তাগুলো চেপে ধরে এগুতে লাগল। খানিকটা উঁচুতে উঠে ওরা প্রথমে ফ্যাঁকড়া পথে এসে গেল। কিন্তু আরো যেতে হবে। এটা তো মোটে পয়লা পথ, ছ'নম্বরে মেয়ুদের কাটিং। ওরা তাকে নরক বলে। প্রতি পনেরো গজ অন্তর পথগুলি যেন এ ওর গায়ে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। দেখে মনে হয়, এ সুড়ঙ্গের যেন আর শেষ নেই। এরই গোলকধাঁধায় শুধু ঘুরে ঘুরে মরতে হবে। এতিয়েঁ কঁকিয়ে উঠল, পাথরের ভার যেন তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি থেঁতলে দিচ্ছে। হাত পা ছড়ে গেছে, হাওয়ার কম্‌তিতে কষ্ট হচ্ছে। তার মনে হ'ল, রক্ত বুঝি চামড়া ছিঁড়ে ফেটে পড়ে আর কি! একটা পথে আবছা দুটি জীবকে দেখা গেল, একজন ঢ্যাঙা, আর একজন বেঁটে। দুজনেই গাড়ি ঠেলছে। ওরা লিদে আর মোকো। কাজ শুরু করে দিয়েছে। আর তাকে এখনো আরো উপরে উঠতে হবে। ঘাম দরদর করে ঝরছে, চোখেও দেখতে পাচ্ছে না। অন্যদের নাগাল পাবারও আশা নেই, তাদের ক্ষিপ্রগতির

শব্দ শোনা যাচ্ছে পাথরের উপর।

আরে এই যে এসে গেছি! ক্যাথেরিন বলে উঠল।

সত্যিই তারা এসে গেছে।

নীচ থেকে কার স্বর ভেসে এল,

এই বুঝি তোমাদের চলা বাপু? মংতসু থেকে চার মাইল ঠেঙিয়ে আসতে হয়, আর আমিই কিনা আগে-ভাগে এসে গেলাম।

সাভাল বলছে। ঢ্যাঙা রোগা, হাড়সার মানুষটি। পঁচিশ বছর তার বয়েস হবে। অপেক্ষা করে করে তার মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে আছে। এতিয়েংকে দেখে ও একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, ওটা আবার কোত্থেকে এল? তার স্বরে ঘৃণা।

মেয়ু তাকে সমস্ত কথা বলতে সে দাঁতে দাঁত চেপে বললে,

ওরা মেয়েমানুষের রোজগারখানেওয়ালা মরদ।

দুজনে দুজনের দিকে তাকাল, এক প্রকৃতিগত ঘৃণা যেন হঠাৎ ঝলসে উঠল দুজনের চোখে। এতিয়েং কথাটার মর্ম বুঝতে পারেনি, তবু অপমান অনুভব করল। কয়েক মুহূর্তের ছেদ। ওরা এবার কাজ শুরু করলে। সবগুলি স্তরই ভর্তি হয়ে গেল ক্রমে ক্রমে।

প্রতি পথের শেষে কাটিংএ কাটিংএ মানুষের কর্মব্যস্ততা। সুড়ংগ তার রোজকার বরাদ্দ গিলে ফেলেছে। তা প্রায় সাতশো মজুর তো হবেই। এই বিরাট উইয়ের ঢিবিতে তারা কাজে ব্যস্ত। মাটিতে গর্ত খুঁড়ছে, ঘুণে-ধরা পুরানো কাঠের মতো তাকে যেন ভোঁড় দিয়ে ফুঁড়ছে। স্তরের নীচের এই প্রচণ্ড নীরবতায় পাথরের উপর কান পেতে শুনতে পাবে এই মানুষ-পোকাদের কর্মের গুঞ্জন, শুনতে পাবে তারের শব্দের সংগে সংগে খাঁচার ওঠা নামা, কয়লার স্তর কাটার শব্দ।

এতিয়েং ফিরে দাঁড়াতেই ক্যাথেরিনের গায়ে ধাক্কা লাগল। এবার সে তার বুকের উন্নত যৌবন দেখতে পেল। সে বুঝতে পারল কিসের উষ্ণ স্বাদ সে পেয়েছিল।

তুমি তাহলে মেয়ে! সে চেঁচিয়ে উঠল, কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেছে।

লজ্জিত না হয়ে সে জবাব দিলে,

মেয়েই তো! তোমার বুঝতে দেরি হ'ল কেন?

চার

কাটিং জুড়ে একজন আর একজনের উপরে যেন পড়ে আছে গাঁইতি চালকরা।

কয়লা যাতে পড়ে না যায় তার জন্য কাঠের মাচা ঝোলানো। প্রতি জন স্তরের চার হাত করে জায়গা জুড়ে আছে। স্তর পাতলা হয়ে এসেছে এখানে তো পঞ্চাশ সেন্টিমেটার মাত্র মাত্র পুরু। তারা যেন ছাদ আর দেয়ালের মাঝখানে পাতের মতো লেগে আছে, হাঁটু আর কনুইয়ে ভর দিয়ে নিজেদের

টেনে নিয়ে চলেছে। ঘুরতে ফিরতে পারছে না, কাঁধখানাই হয়তো তাতে পিষে যাবে। কয়লার স্তরে আক্রমণ চালাবার জন্য একপাশে শুয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে, হাত তুলে নিজেদের ছোট বাঁটওয়ালা গাঁইতিগুলো দুলিয়ে দুলিয়ে ঢালু জায়গাটার উপর কোপ মারছে।

নীচে প্রথমে আছে জাচারি; লেভাক আর সাভাল তার উপরের মাচায়। আর সবচেয়ে উঁচুতে মেয়ু। সবাই শ্লেটের মতো খনির কালোগর্ভে কাজ করছে, গাঁইতি দিয়ে কাটছে, খুঁড়ছে। দুটো আড়াআড়ি চাঙড় কাটছে, একটার থেকে আর একটা লোহার গোঁজ ঢুকিয়ে আলাদা করে নিচ্ছে। চমৎকার কয়লা! চাঁইটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে তাদের পেট আর উরুর উপর। যখন মাচার উপরে এই টুকরোগুলো জমা হয়ে উঠছে, গাঁইতি-চালিয়েরা মিলিয়ে যাচ্ছে সরু সুড়ঙ্গ পথে। মেয়ুর কষ্ট সব চাইতে বেশী। উপরে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রী তাপ, হাওয়া স্তব্ধ, এই স্তব্ধতাই একদিন বিষাক্ত করে তুলবে আবহাওয়া। দেখবার জন্য মাথার কাছে একটা পেরেকে ঝুলিয়ে রেখেছে বাতিটা। বাতির উত্তাপ খুলিতে লাগছে, রক্ত আরো গরম হয়ে উঠছে, কিন্তু সবচেয়ে যন্ত্রণা দিচ্ছে ভিজে আবহাওয়া। তার মাথার উপরের পাথর বেয়ে জলের ধারা নামছে, বড় বড় ফোঁটায় বিরামহীনভাবে পড়ছে একই জায়গায়, কেমন একগুঁয়ে তার ছন্দ। মাথা বাঁকানো বা ঘাড় নোয়ানো বৃথা। তার মুখের উপর পড়ছে তো পড়ছেই। পনেরো মিনিটের ভিতরে সে ভিজে চুপসে গেছে, আবার ঘামও হচ্ছে। ধোবিখানার বাষ্পের ধোঁয়ায় যেন সে আচ্ছন্ন। আজ ভোরে আবার চোখের উপরেও ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে শুরু করেছে। গালাগালি সে দিচ্ছে। কিন্তু কাজ কামাই দেবার তো উপায় নেই, গাঁইতি চালাতে হবেই। আর সে জোরেই কোপ মারছে, তাতে নিজেই দুটো পাথরের মাঝখানে থেকেও প্রচণ্ডভাবে কেঁপে কেঁপে উঠছে। এ যেন একটা পোকা, বইয়ের দুখানা পাতার ভিতরে সেঁধিয়ে গেছে, একেবারে চেপ্‌টে যাবার তার আশঙ্কা।

মুখে কথা নেই। সবাই স্তরে আঘাত করছে। শুধু খাপছাড়া কোপের শব্দ। যেন কেমন ঘেরাটোপ দেওয়া, দূর থেকে আসা শব্দ। একটা কর্কশ গর্জন আছে শব্দে, কিন্তু প্রতিধ্বনি তো নেই এই বায়ুলেশহীনতায়। অন্ধকারও যেন এখানে অজানা কালোয় ভরা। কয়লার গুঁড়োর ঢেউয়ে স্ফীত হয়ে উঠছে, গ্যাসের ভারে ভারি হয়ে চোখের উপর নেমে আসছে অন্ধকার। শুধু মজুরদের টুপির তারে বাঁধা বাতির পলতে রক্তাভ বিন্দুর মতো জ্বলছে। কিছুই দেখা যায় না। কাটিং উপরে বিরাট চোঙের মতো ছড়িয়ে আছে, তেমনি চেপ্টা, তেমনি কালো—যেন দশ বছরের ঝুল গভীর রাতের নিবিড়তা এনে দিয়েছে। তারই মধ্যে ঘুরছে প্রেতায়িত ছায়ার মতো কারা। আলোর ঝলকে শুধু মাঝে মাঝে দেখা যায় সুগোল নিতম্বের আভাস, পাকানো দড়ির মতো হাত, প্রকাণ্ড, কালি-মাখা—যেন পাপানুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত। কখনো বা কয়লার চাঙড়গুলোও ঝলসে ওঠে। তারা যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছে, স্ফটিকের মতো তাদের প্রতিফলন। তারপর আবার অন্ধকার। গাঁইতির ফাঁপা আর ভারি শব্দ উঠছে। বুকের শ্রান্ত ওঠা-নামা, অসন্তোষ আর ক্লান্তির গোঙানি শোনা যাচ্ছে ভারি আবহাওয়া আর বৃষ্টির শব্দের ভিতরে।

জাচারির হাতখানা গত রাতের মাইফেলে কাবু হয়ে গিয়েছিল। তাই সে কাঠের দরকার এই ছুতোয় কাজ করা ছেড়ে দিলে। ও শিস দিতে লাগল ছায়ায় বসে। খানিকটা ভুলে থাক না! গাঁইতি-চালিয়েদের পিছনে তিন স্তর পরিষ্কার হয়ে গেছে। পাথরে ঠেক্‌নো দেবার এখনো কোন বন্দোবস্ত হয়নি। বিপদের ভয় আর দুঃখকে তারা যেন আর গ্রাহ্যই করে না।

এতিয়েঁকে এক ছোকরা চেঁচিয়ে বললে, এই মাথা-মোটা, যাওনা, খানকয়েক কাঠ নিয়ে এস না!

এতিয়েঁ ক্যাথেরিনের কাছ থেকে শাবল কি করে চালাতে হয় শিখছিল, তাকে বাধ্য হয়ে কাঠ আনতে যেতে হ'ল। কালকে যে কাঠ রাখা হয়েছিল, তার খুব সামান্য ক'খানাই আছে। রোজ ভোরে এই কাঠ পাঠানো হয়। ঠেকনোর মতো করে কাটা কাঠ আনে।

এই জল্‌দি কর! জাচারি চেঁচিয়ে উঠল। নতুন পুটার কয়লার ভিতর থেকে আস্তে আস্তে উঠে এল, তার হাত চারখানা কাঠের টুকরোয় জোড়া। কি করবে সে ভেবে পাচ্ছে না।

সে শাবল দিয়ে ছাদে গর্ত করলে, আর একটা গর্ত খোঁড়া হ'ল দেয়ালে, তারপর কাঠের দু'দিক সেখানে বসিয়ে দিলে। এতে পাথরের ঠেক্‌নো হ'ল। বিকেলে গাঁইতি-চালিয়েরা যে সব জঞ্জাল গ্যালারির নীচে জমা করে রেখে যায় সেগুলি মাটি-কাটা মজুররা পরিষ্কার করে ফেলে। স্তরের নিঃশেষিত ভাগ ঝেঁটিয়ে সাফ করে। ওরা উপর আর নীচের পথ সম্বন্ধে হুঁশিয়ার থাকে।

মেয়ুর কাতরানি আর শোনা যাচ্ছে না। তার চাঙড়টা খুলে এসেছে, জামার হাতায় সে ঘাম জবজবে মুখ মুছল। জাচারি পিছনে বসে কি করছে তারই জন্যে সে উদ্বিগ্ন।

সে বললে, ও এখন থাক। দুপুরের খাবার পর দেখা যাবে। যদি নিজেদের ভাগের গাড়ি ভর্তি করতে চাও তো কেটে যাও।

জাচারি উত্তর দিলে, কিন্তু এটা যে নীচে বসে যাচ্ছে, এখানে একটা ফাটল রয়েছে। যে কোন সময়ে ধস নাবতে পারে।

বাবা ঘাড় নাড়ল। আহাম্মক কোথাকার, ধস নামবে! আরে যদি নাবেই তো কি হয়েছে! এ তো আর পয়লা বার নয়। ওরা ঠিক বেরিয়ে আসবে। সে রেগে ছেলেকে কাটিঙের মুখে পাঠিয়ে দিলে।

সবাই এবার গা এলিয়ে দিয়েছে। লেভাক উঁচু হয়ে শুয়ে আছে, সে তার বুড়ো আঙুলটা দেখছে আর গাল দিচ্ছে। এক টুকরো বেলে পাথরে তার আঙুলটা ছড়ে গেছে। সাভাল খুলে ফেলেছে তার সার্টটা, খালি গায়ে কাজ করছে। জুড়িয়েছে এখন তার শরীর। কয়লায় কালো শরীর, ঘাম আর মিহি গুঁড়োয় মিশে ধারা নেবেছে, ভিজে জবজবে হয়ে উঠেছে গা। মেয়ু নীচে আবার ঘা মারতে শুরু করল। কিন্তু কপালে এবার এমন জোরে পড়ছে ফোঁটা, যে মনে হচ্ছে যেন তার মাথার খুলিতে ফুটো হয়ে যাচ্ছে।

ক্যাথেরিন এতিয়েঁকে বুঝিয়ে বললে, তুমি কিছু মনে করে ব'স না, ওরা অমনি সব সময়েই চিল্লায়।

সে আবার ভাল মেয়ের মতো এতিয়েঁকে শেখাতে লাগল। কাটিং থেকে প্রতিটা ভর্তি গাড়ি একইভাবে উপরে চলে যায়। প্রতিটার গায়ে একটা

করে ধাতুর চাকতি থাকে। এতে করে কোন্ খাদ থেকে এল তা বোঝা যায়। তাই খুব সাবধানে ভর্তি করতে হয় গাড়ি, ভাল কয়লা বেছে নিতে হয়। তা না হলে আফিসে নিতে চায় না।

এতিয়েন্‌র চোখ দুটো অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে এসেছে। সে ক্যাথেরিনের দিকে তাকাল। এখনো তাকে তেমনি ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে, কত তার বয়েস তাও সে ঠাহর করতে পারে না। তার তো মনে হয় বারো বছরই বয়েস হবে, যা ছোট দেখতে! কিন্তু তবু বয়েস বেশি বলেই মালুম হয়। কেমন যেন ছেলেদের মতো ভাব, সহজ ঔদ্ধত্য—যাতে তার ধাঁধা লাগে, সে একটু বা ঘাবড়েই যায়। না, তাকে তার ভাল লাগেনি। একটু কেমন যেন বেশি বখাটে। টুপিটা পরায় সেটা একটু বেড়েছে। কিন্তু সে অবাক হয়ে যাচ্ছে তার শক্তি দেখে। এ যেন শিশুর শক্তির সঙ্গে মিশেছে সুদক্ষ কারিগরি। ওর থেকে তাড়াতাড়ি সে গাড়ি ভর্তি করছে, শাবল দিয়ে তুলে তুলে দিচ্ছে কয়লা, তারপর ঝুঁকে পড়ে দিচ্ছে একটা ছোট্ট ঠেলা। গাড়ি সহজেই বেরিয়ে যাচ্ছে। আর ও যেন করতে গিয়ে শতখান করে ফেলছে, রেল লাইনের বাইরে গিয়ে পড়ছে গাড়ি। সে হতাশ হয়ে পড়ছে।

পথটাও সুবিধে নয়। কাটিং থেকে মুখ অবধি ষাট গজ লম্বা। চওড়া তেমন নয়। একটা ছোট-খাটো সুড়ঙ্গ-ছাদ—এখানে ওখানে উঁচু নীচু। কোথাও কোথাও ভর্তি গাড়ি কোন রকমে যেতে পারে। পুটাররা চিতিয়ে শুয়ে পড়ে হাঁটু দিয়ে ঠেলে, তা না হলে মাথা জখম হবার সম্ভাবনা। আর কাঠও নুয়ে পড়ছে বার বার ভারে। মাঝে মাঝে বড় বড় চিড় ধরছে। মনে হয় যেন নড়বড়ে একজোড়া ক্রাচ্। এর উপর দিয়ে সাবধান হয়েই চলতে হয়। কি জানি কখন গা হাত পা ছড়ে যায় কে জানে। চলতে চলতে শব্দ করে ওঠে কাঠ, বুকে হেঁটেই চলতে হয়। সব সময়েই ভয় কখন পিঠ ভেঙে যায়।

আবার অমনি করছ গা! ক্যাথেরিন হাসতে হাসতে বলল।

এতিয়েন্‌র গাড়ি গোলমেলে জায়গাটায় এসে লাইন থেকে সরে গেল। ভিজে মাটিতে বসে গেছে লাইন, তার উপর দিয়ে সে সোজা গড়িয়ে দিতে পারছে না গাড়ি। রেগে গালাগাল দিচ্ছে, চাকা নিয়ে হুড়োহুড়ি করছে। কিন্তু অত চেষ্টায়ও জায়গা মতো আসতে পারছে না।

একটু সবুর কর বাপু, মেয়েটি বললে। অতো চটলে আর গাড়ি নড়বে না, সে কেমন সুন্দরভাবে নীচে গড়িয়ে গিয়ে পাছা গাড়ির নীচে দিয়ে গাড়ি তুলে লাইনের উপর এনে ফেললে। গাড়ির ওজনও কম নয়, সাতশো কিলোগ্রাম। অবাক হয়ে গেল এতিয়েঁ, লজ্জাও করছে। সে আমতা আমতা করে কি বলে গেল। বুঝি বা নানা কৈফিয়ৎ দিলে।

ক্যাথেরিন তাকে দেখিয়ে দিলে, কি করে গ্যালারির দু'ধারের কাঠের উপর পা ফাঁক করে দাঁড়াতে হয়, বাঁকাতে হয় শরীর, কাঁধ আর পাছার মাংসপেশি দিয়ে ঠেলবার জন্যে হাত দুখানাকে মুঠো করে রাখতে হয়। শেখানো হয়ে গেল, এবার চলা শুরু। পেছনে পেছনে সে চলছে, ক্যাথেরিনকে অনুসরণ করছে। ক্যাথেরিন যেন হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে চার হাত-পায়ে, ঠিক অমনি করে চলে সার্কাসের ছোট ছোট জন্তুগুলি। ঘামছে, হাঁফ ধরে গেছে, শরীরের গাঁটে গাঁটে শব্দ হচ্ছে, কিন্তু একটু নালিশ নেই; অভ্যাস বশে এসেছে

উদাসীনতা। এ যেন সবারই দুর্দশা, এমনি করে নুয়ে নুয়ে বাঁচার মাশুল আদায় করতে হবে জীবনে। কিন্তু এতিয়েং অতখানি তো পারল না। জুতোয় লাগছে, অমনি মাথা নুয়ে যেতে যেতে মনে হচ্ছে শরীর বুঝি ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেল। কয়েক মিনিট পরে তো অসহ্য হয়ে উঠল। এক অপরিসীম যন্ত্রণা! সে এক মুহূর্তের জন্য হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। একটু সোজা হয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে।

মেহনতি আরো বাড়ল উপরে গিয়ে। ক্যাথেরিন তাকে কি করে তাড়াতাড়ি গাড়ি ভর্তি করতে হয় শিখিয়ে দিলে। খানিকটা স্তর হেলে পড়েছে। কাটিং থেকে কাটিং-এ যাবার রাস্তা এই। এখানে ব্রেকম্যান রয়েছে। উপরে বসে আছে ব্রেকম্যান, আর নীচে কয়লা নেবার লোক। আর আছে বারো থেকে পনেরো বছরের চ্যাংড়া ছোকরা, পরস্পরকে তারা যাচ্ছেতাই গালাগাল দিচ্ছে। তাদের হুঁশিয়ার করতে গিয়ে আরো জোরে উঠছে চীৎকার। যখন খালি গাড়ি আবার পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে, রিসিভার সংকেত করছে, পুটাররা ভর্তি গাড়ি নিয়ে আসছে। ব্রেক কষতে কষতেই খালি গাড়ি উঠে যাচ্ছে নীচের ভর্তি গাড়ির ভারে। নীচের তলার গ্যালারিতে গাড়ি থেমে আছে। এইগুলি ঘোড়ায়-টানা গাড়ি।

এই পাজির ধাড়ি! ক্যাথেরিন ঝুঁকে-পড়া পথ থেকে চেঁচিয়ে উঠল। কাঠে-ঘেরা পথ, একশো গজ দীর্ঘ হবে। কথা বললে প্রতিধ্বনি ওঠে, বিরাট ঢাকের শব্দের মতো শোনায়।

ওরা জিরোচ্ছে, তাই সাড়া মিলল না। প্রতিটি স্তরে কাজ বন্ধ, এবার শোনা গেল মেয়েলি খ্যান্‌খেনে স্বর ঃ

ওদের কেউ নিশ্চয়ই মোকের উপর চেপেছে!

হাসির হর্‌রা, পুটাররা পেট চেপে ধরেছে।

কে বললে? এতিয়েং ক্যাথেরিনকে জিজ্ঞেস করলে।

ও খুদে লিদির নাম করল। ভারি বজ্জাত মেয়ে। যা জানা উচিত নয় তার চেয়েও বেশি জানে। পুতুলের মতো খুদে খুদে হাত অথচ গাড়ি ঠেলে নিয়ে যায় যেন জোয়ান মরদ। আর মোকের কথা, ও তো এক সঙ্গেই দুটো মরদকে নিতে পারে।

রিসিভারের স্বর শোনা যাচ্ছে, চেঁচিয়ে গাড়ি ভর্তি করতে বলছে। ন'নম্বর খাদে আবার কাজ শুরু হয়েছে। কয়লা তোলা হচ্ছে, এবার শুধু শোনা যাচ্ছে ভর্তি-করিয়েদের হাঁকডাক, আর উপরে পুটারদের হাঁপানির শব্দ। ওরা যেন গুরুভার চাপানো হয়েছে এমনি ঘোড়া। পিটে আদিম বর্বরতা আমদানি হয়েছে, তারই যেন নিশ্বাস ঝরে পড়ছে। এ পুরুষের আকস্মিক কামনা। যখনই চার হাত-পায়ে হেঁটে চলেছে মেয়েরা, তাদের মাংসল ঊরু থল্‌থল্ করছে, ব্রীচেস ফেটে বেরুচ্ছে যেন। মজুররা দেখছে আর অমনি আকস্মিক কামনার টংকার উঠছে দেহে।

এতিয়েং যখনি কাটিং-এর গুমোটে তলিয়ে যাচ্ছে, সে শুনতে পাচ্ছে ফাঁপা কোদালের ভাঙা ছন্দ, গাঁইতি-চালিয়েদের দীর্ঘনিশ্বাস। কত গভীর ব্যথা দুলে দুলে উঠছে, কাজ তবু থামছে না। ওরা চারজনই শুধু নয়, সবারই কয়লায় গা মাখামাখি, টুপি পর্যন্ত কাদায় লেপটে গেছে—কাদা, কালো কাদা। মেয়ুকে

একটু জিরোতে দিতে হবে। সে হাঁপাচ্ছে। তক্তা সরিয়ে কয়লাগুলো পথে ফেলতে হবে। জাচারি আর লেভাক রাগে টং হয়ে আছে। ওরা বলছে, খাদের এখানকার কয়লা ভারি শক্ত, তার মানে তাদের নাজেহাল হওয়া ছাড়া তো কিছুই নয়। সাভাল মুহূর্তের জন্য চিতিয়ে শুয়ে পড়েছে, এতিয়েনকে গাল দিচ্ছে। ছেলেটা আসায় সে রাগে জ্বলে উঠেছে।

পোকা নাকি, একটা ছুঁড়ির যতটুকু তাকত তাও নেই! গাড়ি ভর্তি করতে হবে না? হাতে ব্যথা হবে বলে বুঝি অমনি কর্ছ? যদি কয়লা বাতিল হয়ে যায়, তাহলে দশ সু কেটে না রাখি তো কি বলেছি!

এতিয়েন জবাব দিল না, এড়িয়ে গেল! সে ভারি খুশী হয়েছে, এই কয়েদীর মেহনতি তাকে খুশী করেছে। তাই সে সর্দারের এই বর্বর নিয়ম-কানুনগুলোও মেনে নিচ্ছে। কিন্তু হাঁটতে সে পারছে না, পা দিয়ে ঝরছে রক্ত, শরীরের গাঁটে গাঁটে ধরেছে ব্যথা, শরীরটায় যেন লোহার জামা পরানো হয়েছে। বরাত ভাল, দশটা বেজেছে। এরা এবার দুপুরের খাবার খাবে।

মেয়ুর ঘড়ি আছে, কিন্তু সে তাকিয়েও দেখে না। নক্ষত্রহীন আকাশের নীচে এই গহ্বরে দেখবার দরকারও তার হয় না। পাঁচ মিনিটের জন্যেও সে উপরে ওঠে না। সার্ট আর কোর্তা ওরা পরে নিল। এবার কাটিং থেকে নেমে ওরা পা ছড়িয়ে উবু হয়ে বসেছে। খনির মজুরদের এ ভঙ্গী অভ্যাস-গত। খনির বাইরেও ওরা এমনি করে বসে। পাথর বা কাঠের গুঁড়ির দরকার হয় না। সবাই বার করেছে রুটি, পুরু পুরু টুকরোগুলি কামড়ে খাচ্ছে, সকালের কাজের কথা বলছে মাঝে মাঝে। ক্যাথেরিন দাঁড়িয়েছিল, সে এবার এতিয়েনের সঙ্গে গিয়ে জুটল। এতিয়েন একটু দূরে সটান লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে, রেলিঙের উপর দিয়ে পা চালিয়ে দিয়েছে, পিঠের নীচে রেলিঙের কাঠ। এখানে জায়গাটা প্রায় শুকনো।

খাবে না? ক্যাথেরিন বললে, তার হাতে রুটি, মুখও ভর্তি।

তারপর মনে পড়ল, ও তো নিঃসম্বল হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে ক'দিন। হাতে একটা পয়সা নেই, রুটি জুটবে কোত্থেকে? না রুটি ওর নেই।

আমার থেকে ভাগ নাও না।

এতিয়েন নারাজ; খিদে নেই। কিন্তু স্বর ওর কেঁপে কেঁপে উঠছে, পাকস্থলীতে খিদের হুল ফুটছে। মেয়েটি হেসে বললে,

তা অতো যদি খুঁতখুতানি থাকে, তাহলে না-ই বললাম। কিন্তু এই তো এই ধারটা থেকে একটু কামড়ে খেয়েছি। আমি কিন্তু এধার থেকে কিছুটা ভেঙে দিতে পারি।

রুটি আর মাখনের টুকরোটুকু ভেঙে ফেলেছে ক্যাথেরিন। ছোকরাটি আধখানা ভাগ নিলে, সবটুকু এক সঙ্গে গিলে ফেলল না। ঊরুর উপর হাত রাখলে, সে যে কাঁপছে ওকে তা দেখতে দেবে না। সাথীর মতো উবু হয়ে ক্যাথেরিন ওরই পাশে শুয়ে পড়ল। শান্ত মেয়েটি এক হাতের উপরে চিবুকখানা রেখেছে, আর এক হাত দিয়ে আস্তে আস্তে খাচ্ছে। ওদের লণ্ঠন দুটো রয়েছে মাঝখানে, আলোয় ঝলমল করছে দুজনের মুখ।

ক্যাথেরিন ওর দিকে চেয়ে আছে। চুপচাপ সে, ওকে বুঝি দেখছে। নিশ্চয়ই সুন্দর বলেই ওকে মনে হচ্ছে। সুকুমার মুখখানা তাতে কালো

গোঁফের রেখা। ক্যাথেরিন হাসল, আবছা হাসি, কিন্তু তাতে সুখের আমেজ।

তাহলে তুমি ইঞ্জিনের লোক, তোমাকে রেলের কারখানা থেকে বুঝি তাড়িয়ে দিলে ? কেন গা কেন ?

আমি যে সর্দারকে ক'ঘা বসিয়ে দিয়েছিলাম।

ক্যাথেরিন বুঝি বা অভিভূত, উত্তরাধিকারসূত্রে সে পেয়েছে বশ্যতা আর নিষ্ক্রিয়, পোষমানা স্বভাব।

এতিয়েঁ বলতে লাগল, আমি তখন মাতাল। মদ খেলে আমি পাগল হয়ে যাই—নিজেকে গিলে ফেলতে পারি, অন্যকেও পারি। সত্যি, দুগেলাস খেলেই আমার মাথায় খুন চেপে বসে। কাউকে তখন খুন করতে পারলে যেন খুশী হই। তারপর দুদিন পড়ে থাকি বিছানায়।

গম্ভীর হয়ে ক্যাথেরিন বললে, তোমার মদ খাওয়া ঠিক নয়।

ভয় পেও না, আমি নিজেকে সামলাতে জানি।

মাথা নাড়ল এতিয়েঁ। মাতাল বংশের শেষ বংশধরের মতোই সে মদ ঘৃণা করে, অথচ পিতৃপুরুষের রক্তের ঐতিহ্য তাকে দুঃখ দেয়। তার পিতৃপুরুষ তো মদে ডুবে এমন পাগল হয়ে গিছল যে, তার কাছে এখন এক ফোঁটা মদও বিষতুল্য।

শুধু মার জন্যেই মাতাল হতে রাজি নই, সে রুটির টুকরোটা গিলে ফেলে বললে। মা আমার বড় দুঃখী। মাঝে মাঝে তাকে পাঁচ ফ্রাঁ করে পাঠাতাম।

তোমার মা এখন কোথায় ?

প্যারীতে। ধোবার কাজ করে, রুয়ে দালা গোতেদ্যর তার ঠিকানা।

ছেদ। তার মনে পড়ছে কত কথা। তার কালো চোখে কাঁপন লেগেছে, নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে দৃষ্টি। তার এই যৌবনের শক্তিভরা দেহে কত লাঞ্ছনার ব্যথা সে রোমন্থন করছে। হঠাৎ তো এল এই ব্যথা। মুহূর্তের জন্য তার দৃষ্টি তলিয়ে গেছে খনির অন্ধকারে, আর তারই গভীরে, মাটির ভারে আর শ্বাসরোধী গুমোটে আবার তার ছেলেবেলার কথা মনে পড়েছে—সে যেন তাকে দেখছে চোখের সমুখে। মা তেমনি সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, স্বামী পরিত্যক্তা। আবার আর একজনকে বিয়ে করলে। যে দুজনের সঙ্গে সহবাস করল, তারা তাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গেল—তারা মদ আর কাদায় মাখামাখি হয়ে গড়াগড়ি গেল নর্দমায়।

হাঁ, সেই আস্তানার কথা, সেই পথটির কথাও তার মনে পড়ল। খুঁটিনাটিও বাদ যায়নি। দোকানের ভিতরে ঝুলছে ময়লা কাপড়-চোপড়, আর মাতালের হল্লাহুল্লোড়ে বাড়িটায় ভ্যাপসা গন্ধ উঠেছে আর চোয়াল-ভাঙা ঘুষির স্মৃতি।

সে আবার আস্তে আস্তে বললে, মাকে দিতে পারি এমন তিরিশটা সুও আমার কাছে নেই। ওতো মারা যাবে, ঠিক মারা যাবে।

হতাশ হয়ে সে ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিলে, আবার রুটি আর মাখন খাচ্ছে।

ক্যাথেরিন টিনের ছিপিটা খুলে ফেললে, খাবে নাকি ? না গো তোমার ক্ষেতি হবে না। শুধু তো কফি। অমন শুকনো রুটি চিবুলে গলায় বাধে না !

কিন্তু এতিয়েঁ রাজী হ'ল না। ওর অর্ধেকটা রুটি আর মাখনের ভাগ

বসিয়েছে তাই তো যথেষ্ট। কিন্তু তবু মেয়েটি ভাল মানুষের মতো পেড়াপীড়ি শুরু করেছে। সে এবার বললে,

দেখ, তোমার যখন এতো ভদ্দরতা, আমি নিজে আগে খাব। এবার তো আর কথাটি কইতে পারবে না। তাহলে যে ভদ্দরতা থাকবে না গো।

ক্যাথেরিন তার টিনটা ওর দিকে এগিয়ে দিলে। হাঁটু গেড়ে বসেছে, এতিয়েঁ তার খুবই কাছে। দুটি লণ্ঠনের আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ওদের মুখ। তখন ওকে অমন কুশ্রী বলে এতিয়েঁর মনে হয়েছিল কেন? এখন তো কয়লার গুঁড়োয় কালো হয়ে গেছে ওর মুখ, কিন্তু সত্যিই ভাল লাগছে, ভারি মিষ্টি দেখাচ্ছে। ঐ কয়লার মিহি গুঁড়ো যেন কালো ছায়া, মুখখানা ঘিরে আছে। মুখের হাঁর ভিতর দিয়ে সাদা দাঁত ঝক্‌ঝক্‌ করছে, আর চোখ এখন আরো আয়ত, সবুজ দ্যুতি সে চোখে, ঠিক যেন বিড়ালের চোখ দুটি। এক-গোছা লাল চুল টুপির ভিতর দিয়ে কানের কাছে ঝুলে পড়ছে, সুড়সুড়ি দিচ্ছে, ওকে হাসাচ্ছে। ওকে এখন আর অত কম বয়সী বলে মনে হয় না, তা পুরো চোদ্দই হবে বয়েস।

টিন থেকে কফি খেয়ে টিন ফিরিয়ে দিয়ে বললে, তোমাকে খুশী করবার জন্যেই খেলাম।

মুখের রুটিটুকু ক্যাথেরিন গিলে ফেলে ওকে আর একটু নিতে বললে। আবার পেড়াপীড়ি। এতিয়েঁ নেবে না, ক্যাথেরিন নেওয়াবে জোর-জবরদস্তি করে। এতিয়েঁর হার হ'ল, কফির টিনটাও ঘুরছে এতিয়েঁ আর ক্যাথেরিনের মুখে মুখে। ভারি মজাই লাগছে। হঠাৎ এতিয়েঁ আপন মনে ভাবলে, ওকে দুবাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে ওর ঠোঁটে চুমু খেলে কেমন হয়! কেন সে তা করবে না? ক্যাথেরিনের ঠোঁট দুখানা পুরু, নিষ্প্রভ লালিমা কয়লার গুঁড়োর ভিতর দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে, আর ওতেই তো বাড়িয়ে দিল তার কামনা, তাকে অস্থির করে তুললে। কিন্তু সাহস তো নেই বলবার। ওতো শুধু লিল্-এর পথে ঘুরে বেড়ানো নীচুদরের মেয়েদেরই চেনে। ওতো জানে না ঘরন্তী মজুর মেয়ের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয়।

তোমার বয়েস তাহলে প্রায় চোদ্দ হ'ল। রুটিতে কামড় দিয়ে এতিয়েঁ জিজ্ঞেস করলে।

ক্যাথেরিন অবাক, বুঝি বা রেগেই গেছে।

কি বললে? চোদ্দ? আমার এখন পনেরো বছর বয়েস। হ্যাঁ, বয়েস আন্দাজে বাড়িনি বটে। আমাদের ঘরের ছুঁড়িরা ফন্‌ফনিয়ে বেড়ে ওঠে না।

এতিয়েঁ প্রশ্নের পর প্রশ্ন করলে, ক্যাথেরিন জবাব দিলে। লজ্জা তার নেই, নেই তেমন বেসরম সাহস। সে পুরুষ আর নারীর সম্পর্ক সম্বন্ধে অজ্ঞান নয়, কিন্তু এতিয়েঁর মনে হ'ল তাহলেও ওর দেহে রয়েছে কুমারীর নিষ্পাপতা। এ যেন শিশুর নিষ্পাপতা, দূষিত আবহাওয়া আর ক্লান্তিকর পরিবেশ তাকে যেন জীবনের পূর্ণতা দিতে পাচ্ছে না। মোকের কথা তুলে এতিয়েঁ তাকে বিভ্রান্ত করে দিতে চাইলে—একটু সরম তো আসবে। কিন্তু ক্যাথেরিন শান্ত স্বরে বলে গেল সাংঘাতিক সব কথা, খুব মজাও তার লাগছে। হ্যাঁ, ছুঁড়িটার বহু কীর্তিই আছে! এতিয়েঁ যখন জিজ্ঞেস করলে, তার কোন প্রেমিক নেই, সে ঠাট্টা করে বললে, মাকে সে জ্বালাতে চায় না, কিন্তু মনের মানুষ তো একদিন না

একদিন জুটবেই। ঘাড় নুয়ে পড়েছে ক্যাথেরিনের। ঘামে ভেজা পোষাক, তারই ঠাণ্ডা লেগে একটু বা কাঁপছে—এক যেন আত্মসমর্পণের ভঙ্গী। তার, যা কিছু হোক, যে পুরুষই আসুক তার কাছে, সে সর্বস্ব বিকিয়ে দেবে।

মানুষ একসঙ্গে থাকলে তবে মনের মানুষ পায়, তাই না গো?

হ্যাঁ, তাতো বটেই!

এতে তো কারো ক্ষতি নেই। পাদরী ডাকারও দরকার হয় না।

পাদরী! আমি পাদরীর কি ধার ধারি! কিন্তু ঐ মিশমিশে কালো পুরুষটা তো আছে?

কালো পুরুষ কাকে বলছ?

ওই যে, বুড়ো খনির মজুর পিটে এসে দেখা দেয় আর পাজী মেয়েদের ঘাড় মটকায়।

এতিয়েঁ ওর দিকে তাকাল, ঠাট্টা করছে নাকি ছুঁড়িটা!

ঐসব আজগুবি কথায় বিশ্বাস কর? তাহলে কিছু জান না দেখছি।

জানি গো জানি। লিখতে পড়তেও জানি। ওসব তো কাজে লাগে। আমার বাবা-মা'রা কিন্তু কিছু জানে না। ওদের কালে ওসব বালাই ছিল না।

সত্যিই চমৎকার লাগছে ওকে। ও রুটি আর মাখন খাওয়া শেষ করলে এতিয়েঁ ওকে বুকে তুলে নেবে, ওর পুরু গোলাপী ঠোঁটে খাবে চুমু। কিন্তু এ তো ভীরুর সংকল্প, বেপরোয়া ঝোঁক। গলার স্বর তার বুজে এল। ওর এই পুরুষের পোষাক—কোর্তা আর ব্রীচেসের নীচের নারী-দেহ ওর উত্তেজনা জাগিয়েছে, ওকে অস্থির করে তুলেছে। শেষ রুটির টুকরোটা চিবিয়ে গিলে ফেললে সে, কফি খেয়ে গলা ভিজিয়ে নিয়ে টিনটা ফেরত দিলে। এবার কাজের সময়। দূরের মজুরদের দিকে সে তাকাল, চঞ্চল তার দৃষ্টি। একটা ছায়া দেখা দিয়েছে, গ্যালারি জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে ছায়া।

দূর থেকে সাভাল দেখছে ওদের। এবার সে কাছে এগিয়ে এল, মেয়ে তাকে দেখতে পায়নি এ সম্বন্ধে সে নিশ্চিত। ক্যাথেরিন বসেছিল, ও তাকে তার ঘাড় ধরে মাথাটা পেছন দিকে টেনে আনলে, তারপর শান্তভাবে ওর মুখখানা এক বর্বর চুম্বনে পিষে দিলে। এতিয়েঁকে দেখতে পায়নি এমনি তার ভাব-খানা। আর সে চুম্বনে অধিকারের দাবি রইল, রইল ঈর্ষিত এক সংকল্প।

মেয়েটি ক্ষুব্ধ হ'ল, শুনছ, ছেড়ে দাও বলছি।

সে তবু তার মাথাটা ধরে চোখের দিকে চেয়ে আছে, তার কটা গোঁফ আর দাড়ি কয়লার গুঁড়ো মাখা কালো মুখে ঝলসে উঠছে, নাকখানা তার ঈগলের ঠোঁটের মতোই বড়। এবার সে ওকে ছেড়ে দিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল।

এতিয়েঁ কেঁপে উঠল, সে যেন জমে হিম হয়ে গেছে। দেরি করে ভুল হয়ে গেছে। এখন পাওয়া তো বোকামি। এখন তো চুমু খাওয়া আর চলে না, ক্যাথেরিন হয়তো মনে করবে সাভালের মতোই ও অমনি কিছু করতে চায়। তার গর্ব আহত, সত্যিকার হতাশা তার ঘনিয়ে এল।

তুমি মিছে বললে কেন? সে আস্তে আস্তে বললে, ঐ তো তোমার পিরিতের মানুষ।

ক্যাথেরিন চেঁচিয়ে উঠল, না, না, আমি দিব্যি গাল্‌ছি। আমার সঙ্গে ওর আশনাই নেই। ও কখনো একটু-আধটু ঠাট্টা মস্করা করে। ওতো এখানকার

লোকই নয়। ছ'মাস হ'ল পা-দ্য-ক্যালে থেকে এসেছে।

দু'জনেই উঠে পড়ল, কাজ আবার শুরু করতে হবে। ক্যাথেরিনের খারাপ লাগছে, এতিয়েং যেন এরই মধ্যে কেমন জুড়িয়ে গেছে। ঐ লোকটার থেকে ও তো দেখতে ভাল; ওকেই তার বুঝি ভাল লাগত, পছন্দও করতে পারত। এখন তো থাকবে শুধু মিতালি, তাতে ভদ্রতা আছে, সান্ত্বনা আছে, কিন্তু শান্তি নেই। ক্যাথেরিন বিব্রত। এতিয়েং হঠাৎ অবাক হয়ে গেল, তার লণ্ঠনটার আলো নীলচে হয়ে গেছে, ম্লান কালির বৃত্ত চারদিকে। ক্যাথেরিন ওকে একটু খুশী করবার জন্যে বললে,

এস গো, আমি তোমাকে একটা জিনিস দেখাচ্ছি। বন্ধুত্বের আমেজ তার স্বরে। কাটিং-এর তলায় সে তাকে নিয়ে গেল, কয়লার স্তরের ভিতরে এক ফাটল তাকে দেখিয়ে দিল। পাখীর কূজনের মতোই একটা শব্দ সেই ফাটল দিয়ে বেরুচ্ছে। এই হচ্ছে ফায়ার-ড্যাম্প।

হাত দিয়ে দেখ, হাওয়া টের পাবে। এখান দিয়ে হাওয়া আসে। এতিয়েং অবাক। এই ফায়ার-ড্যাম্প—এই! এই কি সেই ভয়ানক ব্যাপার যা সব কিছু এক লহমায় উড়িয়ে দিতে পারে? ক্যাথেরিন হেসে বললে, আজ কিন্তু জোর হাওয়া আসছে, দেখ না আলোটা কেমন নীলচে হয়ে গেল।

এই কুঁড়ের ধাড়িগুলো, গুজ গুজ ফুসফুস শেষ হয়েছে! মেয়ু কর্কশ-স্বরে চেঁচিয়ে উঠল।

ক্যাথেরিন আর এতিয়েং তাদের গাড়ি ভরতি করতে ছুটে এল। শুরু হ'ল কাজ, গাড়ি ভরতি করা চলছে আর পিঠ টান করে ধাক্কা দিয়ে উপরে তুলে দিচ্ছে, নীচু ছাদওয়ালা পথে হামাগুড়ি দিয়ে চলছে তারা। দু-দুবার এমনি করতেই গা দিয়ে দর্‌দর্‌ করে ঘাম ঝরতে লাগল, শরীরের গাঁটে গাঁটে ব্যথা ধরেছে, যেন মট্‌ মট্‌ করে এখুনি ভেঙে যাবে বলে মনে হয়।

গাঁইতি চলছে কাটিং-এ। ঠাণ্ডা হয়ে যাবার ভয়ে মজুররা খাবার গোগ্রাসে গিলছে। রুটিও অমনি গিলে গিলে পেট ভরাচ্ছে। রুটি তো নয় যেন এক তাল সীসে গিয়ে পেটে জমা হচ্ছে। এক পাশে হেলে পড়ে জোরে চালাচ্ছে গাঁইতি, শুধু এক ভাবনা এখন ওদের—কতো বেশি গাড়ি ভরতি করতে পারবে। অন্য ভাবনা এই রোজগারের উন্মাদনায় তলিয়ে গেছে, কিন্তু এত বড় মেহনতি ব্যাপার। জলের ধারা গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে, তাদের গা আর পোষাক ভাসিয়ে দিচ্ছে সে কথা তাদের এখন অনুভব করবার শক্তি নেই। আঁট অংগ-প্রত্যংগ ফুলে উঠছে, একভাবে বহুক্ষণ থেকে আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে; গুমোট অন্ধকারে দম বন্ধ হবার যোগাড়। তারা ফ্যাকাশে মেরে যাচ্ছে চোরা কুঠরির চারাগাছের মতো। তাও আর তাদের মনে নেই। না, মনে নেই। বেলা বাড়ছে, হাওয়া এখন আরো বিষাক্ত, বাতির ধোঁয়ায় আরো গরম, আর আছে তাদের বিষাক্ত নিশ্বাস-প্রশ্বাস, ফায়ার-ড্যাম্পের শ্বাসরোধী যবক্ষারহীন হাওয়া—তারা যেন চোখে মাকড়সার জালের বাধা সৃষ্টি করেছে। এই বিষ শুধু ঝেঁটিয়ে সাফ করে দিতে পারে রাতের হাওয়া, আর কিছুর তো সে শক্তি নেই। আর এই ঢিবির তলায় মাটির নীচে, ফোলা ফুসফুসে নিশ্বাসের শেষ শক্তিটুকু হারিয়ে তারা গাঁইতি চালাচ্ছে। আওয়াজ উঠছে।

পাঁচ

মেয়ু ঘড়ি না দেখেই থামল। ঘড়িটা তার কোটের পকেটে। সে বললে, একটা বেজেছে। জাচারি, কাম ফতে ?

জাচারি সবে কাজ সেরে কাঠের উপর চিতিয়ে শুয়ে পড়েছে। চার দিকে ছড়িয়ে আছে সব কিছু। কাল রাতের জুয়ো খেলার কথা সে ভাবছে। চোখে তার স্বপ্ন। সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে জবাব দিলে,

হ্যাঁ, এতেই হবে, কাল আবার দেখা যাবে।

কাটিং-এ তার জায়গায় সে ফিরে এল। লেভাক্ আর সাভালও তাদের গাঁইতি ফেলে দিলে। সবাই জিরোচ্ছে। হাত দিয়ে মুখ মুছছে, তাকাচ্ছে ছাদের দিকে। সেখানে চারদিকে ধরেছে চিড়। ওরা ওদের কাজের গল্প ছাড়া আর কোন গল্প করে না। সেই গল্পই শুরু হয়ে গেল।

সাভাল বিড়বিড় করে বললে, আবার মাটি উঠবে, শুধু মাটি, কর্তারা তো সে কথা ভাবে না।

লেভাক গর্জে উঠল, পাজীর দল, ওরা তো আমাদের মাটির নীচে গোর দিতে চায়।

জাচারি হাসতে লাগল। কাজ আর বিশ্রাম দুয়েরই সে তোয়াক্কা রাখে না। কিন্তু কোম্পানিকে কেউ গালমন্দ করছে শুনলে তার বেশ লাগে। মেয়ু শান্তভাবে বুঝিয়ে বললে যে, প্রতি বিশ গজ অন্তর এখানে মাটির চেহারা বদলে যায়। তা সব দিকই দেখতে হবে বইকি! উপরওয়ালারা আর সব কিছু আগেই দেখতে পায় না। কিন্তু আর দুজন তবু মনিবের বিরুদ্ধে বলতে লাগল। মেয়ু অস্থির হয়ে উঠল, চারদিকে তাকিয়ে সে বলল,

চুপ! যথেষ্ট হয়েছে।

লেভাক গলা নামিয়ে বললে, ঠিকই বলেছ, ওসব বলায় তো ভালাই নেই।

গোয়েন্দার ভয় ওদের ঘিরে রেখেছে। এ যেন ওদের এক রোগ, পেয়ে বসেছে ওদের। এই খনির নীচে মুনাফাখোর অংশীদারদের কয়লা এখনো স্তরে জমে আছে, তবু তারও যেন কান আছে।

সাভাল আরো জোরে চেঁচিয়ে উঠল, তার উদ্ধত ভঙ্গী। কিন্তু ঐ হতচ্ছাড়া দাঁসারটা সেদিন যা বলেছিল, আবার যদি তেমনি কথা বলতে আসে তো ওর পেটে একখানা ইঁট ঝাড়া কেউ রুখতে পারবে না। তবে সাদা চামড়াওয়ালা খুবসুরৎ ছুঁড়ি নিয়ে ও যত খুশি লট্পটি করুক তাতে আমার যায় আসে না। জাচারি এবার হো হো করে হেসে উঠল। সর্দারের পিয়েরোঁ-বৌয়ের সঙ্গে ভালবাসার কথা নিয়ে পিটে ওদের সব সময়েই ঠাট্টা চলে। এমন কি ক্যাথেরিন কাটিং-এর তলায় শাবলের উপর ভর দিয়ে পেট চেপে ধরে আছে, হাসিতে তার দম আটকে আসছে। এতিয়েন্‌কে সে ঠাট্টার ব্যাপারটা বললে। মেয়ু চটে গেছে, ভয়ও সে পেয়েছে। তাই সে সামলাতে না পেরে বললে,

চুপ করবে কিনা বল ? ফ্যাসাদে পড়তে চাও তো যখন একা থাকবে তখন ওসব বুলি ঝাড়বে।

কথা শেষ না হতেই, উপরের গ্যালারিতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। তখন তখনি খনির ইঞ্জিনিয়ার 'খুদে' নিগ্রেল এসে কাটিং-এর উপরে দাঁড়ালেন,

তার সঙ্গে দাঁসার, খনির সর্দার। খনির মজুররা ওকে নিজেদের মধ্যে ঐ নামেই ডাকে।

মেয়ু বিড়বিড় করে বললে, বলি নি? যেই কথা বলবে অমনি কেউ না কেউ যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে আসবে।

মঁসিয়ে হানেবুর ভাগ্নে পল নিগ্রেল, ছাব্বিশ বছরের যুবক, সুশ্রী, ছিমছাম, তার মাথার চুল কোঁকড়া, ধূসর গোঁফ আছে। তার টিকলো নাক আর চকচকে চোখে মিটি মিটি চাউনি, শিকারী বেড়ালের ভাবভঙ্গী। দেখে বুঝি ভদ্র বলেই সন্দেহ হয়। কিন্তু মজুরদের সংস্পর্শে এলেই এই ভঙ্গী হঠাৎ বদলে যায়, কর্তৃত্বের হুঙ্কার ওঠে। তাঁরও ওদের মতো পোষাক পরনে, কয়লা-মাখা মুখ; ওদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা আদায় করবার জন্যে অসমসাহসিকতাও সে দেখায়। যত দুর্গম আর বিপজ্জনক জায়গাই হোক, সেখানে হাজির হবেই। যখন ধস নামবে বা ফায়ার ড্যাম্পে বিস্ফোরণ হবে সে-ই সেখানে যাবে প্রথম।

দাঁসার, এখানকারই কথা হচ্ছিল না? সে জিজ্ঞেস করলে। সর্দার, রুক্ষ চেহারার বেলজিয়ামবাসী, নাকটা তার মস্ত বড় আর মোটা। সে অতি বিনয় করে বললে,

হাঁ, মঁসিয়ে নেগ্রেল। এই লোকটিকেই আজ কাজে বহাল করা হয়েছে। কাটিং-এর মাঝখানে তারা এসে দাঁড়াল। এতিয়েঁ তাদের কাছে এল। ইঞ্জিনিয়ার তার বাতি তুলে ধরে তাকে দেখতে লাগল। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করছে না।

এবার বললে, ঠিক আছে। কিন্তু অচেনা লোক রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনা আমি পছন্দ করি না। আর এসব ক'রো না সর্দার।

ঝোড়া ভরতি, আর টেনে তোলার জন্য মেয়েদের জায়গায় এখন মরদদের লাগানো দরকার হয়ে পড়েছে এমনি সব কৈফিয়ৎ শুরু হ'ল। ইঞ্জিনিয়ার সেদিকে কান দিচ্ছে না। সে ছাদের দিকে তাকিয়ে দেখছে। গাঁইতি-চালিয়েরা তুলে নিয়েছে গাঁইতি। হঠাৎ সে চেঁচিয়ে ডাকলে,

এই মেয়ু, তোমার কি প্রাণের ভয় নেই! আরে বাপরে! সবাই যে কবর চাপা পড়বে।

মেয়ু শান্তভাবে বললে, না হুজুর, মজবুত আছে।

কি! মজবুত আছে! পাথর নড়ে গেছে, অথচ দু মিটার অন্তর ঠেক্‌নো দিয়েছে, এখানেও কৃপণতা! সবাই তোমরা সমান দেখছি। 'খুলি চ্যাপ্টা হয়ে যাবে সেও ভি আচ্ছা, কিন্তু দরকার মাফিক ঠেক্‌না লাগাবার সময়টুকু দিতেও রাজি নও। আমি বলছি এখুনি ঠেক্‌নো লাগাও। যা আছে তার দুনো লাগাতে হবে—বুঝেছ?

খনির মজুররা গররাজি, তারা তর্ক শুরু করলে। নিজেদের নিরাপত্তার তারাই তো যোগ্য বিচারক। ইঞ্জিনিয়ার রেগে উঠলেন।

যা বলছি কর! যখন তোমাদের মাথা গুঁড়িয়ে যাবে, তার ফলভোগ কি তোমরা করবে? মোটেও না। কোম্পানিকে তখন পেন্‌শন দিতে হবে না? তোমাদের আর তোমাদের বৌদের পেন্‌শন কে দেবে শুনি? আবার বলছি, তোমাদের আমরা খুব চিনি; সন্ধ্যের আগে দুটো বেশি গাড়ি ভরতি করতে তোমরা তো নিজেদের গায়ের চামড়া বিকিয়ে দিতেও রাজি।

মেয়ুর রাগ বাড়ছে, তবু সে ধীরে ধীরে জবাব দিলে,

আমাদের যথেষ্ট মজুরি দিলে তবে তো আমরা ভাল করে ঠেক্‌নো দেওয়ার বন্দোবস্ত করব।

ইঞ্জিনিয়ার উত্তর না দিয়ে কাঁধে ঝাঁকুনি দিলে। কাটিং থেকে সে নেমে গিয়ে নীচ থেকে বললে,

আর এক ঘণ্টা আছে। কাজ করে যাও। আমি জানিয়ে দিচ্ছি, খাদকে খাদ আমি তিন ফ্রাঁ পাইকারী জরিমানা করলাম।

গাঁইতি-চালিয়েদের মুখ থেকে অস্পষ্ট হুংকার উঠল। এই তারি কথার জবাব। শুধু খনির শাসন ব্যবস্থার চাপে তারা সংযত। এ যেন এক সামরিক বিধি ট্রামার থেকে সর্দার পর্যন্ত বিস্তৃত, একজনের তলায় আর একজন পড়ে আছে, পিষে যাচ্ছে বিধি-ব্যবস্থার চাকায়। সাভাল আর লেভাক তবু মারমুখো হয়ে উঠল, ক্রুদ্ধ তাদের ভংগী। মেয়ু ইশারায় তাদের থামিয়ে দিলে, জাচারি ঘাড় নাড়ল। সেও রেগে উঠেছে। কিন্তু এতিয়েঁ সবচেয়ে বেশি অভিভূত। তার মনে বেজেছে। এই নরকের সবচেয়ে নীচুতলায় আছে সে, এক বিদ্রোহ যেন আস্তে আস্তে তার ভিতরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। ক্যাথেরিনের দিকে সে তাকাল, পিঠ কুঁজিয়ে গেছে, সে আত্মসমর্পণ করেছে প্রভুত্বের কাছে। এও কি সম্ভব—এই কঠোর মেহনতিতে ওরা নিজেকে হত্যা করবে, এই ভয়ংকর অন্ধকারে কি তিলে তিলে মরতে হবে—দিনের বরাদ্দ রুটি কেনাবার জন্যে কটা পয়সাও কি মিলবে না?

নিগ্রেল দাঁসারের সঙ্গে চলে গেল। দাঁসার তো ইঞ্জিনিয়ারের কথায় মাথা নেড়ে সায় দিয়েই গেল। এবার তাদের গলা শোনা যাচ্ছে। তারা এবার কথা থামিয়ে গ্যালারির কাঠগুলি পরীক্ষা করে দেখছে।

ইঞ্জিনিয়ার চেঁচিয়ে উঠল, বলিনি, ওরা কিছুই গ্রাহ্য করে না? আর তুমি? তুমিই বা ওদের উপর নজর রাখছ না কেন?

সর্দার আমতা-আমতা করে বললে, আমি—আমি তো—নজর রাখছি। কিন্তু বলে বলে হন্দ হয়ে গেছি।

নিগ্রেল চেঁচিয়ে ডাকল, মেয়ু, এই মেয়ু!

সবাই নীচে নেমে এল। ইঞ্জিনিয়ার বলতে লাগল।

চোখ চেয়ে দেখছ? এই ঠেকনোয় হবে? এতো নড়বড়ে এক কাঠামো? এই যে বীমটা, এটার তো কোন ঠেক্‌নোই নেই। তাড়াতাড়ি কাজ সারলে যা হয়। হাঁ, হাঁ! এবার বুঝতে পারছি, মেরামতি খরচা কেন এত বেশি লাগে। এতেই হবে—তাই না? যতদিন চলে চলুক না, তারপর তো হুড়মড় করে ভেঙে পড়বে আর কোম্পানিকে লাগাতে হবে একপাল মিস্ত্রী! এই যে—নীচে দেখ—কি, নড়বড়ে না?

সাভাল কি যেন বলতে চাইল, কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার থামিয়ে দিলে।

না, না! জানি, তুমি কি বলবে। বলবে—আরো মজুরি বাড়ানো হোক—তাই না? বেশ তো! আমি তোমাদের হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, তোমরা ম্যানেজারকে বাধ্য করাচ্ছ। কোম্পানি আলাদা করে কাঠের দাম দেবে; কিন্তু গাড়ি ভরতির মজুরিও কমবে। দেখি, তোমাদের কি লাভ হয়? ভাল করে ঠেক্‌নো দাও, কাল আবার আমি দেখতে আসব।

তার হুমকিতে এসেছে হতাশা, এই হতাশার সৃষ্টি করে সে মিলিয়ে গেল। দাঁসার এতক্ষণ ছিল কত নম্র, সে কয়েক মুহূর্তের জন্য পিছিয়ে পড়ল। এবার সে মজুরদের জোর গলায় ধমক দিলে। তার স্বরে পশুর নির্মমতা।

আমাকে ফ্যাসাদে ফেললে তো! তিন ফ্রাঁ জরিমানা আর কি, তার চেয়েও জবর কিছু মিলবে। সবুর করো না!

সর্দার চলে গেলে, মেয়ু ফেটে পড়ল। তার পালা এবার।

হা ভগবান! হ'ল তো এবার! আমি চাই সবাই চুপচাপ থাক্, আমাদের তো তা ছাড়া পথ নেই, কিন্তু পাগল না করে ছাড়বে না এরা! শুনছ তো? গাড়ি-ভরতির মজুরি কমল, কাঠের দাম আলাদা দিতে হবে। তার মানে আমাদের কম দেবার আর এক ফন্দি। হাঁ, হাঁ, ফন্দিই তো!

কারো উপরে গায়ের ঝাল ঝাড়বার জন্যে সে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। সে দেখতে পেল ক্যাথেরিন আর এতিয়েং দাঁড়িয়ে আছে।

এই, ক'খানা কাঠ নিয়ে আয় তো! তোদের আর কি! আমি এবার তোদের লাথ্ না মারি তো কি বলেছি।

ওর কথায় এতিয়েঁর রাগ হ'ল না, সে ছুটল কাঠ আনতে। সে মালিকের বিরুদ্ধে এত উত্তেজিত যে, মজুরদের তো তার খুবই ভালমানুষ বলে মনে হচ্ছে। আর লেভাক আর সাভাল তো গালিগালাজ করে গায়ের ঝাল মেটাচ্ছে। প্রায় আধঘণ্টা ধরে শুধু কাঠের মচমচ শব্দ উঠল। হাতুড়ি মেরে কাঠ লাগানো হচ্ছে। কথা নেই, নিশ্বাস ঘন ঘন পড়ছে, মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে শব্দ। খনির পাথরের উপর তারা রেগে গেছে। যদি সম্ভব হতো কাঁধে চাড় দিয়ে ওরা গড়িয়ে দিত পাথর, উপড়ে ফেলত।

এবার মেয়ু ক্লান্ত হয়ে বললে, তার স্বরে এখনো রাগের আমেজ।—থাক্ থাক্ হয়েছে! দেড়টি ঘণ্টা গেল! এক দিনে খুব কাজ হ'ল! পঞ্চাশ সু আর মিলবে না। আমি চল্লাম। একেবারে ঘেন্না ধরে গেছে!

কাজ শেষ হতে এখনো আধঘন্টা বাকী, তবু মেয়ু পোষাক পরে নিলে। আর সবাইও দেখাদেখি পরে নিচ্ছে। কাটিং-টা দেখে গা জ্বলচে তাদের। পুটার ঝোড়া তুলতে যাচ্ছে, তাকে ওরা ডাকলে। কাজের ফূর্তি দেখে ওরা বিরক্ত। কয়লা এখন চুলোয় যাক! এবার ছ'জন তাদের যন্ত্রপাতি বগলে নিয়ে দুই কিলোমিটার হেঁটে পিটের মুখে চলেছে। ভোরে যে পথে এসেছিল সেই পথে ফিরে চলেছে তারা।

চোঙের কাছে ক্যাথেরিন আর এতিয়েঁর দেরি হয়ে গেল। এদিকে গাঁইতি চালিয়েরা নেমে গেছে। খুদে লিদির সঙ্গে তাদের দেখা, ওদের দেখে সে পথ ছেড়ে দিলে। মোকেকে পাওয়া যাচ্ছে না সেকথা সেই বললে। তার নাক দিয়ে এত রক্ত ঝরছে যে, সে এক ঘন্টা ধরে কোথাও বুঝি নাকেমুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে। কে জানে কোথায় গেল ছুঁড়িটা! ওরা চলে এল। খুদে মেয়েটা আবার গাড়ি ঠেলতে লাগল। কিন্তু, কাদায় গা মাখামাখি, পোকার মতো লিকলিকে হাত আর পিঁপড়ের মতো সরু সরু পা অচল হয়ে এসেছে, তবু সে ঠেলছে বোঝাই গাড়িটা। ওরা চিতিয়ে সটান শুয়ে পড়ল। কপাল ছড়ে যাবার ভয়ে তটস্থ। ঢালু পাথুরে পথে গড়িয়ে গড়িয়ে চলল। মজুর-দের যাতায়াতে এ পথ মসৃণ। মাঝে মাঝে হাত দিয়ে আশেপাশের কাঠ ধরতে

হচ্ছে, কি জানি কখন পিঠে লাগে কে জানে! ওরা একে ঠাট্টা করে বলে পিঠে আগ্ লাগা। এই আগ্ না লাগে সাভাৎ, সামাল সামাল!

নীচে ওরা এসে পেঁছিল। একা, একেবারে একা। পথের বাঁকে লাল তারার মতো আলোর সার মিলিয়ে গেছে। মনে স্ফূর্তি নেই, উবে গেছে। ক্লান্ততে ভারি হয়ে এসেছে শরীর, পা আস্তে আস্তে পড়ছে। ক্যাথেরিন সুমুখে, এতিয়েঁ পিছনে। বাতি দুটো কালি পড়ে কালো হয়ে গেছে। এতিয়েঁ তো ওকে এখন দেখতেই পাচ্ছে না। ও যেন ধোঁয়ার কুয়াশায় ডুবে গেছে, হারিয়ে গেছে। ও যে মেয়ে সেই কথাই বার বার তার মনে পড়ছে, তাকে অস্থির করে তুলছে। সে ভাবছে, এখন ওকে জড়িয়ে না ধরাটাই বোকামি। কিন্তু অন্য এক পুরুষের স্মৃতি তাকে বাধা দিচ্ছে। ক্যাথেরিন নিশ্চয়ই মিছে বলেছে। ঐ লোকটা ওর প্রেমিক, ওর সঙ্গে সে কালো কয়লার উপর কতবার হয় তো শুয়েছে। ওর তো হাবভাব, চাল-চলন মন্দ মেয়েমানুষের মতোই। এতিয়েঁকে যেন সে প্রতারিত করেছে, এমনি তার ভাবখানা। সে অকারণে মনে মনে গজরাতে লাগল। ক্যাথেরিন এগিয়ে চলেছে। বার বার পিছন ফিরে-ফিরে তাকে জানিয়ে দিচ্ছে পথের কোথায় কি বাধা আছে সে-কথা; ওকে যেন ডাকছে আর একটু কাছে আসতে, আর একটু নিবিড় সান্নিধ্যে। ওরা তো এই সুড়ঙ্গের অন্ধকারে হারিয়ে ফেলেছে নিজেদের, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে আর সবার থেকে—তাই তো অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো হাসতে পারলে বুঝি সব কিছুর সমাধান হয়ে যায়। এবার তারা প্রকাণ্ড গ্যালারিতে এসে ঢুকল। এতিয়েঁ এতক্ষণ দোমনা মন নিয়ে অস্থির হয়ে উঠছিল, এবার তার নিবৃত্তি। ক্যাথেরিনের মুখে আবার বিষণ্ণতা—যে আনন্দ ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়ে চিরদিনের জন্য মিলিয়ে গেল—তারই জন্য বুঝি এই দুঃখ।

সুড়ঙ্গের জীবনধারা তাদের চারদিকে গর্জন করে উঠছে। সর্দাররা চলেছে, গাড়ি টেনে নিয়ে আসছে যাচ্ছে ঘোড়াগুলি। এখানে-ওখানে আলো রাতের অন্ধকার চঞ্চল করে তুলছে। শিউরিয়ে উঠছে অন্ধকার। ওরা পাথরের দেয়ালের সঙ্গে নিজেদের যেন মিলিয়ে দিয়েছে। ছায়া মিছিল চলেছে মানুষ আর পশুর, তাদের পথ করে দিচ্ছে ওরা—তাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে ওদের মুখের উপর। জাঁলিন গাড়ির পিছনে খালি পায়ে দৌড়ে আসছে, ওদের দেখে কি একটা অশ্লীল কথা চেঁচিয়ে বলে উঠল। চাকার ঘড়ঘড়ানিতে শোনা গেল না। ওরা আবার চলতে শুরু করল। ক্যাথেরিন চুপচাপ। আর এতিয়েঁর তো কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সকালবেলায় দেখা পথ আর তার বাঁকগুলি সে চিনতে পারছে। শুধু অনুভব করছে তাকে টেনে নিয়ে চলেছে ক্যাথেরিন মাটির বুকে। মাটির অতলে সে তলিয়ে যাচ্ছে। শুধু ঠাণ্ডায় যা কষ্ট! ঠাণ্ডা যেন কাটিং থেকে উঠে আসছে। দুরন্ত শীত। যত মুখের কাছে আসছে তত বাড়ছে ঠাণ্ডা, কাঁপুনি লাগছে শরীরে। দুপাশের দেয়ালের ভিতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে হাওয়া, ঝোড়ো হাওয়া। কখন এ পথ শেষ হবে কে জানে। আশা বুঝি নেই। এমনি অন্ধকারে গভীরে পাক্ খেতে হবে, তলিয়ে যেতে হবে। হঠাৎ দেখল পিটের হলঘরে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা।

সাভাল তাদের দিকে ট্যারচা চোখে তাকাল, মুখখানা সন্দেহে থম্‌থমে, একটু বা কুঁচকে গেছে। অন্য সবাইও এসে গেছে। ঘামে জবজবে শরীর,

ওদেরই মতো চুপচাপ, রাগ হজম করে আছে। ওরা বড় তাড়াতাড়ি এসেছে, আধ ঘন্টার আগে ওদের উপরে নিয়ে যাওয়া হবে না। আরো একটা কারণও আছে। একটা ঘোড়াকে পিটে নামাবার ব্যবস্থা চলছে। তার ফ্যাঁকড়া কম নয়, কুলিরা এখনো গাড়ি ঠেলে নিয়ে চলেছে, পুরানো জংধরা লোহার ঝক্‌ঝক্‌ শব্দে কানে তালা লাগে। খাঁচা উঠে যাচ্ছে উপরে, কালো গর্ত থেকে বর্ষার ধারা ঝরে পড়ছে নীচে, তারই মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে খাঁচা। নীচে দশ মিটার গভীর এক খাদ ভরে উঠেছে জলে; কাদাভরা জল, গন্ধ উঠছে। পিটের মুখে জটলা, ব্যস্ততা। কেউ সিগন্যালের দড়ি টানছে, কেউ বা লেভারটা চাপছে। ধারা ঝরে চলেছে, ভিজে গেছে তাদের পোষাক। তিনটে বাতির লাল আলো ছড়িয়ে পড়ছে। ঢাকনি নেই তাই আলো জোরাল। চলমান ছায়া তারা সৃষ্টি করছে। এই ভূগর্ভের হল-কে যেন দস্যুদের গুহা বলেই মনে হয়। গুহার ঝরনার ধারে জটলা করছে বুঝি দস্যুদল।

মেয়ু শেষ চেষ্টা করলে। পিয়েরোঁর কাছে সে গেল। সে ছটার কাজে এসেছে।

শোনো, আমাদের উপরে নিয়ে চল।

কুলিটি সুশ্রী, অংগ-প্রত্যংগ মজবুত, মুখখানা নম্র, সে ভয় পেল। সে গররাজি।

অসম্ভব, সর্দারকে গিয়ে পুছে এস, ওরা আমাকে জরিমানা করবে।

আবার নিরুদ্ধ বিক্ষোভ, ক্যাথেরিন ঝুঁকে পড়ে এতিয়েঁর কানে কানে বললে,

এস, আস্তাবলে যাই। জায়গাটা বেশ। আরাম আছে।

সকলের সুমুখ দিয়ে তাদের বেরিয়ে আসতে হ'ল। নিষিদ্ধ এলাকা। বাঁ দিকে, গ্যালারির একেবারে এক প্রান্তে আস্তাবল, পঁচিশ মিটার কামরা, আর উঁচুতে হবে প্রায় চার ফুট। পাথর কেটে তৈরি ইটের ছাদ। বিশটা ঘোড়া রাখার বন্দোবস্ত আছে। ভারি আরামেরই জায়গা বটে, জীবন্ত পশুর উত্তাপ যেন চুইয়ে পড়ছে আস্তাবল থেকে। ভারি ভালো লাগে তাজা ঘাসের আর খড়ের গন্ধ। একটা বাতি জ্বলছে, স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে পড়ছে। বিশ্রাম করছে ঘোড়াগুলি। ওরা ঢুকতেই ঘোড়াগুলি মুখ ফিরিয়ে দেখল। শিশুর দৃষ্টি তাদের আয়ত চোখে। আবার খড় খাচ্ছে, তাড়া নেই, এ যেন হৃষ্টপুষ্ট শ্রমিকের দল, ভালো থাকে, ভালো খায় দায়, সবাই পেয়ার করে।

ক্যাথেরিন দস্তার পাতের উপরে লেখা ঘোড়াগুলির নাম পড়তে পড়তে হঠাৎ অস্ফুট চিৎকার করে উঠল। হঠাৎ কি একটা যেন উঠে পড়ল ধড়মড়িয়ে! হাঁ, মোকেই! সে খড়ের গাদায় ঘুমিয়ে ছিল, ভয় পেয়ে উঠে পড়ল। রোব-বারে মাইফেলে শ্রান্ত হয়ে সোমবারে সে নিজের নাক ভেঙে কাটিং থেকে নাক ধোবার অছিলায় সরে পড়েছিল। এইখানে এসে ঘোড়াদের খড়ের গাদায় বেশ আরামে শুয়ে আছে। ওর বাবা বুড়ো মোকের ভারি আদুরে মেয়ে। ও যা-ই করুক, সে চুপচাপ থাকে। নিজেই মেয়ের জন্যে সব বিপদের ঝুঁকি নেয়।

এরই মধ্যে মোকের বাবা এসে হাজির। বেঁটেখাটো মানুষটি, মাথায় টাক, এখনো তাকত আছে। খনির মজুরের পক্ষে পঞ্চাশ বছরে এমন স্বাস্থ্য বিরল। কিন্তু মুখে ক্লান্তির রেখা, এখন সে সইস হয়ে, সারাদিনই খড় চিবোয়, মাড়ি

দিয়ে রক্ত ঝরে। মেয়ের সঙ্গে আর দুজনকে দেখে সে চটে গেল।

এখানে কি করছিস তোরা? চলে আয়, ঢেম্নিরা! মরদ নিয়ে ফুর্তি করতে এসেছে! আমার খড়ের গাদায় এসে ফুর্তি করতে বুঝি ভারি ভাল লাগে?

মোকের হাসি পাচ্ছে, পেট চেপে ধরে আছে। এতিয়েন'র বিশ্রীই লাগল, সে সরে গেল। ক্যাথেরিন তার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। তিনজনেই এবার পিটের মুখে ফিরে এল, বেবেৎ আর জাঁলিনও কয়েকখানা গাড়ি নিয়ে এল। খাঁচাগুলির ওঠানামা বন্ধ। ক্যাথেরিন ঘোড়াটার কাছে গিয়ে হাত দিয়ে আদর করতে করতে সঙ্গীকে ওর সম্বন্ধে বলতে লাগল। বাতাইল খনির সেরা ঘোড়া। এই সাদা ঘোড়াটা দশ বছর ধরে খনির নীচে আছে, এইখানেই একই কোণটুকুতে দশ বছর কেটে গেল, কয়লা কালো গ্যালারিতে একই কাজ করছে, দিনের আলো দেখেনি। বেশ মোটাসোটা ঘোড়াটা, গায়ের লোম চক্‌চক করছে শান্তশিষ্ট ভঙ্গীটি—এ যেন সন্তের জীবন—উপরের পৃথিবীর পাপ থেকে সে আশ্রয় নিয়েছে এই কোণে। এই অন্ধকারে ও হরেকরকম কৌশলও শিখেছে। যে পথে ও গাড়ি টানে, সে পথ ওর এত চেনা যে হাওয়া আসবার দরজাটা সে মাথা দিয়ে খুলে ফেলতে পারে, নীচু জায়গাগুলো দিয়ে চলতে গিয়ে মাথা নোয়ায়। ক'বার যেতে আসতে হবে তাও তার গণা। নিয়মমাফিক যাওয়া আসার পর সে আর নড়তে চায় না। তখন তাকে আস্তাবলে নিয়ে যেতে হয়। বুড়ো হয়ে পড়েছে সে, তার বিড়াল চোখ কখনো বা বিষাদে নিষ্প্রভ হয়ে যায়। হয়তো আবছা এলোমেলো স্বপ্নের গভীরে ভেসে ওঠে সেই কলবাড়ির স্মৃতি—যেখানে সে জন্মেছিল। মার্সিয়েনের কাছেই সে কল-বাড়িটা ছিল, চারপাশে ছিল বিরাট মাঠ সেখান থেকে বয়ে আসতো হাওয়া। হয়তো মনে পড়ে তার সে কথা। হাওয়ায় যেন কিসের পোড়া গন্ধ—একটা বিরাট বাতি জ্বলছে, পশুর স্মৃতিতে তার ঠিক আদলটি ধরা পড়ে না। সে মাথা নীচু করে আছে, জরাজীর্ণ পা দুখানা কাঁপছে। হয়তো সূর্যের কথা মনে করবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। সূর্যের স্মৃতি কি আছে তার মগজে?

কাজ চলেছে। সিগন্যালের হাতুড়িটা চারটে ঘা মারল, ঘোড়াটাকে নামানো হচ্ছে। এ সময় উত্তেজনা দেখা যায়, সাড়া জাগে। কখনো কখনো ঘোড়া ভয় পায়, নামানো হলে দেখা যায় মরে গেছে। যখন উপরে জালের ভিতরে রাখা হয়, ঘোড়াটা হাত-পা ছুঁড়ে রীতিমত লড়াই করে; তারপর যখন দেখে মাটি পায়ের নীচ থেকে সরে গেছে, ভয়ে যেন পাথর হয়ে যায়। একটু কাঁপুনি নেই তখন, শুধু ড্যাবডেবে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে, নীচে মিলিয়ে যায়। মস্ত বড় বলে ওদের খাঁচায় পোরা যায় না, খাঁচার নীচে বেঁধে বেওয়া হয়। নামতে প্রায় তিন মিনিট লাগে। ইঞ্জিন সাবধানে আস্তে আস্তে চালানো হয়। নীচে উত্তেজনা বেড়ে বেড়ে উঠে:—তারপর? ওটা কি মাঝপথে মরেই যাবে নাকি। অন্ধকারে ঝুলেঝুলে নামবে? এবার নীচে এল জন্তুটা, পাথরের মত স্তব্ধ, চোখের দৃষ্টি স্থির, আতঙ্কে বিহ্বল। ঘোড়াটার তিন বছর বয়েস হবে। নাম এমপেৎ।

মোকের বাবার কাজ এবার। ঘোড়াটাকে আস্তাবলে নিয়ে যেতে হবে তাকে। সে চেঁচিয়ে উঠল, হুঁশিয়ার! ওকে এদিকে নিয়ে এস, বাঁধন খুল না।

বাঁধানো মেঝের উপর নামানো হয়েছে এমপেৎকে, যেন একটা স্তূপ। এখনো নড়ছে চড়ছে না। এই অনন্ত গহ্বরে সে যেন এক দুঃস্বপ্নে ডুবে আছে। আর প্রতিধ্বনি উঠছে। গোলমাল। ওরা দড়িদড়া খুলছে, এবার বাতাইল ওর কাছে এসে গলা বাড়িয়ে মাটিতে শোয়ানো সাথীর গায়ের গন্ধ শুঁকতে লাগল। মজুররা ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। আচ্ছা, ওর গায়ে কি এমন মিঠে খোসবাই পেল বাতাইল? বাতাইলের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই সে ঠাট্টায়, সে প্রবল উৎসাহে শুঁকছে। হয়তো ওর গায়ে পেয়েছে খোলা মাঠের ঘ্রাণ, পেয়েছে ভুলে যাওয়া স্মৃতি—সূর্য যখন ঘাসে ঘাসে তার আলো ছড়িয়ে দেয়। তারই গন্ধ সে শুঁকছে। হঠাৎ সে ডেকে উঠল, সংগীতের আনন্দ সে চিৎকারে, উচ্ছ্বাসময় এক দীর্ঘশ্বাস বুঝি দুলে উঠল। এ যেন সম্বর্দ্ধনা, পুরানো দিনের খুঁটি-নাটি স্মৃতি—তারই দম্‌কা হাওয়া বয়ে এসেছে। আর এক বন্দীর বিষণ্ণতা তার সংগে মিশে আছে—সে তো আর মৃত্যুর আগে উপরে উঠতে পারবে না।

মজুররা চেঁচিয়ে উঠল, তাদের পেয়ারের ঘোড়ার কাণ্ড দেখে মজা লাগছে। দেখ, দেখ বাতাইল তার সাঙাতের সংগে বাত্‌চিত্‌ করছে!

এমপেতের যত দড়ি-দড়া খুলে ফেলা হয়েছে। কিন্তু এখনো সে নিশ্চল। সে পড়ে আছে, জাল যেন এখনো জড়িয়ে আছে তার গায়ে। ভয়ে সে বিহ্বল। ওরা এবার তাকে চাবুক মেরে তুলল। বিহ্বলতা কাটেনি, পা কাঁপছে। মোকের বাবা ঘোড়া দুটিকে নিয়ে চলে গেল।

কি—ঠিক—হ'ল? মেয়ু এবার জিজ্ঞেস করলে।

খাঁচাগুলি এখন পরিষ্কার করতে হবে, তাছাড়া উপরে ওঠার আরো দশ মিনিট বাকি। খাদগুলি একে একে শূন্য হ'ল, গ্যালারি থেকে ফিরছে মজুরেরা। এরই মধ্যে জন পঞ্চাশের ভিড় জমে গেছে। একেবারে জমে গেছে তারা, ঠক ঠক করে কাঁপছে, বুক ধড়ফড় করছে। পিয়েরোঁ লিদিকে মার লাগাল, সময়ের আগেই সে চলে এসেছে কাটিং থেকে। জাচারি মোকেকে চিমটি কেটে গরম হবার উপায় বাত্‌লে দিলে। অসন্তোষ বেড়ে চলেছে। সাভাল আর লাভাক ইঞ্জিনিয়ারের শাসানির কথা বললে। গাড়ি ভরতির মজুরি কাটবে, তক্তার দাম আলাদা আলাদা দিতে হবে। এ পরিকল্পনা ওদের মনঃপূত নয়, তাই চিৎকার উঠল। এই ক্ষুদ্র কোণে বিদ্রোহের অংকুর গজিয়ে উঠছে ছশো মিটার নীচে, মাটির তলায়। ওরা আর গলার স্বর চেপে রাখতে পারল না।

কয়লায় কালো শরীর, দেরিতে ঠাণ্ডায় জমে গেছে; কোম্পানিকে গাল দিচ্ছে। ওরা মাটির তলায় অর্ধেক মজুরদের খুন করে ফেলতে চায়, আর আর অর্ধেককে চায় উপোস করিয়ে দাবাতে। এতিয়েং শুনল, কাঁপছে সে।

জলদি, জলদি। ক্যাপ্টেন রিশোমে কুলিদের বার বার বলছে।

ওঠার তোড়জোড় করছে, কঠোর সে হতে চায় না, না শোনার ভান করছে। কিন্তু গুন গুনানি উঠছে জোরে, বাধ্য হয়েই তাকে নজর দিতে হ'ল। পিছনে ওরা হাঁক পেড়ে বলছে, এসা দিন তো থাকবে না, একদিন সব ভেংগে চুরমার হয়ে যাবে।

তোমার তো কাণ্ডজ্ঞান আছে, মেয়ুকে সে বললে, ওদের চুপ করতে বল, যখন তাকত নেই, তখন কাণ্ডাকাণ্ডি জ্ঞান তো থাকা উচিত।

মেয়ু এরই মধ্যে শান্ত হয়ে গেছে, সে উদ্বিগ্ন, তাকে চুপ করিয়ে দিতে হল

না। হঠাৎ স্বর স্তব্ধ হয়ে গেল। নিগ্রেল আর দাঁসার পর্যবেক্ষণ করে ফিরে আসছে, ঘাম জব্‌জবে হয়ে ওরা গ্যালারি থেকে এসে ঢুকল। অভ্যাসমত শৃঙ্খলায় ওরা সার বেঁধে দাঁড়াল। ইঞ্জিনিয়ার ঘরের ভিতর দিয়ে একটি কথাও না বলে চলে গেলেন। একটা গাড়িতে তিনি চেপে বসলেন, আর একটায় সর্দার। পাঁচবার সিগন্যালের ঘণ্টিটা বেজে উঠল। সেই উপরওয়ালাদের জন্যেই বেজে উঠল। মজুররা এই ঘণ্টির নাম দিয়েছে—নেমন্তন্নের ডাক! এবার থমথমে নীরবতার ভিতর দিয়ে খাঁচা শূন্যে উঠে গেল।

ছয়

এতিয়েঁ চারজনের সঙ্গে গাদায় যখন উঠে এল, মনে মনে সে ঠিক করলে আবার ক্ষুধার্ত হয়ে তেমনি পথ চলবে। ঐ নরকে তলিয়ে যাবার চেয়ে যে কারো বুঝি মরণও ভালো, ওখানেও তো নিজের রুজি রোজগারের সম্ভাবনা নেই। ক্যাথেরিন তার পাশে নেই। সেই মধুর প্রাণ-মাতানো উত্তাপ নিয়ে সে আছে উপরের একটা গাড়িতে; তার মনে হ'ল, ওসব ভাবনা আর নয়, সে চলেই যাবে। তার শিক্ষা ওদের চেয়ে বেশি, সে তো ঐ মানুষের পালের মতো বশ্যতা স্বীকার করতে পারবে না; উপরওয়ালাদের গলা টিপে মেরে সে হয়তো এর শেষ করেই দেবে।

হঠাৎ চোখ ধাঁধিয়ে দিল। এত দ্রুত উঠে এসেছে যে, দিনের আলোয় মাথা ঘুরে গেল। চোখের পাতা নড়ে নড়ে উঠল। আলোয় এবার অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। শিকের উপরে থেমে আছে খাঁচা, এও যেন এক স্বস্তি। এক-জন দরজা খুলে দিলে, এবার গাড়ি থেকে বন্যার স্রোতের মতো লাফিয়ে পড়ল মজুরের দল।

মোকে, জাচারি একজনের কানে কানে বললে, আজ রাতে কি ভল্‌কানে যাবে নাকি?

মঁতসুর কাফে ভল্‌কান, সেখানে গান-বাজনার মজলিশ বসে। মোকে বাঁ চোখ টিপলো, নিঃশব্দ হাসিতে, মুখ যেন তার হাঁ হয়ে গেছে, বাপের মতোই বেঁটে আর গ্যাঁট্টাগোঁট্টা সে। কেমন এক উদ্ধত ভঙ্গী তার, অপরিণামদর্শী। ও কালকের কথা না ভেবে আজকেই সব গ্রাস করে ফেলবে, এবার মোকেৎ এল। ভ্রাতৃস্নেহে সে তার পাছায় জোরে এক থাপ্পড় কষিয়ে দিলে।

এতিয়েঁ রিসিভিং হলের সামনেটা দেখে বুঝি চিনতেই পারল না। লণ্ঠনের রহস্যময় আলোয় তখন তো বেশ জাঁকালো বলেই মনে হয়েছিল, এখন তো নগ্ন, ধুলো আর আবর্জনা ভরা। ধুলো ভরা জানালা দিয়ে ম্লান আলো এসে পড়েছে, ইঞ্জিনের তামা চক্‌চক্‌ করছে, চকচকে তেলালো তার কালি-চোবানো ফিতের মতো চলে গেছে। উপরে আছে কপিকল আর একটা বিরাট মাচা। সেইটেই ধরে রেখেছে সব। খাঁচা, গাড়ি আর ধাতুর এই অমিতব্যয়ে হলখানা যেন গম্ভীর হয়ে আছে, আবার পুরানো লোহার ধূসরতাও গাম্ভীর্য বাড়িয়ে তুলেছে। অবিরাম চাকার গর্জন ধাতুর মেঝে তুলছে কাঁপিয়ে; কয়লার

এই ঘূর্ণিতে মিহি কয়লার গুঁড়ো জমি আর দেয়ালে আর জয়েস্টে ছড়িয়ে পড়ছে, কালো করে দিচ্ছে।

রিসিভারের কাচের ছোট্ট আফিসটির টেবিলের উপরের ঝোড়ার হিসেব দেখে সাভাল ভীষণ রেগে ফিরে এল। সে জেনেছে, দুখানা গাড়ি বাতিল হয়ে গেছে। একটায় নাকি কম আছে কয়লা, আর একটার কয়লা তেমন পরিষ্কার নয়।

দিনটা তো খতম হ'ল, সে চেঁচিয়ে উঠল, আবার বিশ সু ঘাটতিও পড়ল। আমরা যতসব কুঁড়ের ধাড়ী নিয়ে কাজ করছি বলেই না এমনি হ'ল। ওরা তো হাত নাড়ে না—শুয়োরে যেন লেজ নাড়ে।

এতিয়েঁর দিকে আড় চোখে তাকিয়ে সে কথাটা শেষ করল।

ওর ইচ্ছে হ'ল ঘুষি মেরে জবাব দেয়। তারপর আপন মনেই ভাবল, কি দরকার! সে তো চলেই যাচ্ছে। এবার সে দৃঢ়সংকল্প। কাজ কি গোল-মাল বাঁধিয়ে!

ওদের ঠাণ্ডা করবার জন্যে মেয়ু বললে, তা পয়লা দিনেই কি আর ঠিক ঠিক কাজ করা যায়। কাল ও আরো ভালো করে কাজ করবে।

সবাই সমান ক্ষেপে আছে, মুখিয়ে আছে ঝগড়া বাঁধবার জন্য। ওরা বাতি-ঘরে এল বাতি জমা দিতে। লেভাক বাতিঘরের কর্মচারীটিকে গালাগাল দিতে শুরু করল। সে তার বাতিটি ভাল করে সাফ করে রাখে নি। তারা বেরিয়ে এসে ধীরে ধীরে চলতে লাগল। এখনো আগুনের কুণ্ডটা জ্বলছে। কাঠ বেশি করেই দেয়া হয়েছিল, চুল্লিটা লাল হয়ে গেছে। বিরাট ঘরখানায় একটাও জানালা নেই, তাই মনে হয় যেন আগুন লেগেছে। আগুনের আভায় লাল হয়ে গেছে দেয়াল। আনন্দের অস্ফুট শব্দ উঠছে, পিঠে এসে লাগছে তাপ দূর থেকে, জোর লাগছে। সুরুয়া থেকে যেমন ধোঁয়া ওঠে তেমনি শরীর থেকে যেন ধোঁয়া উঠছে। গা গরম করে এবার ওরা পেটে লাগাচ্ছে তাপ। মোকে তো নিশ্চিত হয়ে তার ব্রীচেস খুলে ফেলল, সেমিজটা সে শুকিয়ে নিচ্ছে। কয়েকটা ছোকরা তাকে ঠাট্টা করছে, ও হঠাৎ ওর উলঙ্গ পিছনটা দেখিয়ে দিল, এমনি করেই ও ঘৃণা প্রকাশ করে।

সাভাল বাক্সে যন্ত্রপাতি বন্ধ করে বললে, আমি চলি।

কেউ নড়ল না। মোকে শুধু মঁতসুতে যাবার অছিলায় তাড়াতাড়ি ওর পেছু নিলে। সবাই ঠাট্টা করছে। তারা জানে মোকে সম্বন্ধে সাভালের প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

ক্যাথেরিন ব্যস্ত, বাবাকে সে নীচু গলায় কি যেন বললে। সে অবাক হয়ে গেল, তারপর মাথা নেড়ে জানাল সে রাজি। এবার এতিয়েঁকে তার পুঁটলিটা ফিরিয়ে দেবার জন্যে ডাকল।

সে বললে, শোনো, তোমার তো পয়সাকড়ি কিছুই নেই। চোদ্দ দিন ফুরোবার আগে তো উপোস করেই থাকতে হবে। আমি কি কোথাও তোমার জন্যে ধারের চেষ্টা করব?

এতিয়েঁ কেমন বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। সে এইমাত্র তার ত্রিশ সু নিয়ে চলে যাবে ভাবছিল। কিন্তু মেয়েটির সুমুখে লজ্জা করছিল বলেই পারেনি। মেয়েটি তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সে হয়তো ভাবছে, ও

মেহনৎ করতে চায় না।'

মেয়্যু বললে, ধার পাওয়াই যাবে এমন কথা বলতে পারি না। ওরা তো আমাদের সব ব্যাপারেই গর্‌রাজি।

এতিয়েঁ এবার রাজি হ'ল। মালিক নারাজ হবেই। আর তারও কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না। তবু সে যাহোক কিছু খেয়ে দেয়ে চলে যেতে পারবে। কিন্তু তা তো হ'ল না। মালিক ফিরিয়ে দিল না, ক্যাথেরিনের মুখে আনন্দের ছায়া, মুখে সুন্দর হাসি, বন্ধুত্বের দৃষ্টি। ও তার উপকার করতে পেরেছে বলে খুশী। এতিয়েঁ অসন্তুষ্টই হ'ল। কি হবে এ সবে?

কাঠের গোড়-তলা জুতো পরে বাক্স বন্ধ করে দিল। এবার মেয়্যুরা চলল শেড ছেড়ে, সাথীরাও চাঙ্গা হয়ে একে একে চলে যাচ্ছে। তাদের পিছনেই ওরা চলল। এতিয়েঁ সবার পিছনে। লেভাক আর তার বাচ্চা ছেলেটা দলে ভিড়ে গেল। ওরা কিছুদূর গিয়ে থমকে দাঁড়াল। মারপিট চলছে।

মস্ত শেড, বীম-বরগাগুলি পর্যন্ত কয়লার গুঁড়োয় কালো। মস্ত শার্সি ঘরে, তারই ভিতর দিয়ে আসছে অবিরাম হাওয়া। হাওয়ার স্রোত যেন। রিসিভিং রুম থেকে সোজা ফিরে আসছে কয়লার গাড়িগুলো, তারপর ক্রেডলের সাহায্যে উল্‌টে ফেলা হচ্ছে। তারপরে মজুররা সিঁড়িতে উঠে শাবল আর চালুনি দিয়ে পাথরগুলি বেছে কয়লা পরিষ্কার করে ফেলছে। এবার পরিষ্কার কয়লা মালগাড়িগুলোতে গিয়ে পড়ছে ফুঁদেল দিয়ে।

ফিলোমেনা লেভাক সেখানে রয়েছে, বিবর্ণ, শীর্ণ দেহ, নিরীহ তার মুখখানি। এ মুখের অধিকারিণীর মুখ থেকে বুঝি রক্ত ঝরে তাই এমন ফ্যাকাশে মুখ তার। মাথাটা বেঁধে রেখেছে এক টুকরো নীল পশমী কাপড় দিয়ে। হাত আর বাহু কয়লায় কালো। সে ডাইনী বুড়ী পিয়েরোঁর মার নীচে চাপা পড়ে আছে। বুড়ির চোখ দুটো যেন পেঁচার মতো ড্যাবডেবে, আর মুখখানা যেন কৃপণের টাকার থলের মতো কুঁকড়ে আছে। ওরা একে অপরকে গাল দিচ্ছে, ছুঁড়িটা বুড়িকে তার কয়লাগুলো কুড়িয়ে নিতে দেয়নি বলে গাল দিচ্ছে। দশ মিনিটেও ঝুড়ি ভরতি হ'ল না। ঝুড়ি হিসাবে ওরা মজুরি পায়, তাই এই নিয়ে ওদের বিবাদ লেগেই আছে। চুলোচুলি করে ওরা, লাল মুখে কয়লার কালো দাগ পড়ে।

জাচারি তার পিরিতের মানুষকে উপর থেকে চেঁচিয়ে বললে, আচ্ছাসে কষিয়ে দাও না।

সবাই হেসে উঠল। কিন্তু ব্রুল ক্ষেপে উঠল ছোকরার উপর;

নোংরা জানোয়ার কোথাকার! দুটো বাচ্চা তো ওর পেটে জন্ম দিয়েছিস, সেই দুটো তোর পেটে হলে বুঝতি। দেখ দিখি, একটা আঠারো বছরের ছুঁড়ি কিনা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

মেয়্যুর ছেলেকে বাধা দিতে হ'ল।

এবার এল ফোরম্যান। আবার কয়লা কুড়োনো শুরু হ'ল। শুধু দেখা যায় মেয়েদের পিঠ, ওরা নীচু হয়ে পাথর কুড়োচ্ছে, আর ঝগড়া করছে।

হঠাৎ বাইরে হাওয়া বন্ধ হয়ে গেল ; কেমন এক ভিজে ঠান্ডা যেন ধূসর আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে। খনির মজুররা হাত জড়ো করে আনলো বুকের কাছে, চলায় যেন কেমন অসঙ্গতি এসেছে। পাতলা জামার নীচে বড় বড়

হাড়গুলি জেগে উঠেছে। দিনের আলোতে ওদের একদল নিগ্রো বলেই মনে হয়। ওরা যেন কাদায় লুটোপুটি খাচ্ছে। কারো কারো এখনো ব্রিকেৎ খাওয়া শেষ হয়নি, রুটির আধা-খাওয়া টুকরো সার্ট আর জামার ভিতরে ঢুকিয়ে নিলে। আর এতে ওদের কুঁজোই দেখাচ্ছে এখন।

জাচারি বললে, এই যে, বুদেলুপ।

লেভাক না থেমেই তার সঙ্গে দুটো বাত্‌চিত করে নিলে। পঁয়ত্রিশ বছরের জোয়ান লোকটি, শান্তশিষ্ট মানুষ, মুখ দেখলে সৎলোক বলেই মনে হয়।

লুই, সুরুয়া তৈরী হয়ে গেছে?

বোধ হয়। তাহলে বৌয়ের মেজাজ খোশ আছে, কি বল?

মাটি কাটতে যারা যাবে, তারা এসে গেল। নতুন দল। পিটের ভিতরে ওরা একে একে মিলিয়ে যাচ্ছে। তিনটের ঘণ্টি পড়েছে, পিটে নামার ঘণ্টি। আরো মানুষ এবার পিটের কুক্ষীতে চলে যাবে। নীচে অলিগলিতে যে সব লোক কাজ করছিল, এবার তাদের বদলি এল। ক্ষণিকের বিশ্রাম নেই। রাতদিন মানুষ-কীটের দল পাথর খুঁড়ছে। বীটের খেতের নীচে, বহু নীচে তারা খুঁড়ে খুঁড়ে চলেছে পাথর।

ছোঁড়াছুঁড়ির দল এগিয়ে চলেছে আগে। জাঁলিন বেবের্তকে চার স্যুর তামাক ধারে কেনার এক জটিল উপায় বাত্‌লে দিচ্ছে, লিদি চলেছে দূরে দূরে! ক্যাথেরিন জাচারি আর এতিয়েঁর সঙ্গে চলেছে। কারো মুখে রা-টি নেই। আভাঁতাস সরাইখানার সামনে এসে মেয়ু আর লেভাক তাদের দলে ভিড়ল।

এতিয়েঁকে মেয়ে বললে, তুমিও আমাদের সঙ্গে আসবে নাকি?

ছাড়াছাড়ি হ'ল এখানে। ক্যাথেরিন এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, যুবকের দিকে সে তার বড় বড় চোখ দুটি তুলে আছে। এক ঝরনা ধারার সবুজ স্বচ্ছ দ্যুতি তার চোখে—তার কালো মুখখানা যেন স্বচ্ছতা আরো বাড়িয়ে তুলেছে। সে একটু হেসে আর সবার সঙ্গে চলল বস্তির দিকে।

গ্রাম আর খনির মাঝামাঝি দুই পথের মোড়ে এই সরাইখানা। দোতালা ইটের বাড়ি, আগাগোড়া সাদা চুনকাম করা, আবার জানালায় চওড়া হালকা-নীল পাড় টানা। দরজার উপরে একখানা চৌকো সাইনবোর্ডে পেরেক দিয়ে লাগানো, তাতে পড়া যায়, আ লা আভাঁতাস—লাইসেন্সপ্রাপ্ত সরাইখানা। পিছনে একটু ছোট জায়গা, চারদিকে গাছপালা ঘেরা। কোম্পানি এখানকার সব জমিগুলিই কেনবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে, সফলও হয়েছে, কিন্তু ভোরোর মুখে এই সরাইখানা নিয়েই হয়েছে মুশকিল।

ভিতরে চল, মেয়ু এতিয়েঁকে বললে।

ভিতরে কিছুটা জায়গা, চারিদিকে সাদা দেয়াল। তিনটে টেবিল, ডজন-খানেক কাঠের চেয়ার একটা কাউন্টার—বড়জোর ডজনখানেক গেলাস আছে। তিন বোতল মদ, একটা ডিকেন্টার, একটা দস্তার ট্যাঙ্ক, তাতে কল লাগানো। ঐ ট্যাঙ্কে আছে বিয়ার। আর কিছু নেই। একটা মূর্তি নেই, ছোট টেবিল নেই, নেই খেলার সরঞ্জাম। আগুনের কুণ্ডে গন্‌গনে আগুন জ্বলছে।

মেয়ু একটি বড়সড়ো মেয়েকে ডেকে বললে, একটা ছোটা দাও তো! রাসেনার আছে নাকি? মেয়েটি পড়শীদের মেয়ে, এখানে কাজ করে, মাঝে মাঝে সে

সব দেখাশুনো করবার ভারও নেয়।

মেয়েটি কলটা খুলে জানালে, মালিক শীগগীরই ফিরবে। আস্তে আস্তে মজুরটি অর্ধেক গেলাস শেষ করে দিলে। গলায় জমেছে কয়লার গুঁড়ো। এমনি করেই সাফ করে দিলে, সংগীকে একবার সাধলেও না। আর কালিঝুলি মাখা আর একজন খদ্দের টেবিলে বসে নিঃশব্দে পান করছিল, আর একজন ঢুকল। . সে ইশারা করতেই তাকে মদ এনে দেওয়া হ'ল। সে পান করে দাম চুকিয়ে দিয়ে চলে গেল।

এবার এল আটত্রিশ বছরের গোলগাল চেহারার একটি লোক। গোঁফ দাড়ি তার নিখুঁত করে কামানো, মুখে হাসি—এই রাসেনার! আগে ছিল খনির গাঁইতি-চালিয়ে মজুর, তিন বছর আগে তাকে বরখাস্ত করে দেওয়া হয় ধর্মঘটের সময়ে। কাজের লোক, বলতে পারে ভাল, প্রতিটি বিরোধী দলেরই সে পাণ্ডা, বিক্ষুব্ধ মজুরদের সে নেতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার স্ত্রীর ছিল লাইসেন্স। যখন তাকে পথে বার করে দেওয়া হ'ল, সে টাকাকড়ি যোগাড় করে সরাই-খানার মালিক হয়ে বসল। আর সে সরাইখানা বসাল ঠিক খনির মুখে। খনির মালিকেরা আরো চটে গেল, কিন্তু চটে লাভ কিছু হয় নি। এখন সরাইখানার বাড়বাড়ন্ত হয়েছে, এ একটি ঘাটি। এখানে মালিকের বিরুদ্ধে তার পুরানো সাথীদের সে উত্তেজিত করে তোলে, তার ফলে আয়ও বেশ হয়।

মেয়ু বললে, এই ছোঁড়াটিকে আজ সকালে কাজে ভরতি করে নিলাম তোমার দুখানা কামরার একখানা কি খালি আছে, দু হপ্তার জন্য ভাড়া দিতে পারবে?—আগাম পাবে না কিন্তু। রাসেনারের মুখখানায় সন্দেহ দেখা দিল। এতিয়েংকে সে একবার ভাল করে দেখে নিলে, তারপরে জবাব দিলে,

আর তো হয় না। দুটো কামরাই ভাড়া হয়ে গেছে।

এতিয়েং এমনিধারাই আশা করেছিল, কিন্তু তবু দাগা পেল। চলে যেতে মন চাইছেনা। সে অবাক হয়ে গেল। যাহোক, সে তিরিশ সু মজুরি নিয়ে চলেই যাবে। যে মজুরটি দূরে টেবিলে বসে মদ গিলছিল, সে এবার বিদায় নিলে। এবার একে একে অনেকেই এল গলা ভিজিয়ে নিতে। তারপর আবার চলেও গেল। পথ চলেছে ওরা, কুঁজিয়ে চলেছে। এ শুধু মদ গেলা—স্ফূর্তি নেই—নেশা নেই। এ যেন এক প্রয়োজন। নিঃশব্দে তারই তাগিদ মেটানো—হয়তো বা একটু নিবৃত্তির খুশীর আমেজও লেগে থাকে।

মেয়ু তার বিয়ারটুকু তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছিল। রাসেনার তাকে শুধাল, তাহলে কোন খবর নেই সাঙাৎ?

মেয়ু চারদিকে তাকালে। শুধু এতিয়েংই আছে।

এই তো আর-একটা হাঙামা হ'ল।...হাঁ, সেই কাঠ নিয়েই লাগল। সে বলে গেল ঘটনাটা। হোটেলওয়ালার মুখচোখ লাল, আবেগে উদ্বেল হয়ে উঠেছে মুখের চামড়া, চোখে তারই জ্বলন্ত আভাস। সে যেন ফেটে পড়ল।

বহুৎ আচ্ছা, ওরা যদি মজুরি কমাতে চায়, তাহলে ওদেরই দফা রফা হয়ে যাবে।

এতিয়েংকে দেখে সে চেপে গেল। তবু ট্যারচা চোখে তাকিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিবে ম্যানেজারের কথাই বলতে লাগল। নাম না করে ম্যানেজার হানাবু,

তার স্ত্রী, তার ভাগনে সবাইকেই এক চোট নিলে। এমনধারা কারবার চলতে পারে না, একদিন-না একদিন সব ভেঙেচুরে পড়বে। দারিদ্র্য উঠেছে চরমে—বহু কারখানার দরজা বন্ধ হয়ে গেছে—মজুররা এ-তল্লাট থেকে চলে যাচ্ছে। এই তো হোটেলে ছ' পাউন্ডের বেশি রুটি সে রোজ বিলাচ্ছে। কালই তো খবর পেল, পাশের খনির মঁসিয়ে দি'উলিঁ নাকি কি করে খনির কাজ চালাবেন ভাবতে শুরু করেছেন। তার উপরে লিল্ থেকে চিঠিতে এসেছে ঘাবড়ে যাবার মতো খবর।

সে এবার কানে কানে বললে—সেই যে সেদিন সন্ধ্যেয় যাকে দেখেছিলে, সেই,—

তার বৌ ঢুকতেই চুপ করে গেল। ঢ্যাঙা, গ্যাঁট্টাগোঁট্টা দজ্জাল মেয়েমানুষ। লম্বা তার নাকখানা, গালে বেগুনে আভা। স্বামীর চেয়ে তার রাজনীতিক মতামত অনেক চড়া।

কার চিঠির কথা বলছ—প্লুচার্তের? ওর যদি হাত থাকতো, দেখতে এতদিনে কিছু একটা ভালমন্দ হয়ে যেত।

এতিয়েঁ শুনছিল; সে উত্তেজিত হয়ে উঠল। দুঃখ আর তার প্রতিশোধ কামনায় সে মত্ত।

নামটা শুনে সে চমকে গেল। সে নিজের অজান্তেই বলে উঠল,

প্লুচার্ত—আমি তাকে চিনি।

ওরা তার মুখের দিকে তাকালে। সে আবার বললে,

আমি ইঞ্জিনের কাজ করতাম; লিল্-এর কারখানায় ও ছিল আমাদের ফোরম্যান। যুগ্যি লোক। ওর সঙ্গে অনেক বাত্‌চিত্ হয়েছে।

রাসেনার ওকে আবার দেখে নিলে চোখ বুলিয়ে; মুখের ভাব বদলে গেছে; হঠাৎ যেন সহানুভূতি এসে দেখা দিয়েছে। ও তার বৌকে বললে,

মেয়ু, এই ভদ্দর লোককে নিয়ে এসেছে। পুটারের কাজ করে। উনি উপরে একখানা কামরা চান। তা ছাড়া দিন-পনেরোর জন্য ধারও দিতে হবে।

দু-চার কথায় ব্যবস্থা হয়ে গেল। কামরা আছে; ভাড়াটে আজ সকালেই বিদায় হয়েছে। হোটেলওয়ালা এবার তার বিষয়ে ফিরে এল—দিল তার খোলসা। সে বললে, সে অন্যের মত নয়। মালিকের কাছে যা সম্ভব নয় তা সে দাবি করে না, যেটুকু সম্ভব সেইটুকু মালিক দিক না! বৌ মাথা নাড়লে জোরে। সে সমবেদনায় রাজি নয়—তার নিজের হকের জিনিস চাই—আপোসে সে নারাজ।

মেয়ু এবার ওদের কথায় বাধা দিলে, আচ্ছা আসি তাহলে! কথা তো বড় ভালই বললে সাঙাৎ! শুনতেও ভাল লাগে। কিন্তু ওতে তো খনির নীচে যাওয়া আটকাবে না আর মরে মরে মানুষ কাজও করবে। দেখ তো সাঙাৎ, তিন বছর খনির তলায় যাওনি, এর মধ্যে তোমার চেহারা একেবারে পাল্‌টে গেছে!

রাসেনার আত্মতুষ্ট, সে জবাব দিলে—তা যা বল, ভালই আছি।

এতিয়েঁ মেয়ুর সঙ্গে এগিয়ে এল দরজা অবধি, ওকে ধন্যবাদ জানাবে। কিন্তু মেয়ু শুধু মাথা নেড়ে চলে গেল। সে দেখল, বুড়ো আস্তে আস্তে গাঁয়ের দিকে চলেছে।

রাসেনারের বৌ এখন খদ্দের নিয়ে ব্যস্ত। সে এক মিনিট সবুর করতে বললে। খদ্দেরদের পরিবেশন শেষ করে সে তাকে তার কামরায় নিয়ে যাবে। সেখানে স্নান ক'রে ফিটফাট হ'য়ে নেবে এতিয়েং। কিন্তু এতিয়েং কি এখানে থাকবে? আবার সন্দেহ-সংশয় এসে দোলা দিয়ে যাচ্ছে মনে, পেয়ে বসেছে পথে ঘুরে বেড়াবার অস্থির কামনা—সে এক আজাদী। বুভুক্ষা সেখানে আছে—কিন্তু সে বুভুক্ষা চমৎকার রোদে বসে সহ্য করা যায়—নিজের উপর নিজের প্রভুত্ব পাবার জন্য সহ্য করা যায়। যখনি সে এসে এখানে দাঁড়াল, তখন থেকেই তার মনে হয়েছে—এইখানেই মাটির নীচে কেটে গেছে তার বহু বছর—সে যেন পিটের ঐ অন্ধকার পথে বহুদিন ধরে বুকে হেঁটে চলছে। আর ফিরে-ফিরতি শুরু করতে ইচ্ছে হয় না। এ এক অবিচার—এ এক হাড়ভাঙা মেহনতি। ভারবাহী পশু হয়ে চোখে ঠুলি এঁটে সে পিষে যেতে চায় না—ওতে তার মনুষ্যত্বের গর্বে আঘাত লাগে।

মনে তার দ্বন্দ্ব চলছে, আর চোখ চলে গেছে প্রান্তরের বিস্তারে, দেখছে—চোখ চেয়ে দেখছে। সে অবাক—সে তো কল্পনাও করতে পারেনি—দিগ্বলয় এমনি রূপে দেখা দেবে তার কাছে। বুড়ো বনেমোর যখন অন্ধকারে হাত নেড়ে নেড়ে দেখিয়ে দিয়েছিল, তখন তো এমন মনে হয় নি। হাঁ, এখনো লা ভোরো সে তার সুমুখে দেখতে পাচ্ছে। যেন জানোয়ার শুয়ে আছে তার গুহায়—কাঠ আর ইটের বাড়ি শ্লেটে-ঢাকা, আলকাতরা মাখা শেড আর লাল রঙা চোঙের সার সাজানো সে-গুহা। সবই যেন কেমন শয়তানি-ভরা। কিন্তু এই ইটকাঠের চৌহদ্দির চারদিকে উঠোন অনেকখানি ছড়িয়ে আছে। সে—উঠোন যেন কালির হ্রদ। স্তূপাকারে রয়েছে কয়লা। তারাই যেন সে হ্রদের ঢেউ। আর আছে ভারার সার—সেগুলো উঁচু রেল পথের ঠেকনো হয়ে আছে। কোথাও বা তার গাদাকরা কাঠ-কুটরো—দেখে মনে হয় এ যেন এক গাছ-পালা কাটা হয়ে গেছে এমন বন।

ডান দিকের দৃশ্য চাপা পড়ে গেছে স্তূপের আড়ালে। এ যেন এক বিরাট প্রাকার। এখানে কোথাও কোথাও গজিয়েছে ঘাস, কোথাও বা আগুনে পুড়ে খাক্ হয়ে গেছে মাটি—ঘন ধোঁয়ার কালো দাগ রয়ে গেছে, আর রয়েছে শ্লেট আর বেলে পাথরের উপর রক্তের মতো পোড়া দাগ—বেলেপাথরে কলঙ্ক হয়ে আছে। দূরে বিছিয়ে আছে প্রান্তর—শস্য আর বীটের অসীম বিস্তার। বছরের এই সময়ে রিক্ত পড়ে আছে। এখানে-ওখানে জলায় দেখা যাচ্ছে বন্য উদ্ভিদের সতেজ বিকাশ; আবার কোথাও বা দু-একটি ঠুঁটো উইলো গাছ, কোথাও বা দূরান্তের প্রান্তর পপলারের সরু সরু সারিতে বিভক্ত। দূরের শহরগুলিও এখান থেকে সাদা দাগের মতো দেখায়। উত্তরে আছে মার্সিয়েনে ও দক্ষিণে মঁতসু—আর পূব দিকে ভান্দামের অরণ্য। দিগ্বলয়ে বনের রিক্ত-পত্র গাছগুলি এখন রক্তবর্ণ রেখা হয়ে ছড়িয়ে আছে। আর শীতের এই বিষণ্ণ বিকেলে নিষ্প্রভ আকাশের নীচে মনে হয় যেন লা ভোরোর সমস্ত জমাট অন্ধকার আর উড়ন্ত কয়লার গুঁড়ো চেপে বসেছে প্রান্তরের উপর, গাছপালা ঢেকে দিচ্ছে, পথের বালি হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে, মাটিতে তারা বীজ বুনছে।

এতিয়েং সবচেয়ে অবাক হয়ে গেল খালের রেখা দেখে। স্কার্পের কাটা

খাল। রাতে এ রেখা চোখে পড়েনি, দেখা যায়নি। ভোরো থেকে মার্সিয়েনে অবধি এই খাল সোজা চলে গেছে। খাল নয় যেন দু'ক্রোশ লম্বা বিবর্ণ রুপালী ফিতে—দু'পাশে দীর্ঘ গাছের সার। খাড়া সবুজ পাড় দু'দিকে চলে গেছে আর তার ভিতর দিয়ে ছুটে চলেছে নদী—তার বিবর্ণ ধারা ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে বজরার যাওয়া আসায়—তাদের লালরঙা হাল দেখা যাচ্ছে। পিটের ঘাটে সারি সারি নৌকো বাঁধা। রেলপথে যত গাড়ি আসছে, সব খালাস হচ্ছে নৌকোয়। তারপর খাল বাঁক ঘুরে গেছে, জলার মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে। এই যে জলধারা, এই যে জ্যামিতিক রেখা, প্রান্তরের সমস্ত আত্মা যেন এখানে অধিষ্ঠিত। এ যেন এক সদর সড়ক—কয়লা আর লোহা বয়ে নিয়ে সে চলেছে দূর দূরান্তরে।

এতিয়ে'র চোখ এবার খাল থেকে মজুর পাড়ার উপর পড়ল। প্রান্তরের উপর বিছিয়ে আছে গাঁ—শুধু তাদের লাল টালি-ছাওয়া ছাদগুলি দেখা যায়। আবার লা ভোরোর দিকে চোখ নেমে এল। দুটো বিরাট ইটের পাঁজা। ওখানেই ইট তৈরি আর পোড়ানো হয়। একটা বেড়ার আড়ালে কোম্পানির রেলসড়কের একটা শাখা চলে গেছে—পিটের সঙ্গে এই শাখাটার যোগাযোগ আছে। গাঁইতি-চালিয়েদের শেষ দল বোধ হয় নীচে যাচ্ছে। একটা ঠেলা গাড়ির তীক্ষ্ন শব্দ শোনা গেল। আর সেই অজানা অন্ধকার নেই, নেই সেই দুর্বোধ্য বজ্রগর্জন, নেই রহস্যময় তারার জ্বলন্ত দ্যুতি। দূরে ব্লাস্ট ফার্নেস আর কয়লার চুল্লি-গুলো এখন ভোরের আলোয় বিবর্ণ। শুধু অবিরাম এখনো চলছে নিঃসরণ-নলের শব্দ, এখনো তেমনি ঘন আর দীর্ঘ তার নিঃশ্বাস। এখন তাকে স্পষ্ট দেখা যায়। অতৃপ্ত নরখাদক দানবের মতো তার নিঃশ্বাস—ধূসর ধোঁয়ার উদ্গারে ছড়িয়ে পড়ছে। হঠাৎ এতিয়েং মনস্থির করে ফেললে। হয় তো ওর মনে হ'ল, ঐ যেখানে গাঁ শুরু হয়েছে, ওখানে সে দেখতে পাচ্ছে ক্যাথেরিনের দুটি বিষাদিত চোখ, অথবা লা ভোরো থেকে বুঝি বয়ে এল বিদ্রোহের দমকা হাওয়া। কি জানি কি হয়ে গেল। কিন্তু শুধু ঐ খনির নীচে সে যেতে চায়—দুঃখ সইতে চায়, লড়তে চায়। বনেমোর যাদের কথা বলেছে তাদের প্রতি সে ঘৃণায় ফুঁসে উঠল—সেই মেদস্ফীত দেবতার প্রতি এই ঘৃণা। সে তো তৃপ্ত, ওত পেতে আছে—আর দশ হাজার ভুখা মানুষ তাকে নিজেদের মেদের অর্ঘ সাজিয়ে উপহার দিচ্ছে—অথচ তারা তাকে চেনেও না।

দ্বিতীয় খণ্ড

এক

গ্রিগোয়েরদের জমিদারি লা পিয়োলেং। মংতসুর পূব দিকে ছ' মাইল দূরে জমিদারিটি—ঠিক জয়সেল রোডের উপরেই। বাড়িখানা মস্ত আর চৌকো—গড়নের বিশেষ কোন রীতি নেই—গত শতকের শুরুতে তৈরি। এত বড় জমিদারির এখন আর বেশি কিছু নেই। তিরিশ হেক্টেয়ারের মতো জমিজমা আছে—তার চারদিকে পাঁচিল ঘেরা—তদারক করাও সহজ। এরই বাগিচা আর খিড়কির বাগানের এ-তল্লাটে সেরা ফল আর শাকসব্জীর জন্যে নামডাক আছে। কিন্তু এখানে কোন পার্ক নেই, শুধু আছে ছোটখাটো একটি বন। বুড়ো নেবু গাছের ঝাড়, বহু দূর ধরে এক পাতার উপাসনামন্দির যেন গড়ে তুলেছে। রেলিং থেকে বাড়ির সিঁড়ি অবধি বিছিয়ে আছে তারা। এই রিক্ত প্রান্তরে এ এক বিচিত্র দৃশ্য! এখান থেকে আবার মার্সিয়েনে আর বোগোনের গাছপালা এক-এক করে গোনা যায়।

সেদিন ভোরে গ্রিগোয়েরা আটটায়ই উঠে পড়ল। তারা ঘণ্টাখানেক পরে ছাড়া ওঠে না। বড় ঘুম-কাতুরে ওরা। কিন্তু ঝড়ের জন্যে কাল রাতে ঘুম হয়নি। স্বামী গেলেন ঝড়ে কি ক্ষতি হয়েছে দেখতে, মাদাম গ্রিগোয়ের ফ্লানেলের ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে চটি পায়ে চললেন নীচে রান্নাঘরে। মহিলাটি বেঁটেখাটো, গ্যাঁট্টাগোঁট্টা। আটান্ন বছর বয়েসেও মুখখানা এখনো পুরন্ত। ঠিক যেন পুতুলটি—বড় বড় চোখ—সাদা চুলের আড়ালে মুখখানি দেখা যায়।

রাঁধুনীকে ডেকে বললেন, মেল্যাঁ, এখুনি রুটি গড়বে নাকি? ময়দা তো মাখা সারা। মেয়েটা আধ ঘণ্টার ভিতরে উঠবে না। উঠে ও গরম গরম চকোলেটের সঙ্গে খেতে পারবে...অবাক হয়ে যাবে মেয়ে, তাই না?

বুড়ী রাধুনী, হাড় জিরজিরে মানুষ। তিরিশ বছর ধরে এখানেই কাজ করছে। সত্যি গো! ভারি অবাক হবে মেয়ে। আমার উনুন তো ধরিয়ে

দিয়েছি, এতক্ষণে আঁচ উঠেছে...তা ছাড়া অনরিনা একটু যোগান দিলেই হয়ে যাবে'খন।

অনরিনা বিশ বছরের মেয়ে। একেবারে ছেলেবেলায় ও এ পরিবারে ঠাঁই পায়, এইখানেই ওর লালন-পালন হয়। এখন ঝি-গিরি করে। এই দুজন ছাড়া আর একজন বাড়তি লোক আছে। সে গাড়োয়ান ফ্রাঁসোয়া। তার যথেষ্ট কাজ। মালী আর তার বৌ বাগানের তদারক করে। শাকসব্জি, ফুল, মুরগী—সবকিছুই তাদের হাতে। পিতৃশাসিত বাড়ি, তাই এরা এক সঙ্গে মিলেমিশে থাকে।

গ্রিগোয়ের-গিন্নী বিছানায় শুয়ে শুয়েই ভেবে রেখেছিলেন পিঠে খাইয়ে মেয়েকে তাজ্জব করে দেবেন। তিনি ময়দা মাখা, লেচি করা, তুন্দুরে দেওয়া অবধি ঠায় বসে রইলেন। রান্নাঘরখানা বেশ বড়সড়ো। ভাঁর ঝক্ঝকে তক্তকে, আর সেখানে আছে সসপ্যান, হাঁড়িকুঁড়ি, বাসন-কোসনের ডাঁই—এক অস্ত্রাগারও বলা যায়। এটিকে বাড়ির মধ্যে একটি সেরা ঘর বলা যায়। রান্না-ঘর দেখেই মনে হয়, এ-বাড়িতে বেশ তরিবত করে খাওয়া হয়। আলমারি আর তাক তো খাবারে সব সময়েই ভরতি থাকে।

গ্রিগোয়ের-গিন্নী এবার খাবার ঘরে এসে ঢুকলেন। যাবার সময় বার বার বলে গেলেন, দেখো যেন সোনা হেন রং হয়!

সমস্ত বাড়িখানায় তাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য অগ্নিকুণ্ডের ব্যবস্থা আছে, তবু এ ঘরখানায় আর-একটা কুণ্ড জ্বালানো। তা ছাড়া সাধারণ আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো। একখানা খাবার টেবিল—ক'খানা চেয়ার। একটা তাক—এই-ই সব। তবে সবগুলিই মেহগনি কাঠে তৈরি। দুখানা মস্ত আরাম কেদারাও আছে। দেখলে মনে হয়, আয়েসের প্রতি এবাড়ির অনুরাগ আছে—এঁরা হজমের জন্য কয়েক ঘণ্টা কাবার করে দিতেও পেছপা নন। বসবার ঘর এঁরা কখনো ব্যবহার করেন না। এখানেই নিত্যকার পারিবারিক মজলিস বসে।

এবার ঘরে এসে ঢুকলেন মঁসিয়ে গ্রিগোয়ের। গায়ে তাঁর মোটা টুইলের জামা, স্বাস্থ্যবান, লালচে আভা ফুটে উঠেছে মুখে—ষাট বছর বয়েস বলে মনেই হয় না। বেশ ভাল মানুষ চেহারা, মাথায় বরফের মতো সাদা কোঁকড়ানো চুল।

গাড়োয়ান আর মালীর সঙ্গে দেখা করে এলেন। না, ক্ষতি তেমন হয়নি। একটা চিমনি পড়ে ভেঙে গেছে। প্রতিদিনই তিনি লা পিয়োলে'র চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখেন—সরজমিনে তদন্ত করে বেড়ান। এমন বড় ব্যাপার নয় যে দেখা যাবে না, উদ্বেগের কারণ হবে। এমনি করেই তিনি মালিকানার আত্ম-প্রসাদটুকু অনুভব করেন।

এসেই শুধালেন, সিসিল কোথায়? এখনো ওঠেনি?

কি জানি, গিন্নী জবাব দিলেন, বোধ হয় উঠেছে...কার পায়ের শব্দ যেন পেলাম।

টেবিল সাজানো হ'ল। সাদা টেবিল-ঢাকনার উপর রাখা হ'ল তিনটে বড় বড় পাত্র। অনরাইনকে এবার পাঠানো হ'ল দেখতে মেয়ে কি করছে। ও চলে গেল আর ছুটে চলে এল। হাসি চাপতে পারছে না,—যেন এখনো দোতলায় বাড়ির দিদিমণির শোবার ঘরে সে রয়েছে—অনেক কষ্টে ফিস ফিস করে বললে,—

উঃ, আপনারা যদি দেখতে গো—উনি যেন এই এমনি করে ঘুমুচ্ছে গো—ঠিক যেন যীশু! ভাবতেই পারবে না। উঃ, দেখে কি ভালই লাগল!

মা আর বাবা এ ও'র মুখের দিকে তাকালেন। চোখে বাৎসল্যের মেদুর দৃষ্টি।

কি—উপরে যাবে নাকি? কর্তা হাসলেন।

আহা! গিন্নী অস্ফুটস্বরে বললেন, যাব বইকি!

দু'জনেই চলে গেলেন উপরে। বাড়ির মধ্যে এই ঘরখানাই সাজানো, গোছানো। এখানে বিলাসী আবহাওয়া। পর্দাগুলি নীল রেশমের—আসবাবপত্রে সোনালী বার্নিশ, তার উপরে নীল কারুকার্য। আদুরে খুকির এ এক খেয়াল। বাপ-মাও সে খেয়াল পরিতৃপ্ত করেছেন। সরানো পর্দার ভিতর দিয়ে আধো আলো এসে পড়েছে—তাতে অস্পষ্ট শুভ্রতায় বিছিয়ে আছে বিছানা। মেয়েটি তার নগ্ন বাহুর উপর গাল রেখে ঘুমে বিভোর। সুশ্রী সে নয়—একটু বেশি স্বাস্থ্যবতী, একটু বেশি জোয়ান—আঠারো বছরের পক্ষে বেশি বাড়ন্ত—বুঝি বা বেমানান। কিন্তু রং তার দুধের মতো সাদা, কালো চুল, গোলগাল মুখখানা—আর দুই গালের ভিতর দিয়ে উঁকি মারছে খুদে নাকখানা। ঐ নাকও সোজা নয়, কেমন যেন বাঁকা, অবাধ্যতার নিশানা। গায়ের চাদরখানা খসে পড়েছে, আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস নিচ্ছে মেয়ে—তাই তার সুগঠিত স্তনের ওঠা-পড়া বোঝা যায় না।

মা ফিস ফিসিয়ে বললেন, কাল যা ঝড় গেছে, ও হয়তো রাতে ঘুমুতেই পারেনি।

বাপ ইশারায় চুপ করতে বললেন। দুজনেই ঝুঁকে পড়ে মেয়ের দিকে সস্নেহ দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছেন। বহু বছর ধরে কামনা করে ওকে তাঁরা পেয়েছেন বুড়ো বয়সে। তখন তো সন্তান হবার আশাই তাঁরা ছেড়ে দিয়েছিলেন। কুমারীর নগ্নতায় সে শুয়ে আছে—ও'দের কাছে সে সৌন্দর্যের চরম উৎকর্ষ। বেশি মোটা সে নয়, তাকে ও'রা জোর করেও বেশি খাওয়াতে পারেন না এই তাঁদের দুঃখ। সে ঘুমুচ্ছে অঘোরে। জানে না বাবা-মা তার এত কাছে—তাঁদের মুখের ছোঁয়া লাগছে তার মুখে। হঠাৎ কাঁপন উঠল ঢেউয়ের মতো। নিঃসাড় দেহে বয়ে গেল মৃদু ঢেউ। ও যদি জেগে ওঠে, এই ভয়ে ও'রা পা টিপে টিপে চলে এলেন।

দরজার কাছে এসে ঘ'সিয়ে ফিসফিসিয়ে বললেন, স্ স্ স্! কাল রাতে হয়তো ওর ঘুম হয়নি, ওকে এখন আমাদের ঘুমোতে দেওয়াই উচিত।

মাদাম রাজি—আহা বাছা যতক্ষণ খুশি ঘুমোক না। আমাদের তর্ সইবে গো সইবে।

নীচে এসে খাবার ঘরের মস্ত চেয়ার দুখানায় বসে পড়লেন। ঝি দিদিমণির ঘুম দেখে অবাক হয়েছিল বটে, কিন্তু সেও তার খাবার গরম করতে লেগে গেল।

কর্তা একখানা খবরের কাগজ নিয়ে বসলেন, আর গিন্নী বসলেন পশমের চাদর বুনতে। গরম লাগছে, বাড়িখানা এখন নিঝুম।

গ্রিগোয়েরদের আয় বছরে চল্লিশ হাজার ফ্রাঁ। সব টাকাটাই ম'তসুর খনিতে

খাটছে। ও'রা লোকের কাছে খনির ইতিহাস বলতে ভালবাসেন। সে তো কোম্পানির আদি ইতিহাস।

গত শতকের শুরুতে লিল্ আর ভালেসিংয়েনের মাটিতে পাগলের মতো কয়লার স্তরের খোঁজ পড়ে গিয়েছিল। যারা প্রথমে সফল হয়েছিল, তারাই আঁজি কোম্পানি গড়ে তোলে। তাদের দেখে অন্য সবার মাথা ঘুরে যায়। প্রতি জায়গার মাটি পরীক্ষা করা হ'ল, কোম্পানির পর কোম্পানি গড়ে উঠল— খনির পর খনি প্রতি দিন আবিষ্কার হতে লাগল। এই যে অক্লান্ত যোদ্ধার দল, এ'দের মধ্যে বুদ্ধি আর কর্মশক্তিতে সবচেয়ে বিচক্ষণ ছিলেন ব্যারন দেরুমো। তিনি বাধার সংগে চল্লিশ বছর ধরে লড়াই চালিয়ে ছিলেন। প্রথমে তো তাঁর কত প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়ে যায়। নতুন নতুন পিট মাসের পর মাস কাজ করবার পর পরিত্যক্ত হয়। খোঁড়া মাটি ধস নেমে বুজে যায়—হঠাৎ জলের তোড়ে ডুবে মরে মজুররা। এমনি করে লাখে লাখে টাকা তিনি এই তল্লাটের মাটিতে ঢালেন। শুধু যে জন খাটাবার ঝামেলাই ছিল তা নয়; বখরাদারদের ত্রাসও ঠেকাতে হোত—আবার স্থানীয় জমিদারদের সংগেও চলত লাঠালাঠি— তাদের সংগে আগে বোঝাপড়া করে না নিলে রাজার মঞ্জুরি তারা স্বীকার করতে চাইত না। অবশেষে তিনি দেরেমো-কাকেমো য়্যান্ড কোম্পানি গড়ে তুললনে মঁতসুর কয়লা খনির কাজ চালাবার জন্যে, খনিতে সামান্য লাভও হতে লাগল। এদিকে পাশাপাশি আর দুটো খনি—কর্গনি আর জয়সেলও গলা-কাটা প্রতিযোগিতা শুরু করে দিলে। কর্গনির মালিক তখন কাউন্ট কর্গনি—আর জয়সেল কর্নিল আর জার্সাদ্যাদের হাতে। সবকিছু চুরমার করে দেবার জন্যেই এই পাল্লা শুরু হয়ে গেল। যাক বরাত ভাল, ১৭৬০ সালের ২৫শে আগস্ট তিনটি খনির মধ্যে একটা আপোস হয়ে গেল—তারা এবার একত্র হয়ে গেল। গড়ে উঠল মঁতসু মাইনিং কোম্পানি—এখনো সেই প্রতিষ্ঠানটিই বজায় আছে। শেয়ার বিলির জন্যে সমস্ত সম্পত্তি তখনকার অর্থনীতিক ব্যবস্থা অনুসারে ভাগ করা হ'ল। ফি-শেয়ারে ২৪ সু ধার্য হ'ল, আবার সেগুলি ভাগ করা হ'ল বারো দিনেয়ারে—সব সমেত দু' হাজার অষ্টাশী দিনেয়ার হ'ল আমানতি মূলধন। দিনেয়ারের মূল্য তখন দশ হাজার ফ্রাঁ—তাই মূলধনও দাঁড়াল ষাট লক্ষ টাকা। দেরুমো তখন মৃত্যুশয্যায়। কিন্তু তিনি হলেন বিজয়ী। তিনি তাঁর লভ্যাংশ পেলেন ছয় সু আর তিন দিনেয়ার।

এই ব্যারন দেরুমো ছিলেন লা পিয়োলে'র মালিক—তিনশো হেক্টেয়ার জমি-জমাও ছিল তাঁর। তার এসবের দেখাশুনা করত অনরে গ্রিগোয়ের বলে পিকের্দি অঞ্চলের একটি লোক। সেই আমাদের সিসিলির বাবা লিওঁ গ্রিগোয়ের বৃদ্ধ-প্রপিতামহ। যখন মঁতসু কোম্পানি গড়ে ওঠে অনরের কাছে তখন প্রায় পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ পুঁজি—সে সেটা একটা মোজার ভিতরে লুকিয়ে রেখেছিল। সে তখন মনিবের উপর বিশ্বাস করেই তার থেকে দশ হাজার টাকা বার করে দিয়ে এক দিনেয়ারের শেয়ার কিনে ফেলে। তার তখন ভয়, হয়তো টাকা ক'টা হারিয়ে যাবে, ছেলেপুলে'দের সে বঞ্চিত করবে। এটা ঠিক কথা যে, তার ছেলে ইউজিনি তেমন লভ্যাংশ পায়নি; সে তখন ভদ্রলোক হয়ে বসে সেই পৈতৃক ওয়ারিশান হিসাবে পাওয়া চল্লিশ হাজার টাকা একটা বখরাদারি ব্যবসায় হারায়। কিন্তু শেয়ারের সুদ তখন আস্তে আস্তে চড়ছে; তাই পরিবারের বরাত ফিরল

ফেলিসিঁয়ের আমল থেকে। তার ঠাকুর্দা যে স্বপ্ন দেখতেন, সে-স্বপ্ন সে সার্থক করল। লা পিয়োলেঁ যখন সরকারের সম্পত্তি হিসেবে টুকরো-টাকরা হয়ে লাটে চড়ল, তখন সে তা জলের দরে কিনে নিলে। কিন্তু কয়েক বছর বড় মন্দা গেল। এর মধ্যে বিপ্লবের ঝড় বয়ে গেল, তারপরে এল রক্তস্রোতে নেপলিয়নের পতন। লিওঁ গ্রিগোয়ের প্রপিতামহের এই সামান্য টাকা থেকে যে প্রচুর লাভ হ'ল, তার অধিকারী হ'লেন। সেই দশটা হাজার টাকা বেড়ে বেড়ে চলল কোম্পানির বাড়-বাড়ন্তের সঙ্গে সঙ্গে। ১৮২০ সালে তার থেকে শতকরা একশো টাকা মুনাফা হ'ল—টাকা বেড়ে গিয়ে দাঁড়াল আরো দশ হাজার। ১৮৪৫ সালে তো বিশ হাজার; আর ৫০ সালে চল্লিশ হাজার। শেষ দুবছর তো লভ্যাংশের অঙ্ক দেখে মাথা ঘুরে গেল। একেবারে পঞ্চাশ হাজার টাকা। তার মানে একশো বছরের মধ্যে দিনেয়ারের দর লিল্-এর শেয়ার বাজারে বিশ লাখ টাকা দাঁড়িয়ে গেল। দশ হাজার ফ্রাঁর একশো গুণ মুনাফা হ'ল।

বিশ লাখে যখন দর উঠল, মঁসিয়ে গ্রিগোয়েরকে সবাই পরামর্শ দিলে, এবার তিনি বিক্রি করে ফেলুন। বিজ্ঞের হাসি হেসে মঁসিয়ে গ্রিগোয়ের রাজি হলেন না। ছ' মাস পরে দেশে এল শিল্পসংকট—দিনেয়ারের দর কমে কমে দাঁড়াল ছ' লাখে। কিন্তু তবু তাঁর মুখে হাসি, খেদ নেই। তার কারণ —গ্রিগোয়েরদের খনির প্রতি গভীর আস্থা। আবার দর উঠবে। কেন? ভগবানই কি কখনো একরকম থাকেন! ওঠা-পড়া তো আছেই। এই ধর্মভাবের সঙ্গে রইল কৃতজ্ঞতা। ভাগ্যিস খনিতে টাকা খাটিয়েছিলেন বলে তো পায়ের ওপর পা রেখে গোটা পরিবারটা একশো বছর ধরে কিছু না করে খেয়ে-পরে রইল! এ তো টাকা-খাটানো শেয়ার নয়—শেয়ার তাদের বাস্তুদেবতা। তাঁদের আত্মপ্রসাদে বাস্তুদেবতাকে তারা নিজেদের পরিবারের মঙ্গলদাত্রী বলে পূজা করছে—তিনিই তো ওদের অলস শয্যায় দোলা দিচ্ছেন, টেবিল ভরতি খাবার তিনিই যোগাচ্ছেন, তাদের মেদস্ফীত করে চলেছেন। বাপ থেকে ছেলে এই শেয়ার পাচ্ছে—পাচ্ছে বাস্তুদেবীর প্রসাদ। কি দরকার সন্দেহ করে—এতে হয়তো রুষ্ট হবেন ভাগ্যবিধাত্রী? এই অন্ধ বিশ্বাসের আড়ালে রয়েছে তাদের এক কুসংস্কার—এক ভীতি—তাদের লাখে লাখে টাকা হয় তো শেয়ার বেচে দিয়ে ঘরে আনলে মিলিয়ে যেতে পারে। হয়তো দেরাজ থেকেই উবে যাবে। তার চেয়ে ও টাকা মাটির নীচে থাকুক। মজুরের জাত—উপোসী মানুষের দল, ঐ টাকা ওদের জন্যে খনির গর্ভ থেকে একটু একটু করে খুঁড়ে খুঁড়ে বার করুক। দিনের পর দিন এমনি করে কাটুক—ওদের যতটুকু দরকার ততটুকু ওরা খুঁড়ুক—খুঁড়ে এনে দিক।

এ ছাড়া বাড়িটিতে অঢেল সুখ। মঁসিয়ে গ্রিগোয়েরের যখন বেশ কম বয়েস, তখন তিনি মার্সিয়েনের এক নিঃসম্বল কেমিস্টের মেয়েকে বিয়ে করেন। তিনি তাঁকে বড় ভালবাসতেন। স্ত্রীও তাঁকে প্রতিদানে সুখী করেছিলেন। তিনি সব সময়ে ঘর-গৃহস্থালী নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, স্বামীকে ভালবাসতেন। স্বামীর ইচ্ছে ছাড়া তাঁর কোন ইচ্ছেই ছিল না। কখনো দুজনের রুচিরও তারতম্য হয়নি। তাঁদের আকাঙ্ক্ষা একই খাতে বয়ে গিয়ে একই মোহানায় মিশেছে—তাঁদের আদর্শ এক—সুখের ঘরকন্না। এই সুনিয়ন্ত্রিত স্নেহমায়াময় জীবন চল্লিশ বছর ধরে চলেছে—ছোট ছোট ভালবাসার দানে প্রতিদানে ভরে

উঠেছে। চল্লিশ হাজার টাকা নিরুদ্বেগে ব্যয় হয়েছে, বেড়েছে পুঁজি। সিসিলির জন্ম অবশ্য এর মধ্যে তাঁদের আয়ব্যয়ের হিসেবে ক্ষণিকের ব্যাঘাত ঘটিয়েছিল। বিবাহিত জীবনের শেষ দিকেই তার জন্ম। কিন্তু তবু তাঁরা নিজেদের পুঁজি অকাতরে তার জন্যে ঢেলে দিচ্ছেন—তার সব খেয়াল-খুশি মেটাচ্ছেন। দু' নম্বর ঘোড়া আমদানি হয়েছে তার জন্যে—দুখানা এসেছে গাড়ি—আর প্যারী থেকে পোষাক-আষাক। যেন মেয়েকে সাজিয়ে-গুজিয়ে দিয়ে-থুয়ে মন ওঠে না। এই যে ব্যয়—এতে আনন্দও যথেষ্ট। কিন্তু নিজেরা জাঁকজমক ঘৃণা করেন—তাঁরা সেই যৌবনের কামনাই আঁকড়ে ধরে আছেন। বাজে ব্যয় তাঁদের কাছে নির্বুদ্ধিতা।

দরজা খুলে গেল দড়াম করে, চীৎকার ভেসে এল—

কি? কি হচ্ছে? আমাকে ছাড়াই হাজরিতে বসে গেছ!

সিসিলি সোজা বিছানা থেকে চলে এসেছে। এখনো ঘুমে ঢুলু ঢুলু দুটি চোখ। চুলটা কোনরকমে জড়িয়ে এসেছে, পরনে একটা পশমী সাদা ড্রেসিং গাউন।

না গো না, মা বললেন, চেয়ে দেখ—তোমার জন্যে ঠায় বসে আছি। বাছা, কাল বুঝি ঝড়ের জন্যে জেগেই কাটিয়েছ?

মেয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

তাই নাকি—ঝড় উঠেছিল নাকি? আমি তো জানি না। সারা রাত একবারও জাগিনি।

ওঁদের হাসি পেল। তিনজনেই হেসে উঠল। ঝি দুজন ছোট হাজরি আনছিল, তারাও বাদ পড়ল না। সবাই হাসছে—দেখ, মেয়ে কি ঘুম ঘুমিয়েছে—ঘড়ির কাঁটা একবার পুরোপুরি ঘুরে এল—তবে উঠল। পিঠে দেখে আবার মুখে খুশী উছলে পড়ল।

সে কি! এইমাত্র ভাজা হ'ল নাকি? সিসিলি বললে। উঃ—আমাকে তো তাক্ লাগিয়ে দিলে তোমরা! চকোলেটে চুবিয়ে খেতে কি মজা!

এবার সবাই খেতে বসলেন। পাত্রে রয়েছে চকোলেট—ধোঁয়া উঠছে—পিঠে নিয়েই আলাপ চলতে লাগল। মেল্যাঁ, আর অনরাইন ঘরেই আছে। কেমন করে পিঠে তৈরি হয় তারই ব্যাখ্যান করছে। আর গোগ্রাসে গিলছেন মনিব-মনিবানী আর তাঁদের মেয়ে। ঠোঁট তো তেলালো হয়ে উঠল। মনিব-মনিবানী—দিদিমণির যদি ভাল লাগে তাতেই ওদের সুখ।

কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল। বুঝি পিয়ানোর মাস্টারনী এল। ফি-সোম-বার শুক্রবারে সে মার্সিয়েনে থেকে শেখাতে আসে। সাহিত্য পড়াবার জন্যে একজন অধ্যাপকও আসেন। লা পিয়োলে'তে বসে এমনি করে সিসিলির পড়াশুনো চলছে। যেমন খুশি তেমনি পড়ে, খেয়ালে চলে মেয়ে। যখন কোন একটা বিষয় কিছুতেই মাথায় ঢোকে না, জানালা গলিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় বই।

অনরাইন এসে বললে, মঁসিয়ে দেনুউলিং।

দেনেউলিং গ্রিগোয়েরের সম্পর্কিত ভাই। তিনি ঝির পেছনে এসেই ঘরে ঢুকলেন। অতো ভদ্রতার বালাই তাঁর নেই। জোরাল তাঁর স্বর, চলনে চটপটে, এলেন যেন অবসরপ্রাপ্ত ঘোড়সওয়ার ফৌজের সেনাপতি। পঞ্চাশ পার হয়ে

গেছে বয়েস, কিন্তু এখনো মিহিন ছাঁট চুলে আর পুরন্ত গোঁফ একেবারে কালির মতো কালো।

হাঁ, এই এলাম আর কি! তারপর নমস্কার! তারপর তোমাদের অসুবিধে করলাম না তো!

সোরগোল পড়ে গেল। তিনি এবার বসে পড়লেন। চকোলেট-পর্ব আবার শুরু হয়ে গেল।

কি—কোন দরকার আছে? মঁসিয়ে গ্রিগোয়ের শুধালেন।

না, না, কোন দরকার নেই। দেনেউলিঁ তাড়াতাড়ি জবাব দিলেন। বুড়ো হাড়ে একটু হাওয়া লাগতে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়েছিলাম। তোমাদের ফটকের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ভাবলাম—যাই—একবার দেখা করে যাই।

সিসিলি তাঁর দুটি মেয়ে জাঁ আর লুসির খবর নিলে। তারা ভালই আছে। জাঁ মেয়েটা তো ছবি-পাগলী, আর বড় মেয়ে লুসি তো সকাল থেকে সন্ধ্যে খালি পিয়ানো বাজিয়ে গান শিখছে। তিনি সহজভাবেই কথা বলছেন—তবু যেন স্বর তাঁর কেঁপে কেঁপেই উঠছে—তিনি হাসি-তামাশা দিয়ে ঢেকে রাখতে চাইছেন উদ্বেগ।

মঁসিয়ে গ্রিগোয়ের শুধালেন—কি খনির খবর ভাল তো?

দেখ—সত্যি বলতে কি, এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি একটু ভাবনায় পড়ে গেছি। ভাল দিনকাল ছিল তখন আমাদের টাকা খেটেছে। পয়সা পেয়েছি। ওরা বহু কারখানা তৈরি করেছে। বহু রেল সড়ক বসিয়েছে—বহু পুঁজি খরচ করে আরো মুনাফার বন্দোবস্ত হয়েছে। কিন্তু আজ টাকা নেই। খনি চালু রাখবার মতো টাকাও নেই।...তবু বরাত ভাল বলতে হবে—এখনো তেমন হাল হয়নি। ধকল সামলে ওঠা যাবে বোধ হয়।

তাঁর এই ভাইয়ের মতো তিনিও মঁতসু খনির মোটা শেয়ারের অধিকারী, কিন্তু নিজে একজন দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার, তার উপরে ধনী হবার আকাঙ্ক্ষাও তাঁর যথেষ্ট—তাই দিনেয়ারের দাম বিশ লাখ টাকায় পেঁছতেই তিনি তাড়াতাড়ি সব বেচে দিয়েছেন। ক'মাস ধরেই মনে মনে এই ফন্দি ভাঁজছিলেন। তাঁর স্ত্রী তাঁর এক খুড়োর কাছ থেকে ভান্দামের খনিটা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন—সেখানে দুটো পিটে মাত্র কাজ চলছে—তাদেরও আবার ভাঙাচোরা দশা। যন্ত্রপাতিগুলোও একেবারে বিকল—যা কয়লা ওঠে তাতে খনি চালু রাখার খরচ চলে না। তাঁর স্বপ্ন ছিল ঐ পিট দুটি মেরামত করে নেবেন, কলকব্জা হবে হাল আমলের—খাঁচার মুখ বড় হবে—দলে ভারি হয়ে নামবে মজুরেরা। মুঠো মুঠো সোনা উঠে আসবে। ফন্দিটা ছিল ভালই—তাঁর সমস্ত টাকা তিনি এই ব্যাপারে ঢেলে বসে ছিলেন। বিরাট মুনাফা হবার আশাও তখন যথেষ্ট—নিজের প্রতি বিশ্বাস বাড়ছে—এমন সময় এই শিল্পসংকটের হুমকি এসে দেখা দিলে। সব তছনছ করে দিয়ে গেল। তা ছাড়া তত্ত্বাবধানকারী হিসেবেও তিনি চৌকোস নন। মজুরদের উপর কেমন যেন সদয়। কড়া হুমকির ভিতর দিয়ে একটু-দরদ উঁকিঝুঁকি মারে। স্ত্রী মারা যাবার পর থেকে আবার কেমন যেন হয়ে গেছেন। তাঁর নিজের লোকেরা লুটেপুটে নেয়—তিনি দেখেও দেখেন না। মেয়েদেরও রাশ ঢিলে করে ছেড়ে দিয়েছেন। বড়টি তো থিয়েটারে নামবে বলছে, আর ছোটটির তিন-তিনখানা দৃশ্যচিত্র নামঞ্জুর হয়ে সাঁলো (চিত্র-

প্রদর্শনীর স্থান) থেকে ফিরে এসেছে। মেয়ে দুটি কিন্তু হাসিমুখে এই সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, দারিদ্র্যের হুমকি যত বাড়ছে, তত দেখা যাচ্ছে তারা পাকা গৃহিণী।

তিনি একটু ইতস্তত করে বললেন, দেখ লিওঁ, আমি যখন বেচলাম, তখন না বেচে ভুল করেছ। এখন তো দর একেবারে নেমে গেছে। বিশ্বাস করে যদি আমার হাতে টাকাগুলো দিতে—দেখতে ভান্দামে আমি কি করতাম!

মঁসিয়ে গ্রিগোয়ের চকোলেট পান শেষ করলেন। তাড়া নেই। মৃদুস্বরে জবাব দিলেন, না, তা কখনো হবে না। তুমি তো জান, আমি ফাট্‌কা খেলিনে। আমি চাই শান্তি। ব্যবসার উদ্বেগ নিয়ে মাথা ঘামাতে আমি রাজি নই। দেখ—মঁতসু খনির শেয়ারের দর আরো নামতে পারে, কিন্তু আমাদের যা দরকার তা ঐ নামতি শেয়ারের মুনাফায়ও চলে যাবে। অতো লোভ ভাল নয়! আমার কথা শোন, একদিন এর জন্যে তুমিই হাহুতাশ করবে। দর বেড়ে যাবেই। সিসিলির ছেলেমেয়েদের তখনো ঐ শেয়ার থেকেই রুজি চলবে।

দেনেউলিঁ একটু অপ্রতিভের হাসি হাসলেন।

আমি যদি তোমাকে আমার খনিতে লাখখানেক ফ্রাঁ ঢালতে বলি—তুমি বোধ হয় রাজি হবে না?

গ্রিগোয়েরের মুখে ভীতির ছায়া দেখে তাঁর মনে হ'ল, অতো তাড়াহুড়ো করে ভাল করেননি। যাহোক, ধার চাইতে এসেছিলেন, কিন্তু সেটা মুলতবী রইল, অবস্থা যখন আরো কাহিল হবে, তখন শেষ চেষ্টা করে দেখবেন।

না, না, আমি তোমাকে টাকা ঢালতে বলছি না! ঠাট্টা করছিলাম...তুমিই বোধ হয় ঠিক বলেছ... অন্যে মেহনত করে যে টাকা যোগায়, তা থেকে মোটা-সোটা হওয়াই তো ভাল।

ওঁরা এবার বিষয়ান্তরে এলেন। সিসিলি আবার তার বোনেদের কথা পাড়ল। ওদের হাল-চাল তার কাছে অদ্ভুত লাগে—অদ্ভুত হলেও কৌতূহল জাগায়। মাদাম গ্রিগোয়ের কথা দিলেন, যেদিন রোদ উঠবে, তিনি মেয়েকে নিয়ে বাছাদের দেখতে যাবেন।

মঁসিয়ে গ্রিগোয়েরের কথাবার্তায় কান নেই—তিনি যেন স্বপ্নে বিভোর। হঠাৎ বলে উঠলেন—

আমি যদি হতাম ঐ নড়বড়ে খনিটা নিয়ে পড়ে থাকতাম না। আবার মঁতসুতেই ফিরে আসতাম। এখানেও টাকার দরকার। আর টাকা ঢাললে, এখানে আবার টাকা পাওয়া যাবে।

মঁতসু আর ভান্দামের ভিতরে সেই পুরোনো রেষারেষির কথা পেড়ে বসলেন মঁসিয়ে গ্রিগোয়ের। ভান্দাম খনি ছোট বটে, কিন্তু মঁতসুর মালিকেরা সাতষট্টিটা কুলি-ধাওড়ার মাঝখানে ঐ ছোট্ট খনিটাকে কোন দিনই বরদাস্ত করতে পারেননি। ওটার কাজ বন্ধ করে দেবার কত চেষ্টা করেছেন, কিন্তু পারেননি। এবার ওটা একেবারে প্রায় মাগ্‌না কেনার ফিকিরে আছেন। খনিটায় অবস্থা তো এখন শোচনীয়। লড়াই চলছে, আপোস নেই, যুক্তি নেই। প্রতি কোম্পানির গ্যালারি এসে দুশো গজের মধ্যে থেমে আছে; শেষ রক্তবিন্দু

থাকা পর্যন্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধ যেন। যদিও বাইরে দুই কোম্পানির ম্যানেজার আর ডিরেক্টরদের সঙ্গে হৃদ্যতা বজায় আছে।

দেনেউলি'র চোখ দুটো জ্বলে উঠল,

কখনো না। এবার চীৎকারের পালা তাঁর। আমি যতদিন বেঁচে আছি, মঁতসু ভান্দামের খনি কিনতে পাবে না...বিষ্যুদবারে হানাবুদের ওখানে রাতে নেমন্তন্ন ছিল। মনে হ'ল লোকটা আমারই চারপাশে সারাক্ষণ ঘুর ঘুর করছিল। গত হেমন্তে হোমরা চোমরা উপরওয়ালারা সদর অফিসে এসে আমাকে কত সাধ্য সাধনা করলে। হুঁ, আমি ঐ জমিদার আর জাঁদরেল সেনাপতিদের চিনি—মন্ত্রীদেরও আমার চিনতে বাকি নেই।—যতসব বদমায়েসের ধাড়ী—ওরা সুবিধে পেলে তোমার পরনের জামা অবধি খসিয়ে নিতে পারে!

থামলেন না, বলেই চললেন। তাছাড়া মঁসিয়ে গ্রিগোয়েরও মঁতসু কোম্পানির ডিরেক্টরদের পক্ষ সমর্থন করলেন না। ১৭৬০ সালের চুক্তি অনুসারে ছ'জন ডিরেক্টর নিয়ে এক বোর্ড গড়া হয়। তাঁরা কোম্পানিকে যেন লোহার ডান্ডার হুমকি দেখিয়ে তাঁবে রেখেছিলেন। ডিরেক্টরদের একজন মারা যেতে পাঁচজন ডিরেক্টার একজন প্রতিপত্তিশালী শেয়ার হোল্ডারকে সেই পদে বেছে নিলেন। লা পিয়োলে'র মালিক বুঝদার মানুষ। তাঁর মতে এই ভদ্রলোকদের টাকার লোভ কখনো কখনো সীমা ছাড়িয়ে যায় বইকি!

মেল্যাঁ টেবিল সাফ করতে এল। কুকুরগুলো আবার বাইরে ঘেউ ঘেউ করে উঠল, অনরাইন দরজা খুলতে গেল। সিসিলির পেট ভরতি, গরম তার শরীর—সে টেবিল থেকে উঠে পড়ল।

ও কেউ নয়। বোধহয় আমার মাস্টার এল।

দেনেউলি' উঠে পড়লেন। সিসিলি চলে যাচ্ছে। তার দিকে তাকিয়ে হেসে বলে উঠলেন,

তারপর নিগ্রেলের সঙ্গে ওর বিয়ের কদ্দুর?

এখনো কিছুই হয়নি, গ্রিগোয়ের-গিন্নী বললেন। একটা কথা উঠেছে মাত্র! অনেক ভেবেচিন্তে দেখতে হবে।

তিনি হেসে বললেন, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! আমার তো মনে হয় ভাইপো আর পিসি দুজনেই—কিন্তু একটা কথা বুঝিনে, হানাবু-গিন্নী একেবারে শেষে আমাদের সিসিলিকেই আঁকড়ে ধরলেন!

মঁসিয়ে গ্রিগোয়ের রেগে গেলেন। অমন একজন ভদ্রমহিলা—তার উপরে ছোকরার চেয়ে চোদ্দ বছরের বড়। কী সাংঘাতিক কথা! এই নিয়ে কেউ ঠাট্টা-তামাশা করে নাকি! দেনেউলি' এখনো হাসছেন। তিনি করমর্দন পর্ব সেরে এবার বিদায় নিলেন।

সিসিলি ফিরে এসে জানালে, না, এখনো আসেনি। একটি মেয়েমানুষ, দুটি বাচ্চা নিয়ে এসেছে। সেই যে সেদিন যে মজুরের বৌ-এর সঙ্গে আমাদের দেখা হ'ল—সে এসেছে! ওরা এখানে আসবে?

একটু দ্বিধা। ওরা কি খুব ময়লা কাপড়-চোপড় পরে এসেছে নাকি? না—তেমন নয়। তাছাড়া কাঠের গোড়াতোলা জুতো বাইরে ছেড়ে আসবে। এরই মধ্যে বাবা-মা আরাম কেদারার গভীরে গা ঢেলে দিলেন। ওখানে শুয়ে শুয়ে

তাঁরা খাবার হজম করছেন। পরিবেশ বদলে যাবে, এই কথা ভেবেই তাঁরা শংকিত। একটু বা মনস্থির করে নিলেন।

অনরাইন, ওদের নিয়ে এস!

এবার ঘরে ঢুকল মেয়ু-গিন্নী আর তার বাচ্চারা, ওরা শীতে শিটিয়ে গেছে, ক্ষুধায় ওরা পাগল, আর আছে ত্রাস। এমন উষ্ণ কক্ষে, যেখানে ভাজা পিঠের গন্ধ ম-ম করছে, সেখানে ঢুকে ওরা ভয় পাবে বইকি!

দুই

উপরের শোবার ঘর এখনো বন্ধ। শার্সি-তোলা। ভোরাই আলো এসে পড়ছে ধূসর রেখায়—পাখার মতো ছড়িয়ে আছে। হাওয়া এখানে ঘন, ভারি; এখনো সবাই রাতের ঘুমে বিভোর। লেনোর আর আঁরি তেমনি জড়া-জড়ি করে শুয়ে আছে। আলঝির চিতিয়ে আছে, কুঁজটা এখন নীচে—মাথা পড়েছে এলিয়ে। বুড়ো দাদু বনেমোর এখন জাচারি আর জাঁলিনের বিছানার একচ্ছত্র মালিক—হাঁ করে নাক ডাকাচ্ছে। খুদে কামরাখানা থেকে টুঁ শব্দটি আসছে না। সেখানে মেয়ু-গিন্নী এস্তেলকে মাই দিতে দিতে আবার ঢুলে পড়েছে ঘুমে—মাইটা ঝুলে পড়েছে একদিকে, বাচ্চাটা তার তলপেটের উপর শুয়ে ঘুমে বেহুঁস হয়ে গেছে, মাই টেনে টেনে সে পরিতৃপ্ত, আবার মা'র নরম বুকের নরম মাংসের ভিতরে সে যেন ডুবে গেছে।

কুহু-ডাকা ঘড়িতে নীচে ছ'টা বাজল। পাশের বাড়ির দরজা খোলার দুম্‌দাম্‌ শব্দ। তারপরেই কাঠের গোড়তোলা জুতোর খটাখট আওয়াজ ফুটপাথে। যারা চালুনি দিয়ে মাটি ঝেড়ে গুঁড়ো কয়লা বার করে, সেইসব কামিনের এবার পালা এল। ওরাই চলেছে। সাতটা অবধি আবার সুনসান। আবার শার্সি তোলা হ'ল, হাই আর কাশির শব্দ দেয়ালের ভিতর দিয়ে ভেসে এল। কোথায় যেন কাফি পেষা যাঁতা জোড়া বহুক্ষণ ধরে ঘটর ঘটর করছে। কিন্তু এ-ঘরে তবু কারো জাগার লক্ষণ নেই।

হঠাৎ দূর থেকে ভেঁপু আর চীৎকারের শব্দ ভেসে এল। আলঝির উঠে বসেছে। ক'টা বেজেছে তার খেয়াল হ'ল। সে খালি পায়ে ছুটে গিয়ে মাকে ঝাঁকুনি দিলে।

মা, ওমা, বড্ড দেরি হয়ে গেছে। এবার উঠে পড়! আরে—এস্তেলকে দেখছি তুমি পিষে ফেলবে।

সে এস্তেলকে মা'র বিরাট মাইয়ের স্তূপের ভিতর থেকে তুলে নিলে।

পোড়া কপাল আমার! মেয়ু-গিন্নী চোখ রগড়ে জড়ানো স্বরে বলে উঠল, গতর এমন ভেঙে পড়েছে, মনে হয় সারাদিন এমনি ঘুমতে পারি। যা—তুই লেনোর আর আঁরিকে পোষাক-আষাক পরিয়ে দে—ওদের আমি সঙ্গে নিয়ে যাব। তুই এস্তেলকে রাখবি, আকাশের যা অবস্থা, তাতে ওকে টেনে নিয়ে গেলে ওর ঠাণ্ডা লাগবে।

কোনরকমে তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধোওয়া-পাখলা করে নিলে মেয়ুগিন্নী। একটা নীল স্কার্ট গলিয়ে নিলে। এইটেই ওর সব চেয়ে পরিষ্কার পোষাক।

তার উপরে চড়ালে ঢিলেঢালা ধূসর রঙের উলের একটা জামা। আগের দিন জামাটার দু'জায়গায় সেলাই করে রেখেছিল।

তারপরে সুরুয়ার কি হ'ল? আ আমার পোড়া কপাল! আবার গজর গজর করতে লাগল মেয়ু-গিন্নী।

মা তো সমস্ত তছনছ করে দিয়ে নীচে নেমে গেল। আলঝির এবার এস্তেলকে নিয়ে ফিরে এল শোবার কামরায়। বাচ্চাটা ট্যাঁ ট্যাঁ করে কান্না জুড়ে দিয়েছে; কিন্তু আলঝির ওর রাগ দেখে দেখে অভ্যস্ত। আট বছর বয়েসেই মেয়েদের বাচ্চা শান্ত করবার কৌশল তার জানা। সে আস্তে আস্তে তাকে নিজের বিছানায় শুইয়ে দিলে। এখনো গরম আছে বিছানা—তারপরে ঘুম পাড়াতে লাগল। এস্তেল ওর আঙুল চুষতে চুষতে পড়ল ঘুমিয়ে। বেলা হয়ে যাচ্ছে। আবার নতুন করে গোলমাল শুরু হয়ে গেছে। লেনোর আর আঁরির বেধেছে ঝগড়া। ওরা দুজনে এবার আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসেছে। দুজনে একেবারে বনিবনাও নেই—কখনো ঘুমের মধ্যে ছাড়া এ ওর গলা জড়িয়ে ধরে না। লেনোরের ছ'বছর বয়েস। ও ভোরে উঠেই ওর দু'বছরের ছোট আঁরির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আঁরি মার খায়, দেয় না। ওদের দু'জনেরই মাথা বড়—ওয়ারিশান হিসেবে পাওয়া। দেখে মনে হয় যেন ফুঁ দিয়ে ফাঁপিয়ে দিয়েছে কেউ। মাথায় আবার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া একরাশ হলদে চুল। আলঝির বোনকে ঠ্যাং ধরে টেনে নিয়ে এল, আর শাসালে চাবকিয়ে পাছার ছাল তুলে দেবে। মুখ ধোবার জায়গায় আবার এক তুলকালাম কাণ্ড। পোষাক পরাতে গিয়েও তাই। শার্সি এখনো খোলা—দাদু বনেমোরের ঘুম ভাঙাতে ওরা চায় না। ছেলেমেয়েদের এই হইচই-এর ভিতরে সে নাক ডাকাচ্ছে।

মেয়ু-গিন্নী এবার নীচ থেকে চেঁচিয়ে উঠল, কি—তৈরী তো?

খড়খড়ি সে খুলে দিয়েছে, উনুনের আগুন খুঁচিয়ে ধরিয়ে দিয়েছে, আরো দিয়েছে কয়লা। ভরসা ছিল, বুড়ো হয়তো সবটুকু সুরুয়াই গিলে ফেলেনি। কিন্তু এসে দেখা—সসপ্যান একেবারে চাঁছাপোঁছা। তাই একমুঠো সেমুই নিয়ে চাপিয়ে দিলে। তিন দিন ধরে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে এই ক'টা সে রেখেছিল। এই-ই কোনরকমে শুধু শুধু খেতে হবে। ঘরে মাখন নেই—কালকের মাখনের বোধ হয় চিহ্নও নেই। কিন্তু অবাক বনে গেল মেয়ু-গিন্নী। ক্যাথেরিন এমন এক আজব স্যান্ডউইচ বানিয়েছে, আর তারই বড় এক টুকরো রেখে গেছে। কিন্তু আলমারি এখন একেবারে শূন্য। এক টুকরো রুটি নেই, এক টুকরো মাংস নেই। মাইগ্রাত যদি ধার না দেয় তাহলে উপায় কি হবে? আর পিয়োলেঁরা যদি পাঁচ ফ্রাঁ না দিতে চায়? অথচ মরদরা আর মেয়েটা যখন পিট থেকে ফিরে আসবে, তাদের খেতে তো দিতে হবে। কেউ তো আর না খেয়ে থাকার হুনুর এখনো শেখেনি!

খেঁকিয়ে উঠল মেয়ু-গিন্নী, কি রে নাববি, না নাববি না? এখনি তো যেতে হবে!

আলঝির আর দুটি ছেলেমেয়ে এবার নীচে এল। সে তাদের সেমুই তিনটে থালায় ভাগ করে দিলে। নিজে নিলে না, বললে তার খিদে নেই। কালকের কফিতে জল ঢেলে কফি তৈরি করে গিয়েছিল ক্যাথি, মেয়ু-গিন্নী আবার তাতেই জল ঢেলে দিলে। দু' গেলাস কাফি তৈরি করে খেয়ে নিলে।

কাফির রং যা খোলতাই হ'ল, যেন খানিকটা ঘোলাটে জল। কিন্তু এতেই সে খানিকটা চাঙ্গা হবে।

আলঝিরকে এবার বললে, দেখ, বুড়ো দাদুর ঘুম ভাঙাস নে! আর দেখিস, এস্তেলের মাথাটা যেন না ঠুকে যায়। ও জেগে উঠে যদি ট্যাঁ ট্যাঁ করে, এইখানে চিনি রইল। একটু চিনির জল ক'রে চামচে দিয়ে মুখে দিয়ে দিবি। তুই তো ভাল মেয়ে, নিজে খেয়ে ফেলবি না!

মা—ইস্কুলে যাব না?

ইস্কুল? আর একদিন না হয় না-ই গেলি। আজকে তোকে যে দরকার!

সুরুয়ার কি হবে মা? তোমার যদি আসতে দেরি হয় আমি করে নেব?

সুরুয়া? দাঁড়া দেখি—না, আমি এলেই হবে'খন।

আলঝির বোঝে। সে আর উচ্চবাচ্য করলে না। সুরুয়া তৈরির কৌশল তার জানা। পঙ্গু শিশুর বুদ্ধিটা একটু পাকাই হয়, ওরও তাই। একটু যেন ইঁচড়ে পাকা বেশি। এরই মধ্যে গাঁখানা জেগে উঠেছে। দু-তিনজন করে ছেলেমেয়েরা চলেছে ইস্কুলে। জুতোর শব্দ উঠছে ঘস্ ঘস্। আটটা বাজল। বাঁদিকে সাভালদের বাড়ি থেকে গলার স্বর ভেসে আসে। ক্রমেই চড়ছে গলা। মেয়েদের দিন শুরু হ'ল; কফির পটের চারদিকে তারা গোল হয়ে বসেছে ঘরে ঘরে, হাত রেখেছে পাছায়, যাঁতার মতো ঘড়ঘড় করে ছুটছে জিভ্। চিমসে-পানা মুখ, পুরু ঠোঁট, থ্যাবড়া নাক একখানা মুখ শার্সির ওপাশে দেখা দিল। সে চেঁচিয়ে উঠল,

খপর আছে গো! একটু সবুর কর!

মেয়ু-গিন্নী জবাব দিলে, এখন নয়, পরে এস। আমি বেরুচ্ছি।

এক গেলাস গরম কফি খাওয়াতে হবে এই ভয়ে মেয়ু-গিন্নী লেনোর আর আঁরিকে নিয়ে সাত-তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল। উপরে এখনো বনেমোর-দাদু নাক ডাকাচ্ছে। নাক-ডাকানির তালে তালে যেন বাড়িখানা দুলে দুলে উঠছে।

বাইরে এসে মেয়ু-গিন্নী তাজ্জব বনে গেল। হাওয়া আর বইছে না। হঠাৎ বরফ গলতে শুরু করেছে। আকাশের রং এখন মেটে। দেয়ালে দেয়ালে সবজে ছ্যাতলার দাগ। পথ কাদায় কাদা। —কয়লাকুঠির দেশের কাদাও যেন আলাদা। যেন কালিঝুল গলিয়ে তৈরি কাদা। আবার যেমন ঘন তেমনি এঁটেল—মেয়ু-গিন্নীর জুতো বার বার কাদায় আটকে যাচ্ছে। হঠাৎ লেনোরকে একটা ঘুষি মারল। জুতো নয় তো যেন শাবল। সে খানিকটা করে কাদা জুতো দিয়ে তুলে তুলে ছড়িয়ে দিচ্ছে। পাড়া থেকে বেরিয়ে পিটের পাড় ধরে সে চলতে লাগল। এবার এসে পড়ল খালপাড়ের সড়কে। মাঝে মাঝে ঘুর-পথে না গিয়ে সোজা পথ ধরছে। কোথাও বা ভাঙাচোরা রাস্তা, কোথাও বা শ্যাওলা-ধরা বেড়া টপকে চলেছে। শেডের পর শেড ছাড়িয়ে সে চলেছে। কার-খানা বাড়ি পথে পড়ল। চোঙগুলো থেকে কালি ঝুল উগরে দিচ্ছে—এই শিল্প-কেন্দ্র শহরের শহরতলীর নির্জনতা কালোয় কালো করে তুলছে। কয়েকটা পপলার গাছের আড়ালে পড়ে আছে পরিত্যক্ত রিকুইলার পিট। তার ধসে-পড়া খাঁচাটা দেখা যায়, শুধু তার কঙ্কালটাই এখনো সোজা দাঁড়িয়ে আছে। মেয়ু-গিন্নী ডান দিকে ঘুরল। সদর সড়ক এবার শুরু হয়েছে।

এই বজ্জাতের ধাড়ী, রোস্ কি করি দেখবি! কাদাঘাঁটা আমি বার করে দোব!

এবার আঁরির পালা। সে একতাল কাদা নিয়ে একটা বল তৈরি করে ফেলেছে। দুটি বাচ্চার কানে এবার আবছা শব্দ, [illegible] কাদার ভিতরে জুতোয় গর্ত হয়ে যাচ্ছে আর তারা চোখ চেয়ে দেখছে। জুতো টেনে-হিঁচড়ে চলেছে।

এবার মার্সিয়েনের দিকে সড়ক কয়েক ক্রোশ জুড়ে বাঁধানো। দুধারে লাল মাটি তারই ভিতর দিয়ে নোংরা ফিতের মতো চলে গেছে পথ। আবার উল্টো দিকে মঁতসুর ভিতর দিয়ে এই পথই এঁকেবেঁকে চলে গেছে। সেখানে উপত্যকার ঢালের ভিতর দিয়ে পথ পড়েছে। এই পথগুলি কলকারখানার শহরগুলির সংগে মালার মতো করে গাঁথা। কোথাও বা সোজা চলে গেছে, কোথাও বা গেছে বেঁকে, কোথাও বা আস্তে আস্তে উপরে উঠে এসেছে। এই পথের পাশে পাশে আস্তে আস্তে বাড়ির সার তৈরি হয়েছে—এমনি করে গড়ে উঠেছে এক বিরাট প্রধান নগর। ছোট ছোট ইটের বাড়ি, আবহাওয়া থেকে রেহাই পাবার জন্যে তাতে নানা রঙের কলি-ফেরানো—কোথাও বা হলদে, কোথাও বা, নীল; কোথাও বা পড়েছে কালো রঙ। বাড়িগুলো দুসার হয়ে চলে গেছে টিলার ঢালের দিকে। ছোট ছোট বাড়ি, ছোট ছোট ফটক—তারই মধ্যে, এক-একখানা দোতলা বাড়ি জাঁকিয়ে বসেছে। এগুলো কলকারখানার ম্যানেজারদের কুঠি। কোথাও বা ইঁটের তৈরি গির্জা। দেখে নতুন ধরনের ব্লাস্ট ফার্নেস বলে মনে হয়। তার মিনারে মিনারে জমছে কয়লার গুঁড়ো, কালচে মেরে গেছে। চিনির কল, দড়ির কারখানা আর করাত-কলের মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে আছে নাচের হল, রেস্তোরাঁ আর বীয়ারের ভাঁটিখানা। এগুলি সংখ্যায়ও অগুনতি। ফি-হাজার কুঠি প্রতি অমন পাঁচশোটা আছে রেস্তোরাঁ আর বীয়ারখানা।

কোম্পানির ইয়ার্ডের কাছে এগিয়ে এল মেয়ু-গিন্নী। শেড আর কারখানায় ঠেসাঠেসি জায়গাটা। এবার লেনোর আর আঁরির দুহাত নিজে ধরে নিলে। ঠিক শেড আর কারখানার আড়ালেই ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের কুঠি। মঁসিয়ে হানাবু এখানেই থাকেন। এ যেন এক বিরাট দুর্গ—সামনেই লোহার ফটক। আর বাগান। বাগানে কয়েকটা রোগা গাছপালা ছাড়া আর কিছু নেই। একখানা গাড়ি এসে লোহার ফটকে থামল। একজন ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা নামলেন। ভদ্রলোকের কোটের বোতামের ঘরে রাজকীয় সম্মানের ফিতে আঁটা; ভদ্রমহিলার গায়ে ফার কোট। প্যারী থেকেই বোধহয় এসেছেন অতিথিরা। এইমাত্র মার্সিয়েনে স্টেশন থেকে এসে পৌঁছলেন। মাদাম হানাবুকে দোর-গোড়ায় আবছা দেখা যাচ্ছে। তিনি আনন্দে বিস্ময়ে অধীর হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন।

চলে আয় কুঁড়ের ধাড়ী! মা গজরাতে গজরাতে ছেলেমেয়ে দুটিকে টেনে নিয়ে চলল।

মাইগ্রাতের ওখানে পৌঁছে তার ভয় হ'ল। মাইগ্রাত ম্যানেজারের কুঠির লাগোয়া থাকে, তার আর ম্যানেজারের বাড়ির মাঝখানে শুধু একটি দেয়াল। একটা লম্বা বাড়িতে তার দোকান। সবকিছুই এখানে পাওয়া যায়। মুদি-খানার জিনিস, রান্নামাংস, ফল, রুটি, বীয়ার, মায় সসপ্যান পর্যন্ত। ও আগে

ছিল ভোরোর ওভারশিয়ার। ছোট্ট একটা ক্যানটিন দিয়ে শুরু করে। তারপর মুরুব্বীদের দয়ায় ব্যবসা এখন ফলাও হয়েছে—মঁতসুর ছোটখাটো দোকানগুলো ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়েছে। তার ঘরে সবকিছু পাওয়া যায়, আর খদ্দেরও ঢের। তাই সস্তা দামে মাল বেচে, আবার ধারও দেয়। এখনো কোম্পানির আওতায় সে আছে—কোম্পানি তার কুঠি আর দোকান তৈরি করে দিয়েছে।

মেয়ু-গিন্নী মাইগ্রাতকে দোকানের দরজায় দেখে মিনতি করে বললে,

হেঁই গো, আবার আলাম।

মাইগ্রাত একবার তাকিয়ে দেখলে। মুখে কথা নেই। মোটাসোটা লোকটা, ব্যবহারে ভদ্র, স্বভাবে কেমন মিয়নো। তার গর্ব—মত কখনো তার বদলায় না।

আজও কি কালকের মতো তাড়িয়ে দেবে গা? শনিবার অবধি চালাতে তো হবে...জানিগো, ষাট ফ্রাঁ ধার পড়ে আছে। তাও আবার দু'বচ্ছর হ'য়ে গেল...ছোট ছোট কথায় সে কোনরকমে বুঝিয়ে দিতে চাইলে। বহুদিনের দেনা রয়েছে। গত ধর্মঘটের হিড়িকের সময়ের পাওনা। অমন বিশ বার ওরা বলেছে, ধার শুধে দেবে—কিন্তু দু'বচ্ছর ধরে চল্লিশটা পয়সাও দিতে পারেনি। তার উপরে গত পরশু মেয়ু-গিন্নীর বড় বিপদ গেছে। বিশ ফ্রাঁ দিতে হয়েছে মুচিকে—সে বেটা তো আদালতের প্যায়দার ভয় দেখিয়েছিল। আজ তো একটা আধলাও নেই। তা নয় তো আর সবার মতো শনিবার অবধি গোঁজাগাঁজা দিয়ে চলত।

কিন্তু মাইগ্রাত ভুঁড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে মাথা নেড়ে জবাব দিয়ে চলল।

হেঁই গো মঁসিয়ে মাইগ্রাত, শুধু দু'খানা রুটি...আর কিচ্ছুটি চাইব না গো! কাফির আমার দরকার নেই। শুধু তিন পাউন্ডটাক রুটি...

না, হবে না, মাইগ্রাত চেঁচিয়ে উঠল।

এর মধ্যে তার বৌ এসে হাজির, রোগা মানুষ, সারাদিন হিসাবের খাতা মুখে করে কাটায়, একবারও মাথা তুলবার সাহস নেই। গরীব-গুরবো মেয়ে-মানুষটির কাকুতি-মিনতি শুনে সে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। শোনা যায়, বউটা নাকি কুলি-কামিন খদ্দেরের জন্যে স্বামীর বিছানার দাবিও ছেড়ে দিয়েছে। এ তো জানা কথা, যখন খনির কোন মজুর দোকানে ধার চায়—সে তার মেয়ে বা বৌকে পাঠিয়ে দেয়। মেয়েটা রাজি হলেই হ'ল—সুন্দরী আর বাঁদরী হোক—দোকানী অতশত বাছবিচার করে না।

মেয়ু-গিন্নী এখনো মিনতির দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে মাইগ্রাতের দিকে। মাইগ্রাত তার কুতকুতে চোখ দিয়ে তাকে দেখছে—বুঝি বা চোখ দিয়ে তার কাপড়-চোপড় ছাড়িয়ে নিচ্ছে, চোখ পিটপিট করে জ্বলছে অবৈধ কামনায়। মেয়ু-গিন্নীর ওর চোখের দৃষ্টিটা বড় কড়া লাগল। ওমা, কেমন ন্যাংটো ন্যাংটো মনে হয় নিজেকে—ভারি লজ্জাও করে! রাগও হ'ল। যখন ছুঁড়ি ছিল, তখন না হয় ঐসব চলত। তখন তো আর সাত সাতটা বাচ্চা বিয়োয় নি। লেনোর আর আঁরি জঞ্জাল থেকে বাদামের খোলা কুড়োতে ব্যস্ত। খোলা কুড়িয়ে আনছে আর পরখ করে দেখছে বাদাম আছে কিনা। মেয়ু-গিন্নী ওদের টেনে-

নিয়ে চলতে লাগল। যাবার সময় বলে গেল—মঁসিয়ে মাইগ্রাত, এতে তোমার ভালাই হবে না গো হবে না!

এখন পিয়োলেঁদের ওখানে যাওয়া বাকি। ওরা যদি পাঁচটা ফ্রাঁ ছুঁড়ে না দেয়, তাহলে ও তো ধুঁকতে ধুঁকতে মরে যাবে। বাঁদিকের জয়সেল রোড ধরে চলল মেয়ু-গিন্নী। পথের এক কোণে অফিসগুলো। ইট আর সুরকিতে তৈরি। ওখানে প্যারী থেকে হোমরা-চোমরারা জেনারেল আর সরকারী উপরওয়ালারা ফি-বছর হেমন্তকালে আসেন—মস্ত ভোজ হয়। চলতে-চলতে পাঁচ ফ্রাঁর হিসেবও কষে ফেললে। পয়লাই রুটি আর কফি কিনতে হবে, তারপরে সিকি পাউণ্ড মাখন, এক ঝুড়ি আলু কিনতে হবে নাস্তার আর বিকেলের সুরুয়ার জন্যে। তারপরে আবার মাংস আছে—বুড়ো দাদুর তো মাংস চাই।

এ তল্লাটের পাদরী আবি জোয়ার আসছেন। আলখাল্লা ধরে ধরে আসছেন, একেবারে হৃষ্টপুষ্ট বেড়ালটি—আলখাল্লা পাছে নোংরা হয়ে যায় এই তাঁর ভয়। শান্তশিষ্ট মানুষটি—মজুর বা মালিক কারো কোন বিষয়েই থাকতে চান না।

পেন্নাম হই গো!

তিনি না থেমে এগিয়ে চললেন। একটা হাসির টুকরো ছেলেমেয়ে দুটির উপর ছুঁড়ে দিলেন। মেয়ু-গিন্নী পথের মাঝখানে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। গির্জেয় সে যায় না। কিন্তু হঠাৎ মনে হ'ল, পাদরীসাহেব তাকে কিছু দিলেও দিতে পারেন।

আবার এঁটেল কাদা, ভ্যাটভেটে কালো কাদার ভিতর দিয়ে শুরু হ'ল চলা। এখনো বহু দূর। এখন আর আমোদ লাগছে না। কেমন মিইয়ে গেছে, কোন-রকমে পথ চলছে। দু'পাশে তেমনি খাঁখাঁ জমি বিছিয়ে আছে। ছ্যাতলা ধরেছে ভাঙা বেড়ার গায়ে গায়ে। তেমনি কালো আর ভয়ংকর কারখানা বাড়ি—সারি সারি চোঙের সার। দূরে দূরে মুক্ত প্রান্তর—অসীম সমতলতায় ছড়িয়ে আছে। মনে হয় যেন ধূসর মাটির সাগর, একটা ঠুঁটো গাছপালাও নেই। শুধু দিগন্তে দেখা যায় বেগুনি রেখা।—ঐখানে ভান্দামের বন।

মা, আমি কোলে উঠব।

মা এক-একজনকে এক-একবার কোলে নিয়ে চলল। পথের এখানে-ওখানে ঘোলাজলের গর্ত। কাপড়-চোপড় সামলে সে চলেছে, নোংরা হয়ে তো আর কারো বাড়ি গিয়ে ওঠা যায় না। তিন-তিনবার পা হড়কে গিয়ে পড়ে আর কি। বাঁধানো সড়ক না আপদ—একেবারে পিছল হয়ে আছে। তারা এবার এসে বাড়ির সামনে দাঁড়াল, আর অমনি দুটো প্রকাণ্ড কুকুর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কি তাদের ঘেউঘেউয়ানি! বাচ্চারা তো চেঁচিয়ে সারা। গাড়োয়ান চাবুক নিয়ে তাড়া করে আসতে ওরা শান্ত হ'ল।

অনরাইন এসে বললে, জুতো খুলে এস!

খাবার ঘরে এসে মা আর ছেলেমেয়েরা তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ঘরের উষ্ণতায় বুঝি ওরা অভিভূত, হয়তো বা দুই প্রৌঢ় আর প্রৌঢ়াকে দেখে ওরা ভীত। তাঁরা মেয়েকে বললেন, বাছা, তোমার যা দেবার দিয়ে দাও।

গ্রিগোয়ের দম্পতি সিসিলির হাত দিয়েই দান করান। ভদ্রমহিলার শিক্ষার এও একটি অঙ্গ বলেই তাঁরা মনে করেন। বদান্য হতে হবে একথা তাঁদের জানা; তাঁরা একথাও বলে থাকেন—তাঁদের এই বাড়ি ভগবানেরই আবাস।

তাঁদের গর্ব, অপাত্রে তাঁরা দান করেন না। কিন্তু সব সময়েই ভয়ে সারা হয়ে যান, এই বুঝি ঠকলেন, এই বুঝি পাপের প্রশ্রয় দিলেন। তাই টাকাকড়ি তাঁরা কখনো দেন না—দশটি পয়সা না—এমন কি দু' পয়সাও না! তাঁরা জানেন, দুটো পয়সা পেলে সেই দু-পয়সা দিয়েই ওরা মদ গিলবে! তাই দান সবসময়েই জিনিসপত্তরে চলে। বিশেষ করে শীতের দিনে গরীব-গুরবোদের ছেলেমেয়েদের গরম কাপড়-চোপড় বিলান।

সিসিলি চেঁচিয়ে উঠল, আহা, বাছারা কি হয়ে গেছে দেখেছ মা! ঠাণ্ডায় একেবারে ফ্যাকাশে মেরে গেছে! অনরাইন,, যাও তো, আলমারি থেকে মোড়ক দুটো নিয়ে এস তো!

ঝি-চাকরেরা এই গরীব-গুরবোদের দিকে করুণা ভরে তাকায়। আবার ভুরিভোজীদের এই সহানুভূতি দেখে ওরা অস্থির হয়েও ওঠে। ঝি উপরে চলে গেল, রাঁধুনী এবার পিঠে এনে টেবিলে রাখল।

সিসিলি বললে, এখনো দুটো পশমী জামা আর ক'টা কম্ফার্টার আছে, খুব গরম—আহা বাছাদের কি কষ্ট!

মেয়ুগিন্নী এবার তো তো করে বললে,

দিদিঠাকরুণ গো গড় করি। তুমি বড় ভাল মেয়ে! চোখে তার জল, পাঁচটা টাকা মিলবে সে সম্বন্ধেও সে নিশ্চিন্ত, কিন্তু যদি না দেয়, কি করে চেয়ে নেবে সেই কথাই ভাবছে। ঝি এল না। অস্বস্তিকর নীরবতা চুইয়ে পড়ছে ঘরে। মা'র স্কার্টের আড়াল থেকে ছেলেমেয়েরা জুলজুল করে তাকাচ্ছে পিঠের দিকে।

মাদাম গ্রিগোয়ের নীরবতা ভাঙলেন, তোমার বুঝি মোটে দুটি বাছা।

না গো না ঠাকরুণ, আমার সাত-সাতটি বাচ্চা।

মঁসিয়ে গ্রিগোয়ের খবরের কাগজে মনোনিবেশ করেছিলেন, তিনি সিধে হয়ে বসলেন। রাগে গর্‌গর্‌ করছেনঃ

সাত-সাতটা! কেন—সাত-সাতটা কেন?

তার মানে পরিণাম বোঝে না আর কি! স্ত্রী অস্ফুটস্বরে বললেন।

মেয়ু-গিন্নী ক্ষমা চাইবার ভঙ্গি করলে। তা কি করবে? বাচ্চা কেউ তো আর ভেবেচিন্তে পয়দা করে না, এমনিই ওরা এসে হাজির হয়। তারপর বড় হলে, ওরা রোজগার করে আনে। সংসারও চলে। এই তো ওদের নিজের কথাই ধর না! ওদের তো চলেই যাচ্ছিল, এর মধ্যে বুড়ো হঠাৎ অচল হয়ে পড়ল। আর এই গোষ্ঠির মধ্যে দুটো ছেলে আর বড় মেয়েটা ছাড়া কয়লার খনিতে কাজ করবার কেউ রইল না। কিন্তু কচিকাঁচাগুলোর মুখের গেরাস তো জোটাতে হবেই।

তাহলে তোমরা বহুদিন ধরে খনিতে কাজ করছ?

মেয়ুগিন্নীর ফ্যাকাশে মুখখানা একটু বা ঝলমল করে উঠল।

হাঁ গো, হাঁ। আমি তো বিশ বচ্ছরে কুলি-কামিন হয়ে ঢুকনু। যখন দোসরা বাচ্চাটা হ'ল, ডাক্তার হুঁশিয়ার করে দিলে। আমার আর নীচে নামা চলবে না, আমার পেটের ভিতরটায় নাকি নাড়িভুঁড়ি সব এলোমেলো হয়ে গেছে। এবার সাদি হ'ল, ঘরের কাজই একরাশ এসে ঘাড়ে চাপল। আমার

সোয়ামিরা চিরটাকাল এই-ই করছে। ঠাকুরদা থেকে এই এক কাজ—কবে যে কাজ শুরু করেছিল কে জানে। হয়তো রিকুইলারের খনি থেকেই শুরু হয়েছিল।

মঁসিয়ে গ্রিগোয়ের একবার তাকিয়ে দেখলেন। হতভাগী মা আর তার দুই হতভাগা শিশু। মোমের মতো হলদে মুখ, বিবর্ণ চুল—খাদ্যের অভাবে ওরা বাড়তে পায়নি—রক্তহীনতায় ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে। এরাই উপোসী কুশ্রী মানুষ—এরাই হতভাগ্য। আবার নীরবতা ঘনিয়ে এল। শুধু জ্বলন্ত কয়লা থেকে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে ধোঁয়া। উষ্ণ ঘর, স্বচ্ছল স্বাচ্ছন্দ্যের অনুভূতি মনে ঘনিয়ে আসে। এখানে এই আরামের নীড়ে আত্মতুষ্ট বুর্জোয়ারা ঢলে পড়ে ঘুমে বিভোর হয়ে।

সিসিলি অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, ও এতক্ষণ করছে কি? মেল্যাঁ, যাও গিয়ে বল, আলমারির তলার তাকে রয়েছে মোড়ক দুটো। বাঁদিকটায় যেন খোঁজে।

ইতিমধ্যে মঁসিয়ে গ্রিগোয়ের উপবাসীদের দেখে তার নিজের মনের ভাবাবেগ ব্যক্ত করলেন।

হাঁ, পৃথিবীতে দুঃখ-দুর্দশা আছে, একথা সত্যি কিন্তু ওগো একথা জানতো, আমাদের মজুররা মোটেও পরিণাম ভেবে চলে না। চাষীরা যেমন, তিলে তিলে জমায়, ওরা তেমনি জমাতে চায় না। যা পায়, তাই মদ গিলে ফুঁকে দেয়। ধার দেনা করে, তারপরে এমন হয় তখন আর সংসার চলে না।

মেয়ুগিন্নী গম্ভীর হয়ে বললে, সে তো হক কথার এক কথা কর্তা। মজুররা কখনো ঠিক পথে চলে না। যখন হতচ্ছাড়ারা নালিশ করে তখন আমি তো সেই কথাই বলি। কিন্তু আমি ভাগ্যমন্তী, আমার সোয়ামি মাতাল নয়। কখনো সখনো ছুটিছাটার দিনে একটু খায়, তা ঢলাঢলি করে না। তা ভালই বলতে হবে সোয়ামিকে, সাদির আগে তো শুয়োরের মতো মদ গিলতো। থুড়ি কর্তা, কি কথা বলে ফেননু গো। কিন্তু অমন মিনমিনে ধাতের হয়েও মোদের কি ভালাইটা হ'ল। আজকের মতো দিন তো হররোজই আসছে, যাচ্ছে—যখন কোনাকাঞ্চি খুপরি ঢুঁড়েও একটা কানাকড়ি বেরোয় না।

সে বার বার সেই পাঁচ টাকার কথাই তুলতে চাইল। ধারদেনার কথাই গলা নামিয়ে বলে চলল। স্বর প্রথম খাদে রইল, কিন্তু ক্রমেই চড়তে লাগল গলা। হপ্তার পর হপ্তা ধরে রোজ দেনা শোধ হচ্ছে। কিন্তু একদিন যেই কিস্তি দেওয়া হ'ল না, তখন তো এক কান্ড। আর কিছুতেই কিস্তি শোধ হয় না। দেনার সমুদ্র বাড়তে থাকে, মানুষ তখন বিরক্ত হয়ে যায় নিজের মেহনতির উপর। তখন তো আর কিছুতেই রুজি চলে না। যত খাটুক—সেই মরণ অবধি আর কষ্টের অবধি নেই। তা ছাড়া খনির গোলামকে তো কয়লার গুঁড়ো মদ দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। সেই তো পয়লা শুরু, তারপর রোজই নিজের দুঃখধান্দা ভুলতে ভাঁটিখানায় ছোটে।

মাদাম গ্রিগোয়ের বললেন, আমি তো ভেবেছিলাম, কোম্পানি তোমাদের থাকবার ঠাঁই আর জ্বালানি দেয়।

মেয়ুগিন্নী আগুনের কুণ্ডটার দিকে ট্যারচা চোখে তাকিয়ে বললে, তা দেয় গো, ঠাকরুণ দেয়। কয়লা দেয়, তবে তেমন সরেস নয়, তবে জ্বলে বটে! আর মাথা গোঁজার ডেরা, তাও দেয়। ছ' ফ্রাঁ করে মাস মাস ভাড়া নেয়।

শুনতে কিছুই না, কিন্তু মাসকাবারে দিতে জান বেরিয়ে যায়। এই তো আজকের কথা—আজ আমাকে কেটে দু'খান করে ফেললেও দু'টি পয়সা বেরুবে না। খালি নেই, নেই ঠাকরুণ, আর কোন কথা নেই।

আরাম কেদারায় ভদ্রমহোদয় আর মহিলা চুপ করে আছেন। দারিদ্র্যের এই রূঢ় প্রকাশ যেন তাঁদের অস্থির করে তুলেছে, স্নায়ুতে লাগছে তার চোট। মেয়ুগিন্নী ভয় পেলে, হয় তো বা চটিয়েই দিয়েছে। তাই এবার ধীর স্বরে বলতে লাগল। ঝানু মেয়েমানুষ, ভদ্দর আদমীদের কখন কি হয়, সে বোঝে।

না—আমি নালিশ করছি না গো! এই তো আমাদের দশা, আর তা মোরা মেনেও নিইছি। তা যতই লড়াই করি না, এ বুঝি আর পালটাবে না ঠাকরুণ! তাই আমাদের কথা হচ্ছে, নিজের কাজ করে যাওয়া, তারপর তো ভগমান দেখবেন —তাই না কর্তা, তাই না গা গিন্নী-মা!

মঁসিয়ে গ্রিগোয়ের সায় দিলেন,

এমন যার মন, সে তো দুঃখকে কেয়ার করে না।

এবার অনরাইন আর মেল্যাঁ মোড়ক নিয়ে এসে হাজির হ'ল, সিসিলি মোড়ক খুলে ফেলে দুটো ফ্রক বার করলে। তার সঙ্গে আছে শাল, মোজা, টুপি। হাঁ, ভালই মানাবে, সে তাড়াতাড়ি ঝিদের ওগুলো বেঁধে দিতে বললে। গানের শিক্ষয়িত্রী এর মধ্যেই এসে গেছে, তাই তাড়াতাড়ি ওদের বিদেয় দিতে চাইল।

মেয়ুগিন্নী এবার তো তো করে বললে, আমাদের বড় টানাটানি, যদি পাঁচটা টাকা দেন তো...

কথা গলায় বেধে গেল, মেয়ুদের দেমাক আছে, ওরা কখনো ভিখ্ মাগে না। সিসিলি বাবার দিকে উদ্বেগভরে তাকাল। কিন্তু তিনি না-পাট জবাব দিলেন। এ কর্তব্য হলেও এতে ব্যথা আছে।

না, না, আমাদের এ রীতি নয়। আমরা দিতে পারব না।

সিসিলি মেয়ুগিন্নীর মুখখানা দেখে বড় ব্যথিত। ওর ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু করতে পারলে সে বর্তে যায়। এখনো ওরা পিঠের দিকে লোলুপ দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে। সে তাড়াতাড়ি একখানা পিঠে নিয়ে ভাগ করে দু'জনকে দিলে।

এই নাও!

তার পরে কি ভেবে টুকরো দুটো নিয়ে, একখানা পুরানো খবরের কাগজ চাইলে।

দাঁড়াও। ভাইবোনদের সঙ্গে ভাগ করে খেও।

কোনরকমে সে তাদের বিদায় দিলে। মা-বাবা সস্নেহ চোখে তাকিয়ে রইলেন। উপোসী মা উপোসী ছেলেমেয়ে নিয়ে চলে গেল। ছেলেমেয়ের অবশ হাতে পিঠের মোড়ক।

মেয়ুগিন্নী ছেলেমেয়েদের নিয়ে পথে এসে দাঁড়াল। এখন আর খাঁখাঁ মাঠ আর কাদা তার চোখে পড়ছে না। ধূসর নেমে-আসা আকাশও যেন দৃষ্টি থেকে মুছে গেছে। মঁতসুর ভিতর দিয়ে যেতে-যেতে সে সাহস করে মাইগ্রাতের দোকানে গিয়ে উঠল। কত কাকুতি-মিনতি করে শেষে দু'খানা রুটি, কাফি আর কিছুটা মাখন নিয়ে ফিরল। পাঁচটা টাকাও সে পেল। মাইগ্রাত সুদি

কারবারও করে। ফি হপ্তায় টাকা দেয়, আর এক হপ্তায় সুদসুদ্ধ আদায় করে। মেয়ুগিন্নীর উপর তার লোভ নেই। ক্যাথেরিনের উপর তার চোখ। মেয়ুগিন্নী সেকথা বুঝতে পারলে যখন সে বললে মুদিখানার জিনিসের জন্যে সে যেন মেয়েকে পাঠিয়ে দেয়। মেয়ুগিন্নী মনে মনে বললে, আচ্ছা, দেখা যাবে! যদি আশনাই করতে আসে মিন্সে, সে ওর কানে একটা ঘুষো লাগিয়ে দেবে না!.

তিন

দুশো চল্লিশ নং গাঁয়ের ইঁটের তৈরি গির্জার ঘড়িতে এগারোটা বাজলো। পাদরী জোরে এখানে ফি-রোববারে উপাসনা করতে আসেন। পাশের ইস্কুল থেকে ছেলেমেয়েদের সুরেলা আবৃত্তি ভেসে আসছে। দরজা জানালা ঠাণ্ডার জন্যে বন্ধ—তবু স্বর উপছে পড়ছে। চার সারি বাড়িগুলির মাঝখানের ফাঁকা জমি এখন নির্জন। জমির ফুলের কেয়ারীগুলি এখন হতশ্রী। কয়েকটা শাকসবজি ছাড়া আর কিছু নেই। এখন সুরুয়া তৈরির সময়। চোঙ থেকে ঝলকে ঝলকে ধোঁয়া উঠছে। কোন বস্তি থেকে একটি স্ত্রীলোক দরজা খুলে বেরিয়ে এল, আবার ভিতরে ঢুকে গেল। এখনো বৃষ্টি পড়ছে না, তবে কালো মেঘে হাওয়ায় যেন ভারি আর কালো—ভিজে স্যাঁতসেঁতে। ড্রেনের নল থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল চুঁইয়ে পড়ছে পথের খোঁদলে খোঁদলে। গাঁখানা বিরাট প্রান্তরের ভিতরে বিছিয়ে আছে—তারই ধার ঘেঁষে গেছে কালোকোলো সড়কগুলি। যেন শোকের কালো পাড় টানা। কোথাও আনন্দের একটু আমেজ নেই—শুধু আছে সারি সারি লাল টালির জৌলুস—বৃষ্টি ধুয়ে ধুয়ে তার লাল জৌলুস আরো বেড়ে গেছে।

ফেরার পথে মেয়ুগিন্নী ওভারসিয়ারের গিন্নীর কাছ থেকে কিছু আলু কিনতে গেল। একটু ঘুরেই যেতে হ'ল। ওভারসিয়ার-গিন্নী গত বছরের খন্দ থেকে কিছু আলু রেখেছে। কয়েকটা ঠুঁটো পপলারের সারে ঢাকা কয়েকটা বিচ্ছিন্ন কোঠাবাড়ি। এই বাঁজা মাঠে পপলার ছাড়া আর কোন গাছ জন্মায় না। চার সার কোঠাবাড়ি, চারপাশে বাগান। কোম্পানি এগুলো তৈরি করেছে খনির অফিসারদের জন্যে। মজুররা গাঁয়ের এই দিকটার নাম দিয়েছে পশমী মোজা পরা বাবুভায়াদের আস্তানা। নিজেদের দিকটারও নামকরণ তারা করেছে—ধারশুধনেওয়ালার ডেরা। এতে গরীবদের কটু রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

এই তো এসে গেলাম রে, মেয়ুগিন্নী লটবহর আর লেনোর আর আঁরিকে টেনে নিয়ে চলতে চলতে বলে উঠল। ওদের গা কাদায় মাখামাখি আর একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

আগুনের কুণ্ডটার কাছে আলঝিরের কোলে শুয়ে এস্তেল চেঁচাচ্ছে। চিনি ফুরিয়ে গেছে। কি করে যে বাচ্চাকে ঠাণ্ডা করবে সে ভেবে পাচ্ছিল না। শেষে নিজের মাইটাই মুখে পুরে দিয়ে মাই দেবার ভান করছে। এতে আগে আগে কাজ হয়েছে, কিন্তু এবারে হ'ল না। শেষে সে পোষাক খুলে নিজের আট বছরের

অপুষ্ট বুকে বাচ্চার মুখটা লাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বাচ্চা সেখানে চামড়া আর হাড় ক'খানা ছাড়া আর কিছু পায়নি। তাই রেগে গিয়ে আরো জোরে কাঁদছে।

লটবহর নামিয়ে মা বললে, দে, আমার কাছে দে! ওটা এমন হয়েছে, একটু ওর সয়না গা! একটা কথাও বলতে দেবে না!

সে কাঁচুলির ভিতর থেকে নিজের একটা মাই বার করে ফেললে, চামড়ার মদের বোতলের মতোই ফাঁপা আর ফোলা। বাচ্চার মুখে বোঁটাটা পুরে দিতেই কান্না থেমে গেল হঠাৎ। কথা বলবার এবার ফুরসত মিলল! সব কিছু গোছগাছ আছে। খুদে গিন্নীটি আগুন জ্বালিয়েছে, ঘরদোর নিকিয়েছে। এখনো বুড়ো দাদু নাক ডাকাচ্ছে উপরতলায়। হঠাৎ সবাই চুপ করে গেলে তার নাকডাকানি শোনা যায়। ঠিক তেমনি অবিশ্রাম নাকডাকানি। আলঝির জিনিসপত্র দেখে হাসল—উঃ এযে এককাঁড়ি মালপত্তর! মা, তোমার জন্যে সুরুয়া করে দেব?

টেবিলে ডাঁই হয়ে উঠেছে পোষাকের বাণ্ডিল আর রুটি, মাখন, কাফি আর শুয়োরের মাংসে।

সুরুয়া, না বাছা! মেয়ুগিন্নী ক্লান্তিতে ঢলে পড়ে বললে, তার চেয়ে সরেল (এক রকম তেতো স্বাদযুক্ত পাতা) নিয়ে আয়, আর পেঁয়াজের খোসা ছাড়িয়ে রাখ। কয়েকটা আলু সেদ্ধ বসিয়ে দে। মাখনের ছিটেফোঁটা দিয়ে তবু খাওয়া যাবে'খন। আর কফি? হাঁ, কফির কথা ভুলিস নি যেন! হঠাৎ পিঠে ক'টুকরোর কথা মনে পড়ল। আঁরি আর লেনোরের হাত খালি। এখন ওরা জিরিয়ে বেশ চাঙ্গা হয়েছে। অমনি মেঝেয় হুটোপুটি শুরু করেছে। বাপ্‌রে বাপ, খুদে রাক্ষস দুটো পিঠে দুখানা যদি খেয়ে না থাকে তো কি বলেছি! কষে দুটো থাবড়া মারলে। আলঝির এদিকে সস্‌প্যান উনুনে বসিয়ে দিয়ে, মাকে ঠাণ্ডা করতে ছুটল।

মা, ওদের কিছু বোলো না। আমার জন্যে এনেছিলে তো, আমি না হয় না-ই খেলাম! অতো হেঁটেছে, ওদের আর খিদে পাবে না!

বারোটা বাজল। ইস্কুল থেকে বেরুচ্ছে ছেলেমেয়েরা, তাদের জুতোর খট্ খটাখট শব্দ ভেসে আসছে। আলুগুলো সেদ্ধ হয়ে গেছে। কাফিও ঘন হয়ে এল ফুটে ফুটে, এখন শব্দ করছে কেৎলিতে। টেবিলের একধার সাফ করা হ'ল। মা-ই শুধু এখানে বসে খাবেন। তিনটি ছেলেমেয়ে হাঁটুর উপর রেখেই খেয়ে নেবে। কিন্তু ছেলেটার চোখ আর তেলচিটে মাংসের মোড়ক থেকে নড়ে না। ও তো একটা আস্ত রাক্ষস। মুখে রা'টি নেই।

মেয়ুগিন্নী দু' হাতে গেলাস ধরে তারিয়ে তারিয়ে কাফি খাচ্ছে। এবার বুড়ো বনেমোর নীচে নেমে এল। এমনিতে সে এর চেয়ে ঢের পরে ওঠে। তার ছোট হাজরি আগুনের উপর থাকে। কিন্তু আজ সুরুয়া না পেয়ে তার মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে আছে। গজর গজর করছে। কিন্তু বেটার বৌ জানিয়ে দিলে, সবসময়েই যা চাই, তা মেলে না। তাই নিঃশব্দে সে আলু খেতে লাগল। মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে থুথু করে আগুনের কুণ্ডে গয়ার ফেলছে। এটুকু ওর ভদ্রতা বোধ। আবার এসে ধপাস্ করে বসে পড়ছে চেয়ারে, জাবর কাটছে মাথা নীচু করে, চোখ তার বোঁজা।

মা, বলতে ভুলে গেছি, আলঝির বললে, পড়শী যে ফিরল...

মা থামিয়ে দিলে,

মরুক্ গে!

লেভাকের ঐ মাগিটার উপর মেয়ুগিন্নীর ভারি বিদ্বেষ। কাল ও নিজের অভাবের কথা শতখানা করে বলে ওকে কিছু ধার দিতে চায় নি, অথচ মেয়ু-গিন্নী জানে ওদের এখন বাড়বাড়ন্ত, ওদের বাসাড়ে ব্যতেলুপ দু' হপ্তার টাকা আগাম দিয়েছে। ওরা আর পাড়ায় পাড়ায় ধার করতে যায় না! পড়শী বলেই তো গিছল।

মেয়ুগিন্নী বললে, ভাল কথা মনে করেছিস! একটু কাফি তুলে রাখ। পিয়েরোঁ-বউকে দিতে হবে। ওর কাছ থেকে পরশু ধার এনেছিলাম।

মেয়ে মোড়কটা এনে দিতেই সে বললে, এখুনি এসে নিজেই মরদদের সুরুয়া চাপিয়ে দেবে। এবার এস্তেলকে কাঁখে নিয়ে বেরিয়ে গেল। বুড়ো বনেমোর বসে বসে আলু চিবোতে লাগল। আলুর খোসা মেঝেতে ফেলছে বুড়ো, লেনোর আর আঁরি তাই নিয়ে যুদ্ধ শুরু করে দিলে।

মেয়ুগিন্নী রাস্তা ঘুরে গেল না, বাগানের ভিতর দিয়ে সোজা চলে গেল। কি জানি যদি লেভাকের বৌটার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। ওর বাগানটা পিয়েরোঁদের বাড়ির লাগোয়া। বেড়ায় আবার খানিকটা ফাঁকা—সেখান দিয়ে যাওয়া-আসা চলে। চারটে বাড়ির কুয়োটা এখানেই। লাইলাকের ঠুঁটো ঝোপটার আড়ালে একটা নীচু চালা। পুরানো যন্ত্রপাতি সেখানে গাদা করা থাকে। খরগোশগুলো এখানেই রাখা হয়। ছুটিছাটার দিনে এইগুলো মেরে ফিস্টি হয়। একটা বাজল। কাফি পানের সময়। দরজায় বা জানালায় কেউ নেই। মাটি-কাটিয়েদের একজন আছে। তার এখনও কাজের ঘণ্টির দেরি আছে। সে ফালি জমিটায় খুঁড়ছে—সবজী ফলাবে। মাথা নুয়ে সে কাজ করে চলেছে। মেয়ুগিন্নী এবার উলটো দিকের সারে গিয়ে হাজির হ'ল। চেয়ে দেখে দুটি ভদ্রলোক আর দুটি মহিলা গির্জার পথ দিয়ে আসছে। সে তো দেখে তাজ্জব বনে গেল। একটু থেমে পড়ে ভাল করে দেখে নিলে। এবার চিনিছে—হানাবু-গিন্নী দুজন অতিথিকে ঘুরে ঘুরে গাঁ দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন। ভদ্রলোকের কোটে রাজার সম্মানের তকমা আঁটা, আর ভদ্রমহিলার গায়ে ফারকোট।

মেয়ুগিন্নী কফির মোড়কটা দিতেই পিয়েরোঁ-বৌ বললে, ও আবার নিয়ে এলে কেন? এত তাড়া কিসের?

আটাশ বছর তার বয়েস। গাঁয়ের সেরা সুন্দরী। কালো চুল, ছোট্ট কপাল, বড় বড় চোখ আর মুখখানা বড়ই ছোট—একটু ছেনালপনাও আছে বৌয়ের। আর ছিমছাম যেন বেড়ালটি। কাচ্চাবাচ্চা নেই বলে চেহারাখানাও রেখেছে ভাল। তার মা মা-ব্রুল খনিরই এক মজুরের বৌ। মজুরটি খনিতে ধস চাপা পড়ে মারা যায়। সেই থেকে মা দিব্যি গেলেছিল, তার মেয়ে খনির মজুরকে বিয়ে করবে না। ওকে কলে কাজ করতে পাঠায়। কিন্তু এখন তো রাগে সে দিশেহারা। তার মেয়ে কিনা শেষকালে খনির মজুর ঐ পিয়েরোঁকে বিয়ে করে বসলে! লোকটা তার উপরে আবার দোজবরে, একটা আট বছরের মেয়েও আছে।

কিন্তু এত গুজগুজ ফুসফুসের মধ্যেও ওরা স্বামী-স্ত্রী বেশ সুখে দিন কাটাচ্ছে, কিন্তু তবু কত রটনা—স্বামী নাকি একেবারে মিনমিনে ধাতের মেনিমুখো, আর বৌটার তো পিরিতের মানুষের অভাব নেই। কিন্তু ওরা ধার-দেনা করে না, হপ্তায় দুদিন মাংস আসে ওদের বাড়িতে। আর বাড়িখানা এমন ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করে রাখে যে, সস্‌প্যানেও নাকি আরশি-হেন মুখ দেখা যায়। ওদের বরাত আরো ফিরল, যখন কোম্পানি সদয় হয়ে বৌকে বনবন বিস্কুট আর মেঠাই মণ্ডা বিক্রি করার হুকুম দিলে। নিজের জানালায় তাক করে সে দুটো পাত্র রেখেছে—ওই ওর বিজ্ঞাপন। এতে ফি-রোজ ছ-সাত সু লাভ হয়, রোববারে কখনো কখনো বারো সুও হয়। কিন্তু একমাত্র হাঙ্গামা ঐ বুড়ি ব্রুলকে নিয়ে, ও বুড়ি তো ঝুনো বিপ্লবী। সে চেঁচিয়ে তার স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধ চায় মালিকদের উপর। আর খুদে লিদির উপর সবাই রাগের ঝাল ঝাড়ে।

পিয়েরোঁ-বৌ এস্তেলের দিকে চেয়ে বললে, উঃ, বেশ বড়সড়োটি হয়েছে তো!

আর বোলো না, কি যে জ্বালায়! মেয়ুগিন্নী বললে, তোমার যে বাচ্ছা-কাচ্চা হয়নি, বেশ আছ। সাফ-সুতরো ছিমছাম হয়ে থাকতে পার।

তার বাড়িতেও সবকিছু গোছানো। ফি-শনিবারে সে ধোওয়া-পাখলাও করে। কিন্তু তবু ঘরনীর চোখ দিয়ে সে ঝকঝকে তকতকে ঘরের ভিতরে চোখ বুলিয়ে নিলে। ঈর্ষাই হয়। ঘরে একটু বিলাসিতার ছোঁয়া আছে—তাকে আছে গিল্টি করা ফুলের তোড়া, একখানা আরশি আর তিনখানা ফ্রেমে-বাঁধানো ছবি।

ঘরে কেউ নেই, সবাই এখন খনিতে, তাই পিয়েরোঁ-বৌ একাই কাফি খাচ্ছে।

এক গেলাস কাফি খেয়ে যাও! সে বললে।

থাক বাছা, এই মাত্তর খেয়ে এলাম।

আরে তাতে কি হয়েছে!

বটেই তো, কি আর হয়েছে? আস্তে আস্তে পান করছে কাফি। চোখ বার বার বিস্কুট আর মেঠাইমণ্ডার বোয়েমের ভিতর দিয়ে উলটো দিকের বাড়িগুলোর উপর গিয়ে পড়ছে। খুদে খুদে সাদা পর্দা ঘরনীদের সতীধর্মের নিশানা। লেভাকদের পর্দাগুলি ভারি নোংরা, একেবারে ছেঁড়া কানি—মনে হয় সস্‌প্যানের তলা মোছার জন্যেই বুঝি ব্যবহার করা হোত।

মাগো, এমন নোংরার ভিতরেও কেউ থাকতে পারে! পিয়েরোঁ-বৌ অস্ফুট স্বরে বললে।

মেয়ুগিন্নীর অমনি শুরু হয়ে গেল, আর তাকে রোখে কে! ও যদি বুতেলুপের মতো অমনি একটা বাসাড়ে পেত, তাহলে সংসারটা বেশ ভাল-ভাবেই চলে যেত! যারা ঘরগৃহস্থালি করতে জানে, তাদের কাছে বাসাড়ে পাওয়া তো ভাগ্য। কিন্তু এক কথা, তার সঙ্গে এক বিছানায় গিয়ে না শোয়াই উচিত। আবার ভাতারটা তো নাকি মদ ধরেছে। বৌকে মারধর করে—আর মঁতসুর কোন্‌ এক নাচনেওয়ালীর পিছনে ছুটেছে।

পিয়েরোঁ-বৌয়ের বিরক্তির আর সীমা নেই। ঐ নাচনেওয়ালী মাগীগুলো!

ওরা তো সব রকম রোগের ঝাড়! রোগের বীজ ছড়ায়। ঐ তো জয়সেলে একটা মাগী ছিল—সে নাকি খনিকে খনি বিষিয়ে দিয়ে গেছে।

কিন্তু আমি বাপু ভেবে পাইনে, কি করে তোমার ছেলেটাকে ওর পিছনে ছুটতে দিলে।

ওঃ, তা আর বুঝলে না! ওদের রোখে কে বল না! ওদের বাগানটা আবার আমাদের বাগানের পাশেই। ঐ যে লাইলাক ঝোপটা আছে জাচারি ওখানে সারা গরম কালটা ফিলোমেনকে নিয়ে কাটায়। চালার নীচে এসেই বা ওরা থামবার পাত্তর নাকি! কুয়োতে জল আনতে গিয়ে ওদের কাণ্ডকারখানা কে না দেখেছে বল!

গাঁয়ের বেলেল্লাপনার এই নিয়মিত কাহিনী। সন্ধ্যে হতে না হতে ছোঁড়া-ছুঁড়িরা তাদের বেহায়াপনা শুরু করে দেয়। গাঁয়ের লোকের পরিভাষায়—ওরা এ ওর উপর চাপে। শেডের ঢালু ছাদেই ব্যাপারটা চলে। পুটাররা এইখানেই তাদের প্রথম সন্তানের জনক-জননী হয়। অবিশ্যি কেউ কেউ বা ছোটে রিকুইলারের পরিত্যক্ত খনিতে, কেউ বা খেতে। পরিণাম ভয়াবহ হয় না, হতে পারে না। ওরা সময় মতো বিয়ে-থা করে। তখন শুধু মাদের রাগ বাড়ে, তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ছেলে বাড়িতে আর কিছুই দেয় না।

পিয়েরোঁ-বৌ বললে, আমি তুমি হলে ব্যাপারটা কবে চুকিয়ে দিতাম! তোমাদের জাচারি তো এর মধ্যে দুটি পয়দা করেছে। এর পরে দেখো, ওরা গিয়ে কোথাও ঘর বাঁধবে।...যাহোক টাকাটা তো হাতছাড়া হ'ল!

মেয়ুগিন্নী রেগে উঠল,

যদি ওরা তাই করে, আমি গাল দিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব না। জাচারি আমাদের মুখ চাইবে না গা? ওর জন্যে আমাদের খরচ-খরচা হয়নি? তা ওকে তো তার কিছুটা শোধ দিতে হবে—একটা মেয়ের সঙ্গে জোড় গাঁথবার আগে বাপ-মার কথা ভাববে না?...আমাদের ছেলেমেয়েরা যদি পেট থেকে পড়েই অন্যের জন্যে বেগার দিতে শুরু করে তাহলে মোদের কি হবে গো? তার চেয়ে চোখ বোঁজাই ভাল।

এবার সে একটু শান্ত হ'ল।

আমি সব্বার কথাই বলছি; যাহোক, পরে দেখা যাবে। তোমার কাফির কিন্তু বেশ ধক্ আছে। তুমি তৈরি করতেও জান বটে!

আরো পনেরো মিনিট এ-গল্পে সে-গল্পে কাটল। এবার সে পুরুষদের সুরুয়া এখনো তৈরি হয়নি এই বলে হঠাৎ উঠে ছুটে চলে গেল। বাইরে, ছেলেমেয়েরা ফিরে চলেছে ইস্কুলে। ক'জন মেয়ে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। ওরা মাদাম হানাবুকে দেখছে তিনি আঙুল দিয়ে অতিথিদের মজুরপাড়াটা দেখিয়ে কি বলছেন। সারা গাঁয়ে সাড়া পড়ে গেছে। মাটি কাটিয়ে মজুরটি খেত খোঁড়া ফেলে একবার মুখ তুলে তাকাল। দুটো মুরগী ভয় পেয়ে বাগানের ভিতরে ছুটে চলে গেল।

ফিরতি পথে মেয়ুগিন্নীর সঙ্গে লেভাকের বৌয়ের দেখা হয়ে গেল। সে কোম্পানির ডাক্তারকে ধরবার জন্য বেরিয়ে আসছিল। ডাঃ ভ্যান্দারহাগেন চলেছেন পথে, কাজ তাঁর সবসময়েই বেশি। সবসময়ে ছুটে চলেন, তিনি যেন পাখায় ভর করে আসেন-যান-ওষুধের ব্যবস্থা করেন।

সে বললে, হেই ডাক্তার গো, আমার চোখে নিদ্ নেই, খালি ধড়ফড় করি... আপ্নি একটা দাওয়াই বাত্লে দিন না!

তিনি না থেমেই বললেন, যাও, যাও, এখন যাও। খালি কাফি গিলবে, তো ঘুম হবে কি করে!

মেয়্গিন্নী নিজের কথা বললে, আমার সোয়ামির কি হ'ল ডাক্তার? আপনি তাকে দেখতে আলেন না তো! এখনো পায়ের দরদ তো গেল না?

দরদ গেল না! তোমরা যদি বেচারীদের অমন করে কাবু করে দাও, কি করে দরদ যাবে! যাও, যাও এখন!

দুটি স্ত্রীলোকই ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। ডাক্তার ছুটে চলেছেন, ওরা চেয়ে আছে। ওরা দুজনেই ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিলে। হতাশার ঝাঁকুনি।

আরে ভিতরে এস না, লেভাকের বৌ বললে, টাটকা খবর দেব...এক পেয়ালা কাফি খাবে না? এই তো সবে তৈরি করলাম।

মেয়্গিন্নী বাধা দিতে চেষ্টা করলে, কিন্তু তেমন জোর করলে না। কি হবে ওকে চটিয়ে, এক ফোঁটা গিললেই তো চুকে-বুকে যায়। সে বাড়ির ভিতরে গেল।

কয়লার গুঁড়োয় কামরাখানা একেবারে কালো হয়ে আছে, মেঝে আর দেয়ালে তেলের দাগ। আলমারি আর টেবিল তেল চিটচিটে। দুর্গন্ধে গা বমি-বমি করে। ব্যতেলুপ আগুনের ধারে বসে সুরুয়া খাচ্ছে, টেবিলের উপর কনুই রেখেছে, নাকটা রয়েছে প্লেটের উপর। মস্ত জোয়ান মরদ, চওড়া কাঁধ, একটু ঢিলেঢালা মানুষ সে। পঁয়ত্রিশ বছর বয়েস হয়েছে, তবু ছোকরাই দেখায়। খুদে আর্চিল ওর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। এটি ফিলোমেনের বড় ছেলে। তিন বছরে পড়েছে বাচ্চাটা। সে লোভার্ত দৃষ্টি মেলে চুপচাপ দেখছে খাওয়া। যেন ক্ষুধার্ত পশুর নিঃশব্দ আবেদন তার চোখে। বাসাড়ে লোকটার ভীষণ কালো দাড়ির জঙ্গল থাকলে কি হবে, মনটা ভাল। মাঝে মাঝে এক টুকরো মাংস ছেলেটার মুখে টুপ্ করে ফেলে দিচ্ছে।

লেভাকের বৌ কফি-প্লেটে চিনি দিতে দিতে বললে, একটু সবুর কর গো, চিনিটা দিয়ে নিই।

ব্যতেলুপের চেয়ে ও ছ' বছরের বড়। একেবারে হাড়সার মেয়েমানুষ, দেখতে ভয় লাগে। মাই দুটো ঝুলে পড়ে তলপেটে গিয়ে ঠেকেছে, আবার তলপেটটা ঠেকেছে উরুতে। মুখখানা একেবারে চ্যাপটা—কোন ঢকপদ নেই। তাতে আবার পাক-ধরা দাড়ির রেখা—চুলেও পাক ধরেছে। চুল সে কখনো আঁচড়ায় না। ব্যতেলুপ ওকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেছে। সুরুয়ায় যেমন চুল পড়লে ও বাছে না, বিছানায় এক চাদর তিন মাস পাতা আছে বলে ও যেমন খুঁতখুঁত করে না, তেমনি এই পিরিতের মানুষটিকেও সে পেয়েছে। তাকে সাফ্সুতরো করে নেবার দরকার বোধ করেনি। বাসাড়ে হয়ে এসেছে, থাকা-খাওয়ার সঙ্গে মুফ্ত পেয়েছে ওকে। আর লেভাক-বৌয়ের স্বামী তো বলে, যে-খদ্দের তুষ্ট থাকে, সেই সবচেয়ে ভাল মিতা।

লেভাক-বৌ বললে, শোন, একটা কথা বলি গো, কাল পিয়েরোঁ-বৌকে দেখি

গুটি গুটি চলেছে পশমী মোজার তল্লাটে। জান তো, ঐ রাসেনারটার পেছনে কে ভদ্দর আদমী ওত পেতে বসে থাকে।

দুজনে তারপরে খালের দিকে চলে গেল। বিয়ে-ওলা মেয়েমানুষের একি কাজ! ছিঃ ছি ছি!

মেয়ুগিন্নী বললে, এর চেয়ে বেশি আর কি হবে গো! বিয়ের আগে পিয়েরোঁ উপরওয়ালাকে খরগোশ খাওয়াতো, এখন তো বৌকে দেয়। তা খরগোশের চেয়ে বৌ তো সস্তাই!

বুতেলুপ হো হো করে বাজখাঁই গলায় হেসে উঠল। ঝোল-মাখা এক টুকরো রুটি সে পুরে দিলে আর্চালির গলার ভিতরে। পিয়েরোঁ-বৌয়ের উপর দুটি মেয়েমানুষের যত ঈর্ষা জমে ছিল, সব উজাড় করে দিলে। ওটা একটা কুত্তি—এমন কিছু ডাকসাঁইটে সুন্দরী নয়—তবে একটা ব্রণ উঠলে আর পরিচর্যার অন্ত নেই। অমন কতবার মুখ ধোয়, তেল আর পমেড মাখে। যাক্‌গে, সে তার স্বামীর ব্যাপার, সে যদি ওসব ভালবাসে তো কার কি! কতগুলো মানুষ আছে, তাদের আর আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। উপরওয়ালা একটু ধন্যবাদ দেবে তার জন্যে তারা তার পাছাও মুছে দিতে পারে!

এমনি আলাপ চলল, এবার এক পড়শী ফিলোমেনের ন'মাসের বাচ্চাটাকে কোলে করে নিয়ে এল। এইটিই সর্বশেষ, নাম দেসারি। কয়লা বাছার শেডে বসেই ফিলোমেন দুপুরের খাবার খায়। ওখানে বসে মেয়েটাকে মাইও দেয়।

মেয়ুগিন্নী বললে, আমারটাকে তো একদণ্ড ফেলে রাখা যায় না, অমনি চিল্লোতে শুরু করবে। এস্তেলের দিকে তাকাল। সে এরই মধ্যে মার কোলে ঘুমিয়ে গেছে।

লেভাক-বৌয়ের চোখের দিকে চেয়ে মেয়ুগিন্নী চুপ করে গেল। ব্যাপারটা আর এড়িয়ে যাওয়া চলে না।

দেখ গো, এখন তো একটা বিধি-ব্যবস্থা করতে হয়।

প্রথমে দুই পক্ষের মায়েরা এনিয়ে একটা কথাও বলেনি, বিয়ে দিতেও তারা নারাজ ছিল। জাচারির মা ছেলের মাইনের টাকাটা হারাতে রাজি ছিল না, ফিলোমেনের মার পক্ষেও ঐ একই কথা। মেয়ের মজুরি হারাবার ভয়ে লেভাক-বৌ তো রাগে ফুঁসে উঠেছিল। অতো তাড়া কিসের, এমন কি বাচ্চা যখন একটা ছিল তখন তাকে যত্ন-আত্তিও কম করেনি। কিন্তু এখন বাচ্চা বড় হয়ে উঠছে, খাবার গিলছে; আবার আর একটা এসে জুটছে। লেভাক-বৌয়ের তো ষোলআনাই লোকসান। কিন্তু লোকসান দিতে সে নারাজ, তাই বিয়ে দেবার জন্যে সে ঝুলোঝুলি শুরু করেছে।

সে বললে, জাচারি তার মনের মানুষ বেছে নিয়েছে, এখন আর বাধা কি... তা কখন হবে বিয়ে?

মেয়ুগিন্নী অপ্রতিভ হয়ে পড়ল। শীতটা যাক, ভাল দিনকাল আসুক। যত আপদ! বিয়ে না হওয়া অবধি যেন তর সইত না! তার আগেই জোড়া বাঁধলে! দেখ গো, আমি হক্ কথা বলব! আমার ঐ ক্যাথেরিন ছুঁড়িটাকে যদি অমন বোকা বনতে দেখি, তাহলে ওর টুঁটি টিপে ধরে দফা-রফা করে দেব।

লেভাক-বৌ মাথা নাড়ল।

আচ্ছা, দেখবো গো দেখবো। ও তো আর সব্বার মতোই হবে।

ব্যতেল্পের এটাই যেন ঘরবাড়ি। সে আলমারি হাঁটকে রুটি খুঁজতে লাগল।

লেভাকের সুরুয়ার শাকসব্জী, আলু আর রসুন টেবিলের কোণে আধ-ছাড়ানো অবস্থায় জমা হয়ে আছে। অবিশ্রাম গল্পের স্রোতে মাঝে মাঝে হাতে অমন দশবার তুলে দশবারই রেখে দিয়েছে লেভাক-বৌ। এখন আবার খোসা ছাড়াতে ব্যস্ত, কিন্তু সে আর কতক্ষণ! ওগুলো রেখে দিয়ে সে আবার জানালায় গিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিলে।

ওখানে আবার কি হ'ল গো? আরে, হানাবু-গিন্নী যে অতিথিদের নিয়ে ঘুরছেন। ও'রা যে পিয়েরোঁ-বৌয়ের বাড়িতে ঢুকল!

আবার পিয়েরোঁ-বৌয়ের কথায় ওরা এসে গেল। কোম্পানি যখনই কোন অতিথি নিয়ে কুলি-ধাওড়া দেখাতে আসে, তারা সোজা যায় পিয়েরোঁ-বৌয়ের বাড়িতে। তার কারণ বাড়িখানি বেশ ঝকঝকে তকতকে। নিশ্চয়ই খনির সর্দারের সঙ্গে লটাপটির গল্প অতিথিদের কাছে কেউ করে না। তা তিন-হাজারী পিরিতের মানুষ জুটলে, কে না অমন পটের বিবি সেজে থাকতে পারে! তার উপরে কুঠির ভাড়া লাগে না, কয়লার দাম লাগে না—আর উপহারের কথা তো বাদই গেল। তা উপরটা যতই পরিষ্কার হোক, ভিতরটা তো একেবারে নোংরা। অতিথিরা যতক্ষণ পিয়েরোঁ-বৌয়ের বাড়ির ভিতরে রইল, ততক্ষণ অমনি আলাপ চলতে লাগল ওদের।

লেভাক-বৌ এবার বললে, ওরা এবার আসছে! খুব বেড়ানো হ'ল! ওগো, তোমার কুঠির পানেই দেখি চলল!

মেয়ুগিন্নীর ভয় হ'ল। আলঝির কি টেবিলটা সাফ করে রেখেছে? তার নিজের সুরুয়া তো এখনো তৈরি হয়নি। কোন রকমে বিদায় নিয়ে সে পড়ি-কি-মরি ছুটল। কোন দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই।

কিন্তু সব একেবারে ঝকঝকে তকতকে হয়ে আছে। আলঝির যখন বুঝলে যে, মার ফিরে আসতে দেরি আছে, সে একটা ঝাড়ন পরে নিয়ে সুরুয়া রাঁধতে বসে গেল। সে বাগান থেকে—যে-কটা রসুনের চারা বাকি ছিল—উপড়ে নিয়ে এল। কতগুলো সরেলও তুলে আনলে। এখন সে শাক-সব্জী বাছতে বসেছে। পুরুষদের স্নানের জন্য উনুনে চাপানো হয়েছে মস্ত কড়াইয়ে জল। আঁরি আর লেনোরও এখন শান্তশিষ্ট, ওরা মেঝেয় বসে একখানা পুরানো দেয়াল-পঞ্জীর পাতা ছিঁড়তে ব্যস্ত। আর বুড়ো দাদু বেনেমোর আস্তে আস্তে টানছে পাইপ।

মেয়ুগিন্নী ছুটে এসে হাঁফাচ্ছে, এরই মধ্যে হানাবু-গিন্নী এসে দরজায় ঘা দিলেন।

ওগো, কিছু মনে করনি তো?

লম্বা সুশ্রী হানাবু-গৃহিণী। চল্লিশের উপরে বয়েস। তাঁর দেহের পূর্ণতা এখন মেদবহুলতার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। জোর করে তিনি ভদ্রতার হাসি হাসছেন, নিজের ব্রোঞ্জ-রঙা রেশমী পোষাক আর মখমলের ওড়নাখানা নোংরা হবার ভয়ে তটস্থ, কিন্তু নিজের এই ভয় চেপে রাখছেন।

অতিথিদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আসুন, আসুন! না, না কারও অসুবিধে হবে না।...

বলুন তো—বাড়িখানা ঝক্‌ঝকে তকতকে কি না! আর আমাদের এই বাড়ির গিন্নীটির ক'টি বাচ্চা জানেন—সাত-সাতটি! আমাদের সমস্ত বাড়িগুলিই এমনি।

...আপনাদের তো বলেছি, কোম্পানি ওদের ছ' ফ্রাঙ্ক ভাড়ায় বাড়ি দিচ্ছে। নীচের তলায় মস্ত একখানা ঘর, উপরে দু'খানা ঘর, একটা সেলার, একখানা বাগান।

কেমন যেন হতবুদ্ধি নতুন অতিথিরা। সম্মানচিহ্ন-আঁটা ভদ্রলোক আর ফারকোট-পরা ভদ্রমহিলার দৃষ্টি আধ-বোজা। ও'রা প্যারী থেকে ভোরের ট্রেনে এসে নেমেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে পড়েছেন এই নয়া দুনিয়ায়। সবকিছু দেখে-শুনে হক্‌চকিয়ে গেছেন।

বাগানও আছে, ভদ্রমহিলা প্রতিধ্বনি করে উঠলেন। তাহলে এখানে তো বেশ থাকা যায়! সত্যিই সুন্দর জায়গা।

হানাবু-গিন্নী আবার বলতে লাগলেন, ওদের আমরা যা কয়লা দিই, তা পুড়িয়ে আরো বাঁচে। ডাক্তার সপ্তাহে দু'বার করে ওদের দেখে যায়। বুড়ো হলে ওরা ভাতা পায়। কিন্তু মজুরি থেকে আমরা কিছুই কেটে নিই না।

আর্কাদিয়া! ভদ্রলোক উচ্ছ্বাসভরে বলে উঠলেন। এ যে দেখছি দুধ আর মধুর দেশ। এখানে ধারা বয়।

মেয়ু-বৌ ব্যস্ত হয়ে ও'দের চেয়ার এগিয়ে দিতে গেল, কিন্তু ভদ্রমহিলারা বসতে চান না।

হানাবু-গিন্নী ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। সার্কাসের লোক যেমন জীবজন্তু দেখিয়ে ক্ষণিকের আমোদ পায়, এও যেন তেমনি। এরই মধ্যে তিনি বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। বেছে বেছেই বাড়িগুলোর ভিতর তিনি ঢুকেছেন, তবু দারিদ্র্যের সোঁদা গন্ধে তাঁর মাথা এখন ঝিমঝিম করছে। তা ছাড়া তিনি ধরতাই বুলিই আওড়াচ্ছেন—তাঁর ফটকের বাইরে এই যে মেহনতি মানুষের গোটা জাতটা মেহনতি করছে আর দুঃখ সইছে, এদের জন্যে তাঁর ঘুম নেই এমন নয়।

আহা কি সুন্দর ছেলেমেয়েরা! ভদ্রমহিলা বলে উঠলেন। আসলে তাঁর কাছে হতকুৎসিত বলেই ওদের মনে হচ্ছে। কি মস্ত মস্ত মাথা আর খড়ের মতো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া ওদের চুল!

তবু প্রশ্ন চলছে ভদ্রতার খাতিরে, মা ওদের বয়েস বলছে, এস্তেলের কথা বলছে। বুড়ো দাদু বনেমোরও শ্রদ্ধাভরে পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে নিয়েছে। কিন্তু তবু সে এক পরম উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে হানাবু-ঘরনীর কাছে। চল্লিশ বছর খনির তলায় থেকে একেবারে ভেঙে-চুরে একসা হয়ে গেছে বুড়ো —পা সোঁতে ফুলো, দেহ জরাজীর্ণ—মুখখানাও তার ফ্যাকাশে। এবার আবার কাশির দমক এল। বুড়ো ভাবলে বাইরে গিয়ে গয়ার ফেলবে। কি জানি ওর কালো কালো গয়ার হয় তো ভদ্রলোকদের ঘাবড়েই দেবে।

আলঝির খুব প্রশংসা পেল। আহা, খুদে গিন্নীর রকম দেখ না! একেবারে ঝাড়ন পরে তৈরি। এই বয়েসে এমন চালাক-চতুর মেয়ে! ওর মাও

ঝুড়ি ঝুড়ি প্রশংসাই পেল। কেউ ওর কুঁজের কথাটা উল্লেখই করলেন না, কিন্তু তবু দয়ার্দ্র চোখের করুণা বিগলিত দৃষ্টি বার বার পঙ্গু মেয়েটার উপর গিয়ে পড়তে লাগল।

হানাবু-গিন্নী এবার এই বলে শেষ করলেন, সব দেখলেন তো! কেউ যদি আপনাদের আমাদের মজুরপাড়ার কথা প্যারীতে জিজ্ঞেস করে, আপনাদের বলবার মতো খোরাক হ'ল। এর চেয়ে হই-চই কখনো এখানে হয় না। নীতি-জ্ঞানের দিক থেকেও একেবারে খাঁটি। সবাই এখানে সুখী। আর কত বলব, আপনাদের এখানে আসা উচিত। এমন বিশুদ্ধ হাওয়া, এমন নিরালা পরিবেশ আর দুটি মিলবে না।

সত্যিই চমৎকার! ভদ্রলোকটি ভাবাবেগে উদ্বেল হয়ে উঠলেন।

ও'রা এবার বেরিয়ে এলেন। মেলা থেকে বেরিয়ে-আসা মানুষের বিস্ময় ও'দের মুখে-চোখে। মেয়ু-বৌ ওদের এগিয়ে দিয়ে সিঁড়িতে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। ও'রা আস্তে আস্তে চলেছেন, জোরে কথা বলছেন। পথে ভিড়। মেয়েরা এখানে-ওখানে জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অতিথিদের আসার কথা শুনে তারা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে। ও'রা জটলা পার হয়ে চললেন।

পিয়েরোঁ-বৌও একবার দেখতে এসেছে। লেভাক-বৌয়ের সঙ্গে ঠিক তারই বাড়ির দোরগোড়ায় দেখা হয়ে গেল। দু'জনেই অবাক, মনে মনে ঈর্ষা। ও'রা কি মেয়ুদের বাড়িতেই রাতে থাকবেন নাকি? এমন তো আর আচ্ছা ডেরা নয়!

সব সময়েই তো ওরা দেউলে। আর কিই বা রোজগার! কিছু চাইতে গেলে—

এই তো আজ ভোরেই তো ভিখ্ মাঙ্তে বেরিয়েছিল গো। লা পিয়োলেং আর মাইগ্রাতের কাছে গেল। পয়সা তো দিতেই চায় না, শেষে যা হোক কিছু দিলে। মাইগ্রাত কি করে টাকা আদায় করে, তা মোরা জানি গো জানি!

ওর উপরে উসুল করে নেবে নাকি গো! না, না। তাতেও ধক্ লাগে! ক্যাথি ছুঁড়ির উপর উসুল করবে আর কি!

ভাল কথা। কিন্তু মাগীটার কি আস্পর্ধা জান, বলে ক্যাথির যদি ঐ দশা হয়তো টুঁটি টিপে সাবড়ে দেবে? যেন ঐ হোঁদল কুতকুত সাভালটা ওকে শেডে পেড়ে ফেলোনি।

চুপ, ঐ ওরা আসছে!

দুটি স্ত্রীলোক এবার যেন কিছু জানে না, এমনিভাবে দাঁড়িয়ে রইল। কোন বাজে কৌতূহল তাদের নেই এমনি ভাবখানা। শুধু অতিথিদের ট্যারচা চোখে চেয়ে দেখছে। এবার মেয়ু-বৌকে ইশারা করে ডাকলে। এখনো এস্তেল তার কাঁখে আছে। ওরা তিনজনে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। ভাল পোষাক-আষাক-পরা অতিথি আর হানাবু-গিন্নীর পেছন দিকটা দেখা যাচ্ছে। ও'রা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছেন। তিরিশ গজ যেতে না যেতেই এবার পূর্ণোদ্যমে চলল আলোচনা।

না গায়ে-গতরে মেলা জিনিস আছে গো; ওদের চেয়ে ঐ কাপড়-চোপড়ের কিম্মত বেশি।

ঠিক, ঠিক! আমি অন্য কাউকে জানি না, কিন্তু ঐ যে এখানকার ঐ মাগীটা, ও যত জাঁদরেলই হোক ওর জন্যে আমি চারটে পয়সা খরচ করতেও নারাজ। লোকে কত কথা বলে—

কি কথা গো?

ওর পিরিতের মানুষ আছে ঢের ঢের। পয়লা তো ইঞ্জিনিয়ার-সায়েবই রয়েছে।

ঐ হ্যাংলাপনা বাঁটুলটা। না, না, ও তো একেবারে বেঁটে। ওকে তো বিছানার চাদরের ভিতরেই মাগীটা হারিয়ে ফেলবে, সারা বিছানা ঢুঁড়লেও পাবে না।

তাতে কি, ওতেই যদি ওর ফুর্তি হয়? অমন দেমাকি মেয়েমানুষকে আমি বিশ্বাস করিনে। কোথাও গিয়ে ও যেন খুশী নয়। দেখ, দেখ কেমন পাছা দুলিয়ে চলেছে, যেন মোদের সবাইকে হেনস্তা করছে গো! বলি—এটা কি ভাল নাকি?

অতিথিরা তেমনি ধীরে ধীরে চলেছেন, এখনো আলাপ করছেন। গির্জার সুমুখে ওরা এসে গেলেন। একখানা গাড়ি এসে থেমে পড়ল। বছর আট-চল্লিশের এক ভদ্রলোক নেমে এলেন। গায়ে কালো ফ্রক-কোট, রংটা তামাটে। মুখে মালিকানার ভাব সুস্পষ্ট।

লেভাক-বৌ ফিসফিসিয়ে বলে উঠল, ঐ ওর ভাতার। গলা সে খাদে নামিয়ে আনল, বুঝি ভদ্রলোকটি শুনতে পাবে এই তার ভয়। ম্যানেজার তাঁর দশ হাজার কুলি আর কুলি-কামিনের উপর যে ভীতি ছড়িয়ে দিয়েছেন; সেই উপরওয়ালার ভয় তাকে পেয়ে বসেছে। ও তবু বললে; তেনার মুখচোখ দেখ না, বৌ যে পাঁচ-ভাতারি দেখলেই তো বোঝা যায়।

সমস্ত পাড়ার মেয়েরা এখন দোরগোড়ায় জটলা করছে। ওদের কৌতূহল এখন বাড়তি পথে। জটলা মিশছে জটলায়—এখন তো ভিড়ে ভিড়। আর খুদে পাজীগুলো ফুটপাতের উপর ছুটোছুটি করছে। ওদের নাক দিয়ে ঝরছে পোঁটা, হাঁ করে ওরা তাকিয়ে আছে। ইস্কুল-ঘরের সামনের ভিতর দিয়ে এবার ইস্কুলমাস্টারের বিবর্ণ মুখখানাও দেখা দিল। উনিও উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখছেন। বাগানে যে লোকটা মাটি খুঁড়ছিল, সেও শাবলে ভর দিয়ে গোল্লা গোল্লা চোখ মেলে চেয়ে আছে। আলাপ-আলোচনা ক্রমশই চড়ছে, খালি গুজগুজ ফুসফুস। এ যেন শুকনো পাতায় দমকা হাওয়ার মাতুনি।

লেভাক-বৌয়ের দোড়গোড়াই ভিড় জমেছে বেশি। দুজন, দশজন, বিশ-জন করে বাড়ছে ভিড়। এখন শোনার লোক অনেক। পিয়েরোঁ-বৌ বুদ্ধি করে চুপ করে আছে। মেয়ু-বৌয়েরও বুদ্ধি কারো চেয়ে কম নয়, সেও এখন শ্রোতা। এস্তেল জেগে উঠে ট্যাঁ ট্যাঁ করেছে আবার। তাকে শান্ত করবার জন্যে এই প্রকাশ্য দিবালোকেও সে একটা মাই বার করে দিয়েছে। সেটা দুধেলা গাইয়ের বাঁটের মতো ঝুলে আছে। বাঁট দোয়াবার কালে যেমন ঝোলে, তেমনি থল্ থল করে ঝুলছে। মঁসিয়ে হানাবু এবার ভদ্রলোকদের পিছনের আসনে বসিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিলেন। মার্সিয়েনের দিকে ছুটেছে গাড়ি। শেষবারের মতো কথার তুবড়ি ছুটেছে। মেয়েরা সবাই অঙ্গভঙ্গী করছে। সবাই কথা বলছে—যেন পিঁপড়ের গাঁদিতে শুরু হয়েছে বিপ্লব।

তিনটে বাজল। মাটি-কাটিয়ে মজুরদল রওনা হ'ল। ব্যুতেলুপও চলে গেল। হঠাৎ গির্জার কোণে দেখা গেল খনির মজুরদের পয়লা দলকে। একেবারে কালি-ঝুলিমাখা মুখ, ঘামে জবজবে শরীর, হাত জড়ো করা, পিঠ কুঁজিয়ে গেছে ওদের। এবার মেয়েদের দলে সাড়া পড়ে গেল। সবাই বাড়ি-মুখো ছুটছে। কাফি আর গুজ গুজ ফুসফুসের পালা শেষ, এবার তাড়াতাড়ি বাড়ি ছোটার পালা। এখন শুধু উদ্বিগ্ন চীৎকার শোনা যাচ্ছে,

আ আমার কপাল! এখনো সুরুয়া তৈরি হ'ল না।

গৃহবিবাদের বীজ ওদের চীৎকারে।

চার

এতিয়েঁকে রাসেনারের ওখানে দিয়ে মেয়ু বাড়ি ফিরল। এসে দেখলে, ক্যাথেরিন, জাচারি আর জাঁলিন টেবিলে বসে তাদের সুরুয়া খাওয়া সাঙ্গ করছে। পিট থেকে ফিরে বাড়ি এসে এমন খিদে পায়, ঐ ঘামে-ভেজা কাপড়-চোপড় নিয়েই ওরা বসে যায়। ধোয়া-পাখলার কথা ভাবেই না। কেউ না কেউ বসে সবসময়েই খাবার খায়। পালা অনুসারে ওদের এই ব্যবস্থা।

দরজা খুলেই মেয়ু খাবারের আয়োজন দেখে নিলে। কথা নেই, কিন্তু উদ্বেগও নেই মুখে। সারা সকাল ধরে কয়লার স্তরে গাঁইতি চালাতে-চালাতে সে ভেবেছে ফাঁকা আলমারির কথা। বাড়িতে ছিটে-ফোঁটা কফিও নেই, মাখন নেই—এতেই সে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। কয়লার গুড়োয় দম বন্ধ হয়েও এই কথাই ভেবেছে। কি করে বৌ চালাবে? আর ও যদি খালি হাতে ফেরে, কি হবে তাদের উপায়? আর এখন—চেয়ে দেখ না! সবই আছে। কি করে যোগাড় হ'ল সে কথা না হয় পরে শোনা যাবে।

মেয়ুর মুখে স্বস্তির হাসি।

ক্যাথেরিন আর জাঁলিন এরই মধ্যে টেবিল থেকে উঠে পড়েছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কফির গেলাসে চুমুক দিচ্ছে। জাচারির সুরুয়া খেয়ে পেট ভরেনি, সে একখানা রুটির সরু টুকরো কেটে নিয়ে তাতে মাখন মাখাচ্ছে। শুয়োরের মাংসের প্লেটটাও তার নজরে পড়েছে। তবে সেটা ছোঁয়নি। ওরা খেয়ে নিলে। হপ্তার শেষে জলই ভাল পানীয়।

বাপ বসতেই মেয়ু-বৌ বললে, বীয়ার কিন্তু পাইনি। আমি কয়েকটা টাকা রেখেছি। তা তোমার যদি লাগে, ঐ খুদে ছোঁড়াটা গিয়ে এক পাঁইট নিয়ে আসুক।

মেয়ুর মুখচোখ ঝলমল করে উঠল। সে কি? টাকাও এনেছে বৌ!

সে বললে, না, না। ঠিক আছে, আমি এক গেলাস মেরে এসেছি।

আস্তে আস্তে চামচে দিয়ে রুটি, আলু, পেঁয়াজ আর সরেল পাত্র থেকে নিয়ে খেতে লাগল।

এই পাত্রটাই ওর প্লেট, অন্য প্লেটের দরকার হয় না। মেয়ু-বৌ এখনো এস্তেলকে কাঁখ থেকে নামায়নি। কাঁখে নিয়েই আলঝিরকে এটা-ওটা দিতে

সাহায্য করছে। মেয়ুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে মাখন আর মাংসের প্লেটটা। তারপর কফি গরম করবার জন্য পাত্রটা বসিয়ে দিলে উনুনে।

এরই মধ্যে আগুনের কুণ্ডের কাছে ওরা ধোয়া-পাখলা শুরু করেছে। আধখানা পিপে দিয়েই টবের কাজ সারছে। ক্যাথেরিনের পালা পয়লা। সে গরম জলে পিপেটা ভরতি করে দিলে। তারপরে একটুও সরম না করে খুলে ফেললে কাপড়-চোপড়। টুপিটা খুলে রাখলে, তারপর কাঁচুলি, পায়জামা— এমন কি শেমিজটাও বাদ গেল না। আট বছর বয়েস থেকে এ ব্যাপারে সে অভ্যস্ত। এখন বয়েস হয়েছে, কিন্তু এতে কোন লাজলজ্জা নেই। শুধু আগুনের দিকে একটু ঘুরে বসল। তারপরে নরম সাবানখানা দিয়ে জোরে গা রগড়ানো শুরু হয়ে গেল। কেউ তার দিকে তাকিয়ে নেই। লেনোর আর আঁরিরও আর ওকে ন্যাংটো দেখার কৌতূহল নেই। সাফ্সুতরো হয়ে সে এবার একেবারে ন্যাংটো হয়েই উপরে চলে গেল। ভিজে শেমিজ আর কাপড়-চোপড়ের স্তূপটা মেঝেয় পড়ে রইল। এবার দু'ভায়ে শুরু হয়ে গেল ঝগড়া। জাঁলিন টবে লাফিয়ে পড়তে চায়। তার ওজুহাত—জাচারি তো এখনো খাচ্ছে। জাচারি এসে তাকে ঠেলা মেরে সরিয়ে দিলে। তার পালা সে ছাড়বে কেন? ক্যাথেরিনকে সে দয়া করে পয়লা ধোয়া-পাখলা করতে দিয়েছে, কিন্তু তাই বলে ঐ খুদে শয়তানটার গা-ধোয়া ময়লা জলে সে স্নান করবে নাকি। জাঁলিন আগে চান করলে তো ইস্কুলের কালির দোয়াতের মতো জলের অবস্থা দাঁড়াবে। শেষে দুজনে রফা হয়ে গেল। দু'জনে এক সঙ্গে স্নান সারল। ওরাও ঘুরে বসল আগুনের দিকে মুখ করে, দলাই-মলাইয়ে দু'জনে দু'জনকে সাহায্য করলে। তারপরে বোনের মতোই ন্যাংটো হয়ে চলে গেল উপরে।

মেয়ু-বৌ মেঝে থেকে কাপড়-চোপড় তুলে এনে মেলে দিতে দিতে বললে, উঃ, কি ঝগড়াটাই করে দেখ না! আলঝির, এবার ঘরটা একটু মুছে নে!

দেয়ালের ওপাশে গোলমালে বাধা পেল মেয়ু-বৌ। পুরুষের গালাগাল, আর মেয়ের চীৎকার। লড়াই লেগে গেছে, ছুটে পালাবার শব্দ। তারপরেই ফাঁপা কিলঘুষির শব্দ—মনে হয় যেন ফাঁপা বস্-এর উপর কে যেন পেটাচ্ছে।

ঐ লেভাক-বৌ আদর খাচ্ছে ভাতারের, মেয়ু আস্তে আস্তে বললে, সে পাত্রের তলাটা চামচে দিয়ে কেঁখে নিচ্ছে। আচ্ছা মস্করা তো! বুতেলুপ বুঝি সুরুয়াটুকু চেটেপুটে খেয়ে গেছে!

হাঁ, খেয়ে গেছে না ছাই? মেয়ু-বৌ বললে, এখনো শাকসবজি ডাঁই হয়ে পড়ে আছে টেবিলে, খোসা ছাড়ানোই হয়নি।

চীৎকার দ্বিগুণ হয়ে উঠল আর শেষ হ'ল গুরুভার পতনে। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ নড়ে উঠল দেয়াল। তারপরে আবার চুপচাপ। শেষটুকু খেয়ে মেয়ু বিচারকের মতো নিরপেক্ষ রায় দিলে, তা ঠিকই তো। সুরুয়া তৈরি না হলে বোঝই তো কি দশা হয়।

এক গেলাস জল খেয়ে আবার মাংসের প্লেটের উপর পড়ল। চৌকো টুকরো কেটে ছুরির ডগায় ফুঁড়ে রুটির সঙ্গে খেতে লাগল। কাঁটা ব্যবহার করল না। বাপ যখন খায় কেউ কথা বলে না। মাইগ্রাত যে টিনে-ভরতি মাংস বেচে এ তেমনিটি নয়। আর কোথা থেকে এনেছে, কিন্তু বৌকে কোন প্রশ্ন সে করলে না, নিঃশব্দে খেয়ে চলল। সে শুধু জানতে চায়, বুড়ো কি এখনো

ঘুমিয়ে আছে নাকি! না, বুড়ো দাদু অভ্যেস মতো বেড়াতে বেরিয়েছে।

আবার সব চুপচাপ।

কিন্তু মাংসের গন্ধে লেনোর আর আঁরি তাদের জল দিয়ে নদী-নদী তৈরি খেলা ফেলে মুখ তুলে তাকাল। দুজনেই এসে বাপের দুপাশে দাঁড়িয়েছে। খুদে ছেলেটা বাবার সামনে এগিয়ে গেছে। টুকরোগুলো যেন চোখ দিয়ে গিলছে। যখনি প্লেট থেকে বাপ তুলছে, ওদের তখন বড় আশা; কিন্তু তার মুখের ভিতরে মিলিয়ে যেতেই হতাশ হয়ে পড়ছে। অবশেষে বাপের নজরে পড়ল। মুখ দুখানা ফ্যাকাশে মেরে গেছে, এক বুভুক্ষু লোলুপতায় ঠোঁট লালায় ভরে উঠেছে।

সে শুধালে, বাচ্চারা পেয়েছে তো?

বৌ একটু ইতস্তত করলে। বাপ আবার বললে, দেখ, আমি এইগুলো ভালবাসিনে। এতে আমার খিদেই উবে যায়। ওরা টুকরো-টাকরার জন্যে এমন ঘুর ঘুর করে, এ আমার সয় না।

বৌ রেগে উঠে বললে, ওরা পেয়েছে বইকি? ওদের কথা শুনে তোমার ভাগ বিলিয়ে দিতে পার। পার তো অন্যের ভাগও দিয়ে দাও। ওরা খেয়ে খেয়ে পেট ফেটে মরুক। আলঝির, আমরা মাংস খাইনি—তুই-ই বল না?

হাঁ গো, খেয়েছি। খুদে মেয়েটা বলে উঠল। এ ব্যাপারে ও যে-কোন বড় মানুষের মতোই বেশ মিছে বলতে পারে।

লেনোর আর আঁরি কথাটা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল। মিছে কথায় ওরা ফুঁসে উঠেছে। অথচ মিছে কথা বললে, ওরা তো বেত খায়। ওদের মন বিদ্রোহ করে উঠছে, ওরা প্রতিবাদ জানাতে চায়—বলতে চায়—আর সবাই যখন তাদের ভাগ খেয়েছে, তখন ওরা তো এখানে ছিল না।

ওদের ঘরের আর-এক কোণে তাড়িয়ে দিয়ে মা বললে, যা! তোদের বাপের পাতে ভাগ বসাতে লজ্জাও করে না। তা ও যদি একাই মাংস খায়, তাতেই বা কি হয়েছে! ও কাজ করে না! আর তোরা তো নিষ্কর্মার ধাড়ী—বসে বসে শুধু গিলিস! হ্যাঁ, বড় যত না হও, পেটটি তো বাড়ছে!

মেয়ু ওদের ডাকলে। লেনোর আর আঁরিকে দুই হাঁটুর উপর বসিয়ে নিলে। ওরা ভাগাভাগি করে মাংস খাবে। মাংস ছোট ছোট টুকরো করে দুজনকে ভাগ করে দিলে। ওরা গোগ্রাসে গিলছে। কি স্ফূর্তি!

খাওয়া শেষ করে মেয়ু বৌকে বললে, আমায় কফিটা আগে দিয়ো না। হাত-পা ধুয়ে নিই। আগে এস ময়লা জল ফেলে দিই।

দুজনে টবের হাতল ধরাধরি করে দরজার পাশের নর্দামাটায় ঢেলে দিলে। জাঁলিন এবার শুকনো কাপড়-চোপড় পায়জামা, ঢিলেঢালা কোর্তা পরে নেমে এসেছে। এগুলো তার ভাইয়ের ছিল, রং জ্বলে গেছে। ওকে খোলা দরজা দিয়ে চুপি চুপি সরে পড়তে দেখে মা থামাল।

কোথায় যাচ্ছিস?

ঐ হোথায়?

কোথায়? শোন, যা আজকের রাতের সালাদের জন্য পাতা তুলে নিয়ে আয়। বুঝলি? যদি সালাদ পাতা না নিয়ে আসিস তখন টের পাবি!

আচ্ছা, আচ্ছা!

জাঁলিন পকেটে হাত ডুবিয়ে জুতো খট খট করতে করতে চলে গেল। দশ বছর তার বয়েস। একেবারে ঝুনো মজুরের মতো হাড়সার পাছা দুলিয়ে চলেছে। জাচারি এবার নেমে এল। বেশ-বাসে বেশ পারিপাট্য আছে। হাতে-বোনা কালো পশমের এক কোর্তা, তাতে নীল ডোরা। বাপ ডেকে বললে, বেশি রাত না করতে, সে পাইপ মুখে চেপে মাথা নেড়ে বিদায় নিলে। একটা জবাবও দিলে না। আবার টবে গরম জল ভরতি হয়েছে। মেয়ু আস্তে আস্তে কোট খুলে ফেললে। আলঝির লেনোর আর আঁরিকে নিয়ে বাইরে খেলতে গেল। বাবা সকলের সামনে গা-ধুতে নারাজ। পাড়ার সব বাড়িতেই এই রেওয়াজ, কিন্তু এখানে নেই। সে কারো সমালোচনা করে না। শুধু বলে ছেলেপুলেদের সামনে ধোয়া-পাখলা না করাই ভাল।

মেয়ু-বৌ সিঁড়ি থেকে হাঁক পেড়ে বললে, কি করছিস লা ওখানে বসে!

কাল পোষাকটা ছিঁড়ে গেছে, সেলাই করছি! ক্যাথেরিন উপরতলা থেকে বললে।

আচ্ছা, এখন যেন নীচে নামিস নে! তোর বাবা গা ধুচ্ছে।

মেয়ু আর তার বৌ এখন ঘরে একা। মেয়ু-বৌ এস্তেলকে চেয়ারে বসিয়ে দিতে চাইল। কি আশ্চর্য, তাত লেগে সে এখন আর চীৎকার করছে না। ড্যাবডেবে অভিব্যক্তিহীন চোখ মেলে সে চেয়ে আছে বাপ-মার দিকে। এখনো সে অবুঝ। বাপ উবু হয়ে বসেছে টবের সামনে। প্রথমে সাবানের ফেনা-মাখা মাথা ডুবিয়ে আবার তুলে নিলে। পুরুষানুক্রমে এই একই সাবান মেখে-মেখে ওদের চুলের জলুস নষ্ট হয়ে গেছে। এখন তো একেবারে হলদে চুল। এবার ও টবে নেমে পড়ল; বুকে, পেটে, হাতে পায়ে সাবান মাখছে, জোরে রগড়াচ্ছে দু'হাত দিয়ে। বৌ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছে।

সে এবার বললে, তুমি যখন এসে ঢুকলে, তোমার মুখের চেহারা দেখনু গো! তুমি তো ভেবেই সারা হচ্ছিলে। তাই না গো? তারপর খাবার দেখে চাঙ্গা হয়ে উঠলে। ভাব তো একবার, তোমার ঐ লা পিয়োলে'র ভদ্দর আদমীরা একটা পয়সাও দিলেন না! তবে দয়ামায়া আছে গো, বাচ্চাদের পোষাক দিয়েছে! আমি আর কিছু চাইনি গো, আমার বড় হেনস্তা লাগে।

সে কথা থামিয়ে এস্তেল যাতে পড়ে না যায় তাই চেয়ারে ভাল করে শুইয়ে দিতে গেল। বাপ তখনো গা রগড়াচ্ছে। মেয়ুর কৌতূহল বাড়ছে, কিন্তু সে কিছু জিজ্ঞেস করলে না, বলার অপেক্ষায় রইল।

তোমাকে বলব কি মাইগ্রাত তো কুকুরের মতো আমাকে দূর-দূর করে খেদিয়ে দিলে গো। ভাব তো, কি তখন আমার দশা। পশমী জামা মুড়ে না হয় গা-গতর গরম করলে, কিন্তু খালি পেট তো আর ভরবে না। ভরে নাকি গো, বল না?

মেয়ু মুখের দিকে তাকাল, কিন্তু মুখে রা নেই। লা পিয়োলে' থেকে কিছু পায়নি, মাইগ্রাতের কাছ থেকেও না; তাহলে পেল কোথা থেকে? কিন্তু মেয়ু-বৌ যে রোজকার অভ্যেসমতো হাতা গুটিয়ে নিচ্ছে—ওর পিঠ রগড়ে দেবে। যেখানে যেখানে হাত নাগাল পায় না, সেখানেও দেবে। যাহোক, ও যখন সাবান মাখায়, কাঁধ রগড়ে দেয়, বেশ লাগে। সে শরীর টান করে ওর আক্রমণের জন্য তৈরী হয়ে থাকে।

তাই আবার মাইগ্রাতটার ওখানেই গেলাম, তাকে সব কথাই বললাম, না গো না, আদ্ধেকও বলিনি। কই, ওর তো দয়ামায়া বলে কোন কিছুর বালাই নেই। যদি পিথিমিতে বিচার থাকে, তাহলে দেখো ওর কি দশা হয়। ও যেন কেমন ঘাবড়ে গেল, চোখ গোল্লা গোল্লা করে তাকালে। মনে হল, তখনি বুঝি ভয়ে পালায় গো !...

এবার পিঠ থেকে পাছায় রগড়ানো চলল। জোর রগড়ানো, শরীরের হেন জায়গা নেই ও দলাই-মলাই করে দিলে না। এখন ওর শরীরখানা যেন শনি-বারের বাসন-কোসন ঘষামাজা করার পরে তিনটে সসপ্যানের মতো ঝক্ঝক করছে। কিন্তু হাতের এই মেহনতিতে দরদর করে ঘাম ঝরতে লাগল। একে-বারে হাঁপিয়ে গেছে, গলা বুজে আসছে।

ও আমাকে শেষে গালমন্দ দিলে গা...যাহোক, শনিবার অবধি চলবে এমনি রুটিও পেলাম। তা ছাড়া পাঁচটা টাকাও ধার পেলাম। মাখন, কাফি, সবই ধার পেলাম। এমন কি, মাংস আর আলুও ধার পেতাম, কিন্তু মরদটা দেখি গজর গজর করছে। তা সাত আনা লাগল মাংসে, আঠারো আনা গেল আলুতে —মোর কাছে এখনো তিন টাকা ক'আনা আছে। তা দিয়ে সুরুয়া আর মাংসের দাম কুলিয়ে যাবে। তাহলে ভোরটা বরবাদ হয়ে যায়নি, কি বল ?

এখন ও তোয়ালে দিয়ে যেসব জায়গায় জল তাড়াতাড়ি শুকোয় না, সেই সব জায়গাগুলি মুছে মুছে দিচ্ছে। মেয়ুও খুশী, ভবিষ্যতের ঋণ বাড়ল সেকথা কে ভাবে! সে হেসে উঠে ওকে কাছে টেনে নিলে—

এই কি করছ গা! ইস—দিলে তো গা-গতর ভিজিয়ে! শুধু একটা কথা বলি গো—মাইগ্রাত বেটার ভাবগতিক ভাল না!

ক্যাথেরিনের নাম করতে গিয়ে মেয়ু-বৌ চেপে গেল। কি হবে বাবাকে বিরক্ত করে! তারপরে তো আর কথা শেষ হবে না।

কি ভাবগতিক ?

কি আবার! জোচ্চুরি! ঠকাতে চায় মোদের। ক্যাথি ভাল করে হিসেবটা দেখবে'খন। আবার মেয়ু তাকে জড়িয়ে ধরল; এবার ছেড়ে দিল না। স্নান শেষে রোজই এমনি হয়। অমন করে রগড়ে দিলে ওর উত্তেজনা বেড়ে যায়, তার উপরে বৌ আবার তোয়ালে দিয়ে মুছে দেয় সারা গা, বুকের আর এখান-ওখানের লোমে সুড়সুড়ি লাগে। এই সময়েই গাঁয়ের মরদরা পরিবারের সংগে স্ফূর্তি করে, আর কেউ না চাইলেও এই সময়েই মেয়েদের সন্তান সম্ভাবনা হয় বেশি। রাতে তো হয় না, তখন সবাই থাকে। মেয়ু ওকে টেবিলের কাছে ঠেলে নিয়ে গেল। ঠাট্টা-তামাশা করে এই মুহূর্তটিকে স্মরণীয় করে রাখতে চাইছে, এই তো ওদের সারা দিনের মধ্যে একটি উপভোগের ক্ষণ। একে ওরা বলে খাওয়ার পরে মিষ্টিমুখ। মিষ্টি মুখ মাগনাই হয়—আর কি চাই! মেয়ু-বৌ মোটাসোটা গতর আর ঝুলে-পড়া মাই নিয়ে একটু বা ধস্তাধস্তি করলে। ঠাট্টা করেই করলে।

আঃ, তুমি আচ্ছা পাজী তো! বাবাঃ কি লোক! ঐযে এস্তেলটা প্যাট্ প্যাট্ করে তাকিয়ে আছে। সবুর, সবুর, ওর মুখখানা ফিরিয়ে দিই।

থাক, থাক, বাজে বকতে হবে না। তিন মাসের বাচ্চা যেন সব বোঝে!

ব্যাপারটা শেষ করে মেয়ু শুকনো পাজামা পরে নিলে। স্নানের পরে

বৌয়ের সঙ্গে মজা সেরে সে খানিকক্ষণ আদুল গায়ে থাকে। তার গায়ের রং রক্তহীনা মেয়েদের মতো—এখানে ওখানে চামড়ার উপর কয়লায় ছড়ে যাওয়া দাগ। খনির মজুররা এইগুলিকে আদর করে বলে খনির বক্‌শিশ। তাদের এতে ভারি গর্ব—নিজের শিরালো বাহু ছড়িয়ে দিয়ে বুক চিতিয়ে দেখায় খনির এই দাগ। ঘষা মাজা বুক আর বাহুর নীলচে শিরাগুলো যেন মর্মর পাথরের মতো ঝকঝক করে ওঠে। গ্রীষ্মকালে খনির মজুরদের এমনি দোরগোড়ায় আদুল গায়ে বসে থাকতে দেখা যায়। এখন যে স্যাঁতসেঁতে শীতকাল, তবু মেয়ু এক লহমার জন্যে বাইরে এসে এক সাঙাৎকে উদ্দেশ্য করে একটা বাজে ঠাট্টা করে বসল। সেও আদুল গায়ে বাগানের ওপাশের বাড়ির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। আর সবাইও বেরিয়ে এসেছে। ছেলেমেয়েরা খেলছে পথে, ওরা মুখ তুলে তাকিয়ে হাসছে, মজুরদের মুক্ত হাওয়ার আনন্দের ছোঁয়া লেগেছে ওদের গায়ে।

শার্ট না গায়ে গলিয়েই মেয়ু কাফিতে চুমুক দিলে। কাঠের ব্যাপার নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারটা কিরকম ক্ষেপে গিছল। সেও ক্ষেপে উঠেছিল, কিন্তু শান্ত হয়েছে। বৌয়ের পরামর্শে সায় দিচ্ছে। মেয়ু-বৌ এসব ব্যাপারে যথেষ্ট বুদ্ধি রাখে। সে বলে কোম্পানির বিপক্ষে মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়ালে, লড়াই করলে কোন ফায়দা নেই। তারপরে সে হানাবু-গিন্নীর আসার কথা বললে। মুখ ফুটে বললে না বটে, কিন্তু ম্যানেজারের গিন্নীর আগমনে ওরা গর্বিত।

এবার নীচে নামব? ক্যাথেরিন সিঁড়ির উপর থেকে হাঁক পাড়লে।

হাঁ, হাঁ, আয়। তোর বাপ এবার শুকিয়ে খট্‌খটে হয়েছে।

রোববারের ভাল পোষাক পরেছে ক্যাথেরিন। একটা ঘন নীল রঙের পুরানো পপলিনের স্কার্ট। এরই মধ্যে রং জ্বলে গেছে, ভাঁজে ভাঁজে ছেঁড়া। আর মাথায় একটা সাদাসিদে কালো কাপড়ের টুপি।

সাজগোছ করে চলেছিস দেখি! কোথায় যাওয়া হবে?

মঁতসুতে যাব, টুপির একটা ফিতে কিনতে হবে। পুরানো ফিতেটা খুলে ফেলেছি। বড্ড নোংরা হয়ে গেছে।

তাহলে তোর কাছে টাকা আছে বল্?

না—মোকের মেয়ে বলেছে দশ সু ধার দেবে।

দেখ্, মাইগ্রাতের ওখানে কিনতে যাস নে। ও বেটা তো ডাকাত! আর ভাববে, মোদের টাকার আণ্ডিল আছে।

বাপ আগুনের ধারে বসে গলা আর বগল মুছতে মুছতে বললে,

সন্ধ্যের পরে আর পথে ঘুর ঘুর করিস নে, তাড়াতাড়ি চলে আসিস।

মেয়ু বিকেলটা বাগানে কাজ করে কাটায়। এরই মধ্যে সে আলু, বীন, মটরশুঁটি বুনেছে। এখন বাঁধাকপির চাষ করছে, লেটুসের চারা পুঁতছে। এগুলো সে রাতে জিইয়ে রেখেছিল। এই এক ফালি বাগান, এতেই ওদের শাক সবজী কুলিয়ে যায়। তবে আলু কিনতে হয়—তেমন ফলে না আলু। মেয়ু বাগানের কাজে দড়ো, সে আর্টিসচোকস্‌ও ফলায়। পড়শীরা ভাবে, ওযে মালীর কাজে দড়ো তাই বুঝি দেখ্ ছে! আল বাঁধছে মেয়ু, লেভাক এর মধ্যে তার ফালি বাগানটুকুতে এসে পাইপ টানতে টানতে দাঁড়াল। লেটুসগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। ঐগুলো ভোরবেলা ব্যুতেলুপ লাগিয়ে গেছে। বাসাড়ে

ঝুপতেলুপ না থাকলে ওখানে কাঁটা ঝাড় ছাড়া আর কিছু গজাত না। বেড়ার দুধার থেকেই কথাবার্তা শুরু হয়ে গেল। লেভাক বৌকে দু-এক ঘা কষিয়ে এখন চাঙ্গা; সে মেয়ুকে পেড়াপীড়ি করলে, তার সঙ্গে রাসেনারের সরাইখানায় গিয়ে খেতে, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। আরে চল না সাঙাৎ! আর এক গেলাসে ভয় কি? এক হাত জুয়োও খেলা যাবে'খন, একটু বাত্‌চিতও করা যাবে—তারপর রাতের খাওয়ার আগেই বাড়ি ফেরা। কাজের পালা সেরে এই তো করণীয় ব্যাপার, এতে ক্ষতিটা কি? কিন্তু মেয়ু নাছোড়বান্দা; এখন লেটুসের চারাগুলো না লাগালে কালই এগুলো মরে যাবে। ও তো অজুহাত, নিজেরই সুবুদ্ধি হয়েছে। পাঁচটা ফ্রাঙ্কের উদ্‌বৃত্ত দশ সু সে স্ত্রীর কাছ থেকে নিতে চায় না।

পাঁচটা বাজল। পিয়েরোঁ-বৌ এসে জিজ্ঞেস করলে, ওদের লিদি জাঁলিনের সঙ্গে বেরিয়েছে কিনা। লেভাক জবাব দিলে, তাই-ই হবে। তাদের বেবের্তও উধাও হয়েছে। আর এই বাচ্চাক'টার ভারি পোটসোঁট, এক সঙ্গেই ঘুর ঘুর করে বেড়ায়। মেয়ু ওদের সালাদ পাতার কথা বলে নিশ্চিন্ত করলে। এবার সে আর তার সাঙাৎ স্থূল রসিকতা শুরু করলে পিয়েরোঁর জোয়ানী বৌয়ের সঙ্গে। বৌ রেগে টং কিন্তু চলে যায় না তবু, বরং কথাগুলো ভালই লেগেছে। ও শুনে চেঁচিয়ে উঠছে বার বার। এবার হাড়সার এক মেয়েমানুষ বেরিয়ে এসে ওকে উদ্ধার করলে। সে যেন মাদী কুঁকড়োর মতো চেঁচানি শুরু করেছে। রাস্তার ওপাশের দোরগোড়া থেকে কিছু না জেনে ওর পক্ষ সমর্থন করতে লাগল। ইস্কুলের ছুটি হ'ল। বাচ্চারা এবার ছুটোছুটি করছে এদিক-ওদিকে, এক ঝাঁক ছেলেমেয়ে, কেউ বা চিল্লাচ্ছে, কেউ বা গড়াগড়ি যাচ্ছে, কেউ বা করছে লড়াই। যাদের বাপরা সরাইখানায় যায়নি, তারা দেয়ালের ধারে পা ছড়িয়ে বসেছে দুজন তিনজন করে। খনির ভিতরেও ওরা এই ভঙ্গীতেই বসে। পাইপ টানছে আর দু-একটা কথা বলছে। লেভাক পিয়েরোঁ-বৌয়ের ঊরু টিপে পরখ করে দেখতে গেল শক্ত কিনা; পিয়েরোঁ-বৌ অমনি ফোঁস করে উঠে হনহন করে চলে গেল।

হঠাৎ এল গোধূলি। মেয়ু-বৌ আলো জ্বালালে। মেয়ে আর ছেলেরা এখনো ফেরেনি দেখে তার উদ্বেগ। ও তো বোঝে—রাতের খাবারের সময়ও ওরা একসঙ্গে জড়ো হতে চায় না। আবার সালাদ পাতার জন্যেও বসে থাকতে হচ্ছে। এখনো কি পাতা খুঁটে চলেছে নাকি ছেলেটা, এদিকে তো উনুনের মতো কালোয় কালো হয়ে গেল চারদিক। সুরুয়া রাঁধছে, কড়ায়ে ফুটছে টগবগ করে। সালাদ হলে জমতো ভাল, কড়ায়ে এখন সেদ্ধ হচ্ছে আলু, আর সরেল পাতা, তার সঙ্গে আবার পেঁয়াজ কুচি ভাজা। সারা বাড়িতে ভাজা পেঁয়াজের খোসবাই। অমন চমৎকার গন্ধ আর কিছুক্ষণ পরেই বদগন্ধ ছাড়বে। এই কুলি-ধাওড়ার ইটে ইটে গন্ধ রেখে যাবে। দূর থেকেও লোকে বুঝবে, গরীব-গুরবোর রান্না চড়েছে।

রাত হ'ল। মেয়ু বাগান থেকে ফিরে এল। দেয়ালে মাথা ঠেস দিয়ে চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে পড়ল। রাতে বসলেই ওর ঘুম পায়। কুহু-ডাকা ঘড়িতে সাতটা বাজল। আলঝিরকে টেবিলে খানা সাজাতে সাহায্য করতে গিয়ে লেনোর আর আঁরি একটা প্লেট ভেঙে ফেললে। বুড়ো দাদু বনেমোর এল

প্রথমে। তার তাড়া আছে, কাজে যেতে হবে। মেয়ু-বৌ এবার তার স্বামীকে ডেকে দিলে।

এস, আমরা শুরু করে দিই। ওরা বড় হয়েছে, ঠিক বাড়ির পথ খুঁজে পাবে। কিন্তু সালাদ যে তৈরি হ'ল না!

পাঁচ

রাসেনারের সরাইখানায় সুরুয়া খেয়ে এতিয়েঁ তার ছোট্ট খুপরিতে চলে এল। কুঠরিটা ভোরোর একেবারে মুখোমুখি। এই তার ডেরা। সে পোষাক-আষাক নিয়েই বিছানায় গা এলিয়ে দিল। বড় ক্লান্ত। দু'দিন ধরে চার ঘণ্টাও যে ঘুমোয়নি। গোধূলি হতে সে জেগে উঠল। কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেছে, নিজের পরিবেশ চিনতে পারে না। কেমন অস্থির-অস্থির ভাব, মাথাটাও ভারী। ঠাণ্ডা হাওয়া লাগাতে উঠে পড়ল। রাতের খাওয়ার আগে চাঙ্গা হয়ে নিতে হবে তারপর ঘুম দেবে একেবারে রাতের মতো।

বাইরে আবহাওয়া এখন একটু ভাল; কালো ঝুলমাখা আকাশটায় রং ফিরেছে। সীসের রং দেখা দিয়েছে। উত্তর অঞ্চলের বৃষ্টির সংকেত। গুমোট গরমে সে-সংকেত এখন সুস্পষ্ট। রাত এল কুয়াশার ওড়না টেনে দিয়ে, দূরের দৃশ্য আর প্রান্তর একাকার করে দিলে। এই লাল মাটির সমুদ্রে নীচু হয়ে আসা আকাশ যেন কালো ধুলোয় মিশে গেছে। এক ঝলক হাওয়া নেই, ছায়ারা কাঁপে না। এ যেন কবরখানার বিষাদ-ঘন ছায়া ব্যেপে আছে। অন্ধকার জীবন্ত হয়ে উঠছে না সঞ্চরমান ছায়ায়।

এতিয়েঁ পথে নেমে এল। ঘুরে বেড়াচ্ছে আনমনে, তার মাথা ধরাটা কমাতে চায়। লা ভোরোর পাশ দিয়ে যেতে-যেতে থেমে পড়ল। দিনের কাজের পালা সাঙ্গ করে ফিরছে মজুররা। লা ভোরো এখন যেন গহ্বরের গভীরে লুকিয়ে আছে। এখনো একটা আলো জ্বলেনি। ছ'টা হবে বোধহয়। মজুররা, গাড়োয়ানরা দলে দলে যাচ্ছে; আছে কয়লা ঝাড়নেওয়ালি মেয়েরা। ওরা হাসতে হাসতে চলেছে। অন্ধকারে ওদের স্পষ্ট দেখা যায়।

পয়লাই দেখা গেল ব্রুল-বুড়ি আর তার জামাই পিয়েরোঁকে। সে জামাইয়ের উপর ঝাল ঝাড়ছে,—ফোরম্যানের সঙ্গে তর্কাতর্কিতে জামাই কেন তার পক্ষ নেয় নি। তার কয়লার ঝোড়া নিয়েই তো ঝগড়া লাগল।

আরে যা, যা, মেনিমুখো। তুই আবার নিজেকে মরদ বলিস নাকি! ঐ রক্ত-চোষা শুয়োরটার সামনে একেবারে মাথা হেঁট করলি।

পিয়েরোঁ জবাব দিলে না। সে একেবারে চুপচাপ। শেষে সে বললে, তাহলে কি করব, উপরওয়ালার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব নাকি? ভাল, ভাল, ঐ করে এক হাঙ্গামা বাধাই আর কি! একেই বলে হাঙ্গামার শেষ নেই!

যা—ওর জুতোর তলায় গিয়ে পিঠ নুইয়ে দে! চীৎকার করে উঠল বুড়ী, হা ভগবান, মেয়েটা যদি তখন আমার কথা শুনতো! ওর বাপটাকে যে জলজ্যান্ত খুন করলে, তাতেও হ'ল না। তুই তো বলবি—আমি ওদের সেলাম বাজাব। না, না, আমি ওদের গায়ের ছাল ছাড়িয়ে তবে ছাড়ব!

স্বর ডুবে গেল অন্ধকারে। এতিয়েং দেখলে, বুড়ী তার ঈগলের মতো নাক আর সাদা চুল নিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে, ওর সরু সরু হাতের ভঙ্গী এখনো দেখা যায়। দুটি জোয়ান পুরুষের গলা শুনে ও কান খাড়া করলে। জাচারিকে চেনা যায়। এতক্ষণ ও অপেক্ষায় ছিল, এবার ওর মিতা মোকে এসে জুটল।

কি তৈরী তো? মোকে বললে, আমরা এবার কিছু খেয়ে নিয়ে ভাল্‌কানে গিয়ে জুটবো।

এখনি? আমার যে কাজ আছে।

কেন? কি হ'ল? সে চারদিকে তাকিয়ে দেখলে! ফিলোমেন কয়লা বাছাইয়ের শেড থেকে বেরিয়ে আসছে। সে বুঝতে পারল।

বন্ধু, তাহলে আমি চলি।

বহুৎ আচ্ছা, আমি এখুনি তোমাকে ধরে ফেলব।

যেতে-যেতে মোকের তার বুড়ো বাপের সঙ্গে দেখা। সেও খনি থেকে বেরুচ্ছে। দু'জনে দু'-একটা কথা বলে যে যার পথ ধরল। জাচারি সদর সড়ক ধরলে, বুড়ো গেল খালধারে।

ফিলোমেনকে ঠেলে নিয়ে চলল জাচারি নির্জন পথে। ফিলোমেন বাধা দিচ্ছে। না, তার তাড়া আছে—অন্য সময় হবে। বিয়ে-করা পুরানো স্বামী-স্ত্রীর মতোই ওদের ঝগড়া। শুধু বাড়ির বাইরে দেখা হলেই হয় না। তায় আবার শীতকাল—মাটি এখন ভিজে—তাছাড়া এখন গম খেতও নেই যে শুয়ে পড়লেই হ'ল।

জাচারি অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, না, না, ওসব ব্যাপার নয়। আমি তোকে কয়েকটা কথা বলব। সে ওর কোমরে হাত দিয়ে নিয়ে চলল। ওরা আবার পিটের পাড়ের ছায়ায় এসে দাঁড়াল। সে শুধালে, ওর কাছে কিছু টাকা কড়ি আছে কি না!

কেন? ফিলোমেন জিজ্ঞেস করলে।

সে আমতা-আমতা করে বললে, দু'টো টাকা সে ধার করে ফেলেছে। বাড়িতে তো এই নিয়ে তুলকালাম কান্ড।

দেখ, মিছে ব'ল না গো। মোর মোকে ছোঁড়ার সঙ্গে দেখা হ'ল। ও আর তুমি ভাল্‌কানের ঐ বেবুশ্যেগুলোর কাছে যাবে।

সে অস্বীকার করলে, বুকে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করলে। কিন্তু ছুঁড়িটা খালি মাথা নাড়ে। হঠাৎ তার স্বর বদলে গেল।

বেশ তো, আমাদের সঙ্গে এস না! দেখ—আমি তোমাকে কাটান দেব ভাবছ নাকি! ঐ ছুঁড়িগুলোকে নিয়ে আমি কি করব? আসবে নাকি?

বাচ্চাটার কি হবে গো? মেয়েটা জবাব দিলে। বাচ্চাটা যা ট্যাঁ ট্যাঁ করে ওকে নিয়ে কি কোথাও যাবার জো আছে?...তার চেয়ে আমি ঘর যাই। সেখানে আবার কি কান্ড কে জানে!

কিন্তু জাচারি তাকে যেতে দেবে না, সে কাকুতি-মিনতি শুরু করে দিলে। মোকের সামনে সে বে-ইজ্জত হতে চায় না, তাকে সে কথা দিয়েছে। মরদরা আর হর্‌রোজ কুঁকড়োর মতো রাত হলেই বিছানায় শুয়ে পড়তে চায় না—সত্যি কে চায় বল? ফিলোমেনের বাধা ভেসে গেল। সে গাউনের প্রান্তটা তুলে ফেললে, নখ দিয়ে সেলাই কেটে সে ধার থেকে কতগুলো আধুলি বার

করলে। মা কেড়ে নেবে বলে সে তার ওভারটাইম খাটার মজুরি এমনি করে লুকিয়ে রাখে।

পাঁচটা আছে দেখছ তো, সে বললে, তোমাকে আমি তিনটে দেব নাগর। শুধু তোমাকে দিব্যি গালতে হবে, তোমার মাকে বলে মোদের বিয়েতে রাজি করাতে হবে। এমনি করে মাঠে-ঘাটে শুয়ে আর মোর ভাল লাগে নি। মা তো ফি-গেরাসেই কথা শোনায়। আগে দিব্যি গালো, দিব্যি গালো! ওর স্বর মৃদু। এ স্বর রোগজীর্ণ বয়েসী মেয়ের। এতে উচ্ছ্বাস নেই, আবেগ নেই। ও যেন হাঁফিয়ে উঠেছে এ জীবনযাত্রায়। জাচারি দিব্যি করলে। এ তার পবিত্র প্রতিশ্রুতি। তারপর তিনটে আধুলি নিয়ে সে তাকে চুমু খেল। একটু বা সোহাগ দেখাল। মেয়েটা হাসছে। সে এবার পিটের পাড়ে এক কোণে তাদের শীতকালের কামরায় ভালবাসার চরম সমাধান করে ফেলতো, কিন্তু মেয়েটা নারাজ। সে বার বার বললে, ওতে তার সুখ নেই। এবার মেয়েটা আস্তে আস্তে পাড়ায় গিয়ে ঢুকল; আর জাচারি মাঠ পেরিয়ে ছুটল সাঙাতের সন্ধানে।

এতিয়েং ওদের দূর থেকেই দেখলে। ও ধরে নিলে এ ভালবাসার মানুষের মিলন। কয়লা কুঠির দেশে মেয়েরা ফনফনিয়ে বেড়ে ওঠে। তার মনে পড়ল লিল্-এর কারখানার কথা। সেখানে সেও কারখানার পিছনে অপেক্ষা করে থাকত। ওখানকার মেয়ের পাল চোদ্দ বছরে নষ্ট হয়, দারিদ্র্যই এমনিধারা ওদের করে দেয়। কিন্তু আর-এক জোড়ার দেখা পেয়ে সে আরো চম্‌কে উঠল। থেমে পড়ল এতিয়েং।

পিটের পাড়ের নীচে একটা গহ্বর। সেখানে কতগুলো বড় বড় পাথর পড়ে আছে। সেখানে খুদে জাঁলিন লিদি আর বেবের্তকে শাসাচ্ছে। ওরা দু'জনে তার দু'পাশে।

কি—বললি?...তোদের দু'জনকে আচ্ছাসে ধোলাই দেব!...কার মাথায় এ ফন্দি আগে গজাল বল্ তো?

জাঁলিনের মাথায়ই ফন্দি গজিয়েছিল। খালের ধারে ঘণ্টাখানেক ধরে সে সালাদপাতা কুড়োয়। ওরাই ছিল তার সঙ্গী। সে ভাবলে, এত পাতা তো বাড়ির সবাই খেয়ে শেষ করতে পারবে না। তাই গাঁয়ে না ফিরে সে ওদের নিয়ে মঁতসুতে এল। বেবের্তকে পাহারা বসিয়ে ও লিদিকে দিয়ে বাড়ি বাড়ি সালাদ পাতা ফেরি করিয়ে বেড়াল। এরই মধ্যে সংসার সম্বন্ধে তার জ্ঞান হয়েছে। সে জানে, মেয়েরা যা কিছু নিয়ে যাবে, তাই-ই বেচে আসবে। ব্যবসার নেশায় পাতার গোটা স্তূপটাই দেখতে দেখতে উধাও হয়ে গেল। মেয়েটা এগারো আনা পেয়েছে। এবার শুরু হয়েছে লাভের বখরা।

বেবের্ত বললে, এটা কিন্তু ঠিক নয়। সমান তিনটে ভাগ করাই ভাল। তুমি যদি সাত আনা রাখ, তাহলে আমাদের ভাগে পড়বে মোটে দু'আনা করে।

জাঁলিন জ্বলে উঠল, ঠিক নয় কেনরে? আমিই তো বেশি পাতা তুলেছি।

অন্য ছেলেটা বাধ্য হয়ে চিরদিন সায় দেয়। কেমন এক ভীরু বশ্যতায় সে আত্মসমর্পণ করে। এই জন্যেই ও চিরকাল ঠকে। বয়েসে বড়, গায়েও জোর বেশি, তবু মার খায়। কিন্তু আজ অতগুলো পয়সা দেখে সে বিদ্রোহী হয়ে উঠল।

লিদি, দেখ্ তো, ও আমাদের কাছ থেকে পয়সা ঠকিয়ে নিচ্ছে—তাই না রে? ও যদি আমাদের ঠিক-ঠিক ভাগ না দেয়, আমরা ওর মাকে বলে দেব।

জাঁলিন অমনি ছেলেটার নাকে একটা ঘুষি কষিয়ে দিলে।

ফের ঐ কথা! আমি গিয়ে তোদের বাড়িতে অমনি বলে দেব, তোরা আমার মার সালাদ পাতা বেচে দিয়েছিস। তাছাড়া, ওরে বুদ্ধু, কি করে তিনজনের মধ্যে এগারো আনা ভাগ হবে? তা অতো যদি চালাক—কর্ না ভাগ! এই তো দু'আনা করে দিচ্ছি। নিবি তো নে, নয় তো পকেটে পুরলাম।

বেবের্ত হার মেনে দু'আনাই নিয়ে নিলে। লিদি কাঁপছে। সে কিছু বললে না। জাঁলিনকে দেখে ওর যেমন ভয়, তেমনি ভালবাসা জাগে। ও যেন খুদে বৌ, মার খায়, তবু ভালবাসতে ভোলে না। জাঁলিন হাত বাড়িয়ে দু'আনা দিতেই সেও বশ্যতার হাসি হেসে হাত বাড়িয়ে দিলে। কিন্তু হঠাৎ জাঁলিনের মতিগতি বদলাল।

তুই আর পয়সা নিয়ে কি করবি? যদি লুকিয়ে রাখতে না পারিস—তোর মা অমনি কেড়ে নেবে। আমার কাছেই রেখে দিলাম। দরকার হলে চেয়ে নিবি।

ন'আনা পয়সা উধাও হয়ে গেল। ওর মুখবন্ধ করবার জন্যে হাসতে হাসতে সে ওকে জড়িয়ে ধরলে। এবার খাড়া পাড়ের উপর দু'জনে গড়াচ্ছে। ও তার খুদে বৌ। অন্ধকার কোণ পেলে ওরাও পিরিতের খেলার ভান করে। পার্টি-সানের বা দরজার ফাঁক দিয়ে বাড়িতে যা দেখে, যা শোনে, তারই নকল করে। ওরা সব জানে, কিন্তু ছেলেমানুষ বলে তেমন কিছু করতে পারে না—কিন্তু তবু কুকুর ছানাগুলোর মতো জড়াজড়ি করে সময় কাটায়। জাঁলিন এর নামকরণ করেছে, 'বাপ-মা খেলা'। যখনি ও তাড়া করে, লিদি ছুটে পালায়। তার পরে প্রকৃতিগত আনন্দ বিহ্বলতা নিয়ে ধরা দেয়। কখনো বা চটে ওঠে, কিন্তু সব-সময়েই আত্মসমর্পণ করতে দ্বিধা করে না। সব সময়েই ওদের আশা কিছু একটা ঘটবে—কিন্তু কিছু ঘটে না।

বেবের্ত এ খেলার ভাগিদার হতে পারে না। ও লিদিকে একটু ছুঁতে গেলে কিলচড় খায়। তাই ও যখন ওদের ফুর্তি করতে দেখে, চটেই ওঠে। ওর সামনেই ওরা এই খেলা করে। ও তাই শুধু ওদের ভয় পাইয়ে দেওয়ার মওকা খোঁজে। যখন-তখন সব ভেস্তে দেবার জন্যে চেঁচিয়ে ওঠে—কারা যেন দেখছে।

এই—ওঠ, ওঠ। একটা লোক দেখছে।

এবার কথাটা সত্য। এতিয়েঁ দেখছিল; সে আবার চলা শুরু করবে। ছেলেমেয়ে দুটো অমনি উঠে পড়ে, ছুটে চলে গেল, এতিয়েঁ এবার পিটের পাড় ঘুরে খাল ধারে চলে এল। তার হাসি পাচ্ছে, পাজী দু'টোকে আচ্ছা ভয় দেখিয়েছে বটে! এই বয়সে এই! কিন্তু ওরা এত কথা শোনে, এত দেখে যে, ওদের বাধা দিতে গেলে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখতে হয়। কিন্তু এতিয়েঁর তবু মনটা বিষিয়ে উঠল।

একশো গজ দূরে আরো জোড়া জোড়া মেয়েমরদ দেখা গেল। এবার ও রিকুইলারে এসে পড়েছে। এখানে রাতের অন্ধকারে পরিত্যক্ত খনির ধ্বংসস্তূপে মঁতসুর নাগরীরা ঘুরে বেড়ায় তাদের প্রেমিকদের সঙ্গে জোড়ায় জোড়ায়। এই

পরিত্যক্ত নির্জন স্থান সাধারণ মিলন কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। মজুর মেয়েরা এখানে তাদের প্রথম সন্তান সম্ভব করতে আসে। শেডের ছাদে বা বাড়িতে তা তো সম্ভব নয়। ভাঙা বেড়ার জন্য সবাই পরিত্যক্ত ইয়ার্ডে ঢুকতে পারে। সে তো এখন এক বাঁজা মাটির ঢেউ। দুটো ভাঙাচোরা কারখানার ধ্বংসস্তূপে ভরা। এখনো খাঁচার কাঠামোটা দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। অব্যবহৃত ট্রাকগুলো পড়ে আছে আর আছে গাদা করা পচা কাঠ-কুটরো। আবার কোণে কোণে গজিয়েছে ঝোপঝাড়। সতেজ ঘাসের বনও দেখা যায়। আবার দু-একটা চারা গাছও মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। প্রতিটি মেয়েই এখানে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। এ যেন তার নিজেরই ঘর। সবার জন্যেই আনাচ-কানাচ—গুহা আছে। পড়শীর ভয় এখানে নেই। ওদের ভালবাসার মানুষরা এসে ওদের বীমের উপর শুইয়ে দেয়। কেউ বা যায় কাঠের আড়াল খুঁজতে—কেউ বা অব্যবহৃত ট্রাকের ভিতরে ভালবাসার নীড় তৈরি করে। ওরা জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকে। মনে হয়, এই মৃত যন্ত্রপাতির চারদিকে, এই কয়লা প্রসব করে-করে জরতী পিটের অন্ধকারে, জীবনীশক্তি এই বন্ধনহীন ভালবাসার ভিতর দিয়ে তার প্রতিশোধ নেয়। এখনো যারা পূর্ণ নারী হয়নি তাদের গর্ভের গহ্বরে, প্রবৃত্তির তাড়নায় উন্মাদ উচ্ছৃঙ্খল ভালবাসা সন্তানের বীজ বুনে দেয়।

তবু এখানে একজন চৌকিদার থাকে। সে বুড়ো মোকে। কোম্পানি তাকে কারখানার মিনারের নীচে দুটি কুঠরি দিয়েছে। কুঠরি দুটো পড়ো পড়ো এমনি। দেয়াল ধসে পড়লে ওদের হয়তো চিহ্নই থাকবে না। বুড়ো চৌকিদার এরই মধ্যে ছাদটা একটু মেরামত করে নিয়ে ওখানেই দিব্যি সংসার পাতিয়ে বসেছে। সে আর ছেলেটা এক কামরায়, অন্য কামরায় থাকে মেয়েটা। জানালায় খড়খড়ি নেই বলে, সে কাঠ দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে। ভাল দেখা যায় না বটে, তবে কামরা দুটো বেশ গরম থাকে। যাহোক, খপরদারি সে করে না, লা ভোরোতে টাট্টু ঘোড়া দুটোর খপরদারি করতেই তার দিন কাটে—রিকুই-লারের ধ্বংসস্তূপ নিয়ে ভাবনার সে সময় পায় না। শুধু স্যাফ্‌টটা ঠিক থাকলেই হল। পাশের পিটের ধোঁয়া বেরিয়ে আসার ঐটেই একমাত্র চোঙা।

এমনি করেই বাপ মোকো দিন কাটাচ্ছে, আর তার চারপাশে চলছে জোয়ান-জোয়ানীর ভালবাসা। দশ বছর বয়েস থেকেই তার মেয়ে রিকুইলারের প্রতিটি কোণে প্রেম করে বেড়িয়েছে। লিদির মতো অমন আনাড়ী ভীতু মেয়ে সে নয়, সে নাদুস-নুদুস দুরন্ত মেয়ে—তখন থেকেই সে দাড়িগোঁফওলা জোয়ানদের যোগ্য। বাপের কিছু বলারও ছিল না। কেন না, মেয়েটা আর যাই হোক বুঝদার আছে। কখনো ভালবাসার মানুষকে বাড়িতে নিয়ে আসেনি, তা ছাড়া সব ব্যাপার বুড়োর চোখে সয়ে গেছে। ভোরোতে যাবার সময়, ফিরতি পথে, বা নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে, সে কখনো নিশ্চিন্তে পা ফেলতে পারে না। ঘাসের ভিতরে এক জোড়া না এক জোড়ার উপর পা পড়বেই। আবার যদি বেড়ার ওধারে সুরুয়া গরম করবার জন্যে কাঠ আনতে বা খরগোশের জন্য কচিপাতা তুলতে যায়—তখন তো অবস্থা আরো সঙ্গীন হয়ে ওঠে। অমনি মঁতসুর সবগুলো মেয়ের কামনাস্ফুরিত নাকগুলো দেখা দেয়, আবার ওদের পায়ে বেধে পড়ে না যায় তাই বুড়োকে সাবধান হতে হয়। কিন্তু আস্তে আস্তে এসব গা-সওয়া হয়ে গেছে সকলের—বুড়োরও তাই। তার শুধু ভাবনা, পায়ে

পা বেধে না পড়ে যায়। মেয়েরাও কে দেখল-না-দেখল বড় একটা আমল দেয় না। বুড়োও মেয়েদের নির্বিঘ্নে কাজ সারতে দেয়। হুঁশিয়ার হয়ে পা ফেলে ফেলে বুড়ো না-দেখার ভান করেই চলে যায়। সে ভাল মানুষ। জৈবিক তাড়নার তাগিদ সে মেনে নেয়। এতদিনে ওদের মুখ চেনা হয়ে গেছে, ওরাও তাকে চেনে। বাগানের চড়ুই পাখিরা যেমন ডালিম গাছের ডালে বসে অশ্লীল-ভাবে ভালবাসা জানায়, আর ওদের দেখে কে চিনে রাখতে পারে—এরাও যেন তেমনি! আহা, নওজোয়ান-জোয়ানী, কেমন ধারা ঠমক দেখ না! ওরা কি দুর্দম!

কিন্তু সময়ে সময়ে সে নিঃশব্দে ওদের ছায়ায় বসে ধুঁকতে দেখে সখেদে মাথা নাড়ে। শুধু একটা ব্যাপারে ওর বিরক্তি; ওরই দেয়ালের বাইরে দুটি প্রেমিক প্রেমিকা জড়াজড়ি করে প্রেম করে—এইটেই ওদের বদ অভ্যেস। এতে যে তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে তা নয়, কিন্তু ওরা এমনভাবে দেয়ালের উপর ঠেস দেয় যে, মনে হয় দেয়াল কোন্ দিন ধসে পড়বে।

রোজ সন্ধ্যায় মিতা বনেমোর আসে ওর সঙ্গে দেখা করতে। রাতে খাবার আগে সে রোজ যখন বেড়াতে বেরোয়, তখন মোকের ওখানে ঘুরে যায়। দু'জনে কথা কয় কম, আধঘণ্টা এক সঙ্গে থাকে—তার মধ্যে দুটো কথাও কয় না। কিন্তু দু'জনেই চাঙ্গা হয়ে ওঠে পুরানো দিনের কথা ভাবতে ভাবতে—পুরানো স্মৃতির জাবর কাটে—বাত্‌চিতের দরকার হয় না। রিকুইলারে একটা ভাঙা কড়ি বরগার উপর দু'জনে গিয়ে বসে। একটা কথা হয়তো বলে, তারপরে নিজেদের স্বপ্নে বিভোর হয়ে যায়। মুখ নীচু করে মাটির দিকে চেয়ে থাকে। আবার হয়তো যৌবনের দিনগুলি ফিরে আসে মনে, আর তখন নওজোয়ানীরা তাদের পিরিতের মানুষকে জড়িয়ে ধরে। হাসির শব্দ ওঠে—চুমুর শব্দ—মাড়ানো ঘাসের সঙ্গে মেয়েদের গায়ের গন্ধ মিশে যায়। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে বুড়ো বনেমোর ওর বৌকে অমনি করে পিটের আড়ালে নিয়ে গিয়েছিল। সেও ছিল কয়লা-কুড়ানি মেয়ে। আর এমন বেঁটে ছিল যে, ওকে একটা ট্রাকের উপর চড়িয়ে তবে চুমু খেতে হোত। আহা, সেদিন কবে চলে গেছে! বুড়োরা ভাবে আর মাথা নাড়ে, তারপরে সম্ভাষণ না জানিয়েই বিদায় নেয়।

এদিন সন্ধ্যেয় এতিয়েঁ যখন আসছিল, বনেমোর তখন বিদায় নিচ্ছে। মোকেকে বললে, আচ্ছা আসি মিতা। আচ্ছা তোমার কি ঐ রুসি ছুঁড়িটাকে মনে পড়ে?

মোকে মিনিটখানেক চুপ করে রইল। তারপরে কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে সায় দিলে। ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বললে, আচ্ছা, এসগে মিতা!

এতিয়েঁ এসে ঐ বরগাটার উপরই বসে পড়ল। কেন যেন তার মনটা বড় খিচড়ে আছে। বুড়ো চলে যাচ্ছে, ওকে দেখে মনে পড়ছে তার নিজের এখানে আসার কথা। আর ঐ চুপচাপ বুড়োর মুখ থেকে ঠান্ডা হাওয়ায় কথার খই ছুট-ছিল। হায় একি দারিদ্র্য! আর এই মেয়েরা—ওরা তো বোকা—তাই সন্ধ্যেবেলা এখানে আসে আর সন্তান বিয়োবার বীজ গর্ভের ভিতরে নিয়ে যায়—আবার জন্ম দেয় দারিদ্রের—দুঃখ সইবার জন্য সন্তান সৃষ্টি করে! এর শেষ নেই। এমনি উপোসী সন্তানে যদি ওদের গর্ভ অনবরত পূর্ণ হয়ে ওঠে, তাহলে এর শেষ কোথায়! ওরা যদি ওদের গর্ভের দ্বার বন্ধ করে থাকে,

যদি দুর্ভাগ্যের আগমনী টের পেয়ে উরু দুটি জোড়া করে থাকে, তাহলে কি ভাল হয় না? হয় তো এমন ভাবনা ওকে বিষিয়ে দিত না, ও যদি একা না থাকতো। অন্য সবাই তো দিব্যি জোড়া গাঁথছে আর ফুর্তি করছে। গুমোট আবহাওয়ায় কেমন ভারী হয়ে উঠেছে দেহমন, কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি হঠাৎ তেতে-পুড়ে যাওয়া হাতের উপর পড়ল। হাঁ গো, হাঁ, সব ছুঁড়িরই এমনি হয়। এই কামনা—এতো যুক্তির চেয়ে ঢের বড়।

এতিয়েং স্তব্ধ হয়ে বসে রইল আঁধারে। মঁতসু থেকে এসেছে এক জোড়া। ওরা ঢুকেই ওর গা-ঘেঁষে চলে গেল। মেয়েটা নিশ্চয়ই নতুন এ-পথে এসেছে, ধস্তাধস্তি করছে। আর ফিসফিস করে কাকুতি-মিনতি জানাচ্ছে। আর ছোকরাটা কথা না বলে শেডের আঁধার কোণে টেনে নিয়ে চলেছে। এখনো শেডটা খাড়া আছে কোন রকমে—সেখানে একগাদা ছেঁড়াখোঁড়া দড়ি গাদা হয়ে আছে। ক্যাথেরিন আর ঐ হোঁদলকুতকুত সাভাল ওরা! কিন্তু পাশ ঘেঁষে যাবার সময় ওদের চিনতে পারেনি। তাই চেয়ে চেয়ে দেখছে; কাহিনীর উপসংহারটা কেমন হয় তার দেখার ইচ্ছে। নিজের ভাবনার গতি ফিরে গেছে, কাম-কৌতূহল জেগে উঠেছে। সে বাধা দেবে কেন? মেয়েরা যখন অমন 'না না' করে, তার মানে তারা চায় তাদের উপর জোর করা হোক।

গাঁ ছেড়ে ক্যাথেরিন সদর সড়ক ধরে মঁতসু গিয়েছিল। দশ বছর বয়েস থেকেই সে পিটে কাজ করে রুজি রোজগার করে। খনির আর আর মেয়েদের মতন অবাধ তার গতি। সে স্বাধীন জেনানা। তার পনেরো বছর বয়েস পর্যন্ত কোন পুরুষ তাকে ছোঁয়নি—তার কারণ তার অবাড়ন্ত শরীরটা। এখনো নারীত্বের পূর্ণতা সে পায়নি। কোম্পানির কারখানার উল্‌টো দিকে সে পথ পার হয়ে একটা ধোবিখানায় গিয়ে ওঠে। তার আশা ছিল, মোকে ছুঁড়িটাকে ওখানেই পাবে। সে তো ওখানে সকাল থেকে রাত অবধি থাকে। ওখানে সবাই সবাইকে পালা করে কাফি খাওয়ায়। কিন্তু হতাশ হতে হ'ল; মোকে এইমাত্র তার পালার খরচা দিয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। দশ সু দেবে বলেছিল, দিতে পারলে না। যাহোক মেয়েরা ক্যাথেরিনকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে এক পাত্র গরম কাফি খাওয়াতে চাইলে। কিন্তু ক্যাথেরিন খেল না। এমন কি মোকের মিতিন্‌দের কাছ থেকেও ধার করতে দিলে না। হঠাৎ অর্থ-নীতির বোধটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে ক্যাথির—তার ভয়, এখন যদি ধার করা পয়সায় ফিতে কেনে তাহলে তার ভাল হবে না।

গাঁয়ে ফেরার জন্যে সে তাড়াতাড়ি চলতে লাগল। মঁতসুর শেষ বাড়িটা পেরিয়ে আসছে, এমন সময় পিকেৎ-এর ভাটিখানা থেকে কে যেন তার নাম ধরে ডাকলে,

হেই ক্যাথেরিন, হেই! কোথায় ছুটছো গো?

সাভাল। অবাক হ'ল ক্যাথি। সাভালকে তার ভাল লাগে না তা নয়, কিন্তু এখন ঠাট্টা-মস্করা করবার মতো তার মনের অবস্থা নয়।

আরে এস, এস, একটু যাহোক খেয়ে যাও,...এক গেলাস মিঠাপানি খাবে না?

ভদ্রভাবেই সে প্রত্যাখ্যান করলে। প্রায় ঘোর হয়ে এসেছে সন্ধ্যা, বাড়ি ফিরতে হবে। কিন্তু লোকটা রাস্তার মাঝখানে এসে ফিসফিসিয়ে কাকুতি-

মিনতি শুরু করলে। অনেকক্ষণ ধরে সাধাসাধি করে তাকে সরাইখানার উপরে নিজের কামরায় নিয়ে যেতে চাইল। বাসের পক্ষে সুন্দর কামরা, একখানা দু'জনের মতো বিছানাও আছে। সে নারাজ কেন? সে কি ভয় পাইয়ে দিয়েছে নাকি? ক্যাথেরিন ঠাট্টা করে বললে, সে যাবে বই কি। তবে যে হপ্তায় পেট হয় না, সেই হপ্তায় যাবে। তারপরে কথায় কথা এল, সে কখন যেন নীল ফিতের কথা বলে ফেললে। ফিতে কিনতে সে পারেনি।

সাভাল অমনি বললে, আমি পয়সা দেব'খন, চল!

সে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, মনে হ'ল, রাজি না হওয়াই ভাল, কিন্তু তবু ফিতেটা পাবার ইচ্ছে ষোল আনা। হঠাৎ মনে হ'ল, ধার নিলেই হয়। শেষে রাজিই হয়ে গেল। এই শর্ত হ'ল, ফিতে নিতে ও রাজি আছে, তবে পয়সাটা ও শোধ দেবে। আবার ঠাট্টা-তামাশা শুরু হয়ে গেল: শেষে ঠিক হ'ল—ক্যাথি যদি সাভালের সঙ্গে একত্র না শোয়, তাহলে সে টাকাটা ফেরত দেবে। কিন্তু আর এক বিপত্তি দেখা দিল। মাইগ্রাতের ওখানে যেতে চাইলে সাভাল।

না, না, মাইগ্রাতের ওখানে নয়। মা আমাকে যেতে বারণ করেছে।

কেন? কোথায় যাবে না-যাবে তারও ফিরিস্তি দিতে হবে নাকি বাড়িতে? মঁতসুতে ওর দোকানেই তো হরেক কিসিমের ফিতে পাওয়া যায়।

প্রেমিক-প্রেমিকা যেমন করে দোকানে ঢুকে বিয়ের উপহার কেনে, তেমনি করে সাভাল আর ক্যাথেরিন ঢুকতেই মাইগ্রাত চটে লাল হয়ে গেল। সে ফিতের বাক্স রেগে-মেগে বার করে দিলে। মনে হ'ল, ওকে তারা ঠাট্টা করছে. ওরা ফিতে নিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল, সে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে চেয়ে চেয়ে দেখলে। বৌ এসে ভয়ে ভয়ে কি জিজ্ঞেস করলে, আর অমনি তাকে গাল পাড়তে লাগল। সে দিব্যি গাললে, এর মজাটা টের পাইয়ে দেবে! ঐ কিম্ভূত নোংরা জানোয়ারগুলো, ওদের কৃতজ্ঞতারও বালাই নেই। ওদের তো ওর পা চাটাই উচিত।

সাভাল ক্যাথেরিনকে নিয়ে সদর সড়ক ধরে চলল। হাত দোলাতে দোলাতে চলেছে ক্যাথেরিনের পাশে পাশে, মাঝে মাঝে ওর পাছায় ঠেলা মারছে। ওকে চালিয়ে নিয়ে চলেছে ওরই অজান্তে। হঠাৎ ক্যাথেরিন বুঝতে পারলে ওরা সদর সড়ক ছেড়ে এসেছে। এখন ওরা চলছে রিকুইলারে যাবার সরু গলিটা দিয়ে। রাগ করবার উপায় নেই! এরই মধ্যে হাত দিয়ে সাভাল জড়িয়ে ধরেছে তার কোমর, অফুরন্ত কথার সোহাগে তার নেশা লেগেছে। বোকা নাকি, অতো ভীতু কেন সে? ওর মতো অমন ভাল মেয়ের কেউ কি কোন অনিষ্ট করতে পারে! ও তো রেশমের মতো কোমল, এমন তুলতুলে যে ওকে বুঝি সাভাল খেয়ে ফেলতে পারে। সাভালের নিঃশ্বাস ওর কানের ওপর সুড়সুড়ি দিয়ে যাচ্ছে, কেঁপে-কেঁপে উঠছে তার শরীর। নিঃশ্বাস ফুরিয়ে আসছে, মুখে কথা নেই। সত্যিই বুঝি ওকে ভালবাসে লোকটা! এই তো গত শনিবারের ব্যাপার। সে মোমবাতিখানা নিবিয়ে দিয়ে ভাবছিল, ও যদি ওকে এমনি করে গ্রহণ করে; তার পরে ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে স্বপ্ন দেখেছিল—ও যেন বিবশ হয়ে গেল ভালবাসায়, ওকে 'না' বলতে পারলে না। তাহলে আজ ওকথা ভেবে অমন অনিচ্ছা তাকে পেয়ে বসল কেন—আবার পস্তাচ্ছেই বা কেন? আল্‌তো করে ওর গোঁফজোড়া সুড়সুড়ি বুলিয়ে দিচ্ছে ওর গলায়। ওর তো আরামে

চোখ বুজে এল। ওর বোজা-চোখের পাতার উপরে আঁধারে ছায়া ফেলে চলে গেল আর একটি ছেলের মুখ—সেই সকালবেলার ছেলেটি।

ক্যাথেরিন হঠাৎ চোখ মেলে চারদিকে তাকালে। সাভাল তাকে রিকুইলারের ধ্বংসস্তূপে নিয়ে এসেছে। সে ঐ ভাঙাচোরা শেডের অন্ধকার দেখে ভয় পেল, পিছিয়ে এল।

না, না, না! আমাকে ছেড়ে দাও গো!

পুরুষের ভীতি ওকে পেয়ে বসেছে, এই ভীতির টংকারে প্রকৃতিগত তাড়নায় নারীর মাংসপেশী আত্মরক্ষার জন্য শক্ত হয়ে ওঠে। তার ইচ্ছে থাকলেও এমনি-ধারা হয়। পুরুষ তাকে জিনে নিতে আসছে—তখন এই তার অনুভূতি। তার অপাপবিদ্ধ কুমারী মনে জানতে কিছুই বাকি নেই, কিন্তু তবু ভয় পেল। এ যেন আঘাতের ভয়, এক ক্ষতর ভয়—তাই তো সে এই অজানা পুরুষত্বের আস্বাদন নিতে ভয় পায়।

না, না! আমি চাইনে! আমার বড় কম বয়েস গো! সাঁচ কথা বলছি! দাঁড়াও, আগে বড় হয়ে নি—তখন হবে।

চাপা গলায় গরজে উঠল মরদ, হাঁদা কোথাকার! ভয় কি! এতে আর কি এমন হবে।

কথা না বলে, দু'খানা কঠিন হাত দিয়ে ও ওকে চেপে ধরে শেডের ভিতরে ছুঁড়ে দিলে। ও গিয়ে ছিটকে পড়ল দড়ির স্তূপের উপর। আর লড়াই করবার তাকত নেই। সে নিষ্ক্রিয় হয়ে পুরুষকে গ্রহণ করলে। এখনো পূর্ণতা পায় নি মেয়ে, তবু ওয়ারিশান-সূত্রে পাওয়া বশ্যতায় মেনে নিলে। ওর জাতের মেয়েরা তো ছেলেবেলায় এমনি চিতিয়ে পড়ে বশ্যতা স্বীকার করে—এই তো তাদের রেওয়াজ। ওর ভীতি-বিহ্বল আকুতি থেমে গেছে, শুধু পুরুষের ঘন ঘন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ এখন শোনা যায়।

এঁতিয়েঁ ঠায় বসে আছে—শুনছে। আবার আর-একটি মেয়ে কামনার সাগরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। যাহোক, মিলন তো দেখা হ'ল, সে উঠে পড়ল। অস্থির হয়ে উঠেছে—হয়তো বা ঈর্ষা-মিশ্রিত উত্তেজনায় সে অধীর। আবার রাগও আছে। সে আর চুপচাপ করে থাকতে রাজি নয়—কড়ি বরগার উপর দিয়ে এগিয়ে এল। এখন ওরা এত ব্যস্ত যে ওদের আর ব্যাঘাত হবে না। কিন্তু ক্যাথেরিন আর সাভালকে চিনতে পেরে সে স্তব্ধ হয়ে গেল। প্রথমে এল দ্বিধা; সত্যিই কি ক্যাথি? ঐ কি মোটা কাপড়ের নীল কোর্তা আর টুপি-পরা ক্যাথি? আর ঐ পাজীটা কি সেই পায়জামা আর ক্যাম্বিসের টুপি পরা মজুর? ঐ পোষাক পরেছে বলেই পাশ কাটিয়ে চলে যেতেও ও চিনতে পারেনি। কিন্তু এখন আর সন্দেহ নেই; আবার ওর চোখ দুটি সে দেখতে পাচ্ছে—ঐ স্বচ্ছ সবুজ দুই চোখ—যেন ঝরনার ধারার মতো স্বচ্ছ আর গভীর। আদৎ কুত্তি! হঠাৎ কি-এক কামনা পেয়ে বসল, ওর উপরে প্রতিশোধ নেবে—ওকে যা-তা করে ব্যবহার করবে। ওর কোন মতলব নেই—এমনি। তা ছাড়া ওকে মেয়ে হিসেবে সে পছন্দ করে না—ও তো হতকুৎসিত।

ক্যাথেরিন আর সাভাল ওর পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল। ওরা টের পেলে না,—ওদের কেউ দেখছে। সাভাল ওকে জড়িয়ে ধরে ওর কানের পাশে চুমু খাচ্ছে। আর মেয়েটা থেমে পড়ে ওর সোহাগ উপভোগ করছে। হাসছে।

এতিয়েং এখন পিছনে। তাই ওদের পেছু নেওয়া-ছাড়া তার উপায় নেই। ওরা পথ জুড়ে আছে বলে তার বিরক্তি। ইচ্ছে না থাকলেও তাকে এসব কেলেংকারি দেখতে হচ্ছে। চটে উঠছে সে। তাহলে একথা সত্যি—ও যে ভোরবেলা বলে-ছিল তখন অবধি ওর ভালবাসার মানুষ ছিল না। কিন্তু ও বিশ্বাস করতে পারেনি, তবু ওকে একটু ছোঁবার লোভও ও ত্যাগ করেছে। আর-আর ছোকরাদের মতো ও নয়। কিন্তু এখন তো ওর নাকের ডগার উপর দিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে গেল মেয়েটাকে। আর ও বোকার মতো এমন একটা নোংরা তামাশা চোখ চেয়ে চেয়ে দেখলে! পাগল হয়ে গেল এতিয়েং। মুঠো পাকালে সে, বুঝি ঐ মরদটাকে খুন করতে পারে। খুনের নেশা পেয়ে বসেছে, সবকিছু যেন লালে লাল!

আধ ঘণ্টা ধরে ওরা চলল। লা ভোরোর কাছে এসে ক্যাথেরিন আর সাভাল গতি কমিয়ে দিলে। খালের ধারে দু'বার থেমে পড়ল, তিন বার পিটের খাড়া পাড়ের উপরে। ওরা সুখী, প্রেমিক-প্রেমিকার ছলাকলা চলছে। ওরা দেখতে পাবে এই ভয়ে এতিয়েংকেও থেমে পড়তে হ'ল ওদের সংগে সংগে। এক মর্মান্তিক ওর দুঃখ; এখন থেকে ও ভালমানষি করবে না—মেয়েদের সংগে মিশতে শিখবে! লা ভোরো ছাড়িয়ে এল ওরা, এবার সে স্বচ্ছন্দে গিয়ে রাসেনারের ওখানে রাতের খাওয়া সমাধা করতে পারে। কিন্তু তবু পিছনে-পিছনে গাঁ পর্যন্ত এল। অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে আধ ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে রইল। অপেক্ষা করে আছে—কখন সাভাল ছাড়বে ক্যাথেরিনকে—কখন সে বাড়ি গিয়ে ঢুকবে। যখন সে ওদের ছাড়াছাড়ি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'ল, তখন আবার হাঁটতে শুরু করল। হাঁটতে হাঁটতে সে মার্সিয়েনের পথে অনেকখানি চলে এল। কি করছে সে জানে না। সে ফুঁসে উঠেছে রাগে—ঘরে বন্দী হয়ে বসে থাকতে এখন রাজি নয়।

এক ঘণ্টা পরে ন'টার সময় এতিয়েং আবার গাঁয়ের ভিতর দিয়ে চলল, ভোর চারটেয় উঠতে হলে এখন কিছু খেতে আর ঘুমুতে হবে। গাঁ এখন অন্ধকার—ঘুমে বিভোর। বন্ধ শার্সির ফাঁক দিয়ে একটুও আলো দেখা যায় না। দীর্ঘ পথ বিছিয়ে আছে—দু'ধারে ঘুমে বিভোর ব্যারাকের সার। একটা বেড়াল শূন্য বাগানের ভিতর দিয়ে পালিয়ে গেল। আবার আর একদিন শেষ হ'ল। মেহনতি মজুররা টেবিল থেকে টলতে টলতে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েছে খাদ্য আর ক্লান্তিতে অভিভূত হয়ে।

রাসেনারের সরাইখানায় এখনো একটা আলো জ্বলছে। দুজন মিস্ত্রী আর দিনের সিফ্‌ট-এ কাজ-করা দু'টি লোক তাদের আধ পাঁইট বীয়ার শেষ করছে। উপরে যাবার আগে এতিয়েং থেমে পড়ল—অন্ধকারের দিকে তাকাল। আবার সে অসীম অন্ধকারে ডুবে গেল। ভোরে যখন এসেছিল—ঠিক তেমনি অবস্থা। হাওয়া এখনো বইছে শন্‌শন্ করে। লা ভোরো তার সুমুখে এক শয়তান জানোয়ারের মতো ওত পেতে আছে। শুধু এখানে ওখানে লণ্ঠনের ঝিকিমিকি আলোয় স্পষ্ট দেখা যায়, পিটের পাড়ে তিনটে তাওয়া এখনো উপরে শূন্যে ঝুলছে রক্তাক্ত চাঁদের মতো—বনেমোর আর তার পাঁশুটে রঙের ঘোড়াটা মস্ত বড় বড় ছায়া রচনা করছে। বাইরে প্রান্তর এখন অন্ধকারে ডুবে আছে। ম'তসু মার্সিয়েনে, ভান্দামের বন, বীট আর শস্যের বিস্তীর্ণ সাগর এখন অন্ধকারে

একাকার—শুধু দূরাগত মশালের আলোয় ঝিকিমিকি করে। মশাল তো নয় —ব্লাস্ট ফার্নেসের নীল শিখা আর চুল্লির লাল আলো। আস্তে আস্তে রাত গভীর হয়ে এল। আস্তে আস্তে নামল বৃষ্টি—সব কিছু ছাপিয়ে দিল তার অবিরল একঘেয়ে ধারায়। শুধু একটি স্বর এখনো শোনা যায়—সে নিঃসরণ-পাম্পের ভারী আওয়াজ—সারা দিন রাত ধরে ঐ নলটা খালি ধোঁকে।
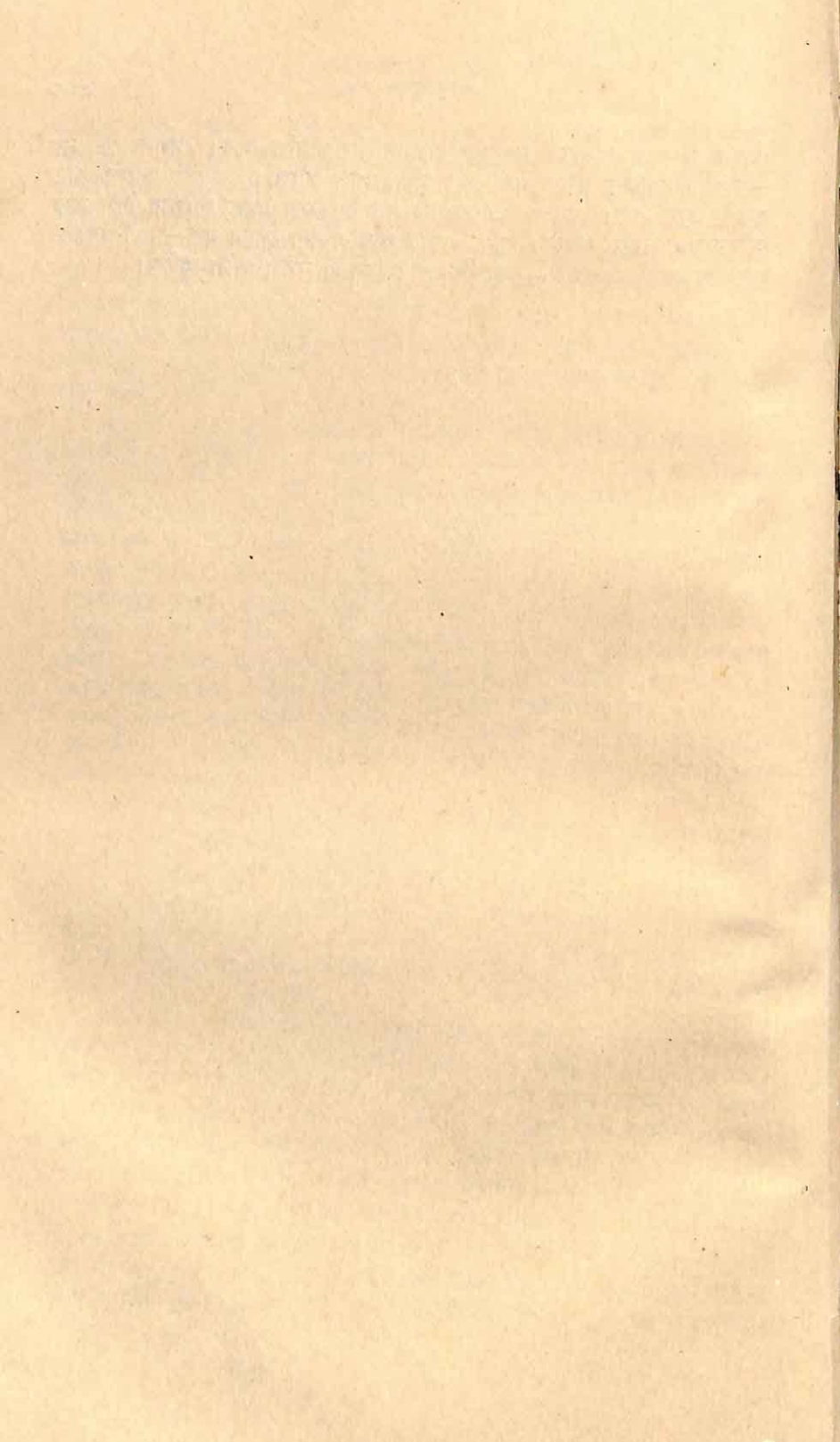
তৃতীয় খণ্ড

এক

পরদিন আর তার পরের দিনগুলো এতিয়েং পিটে কাজ করে কাটাল। আস্তে আস্তে সব গা-সওয়া হয়ে গেছে। মানিয়ে নিয়েছে নতুন কাজের নতুন অভ্যাসের সঙ্গে। প্রথমে তো কাজ শক্ত বলেই মনে হয়েছিল। প্রথম দু'হপ্তার একঘেয়েমি কাটল একটা ঘটনায়; সামান্য জ্বরে আটচল্লিশ ঘণ্টা বিছানায় শুয়ে রইল। গা-ব্যথা, মাথা টিপটিপ করছে—প্রলাপ বকছে—স্বপ্ন দেখল—সে তার টব একটা সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে টেনে নিয়ে চলেছে। কিন্তু সুড়ঙ্গটা এত সরু, যেতে পারছে না। কিন্তু এ তো শিক্ষানবিশের ক্লান্তি—দুদিনেই সে সেরে উঠল।

দিনের পর দিন কাটতে লাগল—হপ্তার পর হপ্তা—মাসের পর মাস। এখন তার অন্যান্য সাথীদের মতো রাত তিনটেয় ওঠে, কাফি খায়—ডবল রুটির টুকরো আর মাখন রেখে দেয় রাসনারের বৌ আগের দিন সন্ধ্যেয়—সে তাই নিয়ে চলে যায়। নিয়মিত সে রোজ ভোরে পিটে যায়, বুড়ো বনেমোরের সঙ্গেও দেখা হয়। বুড়ো তখন ঘরে ঘুমুতে চলে যায়। বিকেলে ফেরার পথে ব্যতেলুপের সঙ্গেও দেখা হয়ে যায়। সে তখন আসে কাজে। এতিয়েং মাথায় পরে টুপি, পরনে পায়জামা আর ক্যাম্বিসের কোর্তা তার গায়ে। শেডে বিরাট অগ্নিকুণ্ডের সামনে বসে কাঁপে শীতে আর আগুন পোহায়। তারপরে খালি পায়ে রিসিভিং রুমে অপেক্ষা করে। হাওয়ার তোড় বয়ে যায় ঘরের ভিতর দিয়ে। মজবুত ইস্পাত-দেহ তামার পাত লাগানো ইঞ্জিনটা এখন আর নজরে পড়ে না। সেটা অন্ধকারে ঝলমল করে ওঠে, কিন্তু তবু না। নিশাচর পাখীর মতো তারগুলো নিঃশব্দ গতিতে কালো ঝলক তুলে আসা-যাওয়া করে, তাও সে দেখে না। খাঁচার সিগন্যালের ঝনঝনানির ভিতর দিয়ে ওঠা আর নামা, তারস্বরে হুকুম—লোহার মেঝের উপর ঠেলাগাড়ির শব্দ—কোনদিকেই তার

ভ্রূক্ষেপ নেই। তার বাতিটা ভাল জ্বলে না—ঐ লক্ষ্মীছাড়া ফরাসটা বোধহয় ভাল করে পরিস্কার করে না। ওর ভাল লাগে না, ঝিমিয়ে থাকে। শুধু যখন মোকে-ছোঁড়া মেয়েদের খাঁচায় পুরে সশব্দে ওদের পাছায় ঠাট্টা করে চাপড় মারে —তখন ও সজাগ হয়। খাঁচা এবার চলতে থাকে, একটা গর্তের ভিতরে ঢেলার মতো গিয়ে যেন ছিটকে পড়ে। দিনের আলো যে মিলিয়ে গেল তা দেখার জন্যে মাথাও এখন আর সে তোলে না। পড়ে যাবার ভয়ও তার নেই। সে অন্ধকার আর জলের ধারার ভিতরে নেমে আসে। বড় বুঝি স্বস্তিও বোধ করে। পিটের তলায় পিয়েরো ওদের বার করে দেয়। তেমনি ভীরু চাউনি তার। তেমনি দলবেঁধে ওরা চলে। ইয়ার্ডের মজুররা তাদের নিজেদের কাটিং-এ চলে যায়। এখন মঁতসুর পথ ঘাটের চেয়ে খনির গ্যালারিগুলো তার বেশি রপ্ত হয়ে গেছে। সে জানে এখানে বাঁক ঘুরতে হবে, খানিকটা গিয়ে মাথাটা নুইয়ে দিতে হবে—কোথায় বা আছে ঘোলা জলের খোঁদল। মাটির নীচের এই বিস্তীর্ণ পরিধিতে সে অভ্যস্ত, আলো ছাড়াও অনায়াসে চলতে পারে পকেটে হাত ডুবিয়ে দিয়ে—হাতড়াতে হয় না। সেই একই লোকের সঙ্গে দেখা হয়; ওরা যখন চলে যায়, সর্দার আলো মুখের কাছে ধরে ধরে দেখে। কখনো বা বুড়ো মোকে টাট্টু নিয়ে আসে। বেবের্ত বাতাইলকে ধরে চলে; জাঁলিন গাড়ির পেছনে পেছনে হাওয়া-ঢোকবার ফালি দরজাটা বন্ধ করতে ছোটে। আর মোকে ছুঁড়ী আর লিদি গাড়ি ঠেলে।

ধীরে ধীরে এতিয়েঁর কাটিং-এর এই স্যাঁতসেঁতে গুমোট সয়ে গেল। ওঠার মুখের পথ বা চোঙটা দেখে এখন মনে হয়, ভারি সুবিধে হয়েছে তোঃ আগে যেখানে হাত গলিয়ে দিতে ভয় পেত, এখন বুঝি সেখানকার ফুটোফাটা দিয়েও মিলিয়ে যেতে পারে, গড়িয়ে বয়ে যেতে পারে। আগে তো সেখানে হাত দিতেও তার ভয় ছিল। এখন কয়লা গুঁড়ো নিঃশ্বাসে উড়িয়ে দিতে সে অস্বস্তিবোধ করে না। অন্ধকারে দেখতে পায়, স্বচ্ছন্দে ঘামে ভিজে ওঠে, আবার সহজেই ঘাম শুকিয়ে যায়। দিন থেকে রাত অবধি জামা ঘামে ভিজে জবজবে হলেও সে কেয়ার করে না। কাজ করতে গিয়ে জবুথবু হয়ে যায় না, বৃথা শক্তির অপব্যয় করে না। দক্ষতা তার এসেছে তাড়াতাড়ি—আর তাতে তার কাজের সাথীরা অবাক। দু'সপ্তাহ পরে ঠেলাগাড়ি-চালিয়েদের দলে সে ওস্তাদ বলে গণ্য হ'ল। ওর চেয়ে কেউ তাড়াতাড়ি গাড়ি ঠেলে নিয়ে যেতে পারে না, খালাস করতেও এমন করে পারে না। ওর ছিপছিপে শরীরটাও বড় মানানসই—যে-কোন জায়গা দিয়ে গ'লে যেতে পারে। মেয়েদের মতো সরু সরু আর সাদা তার হাত, কিন্তু তারা যেন ইস্পাতে গড়া। এমন তাকত দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। হাঁপ ধরলেও সে নালিশ করে না, বড় বেশি দেমাকি ছেলে। শুধু এক তার দোষ—ঠাট্টা সে বোঝে না। কেউ তার খুঁত ধরলে সে জ্বলে ওঠে। সত্যি-কারের খনির মজুর বলে সে দলে কল্কে পেয়েছে। মজুরদের এই মেহনতি পিষে ফেলে—গড়ে-পিটে নেয় নতুন ছাঁচে। তাকেও পিষে ফেলছে—যত দিন যাচ্ছে—সে হয়ে উঠছে ওদের মতনই একটা যন্ত্র।

মেয়ুর এতিয়েঁকে মনে ধরেছে; ভাল কাজের উপর তার শ্রদ্ধা। তা ছাড়া, আর সবারই মত সে ভাবে, ছোকরার পেটে ওর নিজের চেয়ে ঢের এলেম আছে; লিখতে পড়তে জানে, খসড়াও আঁকে—এমন সব কথা বলে, যা ও কখনো শোনে

নি। এতে অবাক হয় না, মিস্ত্রীদের চেয়ে খনির মজুররা কাজে অনেক দড়। তবে অবাক হয় ওর সাহস দেখে—উপোস করবে না ছেলে—কয়লা খুঁড়তে লেগে গেল কেমন। মিস্ত্রীরা কখনো এসে এমনি চট্ করে কাজ শিখে নিতে পারে না। যে এই পহেলা পারল, সে এতিয়েং। এখন গাঁইতি-চালানোটাই বড় কথা, তাই ও গাঁইতি-চালিয়েদের কাউকে না দিয়ে কাঠের কাজটা দিয়েছে ছোকরাকে। ও-কাজ ছিমছাম করে করবে ছোকরা। উপরওয়ালা তো সবসময়েই তক্তার ব্যাপার নিয়ে ওকে জ্বালায়। ফি-ঘণ্টায়ই ও ভয় পায়—এই বুঝি ইঞ্জিনিয়ার নিগ্রেল এসে হাজির হয়। আর সঙ্গে সর্দার দাঁসার। এসেই চিল্লাবে, আর হুকুম ঝাড়বে, আবার সব নতুন করে করতে হবে। ওর এই নয়া পুটারের কাজ উপরওয়ালার পছন্দ—তাও সে লক্ষ্য করেছে। ওঁরা কিছুতেই খুশী নন, তবু সে বুঝেছে একথা। ওরা তো এসেই বলে, কোম্পানি হেন করবে, তেন করবে। এমনি করেই চলেছে; এক গভীর অসন্তোষ ধুঁইয়ে উঠছে পিটে। মেয়ু তো নিজে নিরীহ, গোবেচারী—কিন্তু সেও এখন মাঝে মাঝে ঘুষি পাকায়।

জাচারি আর এতিয়েঁর ভিতরে প্রথমে কিছুটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। এক সন্ধ্যায় ওরা তো ঘুষোঘুষিও বাঁধিয়েছিল। কিন্তু জাচারি ছেলেটা ভাল। যদিও নিজের স্ফূর্তি ছাড়া আর কিছু বোঝে না। সে কয়েক দিনের ভিতরে এক পাত্র খাইয়ে ওর সঙ্গে ভাব করে ফেললে। আগন্তুকের কর্মদক্ষতা সেও মেনে নিলে। লেভাকের সঙ্গেও তার বেশ ভাব আছে। পুটারের সঙ্গে সে রাজনীতির কথা কয়। সে বলে—ওর এলেম আছে। শুধু একজনের সঙ্গে তার ঘোর শত্রুতা। সে ঐ সাভাল। আড়ি নেই, বরং দুজনে দুজনের সাঙাৎ। তবে ঠাট্টা-তামাশায় এ ওকে ছাড়ে না। চোখ দেখে মনে হয় দু'জনে দু'জনকে গিলে ফেলবে। ক্যাথেরিন ওদের মধ্যে ক্লান্ত, আত্মনিবেদিত হয়ে ঘুরে বেড়ায়, পিঠ কুঁজিয়ে গাড়ি ঠেলে। এতিয়েঁর সঙ্গেও তার ভাব, সেও তাকে কাজে সাহায্য করে, পিরিতের মানুষেরও সে বশ—তার আদর-সোহাগ প্রকাশ্যেই গ্রহণ করে।

ব্যাপারটা সবাই মেনে নিয়েছে। ওরা এখন দম্পতি হিসাবে স্বীকৃত। এমন কি ক্যাথেরিনের গোটা পরিবারটাই চোখ বুজে আছে। এখন রোজ রাতেই সাভাল ওকে পিটের খাড়া পাড়ের আড়ালে নিয়ে যায়, আবার ফিরিয়েও দিয়ে যায় দোরগোড়ায়। গোটা মজুর-পাড়ার চোখের সুমুখে শেষবারের মতো জড়িয়ে ধরে, চুমু খেয়ে ও বিদায় নেয়। এতিয়েঁর মনে হয়, সেও বুঝি মনটাকে বাগে এনেছে; কিন্তু ওর এই রাতে বেড়ানো নিয়ে ওকে প্রায়ই জ্বালায়, ঠাট্টা করে, অশ্লীল কথা বলে বসে। মজুর ছোঁড়া-ছুঁড়িরা এমনি অশ্লীল ইয়ার্কি ঠোকে পিটের গহ্বরে বসে। ক্যাথেরিনও সমান তালে জবাব দেয়—তারপরে বাহাবা নেবার জন্যে বলে—তার পিরিতের মানুষ তাকে নিয়ে কি কাণ্ড করেছে। কিন্তু ওর চোখে চোখ পড়তেই কেমন বিব্রত হয়, মুখ ফ্যাকাশে মেরে যায়। ওরা দুজনেই মুখ ফিরিয়ে থাকে। দু-এক ঘণ্টা আর আলাপ হয় না। মনে হয়, ওদের বুকের কোথায় যেন এক অব্যক্ত কি লুকিয়ে আছে—তার জন্যে ওরা পরস্পরের প্রতি ঘৃণায় ফুঁসে ওঠে।

বসন্ত এল। পিট থেকে বেরিয়ে এসে এতিয়েং এক দিন টের পেল, এপ্রিলের হাওয়া তার মুখে উষ্ণ স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। নতুন পৃথিবী।

মিষ্টি গন্ধ, নতুন ঘাস আর মন-মাতানো হাওয়া। এখন যখনি পিট থেকে উঠে আসে, বাসন্তী গন্ধ আরো যেন মিষ্টি বলে মনে হয়—উষ্ণতর হয়ে ওঠে তার স্পর্শ। খনির নীচে চিরন্তন শীতে সে কাজ করে যায়। স্যাঁতসেঁতে ছায়া চারিদিকে ঘিরে থাকে, কোনদিন গ্রীষ্ম এসে শীতকে দূর করে দেয় না। দিন দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে এল। মে মাসে সূর্যোদয়ে গিয়ে তাকে নীচে নামতে হয়। তখন লাল আকাশ লা ভোরোকে ভোরাই কুয়াশায় ঘিরে রাখে। আর পাম্পিং-ইঞ্জিনের সাদা ধোঁয়া গোলাপী হয়ে যায়। আর শীতের কাঁপুনি নেই। প্রান্তরের বিস্তার থেকে মৃদু হাওয়া বয়ে আসে। উপরে আকাশে গান গায় চাতকপাখী। রোজ বিকেল তিনটেয় রোদ এসে তার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে যায়। দূর দিগন্ত জ্বালিয়ে দেয়, কয়লার পুরু ময়লা আস্তরণের নীচে ইটগুলো অবধি তেতে আগুন হয়ে ওঠে। জুন মাসে শস্যের চারাগুলো ফনফনিয়ে বেড়ে উঠল। নীলচে সবুজ আভা দেখা দিলে, বীটপাতার কালচে সবুজের সঙ্গে তার ঘোর অমিল। দিনের পর দিন এল, গেল। এই অসীম শস্য সমুদ্র একটুকু ঝিরঝিরে হাওয়ায় ঢেউয়ের মতো দুলে-দুলে উঠতে লাগল—ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ওর চোখের সামনে বিরাট হয়ে উঠল ঢেউ। মাঝে মাঝে ও তো অবাক হয়ে যায়, সকালের চেয়ে এই সবুজ বন্যা যেন আরো ফুলে-ফেঁপে উঠেছে সন্ধ্যায়। খালের ধারে পপলারের সার পাতার পালকে সেজে উঠছে। আগাছার জঙ্গল এসে চড়াও হয়েছে পিটের খাড়া পাড়ে। আর ফুলে ফুলময় প্রান্তর। সে মাটির নীচে আঁধারে পড়ে পড়ে মেহনতি করছে, ধুঁকছে ক্লান্তিতে—আর তারই মাথার উপরে মাটি এখন নতুন জীবনে উদ্বেল। ফুঁড়ে বেরুচ্ছে, ঠেলে উঠছে।

এখন আর সন্ধ্যেয় বেড়াতে বেরিয়ে সে পিটের খাড়া পাড়ের আড়ালে প্রেমিক-প্রেমিকাকে চমকে দেয় না। এখন তাদের খুঁজে খুঁজে ও যায় শস্যের খেতে। পেকে-আসা শস্যের দুলুনি দেখে ঠাহর করে নেয় কোথায় তাদের ভালবাসার নীড়। লাল পপির ছড়াও দুলে-দুলে ইশারা জানায়। জাচারি আর ফিলোমেনও সেখানে যায় অভ্যেসবশে; বুড়ী-মা ব্রুল খুঁজে বেড়ায় এখানে লিদিকে—তাড়া করে বেড়ায়। ওরা দুজন এমনি জড়াজড়ি করে পড়ে থাকে, ওদের উপর পা না পড়লে নড়ে না। আর মোকে-ছুঁড়ির কথা! সে তো এখানে-খুশি—সে তাই করে। এতিয়েন্‌র শুধু খারাপ লাগে, যখন ক্যাথেরিন আর সাভালের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। দু-দুদিন সে দেখেছে, ওরা মাঠের মাঝখানে শুয়ে পড়ল। শস্যের দুলুনি আস্তে আস্তে কমে গেল। আর একবার সে একটা গলি দিয়ে যাচ্ছিল—তখন ক্যাথেরিনের স্বচ্ছ চোখ দুটি তার নজরে পড়ল। গমের চারার মধ্যে একবার উঁকি দিলে, তারপর আবার মিলিয়ে গেল, ডুবে গেল। তখন এই বিরাট প্রান্তর যেন বড় ছোট বলে মনে হয়েছিল তার কাছে। সে ছুটে চলে গেল। রাসেনারের সরাইখানায় সন্ধ্যেটা কাটাল।

গিয়ে বললে, মাদাম, আমাকে এক পাত্তর দিন তো! না—আজ রাতে আর বেরুব না। পায়ে ব্যথা। এক সাঙাৎকে দেখে ফিরে তাকাল। সে কোণের এক টেবিলে সব সময়ে দেয়াল ঠেস দিয়ে বসে থাকে।

সুভোরিন, কি—এক পাত্তর হবে নাকি?

না, না!

পাশাপাশি থাকতে থাকতে এতিয়েঁ আর সুভেরিনের মিতালি। সে লাভোরোর ইঞ্জিনম্যান। এতিয়েঁর পাশেই উপরতলায় তার ঘর। হয় তো বছর ত্রিশেক বয়েস হবে। রং ফর্সা, ছিপছিপে মানুষটি—মুখখানা সুকুমার—ঘন চুল আর স্বল্প দাড়ির ফ্রেমে আঁটা। ওর চকচকে ধারাল দাঁত, সরু ঠোঁটের রেখা, নাক আর গোলাপী রং দেখে ওকে খানিকটা মেয়েলী বলেই মনে হয়। কিন্তু কেমন এক একগুঁয়েমি আছে, যখন তা দেখা দেয়, ওর ইস্পাতের মতো চোখ যেন শানিত হয়ে ওঠে। গরীব মজুর সে, তার ঘরে একমাত্র সম্বল একটা তোরঙ্গে কিছু বই আর কাগজপত্র। সে রুশ, নিজের কথা সে কখনো বলে না। কিন্তু তবু ওকে নিয়ে গল্পের কামাই নেই। খনির মজুরদের অপরিচিতের উপর ভারি সন্দেহ। ওকে তারা অন্য শ্রেণীর বলে মনে করে। ওর হাত দুখানা তো ভদ্দর লোকের মতো। ওরা ওর সম্বন্ধে প্রথমে রোমহর্ষক কিছু আঁচ করেছিল। হয়তো খুনী ফেরার হয়েছে। কিন্তু আস্তে আস্তে সকলের সঙ্গে ও দোস্তালি পাতিয়ে নিয়েছে। দেমাকে সে নয়, নিজের খরচ-খরচা হয়ে যা বাঁচে—গাঁয়ের বাচ্চা-কাচ্চাদের সে বিলিয়ে দেয়। ওকে ওরা নিজেদের সমাজে গ্রহণ করে নিয়েছে। 'রাজনৈতিক ফেরারী' কথাটা ওর সম্বন্ধে শুনে ওরা এখন নিশ্চিন্ত। এ একটা এমন কথা—যার মানে ওরা বোঝে না—যদি বা বোঝে—আবছাই বোঝে। কিন্তু মস্ত পাপ এর আড়ালে-আবডালে লুকিয়ে থাকলেও ওরা মাপ করে। এমনি করে ওরা তাকে নিজেদের দুঃখের সাথী করে নেয়।

প্রথমে প্রথমে এতিয়েঁ ওকে নিতান্ত মিনমিনে ধাতের মানুষ বলেই ঠাউরে-ছিল। লোকটা যেন বড় গম্ভীর। তার ইতিহাস সে আবিষ্কার করেছে অনেক পরে। সুভেরিন তুলার এক অভিজাত পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। সেন্ট পিটার্সবুর্গে যখন ডাক্তারী পড়ে, তখন সোশালিজমের ঢেউ বয়ে চলেছে দেশে। রাশিয়ার সব তরুণকেই ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে ঢেউ। এই সোশালিজমের আওতায় এসে সে ঠিক করলে, একটা কিছু হাতের কাজ শিখবে। সে মিস্ত্রী হবে। এতে করে জনগণের সঙ্গে মিশতে পারবে, তাদের চিনতে পারবে আর ভাইয়ের মতোই তাদের সাহায্য করবে। এখন এই বৃত্তি করেই তাকে খেতে হয়। সম্রাটকে খুন করতে গিয়ে অকৃতকার্য হয়ে সে পালিয়ে এসেছে দেশ থেকে। সে নাকি এক সবজিওয়ালার দোকানে একমাস লুকিয়ে থেকে সুড়ঙ্গ খুঁড়েছিল পথ অবধি। তারপরে সেখানে বোমা পুরে রাখলে। বোমা ফাটলে বাড়িখানাই উড়ে যেত। পরিবার থেকে খেদানো ছেলে নিঃসম্বল হয়ে এল ফ্রান্সে। ফ্রান্সের কারখানাগুলো তার নাম কালো খাতায় বসিয়ে রাখলে। কারণ সে বিদেশী, গোয়েন্দাও হতে পারে। তখন সে উপোস করে মরবার দাখিল। শেষে মজুরের ঘাটতি পড়ায় মঁতসু কোম্পানি তাকে নিয়ে নিলে। এক বছর ধরে এইখানেই কাজ করছে। ভাল মানুষ, নিরীহ, চুপচাপ মানুষ—এক হপ্তা দিনে কাজ করে, পরের হপ্তা রাতে। এমন নির্ভরযোগ্য বিশ্বাসী মানুষ, উপরওয়ালারা কথায় কথায় তারই নজির দেখান।

এতিয়েঁ ঠাট্টা করে শুধালে, তোমার কি তেষ্টা পায় না সাঙাৎ?

যখন খাবার খাই, তখন তেষ্টা পায়।

মেয়েদের কথা নিয়েও ওকে সাথীরা ঠাট্টা-তামাশা করে। ওকে নাকি রেশমী মোজা পাড়ার কাছে কবে এক কয়লা-চালুনি মেয়ের সঙ্গে দেখেছে। খেতে ওরা ওলট-পালট করছিল।

সে কিন্তু উদাসীন ভাবেই ঘাড় নাড়ে। কয়লা-চালুনি মেয়ে দিয়ে তার কি হবে? মেয়েরা তখন পর্যন্ত তার কাছে সাথী—যতক্ষণ তারা বন্ধুত্ব আর সাহস দেখাতে পারে। যদি ভীরু হয়, কি দরকার ফ্যাসাদে পড়ে। ওতে তো পস্তাতেই হয়। না, বন্ধন সে চায় না—সে মিতাই হোক আর মিতানিই হোক। সে তার নিজের জীবনের মালিক—অন্যের জীবনধারা নিয়ন্ত্রণের ভারও তার উপর।

প্রতিদিন রাত ন'টার পরে সরাইখানা খালি হয়ে যায়। এতিয়েং শুধু তখন সাথীর সঙ্গে বসে এমনি আলাপ করে। আস্তে তারিয়ে-তারিয়ে বীয়ার খায়, আর ইঞ্জিনম্যান হড়ঘাড়ি সিগ্রেট টানে। তামাকে সরু সরু আঙুলগুলো হলদে হয়ে গেছে তার। সাধুসন্তের মতো ধোঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে স্বপ্নালু দৃষ্টিতে তন্ময় হয়ে চেয়ে থাকে, আর বাঁ হাতখানা কি যেন হাঁতড়ে বেড়ায়, অনুভব করতে চায়। শেষে একটা পোষা খরগোশ তুলে নেয় কোলে। খরগোশটা বাড়িতে স্বচ্ছন্দে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সব সময়েই পেটউলী হয়ে থাকে। ওর নাম দিয়েছে পোল্যান্ড। খরগোশটাও তাকে ভালবাসে, এসে সুঁ সুঁ করে পায়জামা শোঁকে, থাবা দিয়ে আঁচড়ে দেয়। ও তাকে কোলে তুলে নেয়। ওর কোলে জবুথবু হয়ে বসে থাকে, কান দু'খানা এলিয়ে দেয়, চোখ মুদে আসে। ক্লান্তি তার নেই, অজান্তে সোহাগ করে ওর ধূসর রেশমের মতো লোমে আদর করে হাত বুলিয়ে দেয়। এই জীবন্ত কোমলতার উষ্ণ স্পর্শে সে বুঝি শান্তি পায়।

এতিয়েং এক সন্ধ্যায় বললে, জানো, প্লুচার্তের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি। ওরা দু'জন আর রাসেনার আছে। শেষ খদ্দের ধাওড়ায় ফিরে গিয়ে এতক্ষণে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছে।

সরাইখানার মালিক ওদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললে, তাই নাকি? এখন ও কি করছে?

লিল্-এর এই মিস্ত্রীর সঙ্গে পুরো দু'মাস ধরে এতিয়েং'র চিঠিপত্র চলছে। ম'তসুতে সে কাজ পেয়েছে সেকথা তাকে জানিয়েছে। ওকে রাজনীতিক শিক্ষা কে দিচ্ছে তার নামও বাদ পড়েনি। এতিয়েং'র মনে হয়েছে, খনির মজুরদের মধ্যে রাজনীতির প্রচারে সুভেরিনের যথেষ্টই এলেম আছে।

সমিতিটা ভালই চলছে। চারদিক থেকে এসে ভরতি হচ্ছে মানুষ।

সুভেরিনকে রাসেনার শুধাল, সমিতির ব্যাপারটায় তোমার কি মনে হয়?

সুভেরিন পোল্যান্ডের মাথা আদর করে চুলকে দিচ্ছে। সে এবার এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে আস্তে আস্তে বললে,

বোকামি ছাড়া আর কি!

কিন্তু এতিয়েং দমল না, সে বরং উৎসাহী হয়ে উঠল। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে মজুরের যে লড়াই চলছে, তার ভিতরে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তার বিদ্রোহী প্রকৃতি তাকে এখানে টেনে এনেছে। এখনো তার আছে নির্বুদ্ধিতার মোহ। সে আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংস্থার কথা বললে। লন্ডনে সবে তার

প্রতিষ্ঠা হয়েছে। একি এক বিরাট প্রচেষ্টা নয়—এ অভিযানে কি শেষে ন্যায়ের জয় হবে না? আর তো সীমান্তের বাধা নেই। সমস্ত দুনিয়ার মজুর জেগে উঠেছে, এককাট্টা হয়েছে—মজুররা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে রুজি রোজগার করে তারই প্রতিশ্রুতি ওদের দাবি। সহজ সরল সংস্থা, বিরাট সংস্থা। নীচে কমিউন, তারপরে ফেডারেশন—এই ফেডারেশন গড়ে উঠেছে গোটা প্রদেশ নিয়ে; তারপরে আছে জাতি; তারপরে তো এক সাধারণ সভায় সমস্ত মানবতা প্রতিনিধিত্ব করছে। প্রতি জাতির একজন করে নির্বাচিত সম্পাদক সেখানে রয়েছে। ছ' মাসের ভিতরে সারা দুনিয়া এই সংস্থা জিনে নেবে—নিজেরা মালিকদের সুমুখে নিজেদের দাবি উত্থাপন করবে। মালিক যদি বেচাল চালে—ওরা তাদের নিজেদের দাবি মানতে বাধ্য করাবে।

সুভেরিন আবার একই কথা বললে—এতো নিছক বোকামি! তোমাদের বন্ধু কার্ল মার্কস এখনো নিরপেক্ষ শক্তির কাজের পক্ষপাতি। সেই শক্তিগুলির ক্রমিক গতির দিকেই চেয়ে আছেন। এখন রাজনীতি নয়, ষড়যন্ত্র নয়—তাই না সাঙাৎ? সব কিছুই এখন দিনের বেলায় করতে হবে সব্বার সুমুখে—শুধু মজুরি বৃদ্ধিই এখন উদ্দেশ্য। তোমাদের ঐ ক্রমিক অগ্রগতির কথা বলে আমাকে জ্বালিও না। আগুন জ্বালিয়ে দাও শহরের চারদিকে, মানুষকে পেড়ে ফেল—সব কিছু দলে-পিষে দাও! ত্যর পর যখন এই পচা-গলা দুনিয়াটার বাকি কিছুই থাকবে না, হয়তো তখন এই জায়গায়ই গড়ে উঠবে, সেরা দুনিয়া।

এতিয়েঁ হাসল। তার সাথীর বক্তৃতা সে সব সময়ে বোঝে না। এই যে ধ্বংসের দর্শন এ যেন তার কাছে ভান বলে মনে হয়। রাসেনার ওর চেয়ে বুদ্ধিমান—দুনিয়ার হালচালে সে দড়। সে রেগে উঠতে রাজি নয়। সে ব্যাপারটা জানতে চাইলে।

কি করবে? মঁসুতেও একটা সমিতি গড়বে নাকি?

প্লুচার্তের তাইত্ই ইচ্ছে। সে নর্ডের ফেডারেশনের সম্পাদক। সে ওদের একটা ব্যাপারেই বেশি করে সমিতির কার্যকরীতা সম্বন্ধে বুঝিয়েছে—ধর্মঘটের সময়ে খনির মজুরদের এতে উপকার হবে। এতিয়েঁর বিশ্বাস ধর্মঘট আসন্ন; এই কাঠের ব্যাপারটাই শেষটায় খারাপ দাঁড়াবে; কোম্পানি যদি আর কিছু দাবি করে তাহলে পিটে পিটে বিদ্রোহ দেখা দেবে।

রাসেনার বিবেচকের মত বললে, ঐ চাঁদা নিয়েই হবে যত মুশকিল। সাধারণের ভান্ডারে আধ ফ্রাঁ করে দাও, আবার সমিতিতে দু' ফ্রাঁ। যদিও এমন কিছু ব্যাপার নয়, কিন্তু দেখবে অনেকেই দিতে চাইবে না।

এতিয়েঁ বললে, তাছাড়া আমরা একটা আখেরী সমিতি তৈরি করব, সেইটাই দরকার হলে সংগ্রামী তহবিল হয়ে দাঁড়াবে।...যাই হোক, এ নিয়ে ভাবা দরকার। আর সবাই যদি তৈরী থাকে—আমিও তৈরী আছি।

নীরবতা। কাউন্টারের উপরে তেলের বাতিটা ধোঁয়া উগরে দিচ্ছে। খোলা দরজা দিয়ে ভেসে আসছে লা-ভোরোর খালাসীদের ফার্নেসে কয়লা যোগাবার শব্দ।

রাসেনার-গিন্নী এরই মধ্যে এসে ঢুকেছে। মুখ গোমড়া করে শুনছে আলাপ। তার সেই চিরন্তন কালো পোষাকে যেন বড় বেশি ঢ্যাঙা বলে মনে

হয়। সে বললে, সবকিছুই এখন আক্রা!...তোমাকে যখন বনু বাইশ সু ডিমের জন্যে দিনু...দেখো, দেখো, সব ফেটে পড়বে গো!

তিনজনেরই এ-বিষয়ে একমত। দুঃখের পাঁচালি গাইতে বসল ওরা। স্বরে হতাশা। মজুররা আর পারছে না; বিপ্লব হয়ে আগের চেয়ে আরো তাদের দুর্দশা বেড়েছে। ১৭৮৯ সাল থেকে বুর্জোয়ারা (মধ্যবিত্ত শ্রেণী) দেশের যা কিছু চর্বি ছিল চেটেপুটে নিয়েছে—মজুররা যে থালা-বাসন চেটে পেট ভরাবে—সেটুকুও বাকি রাখেনি। মজুররা একশো বছর ধরে সমৃদ্ধি আর জীবন ধারণের মানের বখরাদার হয়ে এসেছে—একথা কে বলবে? ওদের স্বাধীন বলাও তো বিদ্রূপের নামান্তর—হ্যাঁ, স্বাধীন ওরা বটে—তবে সে মরবার জন্যে —আর মরছেও। মরার আজাদী ওরা পেয়েছে। যারা গিয়ে দিব্যি নিজের কাজ গুছিয়ে নেয়, গরীব বেচারীদের জন্যে একবারও ভাবে না—পুরানো জুতোর মতো যাদের মনে করে—তাদের ভোট দিয়েই বা কি হবে? ওতে তো মুখে একটা দানাও জুটবে না! না—যেভাবে হোক, এর শেষ হওয়া চাই; হয়, আইন বাঁচিয়ে ভালভাবে একটা সমঝোতা করে নিতে হবে, নয়তো আমদানি হবে বর্বরতা। আগুন জ্বালিয়ে দেবে, খুন করবে। বুড়োরা না দেখতে পারে —কিন্তু ছেলেপুলেরা এসব চোখে দেখে যাবে। বর্তমান শতক যেতে না যেতে আর এক বিপ্লব আসবেই—আর সে হবে শ্রমিক বিপ্লব—সে এক চূড়ান্ত ব্যাপার—সমাজের উঁচু থেকে নীচুতলা একেবারে সাফ করে দিয়ে সেখানে গড়ে তুলবে ন্যায়ের ইমারত। সেখানে থাকবে না, অন্যায়, অবিচার।

রাসেনার-গিন্নী আবার জোর দিয়ে বললে, দেখো, এ হবেই।

সবাই এক মত! হাঁ, হবেই—একটা ভাঙচুর হয়ে যাবে।

সুভেরিন পোল্যান্ডের কানে সুড়সুড়ি দিচ্ছে, আর তার নাক ফুলে ফুলে উঠছে খুশীতে। আস্তে আস্তে কি বলছে সুভেরিন—সুদূরে তার দৃষ্টি।

মজুরি বাড়াও! কি করে বাড়ানো হবে? সবচেয়ে কম পয়সায় ধার্য হয়ে আছে মজুরি—লোহার মতো আইনের শেকল তাকে ঘিরে আছে। এ এমন মজুরি যাতে মজুর আর তার কাচ্চাবাচ্চাদের শুকনো রুটিই জোটে। যদি এর চেয়ে কম হোত, মজুররা মারা যেত; আর নতুন মজুরের দরকার পড়ত—তখন মজুরির হার চড়ে যেত। আবার যদি মজুরির হার ওরা বেশি বাড়িয়ে দেয়, তাহলে তো পালে পালে মানুষ এসে জুটবে, আর সঙ্গে সঙ্গে মজুরি যাবে কমে। এ হচ্ছে শূন্য উদর দিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখা—বুভুক্ষার কারাগারে যাবজ্জীবন দণ্ডাদেশ।

কখনো কখনো সুভেরিন নিজেকে ভুলে যায়, তখন সোশালিজমের বুলি কপচায়। বুদ্ধিজীবী হয়ে সে দেখা দেয়। রাসেনার আর এতিয়েন্‌র কেমন হাঁফ ধরে। ওর এই হতাশা ওদের বিব্রত করে, ওরা জবাব খুঁজে পায় না।

সে আবার শান্ত স্বরে বলতে লাগল, তোমরা দেখছ না? সবকিছু ভেঙে-চুরে ফেলতে হবে, তা নয় তো আবার দেখা দেবে বুভুক্ষা। হাঁ, চাই বিদ্রোহ, চাই ভাঙচুর—সবকিছু শেষ হয়ে যাক—সারা দুনিয়া রক্তে স্নান করে উঠুক—অগ্নিশুদ্ধি হোক তার...তার পরে আমরা দেখব কি করা যায়।

রাসেনার-গিন্নী সায় দিলে। এমনি সে বৈপ্লবিক জিগির তুললেও বড় ভদ্র, সে বললে, ভদ্দরলোক, ঠিকই বলেছেন গো!

এতিয়েঁ নিজের অজ্ঞতায় হতাশ হয়ে গেছে। সে আর তর্ক করলে না। উঠে পড়ে বললে, চল, এবার শুতে যাই। এসব তর্কে কি ভোর তিনটেয় ওঠা থেকে রেহাই মিলবে?

সুভেরিন, সিগারেটের শেষ টুকরোটা ঠোঁট থেকে ফেলে দিলে। খরগোশ-টাকে পেট ধরে তুলে মেঝেয় নামিয়ে দিচ্ছে। রাসেনার দোকানের দরজা-জানালা বন্ধ করছে। ওরা এবার নিঃশব্দে বিদায় নিলে। কানে এখনো বাজছে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলী। ওদের মাথা যেন ভারী হয়ে গেছে আলাপ-আলোচনায়।

রোজ রাতেই এমনি আলাপ-আলোচনা চলে শূন্য সরাইখানায়। এতিয়েঁর একক গেলাস ঘিরেই জমে ওঠে বৈঠক। এক ঘণ্টা কেটে যায় গেলাস শেষ করতে। কতগুলি অস্ফুট ধারণা ওর ভিতরে ঘুমিয়েছিল—সেগুলি জেগে জেগে ওঠে—প্রসার পায়। প্রথমেই ওর মনে হয়, ও কিছু জানে না। বহুদিন ধরে ওর পড়শীর কাছ থেকে বই ধার চাইতে ওর দ্বিধা হয়েছে। আবার এমন ভাগ্য, জার্মান আর রুশ বই ছাড়া ওর কাছে ফরাসী বই বড় বেশি নেই। শেষে সে সুভেরিনের কাছে একখানা ফরাসী বই চেয়ে ফেললে। বইখানা সমবায় নিয়ে লেখা। সুভেরিন বলে—এই আর একখানা বাজে বই! সে আবার নিয়মিত একখানা পত্রিকা ওর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে পড়ে। পত্রিকাখানির নাম 'সংঘর্ষ'। বিদ্রোহীদের কাগজ, জেনিভা থেকে বেরোয়। ওরা পাশাপাশি থাকে, দিনের পর দিন এক সঙ্গে কাজ করে—তবু ও যেন কেমন গম্ভীর। মনে হয় যেন জীবনের এটা বাসস্থান নয়—তাঁবু ফেলেছে মাত্র এখানে। কৌতূহল নেই, কোন উচ্ছ্বাস নেই—কোন সম্বলও তার নেই।

জুলাই মাসের প্রথম দিকে এতিয়েঁর বরাত কিছুটা ফিরল। খনির দিনের পর দিনের একঘেয়েমি একটা দুর্ঘটনায় ভেঙে গেল। গিয়োম স্তরে যারা কাজ করছিল, তারা হঠাৎ দেখলে ভুল হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে ভুলটা ধরা পড়ল। ইঞ্জিনিয়ারদের মাটি সম্বন্ধে অগাধ জ্ঞান থাকলেও তাদেরই দোষে ব্যাপারটা ঘটল। স্তর এখানে এসে গতি পরিবর্তন করেছে। সমস্ত পিট একেবারে নিষ্ফলা বরবাদ; শুধু আলাপ-আলোচনা শোনা যায়। এখানে এসে কয়লার স্তর একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে। হয় তো অন্যদিকে কোথাও গেছে স্তর। পুরানো মজুর যারা, তারা যেন কুকুরের মতো খালি শুঁকে বেড়াচ্ছে মাটি —খুঁজে ফিরছে অদৃশ্য কয়লার স্তর। কিন্তু গাঁইতি-চালিয়েরা তো আর ঠুঁটো হয়ে বসে থাকতে পারে না। এরই মধ্যে বিজ্ঞপ্তি লটকানো হ'ল, কোম্পানি ঠিকেদারদের সঙ্গে নতুন চুক্তি করবেন। কতগুলো কাটিং-এর চুক্তিনামা নিলামে উঠবে। ডাক হবে।

একদিন মেয়ু এতিয়েঁর সঙ্গে খনি থেকে বেরিয়ে এল। সে ওর দলে এতিয়েঁকে গাঁইতি-চালিয়ে হিসেবে নিতে চায় লেভাকের বদলে। সে এখন অন্য খাদে চলে গেছে। সর্দার আর ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে তার এ নিয়ে কথাও হয়ে গেছে। তাঁরা এতিয়েঁর উপর খুব খুশী। এতিয়েঁকে এই পদোন্নতি মেনে নিতে হল। মেয়ু যে তার উপর তুষ্ট এতেই সে খুশী।

সেদিন সন্ধ্যায় ওরা দুজনে পিটে এসে বিজ্ঞপ্তিগুলো পড়ে দেখলে। ভোরোর উত্তর দিকের গ্যালারির ফিলোনেয়ার স্তরের কাটিংগুলো নিলামে

উঠেছে। এগুলোতে বড়-একটা লাভ হয় না। এতিয়েং তাকে শর্তগুলি পড়ে শোনাতে মেয়ু মাথা নাড়লে। পরদিন ওরা যখন নীচে এল, মেয়ু এতিয়েংকে স্তর দেখাতে নিয়ে গেল। পিটের তলা থেকে এই জায়গাটা বহু দূরে, তাছাড়া এখানকার পাথরে ধস্ নামতে পারে সহজে—কয়লাও এখানকার শক্ত, আর স্তরও বড় পাতলা; কিন্তু খেতে হলে তাদের মেহনতি করতেই হবে। তাই পরের দিন ওরা শেডে নিলামের ডাক দেখতে গেল। ইঞ্জিনিয়ার নিলামের কর্তা, তার সহকারী সর্দার। বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়ার উপস্থিত নেই বলেই এই ব্যবস্থা। পাঁচ-ছ'শো মজুর এসে ভিড় করেছে কোণের ছোট্ট মঞ্চটির সুমুখে—এদিকে ডাক উঠছে। এমন তাড়াতাড়ি উঠছে ডাক—শুধু গোলমালই শোনা যায়। অঙ্কের পর অঙ্কের ডাক ওঠে—আবার ডুবে যায়, অন্যের চড়া ডাকে বাতিল হয়ে যায়।

কোম্পানি চল্লিশটা কাটিং-এর চুক্তি নিলামে চড়িয়েছে। মেয়ুর ভয়, সে হয়তো একটাও পাবে না। প্রতিদ্বন্দ্বী ডাকিয়েরা কমাতে কমাতে চলেছে ডাক। ওরা শিল্প-সংকটের গুজবে অধীর, বেকারত্বের ভয়ে ভীত। এই গলা-কাটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এই ত্রাসের ভিতরে নিগ্রেলের তাড়াহুড়ো নেই—ডাক নীচে নামতেই সে দিচ্ছে। আর অন্যদিকে দাঁসার চাইছে তাড়াতাড়ি কাজ সারতে। সে নির্জলা মিথ্যা বলে বুঝিয়ে দিচ্ছে, এ এক বিরাট দাঁও। পঞ্চাশ মিটারের চুক্তি ডেকে নেবার জন্যে মেয়ু তার এক সাথীর সঙ্গে লড়াই শুরু করে দিলে। সেও সমান একগুঁয়ে, কিছুতেই ছাড়বে না। প্রতি টবের মজুরির হার থেকে ওরা এক সেন্ট করে বাদ দিলে। শেষে মেয়ু সবচেয়ে কম মজুরির হারে চুক্তি ডেকে নিলে। দু নং সর্দার রিসোম ওর পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল, সে চাপা স্বরে গাল দিলে। কনুই দিয়ে গুঁতোলে, বার বার বিড়বিড় করে বললে, ঐ হারে সে কাজ চালাতে পারবে না।

এতিয়েংও গাল দিতে দিতে বেরিয়ে এল। ক্যাথেরিনের সঙ্গে গমখেত থেকে ফিরছিল সাভাল, সে তার সামনেই ফেটে পড়ল। সে তো মজা মেরে এল, এদিকে তার হবু-শ্বশুরটি যে এরই মধ্যে এক দাঁও মারলেন।

হা ভগবান! মোরা যে শেষ হয়ে গেলাম! একি গতিক হ'ল—শেষে কি মজুরে মজুরে লড়াই বেঁধে যাবে নাকি!

সাভাল ফুঁসে উঠল। সে তার মজুরি কমাতে দেবে না। জাচারি এসেছিল কৌতূহলী হয়ে, সে বললে, ব্যাপারটা ভারি খারাপ হ'ল। এতিয়েং রেগে উঠেছে, হাত নেড়ে ওদের থামতে বললে।

একদিন এসব মজুরি কাটাকাটির শেষ হবে—সেদিন আমরাই হব মালিক।

মেয়ু ডাকের পর থেকে বোবা হয়ে গিয়েছিল, সে এবার যেন জেগে উঠল, সে বিড়বিড় করে আওড়ালে,

মালিক হব! কি পোড়া বরাত। একটু জলদি-জলদি হলে তো হোত!

দুই

জুলাই মাসের শেষ রোববার। পরব আর মঁতসুর মেলার দিন। শনিবার রাত থেকে গাঁয়ের সুগৃহিণীরা কামরাগুলি জলে ধোয়,—সে যেন এক প্রলয় চলে—

কলসী কলসী জল ঢালা হয় পাথুরে মেঝেয়, আর দেয়ালে। মেঝে শুকোতে না-শুকোতে তার উপরে সাদা বালি এনে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। গরীবের পক্ষে এতো এক রীতিমতো বিলাসিতা। দিনটা বড় গুমোট। আকাশে ঘন মেঘ, ঝড়ের আশংকা আছে। এমনি আকাশের নীচে উত্তর অঞ্চলের খাঁ-খাঁ মাঠ বিছিয়ে আছে, বুঝি বা ঘামছে।

রোববারে মেয়ুদের বাড়িতেও ওঠার সময় ঠিক থাকে না। খুশি মতোই সবাই ওঠে। ভোর পাঁচটা থেকে মেয়ু এপাশ-ওপাশ করতে থাকে, তারপর উঠে পড়ে কাপড়-চোপড় পরে। কিন্তু ছেলেমেয়েরা বেলা ন'টা অবধি ঘুমোয়। আজ পরবের দিন। মেয়ু উঠে বাগানে গিয়ে পাইপ টানলে। ফিরে এসে সবার জন্যে বসে রইল টেবিলে। এরই মধ্যে একটুকরো রুটি ও একা একা খেলে। এমনি করেই সকালটা কেটে গেল। স্নানের টবটার ফুটোটা মেরামত করলে, ঘড়ির নীচেই যুবরাজের একখানা ছবি টাঙালে। ছেলেমেয়েরা ঐ ছবি-খানা উপহার পেয়েছিল। এবার একে একে সবাই নেমে এল, বুড়ো দাদু বনেমোর বাইরে রোদে চেয়ার নিয়ে গিয়ে বসে পড়ল। মা আর আলঝির এবার রান্না-বান্নায় লেগে গেল। ক্যাথেরিন আঁরি আর লেনোরকে সাজিয়ে-গুজিয়ে নিয়ে নীচে এল; এগারোটা বাজল। জাচারি আর জাঁলিন যখন এল তখন সিদ্ধ আলু আর খরগোশের মাংসের গন্ধে সারা বাড়িখানা ম-ম করছে। ওরা এল হাই তুলতে-তুলতে, চোখ ওদের ফোলা-ফোলা।

পরবের ব্যাপারে সারা গাঁয়ে সাড়া পড়ে গেছে। সবাই তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলে, দল বেঁধে মঁতসুতে যাবে। পালে পালে ছেলেমেয়ে ছুটোছুটি করছে, ছুটির দিনে চটি-জুতো ঘষড়াতে-ঘষড়াতে ঢিলেঢালা ভাবে চলেছে পুরুষরা। বাড়িগুলির দরজা-জানালা এখনো খোলা—কামরার পর কামরা এখন দেখা যায়। বাড়ির লোকে এখন থই থই করছে। ওরা কেউ বা ব্যস্ত, কেউ বা চীৎকার করছে, কেউ বা আবার গল্প-গুজবে মত্ত। গাঁয়ের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি খরগোশের মাংসের গন্ধ চিরাচরিত ভাজা পেঁয়াজের গন্ধের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে।

মেয়ুরা কাঁটায় কাঁটায় বারোটায় খাওয়া-দাওয়া সারল। ঘরে ঘরে হৈ-হল্লা চলছে, মেয়েরা এ ওকে চেঁচিয়ে ডাকছে, জবাব দিচ্ছে—ধার নিচ্ছে, ধার দিচ্ছে—ছেলেমেয়ের পিছে তাড়া করছে, মারছে, টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসছে। এই হৈ-হট্টগোলের তুলনায় মেয়ুরা বেশ চুপচাপ। তা ছাড়া আর-একটা ব্যাপার ঘটেছে। তিন হপ্তা ধরে লেভাকদের সঙ্গে জাচারি আর ফিলোমেনের বিয়ের ব্যাপার নিয়ে মন কষাকষি হয়ে গেছে। পুরুষদের মধ্যে তবু দেখা-শোনা হয়, কিন্তু মেয়েদের মধ্যে মুখ দেখা-দেখি বন্ধ। ওরা যেন কেউ কাউকে একেবারেই চেনে না। ঝগড়ার ফলে এখন পিয়েরোঁ-বৌয়ের সঙ্গে দুই পরিবারের ভারি গলাগলি ভাব। কিন্তু আজ পিয়েরোঁ-বৌ মার জিম্মায় স্বামী আর লিদিকে রেখে মার্সিয়েনেয় তার এক 'তুতো' বোনের বাড়ি গেছে বেড়াতে। ওরা সবাই ব্যাপারটা নিয়ে হাসাহাসি করেছে। 'তুতো' বোনটি কে তা ওরা জানে। গোঁফওলী বোন—লা-ভোরোর সর্দার ছাড়া সে আর কেউ নয়। মেয়ু-বৌ একটু রসান দিয়ে বললে, তা যাই হোক বাপু, পরবের দিনে ঘর ছেড়ে যাওয়া ঠিক নয়।

আলু দিয়ে রান্না খরগোশের মাংস তো আছেই। খরগোশটাকে মাসখানেক

ধরে শেড়ে রেখে খাইয়ে মোটাসোটা করা হয়েছে। তাছাড়া আছে মাংসের সুরুয়া, গরুর মাংস। গতকালই দু হপ্তার মজুরি মিলেছে, এমন বরাত পরবের দিনের আগে কখনো হয় নি। এমন কি গত সন্ত বার্বারার পরবে তিন দিন ছুটি মিলেছিল, কিন্তু তখন খরগোশটা এমন মোটাসোটা আর নধর হয়ে ওঠেনি। দশ জোড়া চোয়ালে এমন ভাবে হাড় চিবোনো শুরু হ'ল যে শেষে আর হাড়ের খোঁজই পাওয়া গেল না। খুদে এস্তেলের তো সবে দাঁত গজাচ্ছে, আর বুড়ো বনেমোরের দাঁত পড়ে যাচ্ছে—তবু তারা বেশ আচ্ছা করেই চিবোল। মাংসও ছিল ভাল, কিন্তু ভাল হজম হ'ল না; মাংস তো বাড়িতে কখনো-সখনো আসে। দেখতে-দেখতে সব উজাড় হয়ে গেল; শুধু সন্ধ্যের জন্যে রইল একটুকরো গরুর মাংস সিদ্ধ। খিদে পেলে ওরই সঙ্গে রুটি আর মাখন দিয়ে তারা আহারপর্ব সারবে।

জাঁলিন সবার চেয়ে আগে বেরিয়ে পড়ল। ইস্কুল-বাড়ির আড়ালে বেবের্ত তার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। তারা বহুক্ষণ ধরে ঘুর ঘুর করলে। বুড়ী-বুলের কাছ থেকে ফুসলে লিদিকে নিয়ে আসতে হবে। বুড়ী বেরুবে না, আর ছুঁড়িটাকেও ঘরে বেঁধে রাখবে। বুড়ী যখন দেখলে, মেয়েটা উধাও হয়েছে, সে চেঁচিয়ে, প্যাকাটির মতো হাত ছুঁড়ে এক কাণ্ড বাঁধিয়ে দিলে। পিয়েরোঁ এই হাঙ্গামায় চটে গেছে। সে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ল। বৌ তার স্ফূর্তি করতে গেছে, সেও একেবারে পরিশুদ্ধ বিবেক নিয়ে বেরিয়ে পড়ল স্ফূর্তির খোঁজে।

বুড়ো বনেমোরও শেষে বেরিয়ে পড়ল। মেয়ুরও বিশুদ্ধ বায়ু সেবন দরকার। সে বৌকে শুধালে, সে আসবে কি না। না, কি করে সে আসবে? কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে এতো বাঁদি-গিরি ছাড়া কিছু নয়। তবে—আসতেও পারে —একটু ভেবে দেখবে। ওরা দুজনে দুজনকে ঠিক খুঁজে পাবে ভিড়ে। মেয়ু পথে পড়েই একটু ইতস্তত করলে, তারপর পাশের দরজায় গিয়ে হাঁক পাড়লে —লেভাক তৈরী তো! কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখে জাচারি ফিলোমেনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে; এবার লেভাক-বৌ সেই একঘেয়ে বিয়ের কথা পেড়ে বসল। সে চেঁচিয়ে বললে, কেউ তার জন্যে ভাবে না। সে মেয়ু-বৌয়ের সঙ্গে এ-ব্যাপারে একটা হেস্ত-নেস্ত করে ফেলবে। একি জীবন সে কাটাচ্ছে, মেয়েটার বেজন্মা কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে সে থই পাচ্ছে না, এদিকে মেয়েটা পিরিতের মানুষের সঙ্গে লটপটি করছে। ফিলোমেনের ভ্রূক্ষেপ নেই, সে টুপিটা পরে ফিতেটা বেঁধে নিলে, জাচারি তাকে নিয়ে চলল। যাবার সময় বলে গেল, তার মার মতো হলেই সে রাজি। লেভাক চলে গেছে, মেয়ুও তাড়াতাড়ি এই বলে চলে এল—লেভাক-বৌয়ের কথা সে তার পরিবারকে জানাবে। বুতেলুপ এক টুকরো পনীর খাচ্ছে টেবিলে বসে; সে এক পাত্তর টানবার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলে। দিব্যি শান্তশিষ্ট স্বামীর মতো বাড়িতে বসে থাকতেই তার ভাল লাগে।

একে একে গাঁখানা খালি হয়ে গেল। পুরুষরা একে একে চলে গেল। মেয়েরা দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দেখছে। তারা তাদের ভালবাসার মানুষদের সঙ্গে উলটো পথ ধরল। বাপ গির্জার আড়ালে চলে যেতেই ক্যাথেরিন সাভালকে দেখে ছুটে এল। এবার দুজনে চলল মঁতসুর পথে। মা পড়ে

রইল একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে। চেয়ার ছেড়ে ওঠারও উপায় নেই। এক পেয়ালা ফুটন্ত কাফি তৈরি করে নিয়ে আস্তে আস্তে চুমুক দিতে লাগল। শুধু এখন গাঁখানায় বৌরাই আছে, তারা পরস্পরকে ডেকে আনছে, টেবিলে গোল হয়ে বসে কফি-পটের কফি নিঃশেষ করছে। এখনো কফি-পটগুলো বেশ গরম আছে, আবার তেলালো হয়ে উঠেছে দুপুরের খাওয়ার ঝোলে আর তেলে।

মেয়ু আঁচ করে নিলে, লেভাক বোধহয় আঁভাতাস-এ আছে। তাই সে আস্তে আস্তে রাসেনারের ওখানে এসে ঢুকল। সত্যিই তাই! বারের আড়ালে ছোট্ট বাগানখানা। একটা ঝোপ আড়াল করে রেখেছে। সেখানে লেভাক কয়েকজন সাঙতের সঙ্গে খেলছে। স্কিটল ('ক'টা পিন পুঁতে খেলা। বল ছুঁড়ে পিনগুলো ফেলে দিলেই জিত হয়'—অনুঃ) পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে বুড়ো দাদু বনেমোর আর মোকে-বুড়ো। ওরা এমন তন্ময় যে পরস্পরকে কনুইয়ের গুঁতো অবধি দিচ্ছে না। ট্যারচাভাবে জ্বলন্ত সূর্যের কিরণ এসে পড়েছে তাদের উপর; শুধু সরাইখানার একদিকেই এখন ছায়া। এতিয়েঁ সেই ছায়াঘন কোণে এক টেবিলে বসে পান করছে। সে বিরক্ত। এইমাত্র সুভেরিন দোতলায় তার ঘরে চলে গেল। প্রায় প্রতি রোববারেই ইঞ্জিনম্যান সুভেরিন তার ঘরে দরজা বন্ধ করে লেখে বা বই পড়ে।

লেভাক মেয়ুকে বললে, খেলবে নাকি এক হাত?

মেয়ু নারাজ; বেজায় গরম, তেষ্টায় তার গলা ফেটে যাচ্ছে।

এতিয়েঁ ডাকলে, রাসেনার আর এক গেলাস নিয়ে এস।

মেয়ুর দিকে তাকিয়ে বললে, আমি দাম দেব।

ওরা এখন সাথী—সাঙাৎ। রাসেনারের তাড়া নেই। তিন-তিনবার হাঁক দিতে হ'ল। শেষে রাসেনার-গিন্নী বীয়ার নিয়ে এল। না-গরম-না-ঠান্ডা বীয়ার। এতিয়েঁ গলা নামিয়ে তার এই ডেরাটা সম্বন্ধে নালিশ জানালে। লোক এরা ভাল, আদর্শও আছে—কিন্তু বীয়ার একবারে যাচ্ছেতাই—আর সুরুয়া তো আরো খারাপ! সে দশবার আস্তানা বদলাবার কথা ভেবেছে, শুধু মঁতসু থেকে দূরপাল্লায় পড়ে বলে বদলায়নি। যাহোক, একদিন না একদিন ও গিয়ে গাঁয়ে কারো বাড়িতে উঠবে।

ঠিক, ঠিক! মেয়ু চাপা গলায় বললে, কারো বাড়িতেই ওঠা উচিত।

এবার হৈ-হল্লা শুরু হয়ে গেল। লেভাক এক বলে সবগুলো পিন ফেলে দিয়েছে। হল্লা-হুল্লোড়ের ভিতরে মোকে আর বনেমোর নীচু দিকে চেয়ে আছে। ওরা নিঃশব্দে তারিফ করছে তার ওস্তাদি। এবার ঠাট্টা-তামাশা শুরু হয়ে গেল স্ফূর্তিতে। খেলুড়েরা ঝোপের আড়ালে মোকে-ছুঁড়ির হাসি-খুশি মুখখানা দেখতে পেয়েছে। এক ঘণ্টা ধরে সে ঝোপের আড়ালে আছে। হাসির শব্দ শুনে এবার কাছে আসার সাহস হ'ল।

সে কি? একা নাকি গো? লেভাক চেঁচিয়ে উঠল। তোর পিরিতের মানুষগুলো কোথায়?

আমার পিরিতের মানুষ! তাদের আস্তাবলে রেখে এসেছি, সে উচ্ছৃঙখল আনন্দে মাতোয়ারা। এখানে একটাকে খুঁজে নেব।

ওরা সবাই অশ্লীল ইয়ার্কি ঠুকে নিজেদের সঁপে দিতে চাইল। সে মাথা

নাড়ছে, আরো জোরে হেসে হেসে উঠছে—লজ্জার ভান করছে ছুঁড়িটা। তার বাপ শুনছে হাসি-ঠাট্টা, কিন্তু উপড়ে-পড়া পিনগুলো থেকে চোখ তুলছে না।

এতিয়েঁর দিকে তাকিয়ে লেভাক বললে, তুমি ভিড়ে পড় না সাঙাৎ। আমার ছুঁড়িটার উপরই যে তোমার তাগ সেকথা আমরা জানি। ওরে—এই ছোঁড়াটাকে গায়ের জোরে জিনে নিতে হবে।

এতিয়েঁও হেসে উঠল। ওর চারপাশেই ঘুর ঘুর করছে মেয়েটা। এতিয়েঁ নারাজ। আমোদ সে পাচ্ছে, কিন্তু ওর উপর তার একটুও মন নেই।

মেয়েটাও ওকে বুঝি ভোলাতে পারে না। আরো কিছুক্ষণ ঝোপের আড়ালে সে ওর দিকে বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে রইল, তারপর চলে গেল। এবার তার মুখখানা গম্ভীর। যেন গলন্ত রোদে ঝলসে গেছে মুখখানা, অভিভূত হয়ে পড়েছে সে।

এতিয়েঁ তেমনি ফিসফিসিয়ে মেয়ুর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে লাগল। মঁতসুর খনির মজুরদের জন্যে একটা আখেরী তহবিল খুলতে হবে।

এতে ভয় পাবার কি আছে! কোম্পানি তো আমাদের স্বাধীনভাবে থাকার কথাই বলছে, আমরা ওদের কাছে ভাতা পাই, আর সেই ভাতা ওদের খুশিমতো ওরা বিলিয়ে দেয়। আমাদের মজুরি থেকে তো এই ভাতা কেটে রাখে না। আমি বলি, ওদের এই আওতার বাইরে যদি আমরা নিজেদের সাহায্যের জন্য একটা সমিতি খুলি—তাহলে দরকার মতো সেটার টাকাকড়ি কাজে লাগবে।

সে বিস্তারিত বিবরণ দিলে, সংগঠনের নানা আলোচনা করলে, নিজে সে এর জন্যে যা মেহনতি হয় করতেও রাজি আছে।

মেয়ুর ওর উপর বিশ্বাস হ'ল; আমি রাজি, তবে আর-সবাই আছে...... ওদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দলে টান।

লেভাক খেলায় জিতেছে। এবার খেলা ফেলে সবাই বীয়ার নিয়ে মেতেছে। কিন্তু মেয়ু আর খাবে না।

এখনো দিন যায়নি, পরে না হয় আর-এক গেলাস হবে। পিয়েরোঁর কথা ভাবছে। পিয়েরোঁ কোথায় গেল। লেফাঁতে হয়তো। সে এতিয়েঁ আর লেভাককে দলে টানল, এবার তিনজন মঁতসুর পথে রওনা হ'ল। আবার আঁভাতাস-এ আর একদল বসল স্কিটল খেলায়।

সদর সড়কে যেতে যেতে ওরা কাজিমিরের সরাইখানায় গিয়ে দুদণ্ড বসল, প্রোগ্রেম-এও কিছুক্ষণ কাটল। সাঙাৎরা খোলা দরজা দিয়ে হাঁক-ডাক শুরু করলে, না বসে উপায় নেই। ডাকা মানে ফি-বারেই একটা কি দু'টো বীয়ার টানা—নিমন্ত্রণ বজায় রাখবার এই রীতি—আবার খাওয়াতেও হয়। দশ-মিনিট থেকে বার্তাচিত করে ওরা আবার বেরিয়ে এল। আবার কিছুক্ষণ পরেই ঢুকতে হ'ল আর-একটা সরাইখানায়। বেসামাল হবার ভয় নেই। বীয়ার ওদের চেনা মাল—যত খুশি খেতে পারে, শুধু এক অস্বস্তি—ঠিক ঐ পরিমাণে আবার মুততেও হয়। সে কি মুত—মনে হয় যেন স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ জল! এস্তামিনেৎ লেঁকেত-এ পিয়েরোঁর সঙ্গে ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। সে তার দু'নম্বর গেলাস তখন শেষ করছে। গেলাসে গেলাসে ঠোকাঠুকি করে, পানে তো আর নারাজ হলে চলে না—তাই তিন নম্বর গেলাসও নির্বিবাদে গিলে ফেললে। বলাই বাহুল্য, ওরাও এক-এক গেলাস খেল। এবার চারজনে

বেরিয়ে পড়ল—জাচারিকে তিসোঁর সরাইখানায় পায় কিনা দেখতে। কিন্তু সরাইখানা শূন্য। ওরা আধ-পাঁইট করে নিয়ে বসে গেল। অপেক্ষা করছে। হঠাৎ সাঁত-ইলোর পানশালার কথা মনে পড়ে গেল। সেখানে দু'নম্বর সর্দার রিসোম সবাইকে এক পাত্র করে খাওয়ালে। এবার বেড়ানোর ওজুহাতে চলল এ-ও সরাইখানায় ঢুঁ-মারা।

লেভাক হঠাৎ বলে উঠল, ভাল্‌কানে চল না সাঙাৎরা। কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে সে।

সবাই হেসে উঠল, একটু বা এল দ্বিধা; তারপরে মেলার বেড়ে-ওঠা ভিড়ের ভিতর দিয়ে পথ করে চলল। ভাল্‌কানের লম্বা অপরিসর ঘরটার এক কোণে একটা কাঠের মঞ্চ। সেখানে পাঁচটা বাইজী, ওরা লিল্‌-এর বেশ্যাসমাজের তলানি। ওরা নাচছে-কুঁদছে, বুক খোলা, উরু খোলা পোষাকে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী করছে। খদ্দেররা দশ সু নজরানা দিয়ে ওদের যে-কোন একটাকে নিয়ে মঞ্চের পিছনে চলে যাচ্ছে। এরা বেশির ভাগই গাড়োয়ান, নয় তো খালাসী—এমন কি এদের মধ্যে চোদ্দ বছরের ছোঁড়ারাও আছে—এরাই খনির তরুণদল—এরা বীয়ার যত না খায়, তার চেয়ে জিন খায় ঢের ঢের বেশি। কয়েকজন বেশি বয়েসী মজুরও জুটেছে—ওরা গাঁয়ের লম্পট স্বামীর দল—তাদের বাড়িঘর রসাতলে যায়, তারা চেয়েও দেখে না।

ওরা একটা টেবিলে গিয়ে বসতে এতিয়েঁ লেভাককে আখেরী তহবিলের কথাটা বোঝাতে লাগল। সদ্য সে পেয়েছে তার আদর্শের প্রতি বিশ্বাস, তার লক্ষ্য মহৎ—আর তাই সে অক্লান্ত প্রচারক হয়েও উঠেছে।

সে বলতে লাগল, প্রতিজনই বিশ সু করে মাসে মাসে দিতে পারবে। চার-পাঁচ বছরের ভিতরে আমাদের বেশ কিছু টাকা জমবে। টাকা পিছনে থাকলে তাকতও বাড়ে। যাই ঘটুক, লড়াই চালিয়ে যাওয়া যায়...তোমার কি মনে হয় সাঙাৎ?

লেভাক আনমনা হয়ে বললে, আমি 'না' বলছিনে তো! বেশ তো পরে কথা হবে।

তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে একটা মোটা-সোটা মেয়ে। বিরাট তার চেহারা, মাথার চুল সোনালী।

মেয়ু আর পিয়েরোঁ গেলাস শেষ করে উঠে পড়ল। দু'নম্বর গানখানা শোনবার আর তাদের ইচ্ছে নেই। লেভাক রয়ে গেল।

এতিয়েঁ ওদের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে। সে বাইরে এসে মোকে-ছুঁড়িকে দেখতে পেলে। পেছু পেছু এসেছে। সবসময়েই সে হাজির, তেমনি বড় বড় চোখ মেলে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। হাসছেও ছুঁড়িটা—যেন হাসির ভিতর দিয়ে জানাচ্ছে—কি রাজি তো নাগর? এতিয়েঁ ঠাট্টা করে ঘাড় নাড়লে। মেয়েটা রেগে উঠে ভিড়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

পিয়েরোঁ শুধালে, সাভাল আবার কোথা গেল?

তাইত, মেয়ু বললে, ও হয়তো পিকেৎ-এ বসে আছে, চল—ওখানেই যাই।

ওরা পিকেতের সরাইখানায় ঢুকে দোরগোড়া থেকে ঝগড়া শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

জাচারি একজন গাট্টাগোট্টা লোককে ঘুষি পাকিয়ে শাসাচ্ছে। লোকটা পেরেক তৈরি-করিয়ে মিস্ত্রী। সাভাল পকেটে হাত ডুবিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছে।

মেয়ু শান্তস্বরে বললে, ঐ তো—ঐ তো সাভাল! ও ক্যাথেরিনকে নিয়ে এসেছে।

দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা ধরে ক্যাথেরিন আর তার ভালবাসার মানুষ মেলায় টো-টো করে ঘুরেছে। মঁতসু রোডের উপর দিয়ে এঁকে-বেঁকে চলেছে জনতার ধারা—চওড়া সড়কের দু'দিকে নীচু রং-চটা বাড়ির সার ধুঁকছে রোদে। আর জনতা চলেছে এঁকে বেঁকে, বাঁক ঘুরে ঘুরে। ওরা যেন পিঁপড়ের সার—সমতল রিক্ত প্রান্তরে এসে মিলিয়ে যাচ্ছে ভিড়ে। সেই চিরন্তন ভ্যাটভেটে কাদা এখন শুকিয়ে গেছে, উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে কালো কালো ধুলো। এ যেন ঝোড়ো-মেঘ। আচ্ছন্ন করে দিয়ে গেল প্রান্তর ঝড়ের আগে।

পথের দু'পাশের সরাইখানাগুলোয় এখন ভিড়ে ভিড়। পথ অবধি গেছে টেবিলের সার। তার পরেই সারি সারি দোকান বসেছে। খোলা বাজার বসেছে। মেয়েদের জন্যে সেখানে বিক্রি হচ্ছে স্কার্ফ আর আরশি, বাচ্চা ছেলেদের জন্যে টুপি আর ছুরি, আর মেঠাই-মণ্ডা, খেজুর আর বিস্কুটের তো কথাই নেই। গির্জার কাছে ধনুর্বানের খেলা দেখানো হচ্ছে। কারখানার উলটো দিকে চলছে বোল খেলা (কাঠের বল গড়িয়ে দিয়ে এই খেলা চলে)। জয়সেল রোডের কোণে আদালতের পাশে একটা জায়গা বেড়া দিয়ে ঘেরা হয়েছে। এখানে ভিড় জমেছে। সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে কুঁকড়োর লড়াই। দুটো মস্ত লাল রঙের মোরগ আমদানি হয়েছে। ওদের পায়ে ইস্পাতের কাঁটা লাগানো। ওদের বুক ক্ষত-বিক্ষত, রক্ত ঝরছে। কিছু দূরে মাইগ্রাতের দোকানে বিলিয়ার্ড খেলার বাজি জিতলে ঝাড়ন আর ট্রাউজার উপহার দেওয়া হচ্ছে। দীর্ঘ—দীর্ঘ বিরতি এসে ঘিরে ফেলছে জনতাকে। জনতা পান করছে, খাবার খাচ্ছে কথাটি না বলে। গুমোট গরম। আশে-পাশে ভাজাভুজি আর মাছের দোকানগুলি এই গুমোট আরো বাড়িয়ে তুলছে। এই প্রচণ্ড গরমে বীয়ার আর আলুভাজা খেয়ে খেয়ে আরো বদহজম বাড়ছে।

সাভাল ক্যাথেরিনকে উনিশ সু দিয়ে কিনে দিয়েছে একখানা আয়না, আর তিন ফ্রাঁ দিয়ে একখানা স্কার্ফ। ওরা যতবার চক্কোর দিয়েছে, ততবার দেখা হয়ে গেছে মোকে-বুড়ো আর বনেমোরের সঙ্গে। ওরা মেলায় এসে বেতো পা নিয়ে আস্তে আস্তে চলছে। কিন্তু আর একজনের সঙ্গে দেখা হতে ওরা চটে গেল। ওরা দেখলে জাঁলিন বেবের্ত আর লিদিকে পথের পাশে এক খোলা সরাইখানা থেকে জিনের বোতল চুরি করবার জন্যে মতলব দিচ্ছে। ক্যাথেরিন শেষে গিয়ে ভাইয়ের গালে এক থাবড়া কষিয়ে দিলে; খুদে লিদিটা এর মধ্যে একটা বোতল নিয়ে দে ছুট। এই খুদে শয়তানগুলো শেষটায় জেলেই যাবে। ওরা আর একটা জায়গায় এসে পড়ল। সাভালের মনে হ'ল, তার প্রেমিকাকে চা-ফিঞ্চের প্রতিযোগিতা দেখিয়ে আনলে কেমন হয়। এক হপ্তা ধরে তো জোর বিজ্ঞাপন দিয়েছে এই ব্যাপারে।

মার্সিয়েনের পেরেকের কারখানায় পনেরোজন মিস্ত্রী ডজনখানেক খাঁচা নিয়ে এসে ঢুকল। খুদে খাঁচা, আঁধার ঘুরঘুট্টি, ওরই ভিতরে আছে অন্ধ চাফিঞ্চপাখীগুলি। ওগুলো এখন উঠোনে একটা বেড়ার গায়ে ঝুলিয়ে দেওয়া

হয়েছে। প্রতিযোগিতার বিষয় এইঃ—কোন পাখীটা একটা বিশেষ গান এক ঘণ্টায় ক'বার গাইতে পারে। পেরেকের কারখানার মিস্ত্রীর দল যে যার খাঁচার পিছনে একখানা করে শ্লেট নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। নিজের পাখীর গান ক'বার হ'ল লিখে রাখছে, আবার অন্যের হিসেবগুলোও দেখছে। এবার পাখীরা ধরল তান। কারো বা গভীর গিটকিরি, কারো বা উচ্চগ্রামে উঠল স্বর। যারা উচ্চগ্রামে তাল তুললে, তারা প্রথমে ছিল ভীরু হয়ে—দু-একটা ডাক-ডোক্ দিচ্ছিল—কিন্তু জোর পাল্লা চলল—শেষে কোন কোনটা চিৎপাত হয়ে পড়ে মরেও গেল। মিস্ত্রীরা ওদের আরো জোরে গান গাইতে বলছে চেঁচিয়ে—জোরে—আরো একটু জোরে—আরো জোরে। আর শ'খানেক বা তারও বেশি দর্শক রুদ্ধশ্বাস, নিস্তব্ধ, তারা শুনছে একশো আশীটা পাখীর সংগীত প্রতিযোগিতা। নরক গুলজার হয়ে উঠেছে। একই গান গাইছে পাখীরা—শুধু স্বরগ্রামেরই তারতম্য। যারা উঁচু তান ধরেছিল, তাদের মধ্যে একটা পাখী একটা ধাতু-গড়া কফি-পট পুরস্কার পেলে।

ক্যাথেরিন আর সাভাল থাকতে-থাকতেই, জাচারি আর ফিলোমেন এল। দু'জনে হাত-ঝাঁকুনির হৃদ্যতার পালা শেষ করে দেখতে বসে গেল। জাচারি হঠাৎ জ্বলে উঠল—একটা মিস্ত্রী ওর বোনের উরুতে বার বার চিমটি কাটছে। বোন রাঙা হয়ে উঠেছে, কিন্তু ওকে থামাতেই চেষ্টা করলে। কি জানি হয়তো লড়াই বেঁধে যাবে। আর সাভালও যদি চিমটি কাটার জন্যে চটে ওঠে—তাহলে মিস্ত্রীরা সবাই ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে সাবড়ে দেবে।

চিমটি-লেগেছে ঠিকই, কিন্তু পরিণাম ভেবে কিছু বললে না। তার পিরিতের মানুষ কিন্তু একবার মুখ বাঁকানো ছাড়া কিছুই করলে না। ওরা এবার বেরিয়ে এল। ব্যাপারটাও চুকে গেল। কিন্তু পিকেৎ-এর সরাইখানায় গিয়ে ঢুকতে-না-ঢুকতেই সেই মিস্ত্রীটা এসে হাজির। ওদের সে ঠাট্টা করলে, ওদের মুখের উপর জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে মোদো গন্ধ ছড়ালে।

জাচারির পারিবারিক সম্মানে আঘাত লাগল, সে গিয়ে ঐ শয়তানটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এই শুয়োর, জানিস—ও আমার বোন! রোস্, তোকে আমি দেখাচ্ছি। ওকে মাথা নুইয়ে সেলাম করে যেতে হবে।

দু'জনকে ছাড়িয়ে দিতে ক'জন ছুটে এল। কিন্তু সাভাল ধীর স্বরে বললে,

তোমরা ছেড়ে দাও, এটা আমার ব্যাপার।...ও কি করেছে না করেছে তাতে আমার বয়ে গেল।

মেয়ু আর তার বন্ধুরাও এর মধ্যে এসে হাজির হ'ল। ক্যাথেরিন আর ফিলোমেন কাঁদছিল, সে তাদের শান্ত করলে। এবার হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল ভিড়ে। মিস্ত্রীটা পালিয়েছে। সাভাল পিকেৎ-এর সরাইখানায় থাকে। সে সবার মনের গুমোট দূর করবার জন্যে বীয়ার খাইয়ে দিলে। এতিয়েনকেও ক্যাথেরিনের সম্মানে গেলাস তুলতে হ'ল। সবাই পান করলে। বাপ, মেয়ে, তার মানুষ, ছেলে আর তার উপপত্নী—সবাই ভদ্রভাবে এ ওর দীর্ঘায়ু কামনা করলে।

এবার পিয়েরোঁ ধরলে, সেও এক চক্কোর খাওয়াবে। এবার ভাব হয়ে গেছে সকলের, সবাই শান্ত—হঠাৎ জাচারি তার সাঙাৎ মোকেকে দেখে আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল। সে ওকে ডেকে বললে, মিস্ত্রীকে সায়েস্তা করতে সে যাচ্ছে—তাকে সাহায্য করতে হবে।

আমি গিয়ে কয়েক ঘা বসিয়ে দিয়ে আসব। সাভাল, তুমি ক্যাথির সঙ্গে ফিলোমেনকেও দেখো। আমি এখুনি ফিরছি।

এবার বীয়ার খাওয়াবার পালা মেয়ুর। ও যদি ওর বোনের অপমানের প্রতিশোধ নিতে চায় তো সেটা এমন কিছু মন্দ কথা নয়। মোকেকে দেখে ফিলোমেনের আর কোন সন্দেহ নেই—ওরা ঠিক জিতে আসবে। সেও তাই ঘাড় নেড়ে সায় দিলে। ওরা দু'টো নিশ্চয়ই ভালকানে গেল।

পরের দিনের উৎসব শেষ হয় বোঁ জ্যোর নাচের আসরে। এই নাচের আসরের মালিকানী মাদাম দেসির। বিধবা। বছর পঞ্চাশ বয়েসের মোটা-সোটা স্ত্রীলোক, পিপের মতো গোলগাল। কিন্তু এখনও তাজা আর তেজী আছেন। তাঁর ছ' ছটি পিরিতের মানুষ। তিনি বলেন—হপ্তার ছ' দিনের জন্যে ছ'টি নাগর—আর রোববারে তো একই সঙ্গে ছ'টি নাগরকে নিয়ে মজা লোটেন। যত খনির মজুর-মজুরাণী আছে সবাই তাঁর ছেলেমেয়ে—ঐ বলেই ডাকেন। তিরিশ বছর ধরে ওদের জন্যে তিনি বীয়ারের ভাঁটি খুলে বসে আছেন। তাঁর হাত দিয়ে কত যে স্রোত বয়ে গেছে ভাবলেও বাৎসল্যরসে অভিষিক্ত হয়ে ওঠেন। তাঁর আর এক গর্ব—এমন কোন কয়লা-কুড়নি মেয়ে নেই যে, তাঁর সরাইখানায় এসে সতীত্ব হারায়নি। তাদের গর্ভবতী হবার আগের ভূমিকাটা এইখানেই সাঙ্গ হয়েছে। বোঁ জ্যোতে দুটি কামরা—একটা বার—সেখানে কাউন্টার আছে, টেবিল আছে; আর তারই পাশে বল-নাচের আসর। সে এক মস্ত ঘর, মাঝখানে আছে কাঠের মঞ্চ, আর চারপাশে ইটের মেঝে। দু'সারি কাগজের ফুলের মালা ঝুলছে ছাদ থেকে—ঘরের চার কোণে চলে গেছে—আবার যেখানে দু'সারি এক জায়গায় এসে মিশেছে, সেখানেই ফুলের ঝাড়। দেয়ালে চক্‌চক করছে গিল্টি-করা সারি সারি ফলক—তাতে আছে মজুর-মজুরাণীদের সন্তবাবাদের নাম খোদাই-করা। সন্ত ঈলোই—লোহার কারখানার মজুরদের অধিপতি, সন্ত ক্রিসাপস মুচিদের দেবতা আর সন্ত বার্বারা তো খনির মজুর-মজুরণীদের দেবী; একেবারে সবকটি স্নেহ-নতির অধিষ্ঠাতা-অধিষ্ঠাত্রীদেরই সমন্বয়। ছাদ বড় নীচু—মঞ্চটিও ছোট—উপাসনার বেদীর মতোই ছোট—সেখানে বাজনদারের দল দাঁড়ালে ছাদে মাথা ঠেকে। তিনটে কেরোসিনের বাতি ঝোলে কামরার চারকোণে—রাতে তাদেরই আলোতে ঝলমল করে ওঠে ঘর।

আজ বিশেষ দিন। তাই পাঁচটা বাজতেই নাচ শুরু হয়ে গেল পুরোদমে। জানালা দিয়ে আসছে রোদ। সাতটা বাজতে বাজতে কামরা ভরে গেল। বাইরে উঠেছে ঝোড়ো হাওয়া। কালো ধুলো বইয়ে দিয়ে গেল। মানুষ তো অন্ধ হয়ে গেছে, কড়ায়ের গলানো চর্বি কালোয় কালো করে দিয়ে গেল। এতিয়েঁ আর পিয়েরোঁ আর মেয়ুও এখানে এসেছে একটু জিরোতে। এসেই ওরা দেখলে সাভাল ক্যাথেরিনের সঙ্গে জোড় বেঁধে নাচছে; আর ফিলোমেন দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে দেখছে। লেভাক আর জাচারির পাত্তা নেই। মঞ্চের চারধারে বসবার কোন বন্দোবস্ত নেই। তাই ক্যাথেরিন ফি-বারের নাচের পালা সেরে বাপের টেবিলে এসেই জিরিয়ে যেতে লাগল। ফিলোমেনকেও ওরা ডেকেছিল, কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকাই ওর পছন্দ। আঁধার হয়ে এল। বাজনদারের দল এবার যেন পাগলা হয়ে উঠেছে। হল-কামরায় এখন শুধু দেখা যায় নিতম্ব আর স্তনের আন্দোলন হস্ত সঞ্চালনের অরণ্যে। চারটে বাতি জ্বলতেই নারী-পুরুষ সোরগোল করে তাদের সংবর্ধনা জানালে। হঠাৎ ঘরখানা আলো হয়ে গেল। রক্তিম মুখের সার। আলুল চুল এসে পড়েছে মুখে-চোখে। কাঁধে, চামড়ায় লেপটে গেছে। স্কার্ট উড়ছে—আর ঘামের গন্ধ ভেসে আসছে। মেয়ু এতিয়েংকে মোকে-ছুঁড়ির দিকে তাকাতে ইশারা করলে। ছুঁড়িটা মোটা যেন একতাল চর্বি। সে একটা ঢ্যাঙা, রোগা খালাসী ছোঁড়ার সঙ্গে জড়াজড়ি করে ভয়ানক ঘুরপাক খাচ্ছে। ভালবাসার একটা মানুষ যোগাড় করে এতিয়েংর প্রত্যাখ্যানের দুঃখ ভুলে গেছে।

অবশেষে আটটার সময় এল মেয়ু-বৌ এস্তেলকে কোলে করে। সঙ্গে তার আলঝির, আঁরি আর লেনোর। সে স্বামীকে খুঁজতে সোজা এখানেই এসেছে। পরে ওরা রাতের খাবার খাবে, এখনো খিদে পায়নি। ওদের পাকস্থলী এখন কফি আর বীয়ারে ফুলে ঢোল হয়ে আছে। আর আর স্ত্রীলোকরাও আসছে। মেয়ু-বৌয়ের পিছনে পিছনে লেভাক-বৌ ব্যুতেলুপকে নিয়ে এসে হাজির হ'ল। ব্যুতেলুপ ফিলোমেনের বাচ্চা আচিলি আর দেসারির হাত ধরে আছে। তাদের দেখেই মেয়েদের মধ্যে ফিসফিসানি উঠল। দুই পড়শীতে যেন খুব মিল। মেয়ু-বৌ লেভাক-বৌয়ের কাছে গিয়ে গল্প শুরু করে দিলে। পথেই অন্তরঙ্গতা দানা বেঁধেছে, সারা পথ এসেছে গল্প করতে-করতে। মেয়ু-বৌ শেষে জাচারির বিয়ের মত না দিয়ে পারেনি। প্রথম ছেলেটার রোজগার হারাবে ভেবে দুঃখও তার কম নয়, কিন্তু তাই বলে কতদিন আর ঠেকিয়ে রাখা যায়। ওতে অধর্মই হবে। তাই সে সাহস করে মত দিয়ে ফেলেছে, কিন্তু উদ্বেগ তার যায়নি। বাড়ির গিন্নী হিসেবে বার বার সে ভেবেছে, তার আয়ের বেশি ভাগটাই যদি এমনি করে উবে যায়, তাহলে সে সংসার চালাবে কি করে।

মেয়ু, এতিয়েং আর পিয়েরোঁ যে টেবিলে বসেছিল, তারই পাশের টেবিলটা দেখিয়ে বললে, পড়শীগো, এখানে ব'সো!

লেভাক-বৌ শুধালে, আমার সোয়ামি তোমাদের সঙ্গে আসেনি গা?

ওরা বললে, এখুনি ও এসে পড়বে। এবার ওরা ঠেসাঠেসি করে বসে পড়ল। ব্যুতেলুপ আর বাচ্চারাও কোনরকমে ঠাঁই পেয়েছে। ওদের চার-পাশে ঘিরে আছে দলে দলে লোক, বীয়ার-পানে তারা মত্ত। পানীয় আনবার ফরমায়েস দেওয়া হ'ল। মা-আর নিজের বাচ্চাদের দেখে ফিলোমেনের ইচ্ছে হ'ল ওদের সঙ্গে গিয়েই জোটে। সে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। সে শুনে খুশী হ'ল—শেষ অবধি তাদের বিয়ে ঠিক হয়েছে। সে এখন বিয়ের কনে। কে-একজন শুধালে, জাচারি এখন কোথায় গেল। ও আস্তে আস্তে বললে, ওর জন্যেই তো বসেছিলাম, ও ওখানে আছে।

মেয়ু বৌয়ের সঙ্গে চোখ ঠারাঠারি করলে। তাহলে বৌ রাজি? গম্ভীর

হয়ে গেছে সে, নিঃশব্দে পাইপ টানছে। ছেলেমেয়েদের অকৃতজ্ঞতাই তো আনে আগামীর উদ্বেগ আর দুর্ভাবনা। ছেলেমেয়েরা একে একে বিয়ে-থা করে, তারপর ছেড়ে চলে যায় আর বাপ-মার দুঃখের অবধি থাকে না।

এখনো চলছে নাচ—একটা কোয়াদ্রিলে (একটি বিশেষ নাচের নাম) শেষ হয় হয়, সারা কামরায় উড়ছে লালচে ধুলো, দেয়াল যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে শব্দে—বাঁশী বাজছে তীব্র স্বরে—যেন একটা রেলের ইঞ্জিন বিপদের সংকেত জানাচ্ছে অধীর হয়ে। এবার নাচিয়ের দল থামল, ওরা ঘোড়ার মতই ঘামছে।

মেয়ু-বৌয়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে লেভাক-বৌ বললে, মনে আছে গো—সেই যে বলেছিলে—ক্যাথি বোকামি করলে তার গলা টিপে মারবে।

সাভাল এবার ক্যাথেরিনকে পারিবারিক জমায়েতে নিয়ে এল। সবাই পানীয় শেষ করছে—ওরা পিছনে দাঁড়িয়ে রইল।

আত্মসমর্পণের ভঙ্গী করলে মেয়ু-বৌ—যাক্‌গে—অমন কত কথা লোকে বলে—কিন্তু একটা সোয়াস্তি—মেয়েটার পেট হয়নি। একেবারে দিব্যি গেলে বলতে পারি। ওর যদি পেট হয়ে বিয়ে-থাওয়া হয় তখন মোদের দশা কি হবে গো? রোজগেরে মানুষ যে শুধু কমবে!

এবার করোনেটে বাজছে পোল্‌কার গৎ—কানে তালা লাগছে। মেয়ু বৌয়ের কানে কানে একটা মতলবের কথা বললে। একজন বাসাড়ে নিলে ক্ষতি কি? এতিয়েঁ তো বাসা খুঁজছে—ওকে নিলেই হয়। জাচারি চলে যাচ্ছে, কামরা তো খালি পাওয়া যাবে। মেয়ু-বৌয়ের মুখখানা ঝলমল করে উঠল। আচ্ছা মতলব! তাহলে ব্যবস্থা করতে হয়। উপোস থেকে তো বাঁচা যাবে। খুশীতে উছলে পড়ল মেয়ু-বৌ—আর-এক চক্কোর বীয়ারের ফরমায়েস দিলে।

এতিয়েঁ এর মধ্যে পিয়েরোঁকে খানিকটা রাজনীতিতে তালিম দেবার চেষ্টা করছিল—আখেরী-তহবিল ব্যাপারটা সে তাকে বোঝাচ্ছে। সে তার কাছ থেকে আখেরী-তহবিলে চাঁদা দেবার প্রতিশ্রুতি আদায় করলে। শেষে বোকার মতো আসল উদ্দেশ্যই ফাঁস করে দিলে।

যখন ধর্মঘট হবে তখন দেখবে এই টাকাটা কত কাজে লাগে। তখন কোম্পানিকে বুড়ো আঙুল দেখাতে পারব। আমাদের সংগ্রাম-তহবিল তো রইলই। তোমার কি মনে হয় সাঙাৎ?

পিয়েরোঁ চোখ নামিয়ে নিলে, মুখ তার ফ্যাকাশে মেরে গেছে।

আচ্ছা...ভেবে দেখবো...মোদের আখেরী-তহবিল মানে তো ভাল হয়ে থাকা।

এবার মেয়ু এতিয়েঁকে ডাকলে, একেবারে সোজাসুজি বলে বসলে, সে তাকে বাসাড়ে করে নিতে চায়। অন্তরঙ্গতা তার স্বরে। এতিয়েঁও তেমনি হৃদ্যতার সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। সে গাঁয়ে থাকতে চায়, তার সাথীদের সঙ্গে ভাল করে মিশতে চায়। কয়েকটা কথায়ই ব্যবস্থা হয়ে গেল। মেয়ু-বৌ বললে, ছেলের বিয়ে না হওয়া অবধি তাকে অপেক্ষা করতে হবে।

জাচারি এবার মোকে আর লেভাককে নিয়ে এসে হাজির হ'ল, তারা, ক'জনেই ভালকানের খোসবাই যেন সঙ্গে করে এনেছে। জিনের গন্ধ উঠছে ভক্ ভক্ করে, আর ঐ বাজে মেয়েমানুষগুলোর গায়ের বদ-বু। ওরা একেবারে

মাতাল; আর ভারি খুশী। এ ওকে কনুই দিয়ে গুঁতোচ্ছে আর খিল খিল করে হাসছে। যখন জাচারি শুনলে যে, ওর বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে, ও এমন হেসে উঠল যে মনে হয় দম বন্ধ হয়ে গেছে। ফিলোমেন বললে, ওর হাসি দেখলেই তার ভাল লাগবে, কান্না সইবে না। আর চেয়ার নেই, ব্যুতেল্প সরে বসে লেভাককে খানিকটা জায়গা করে দিলে। সেও আবেগে অধীর হয়ে আর-এক চক্কোর বীয়ার ফরমায়েস করলে। ওরা যেন এখন মিলে-জুলে এক পরিবার হয়ে গেছে।

সে জোর গলায় চেঁচিয়ে উঠল, আহা! এমন স্ফূর্তি আর কখনো জমেনি।

রাত দশটা অবধি ওরা ওখানেই রইল। মেয়েরা দলে দলে আসছে। ওরা দল ভারি করছে, না-হয় ওদের মরদদের তুলে নিয়ে যেতে আসছে। ছেলে-মেয়েরাও এসে সারি সারি জুটছে, মায়েদের আর ওদের নিয়ে উদ্বেগ নেই। তারা গমের বস্তার মতো ফ্যাকাশে মাই বার করে দিয়েছে, আর কোলের বাচ্চাদের মাই দিচ্ছে। যারা হাঁটতে শিখেছে, তারাও বীয়ার খাচ্ছে আর টেবিলগুলির চারপাশে চার হাত পায়ে ভর করে হাঁটছে। আবার মূততেও ওদের দ্বিধা নেই। মাদাম দেসিরের শূন্য পিপে থেকে বয়ে যাচ্ছে স্রোত—সাগর হয়ে উঠেছে। সকলের পেট টৈটুম্বুর, নাক-মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে বীয়ার। সবাই একেবারে বেসামাল, সবাই সবাইকে গুঁতোচ্ছে, ঠেলাঠেলি করছে—হেসে উঠছে। গরমও যথেষ্ট—যেন তুঁদুর আর কি। সবাইকে ভাজা ভাজা করে দিচ্ছে গরমে—তাই গা আদুল করে ওরা গা জুড়োচ্ছে। পাইপের ধোঁয়ার ভিতরে চক্-চক্ করে উঠছে গায়ের চামড়া। শুধু বাইরে গেলে অস্বস্তি লাগে; মাঝে মাঝেই এক-একটা মেয়ে উঠে পড়ছে। ঘরের অন্য কোণে কলটার কাছে গিয়ে স্কার্ট তুলে দাঁড়াচ্ছে—আবার ফিরে আসছে। ঝোলানো কাগজের ফুলের শেকলের নীচে নাচিয়েরা আর একে-অপরকে দেখতে পাচ্ছে না। ঘেমে ওরা একেবারে নেয়ে উঠেছে, হতচেতন হয়ে গেছে। এরই ফলে খালাসীরা জো পেয়ে গেছে। ওরা মেয়েদের পাছা আঁকড়ে ধরছে ঘন ঘন—আর ওদের চিত করে ফেলে দিচ্ছে, যখনি কোন চিতিয়ে-পড়া মেয়ের উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে কোন ছোকরা—করোনেট আরো জোরে বেজে উঠছে। খ্যাপা সুর বেজে উঠছে বাঁশীতে, ডুবিয়ে দিচ্ছে মেয়েদের অস্ফুট আর্তনাদ। আর জোড়ায় জোড়ায় মেয়ে-পুরুষ নাচতে নাচতে ঘুরছে ওদের ঘিরে।

কে-একজন পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে হুঁশিয়ার করে দিয়ে গেল পিয়েরোঁকে। তার মেয়ে লিদি নাকি দোরগোড়ায় বেহুঁস হয়ে ঘুমিয়ে আছে। চুরি-করা বোতলের ভাগ পেয়ে সে খেয়ে নিয়েছে অনেকখানি মদ—এখন তো বেহুঁশ। পিয়েরোঁ তাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে চলে গেল। সঙ্গে চলল জাঁলিন আর বেবের্ত। ওদের এখনো হুঁশ আছে। ওদের দুশো মজা! ফিরে যাবার এই-ই সংকেত। কয়েকটি পরিবার বোঁ জ্যো থেকে বেরিয়ে পড়ল। মেয়ু আর লেভাকরাও ভাবলে, এবার ওরা ধাওড়ায় ফিরে যাবে। বুড়ো দাদু বনেমোর আর মোকে-বুড়োও মঁতসু থেকে ফিরে চলেছে। তেমনি তন্দ্রার ঘোরে নিঃশব্দে স্মৃতির জাবর কাটতে কাটতে এগিয়ে যাচ্ছে। সবাই চলল এক সঙ্গে; শেষবারের মতো মেলা ঘুরে দেখে যাচ্ছে। এখন ছোট ছোট

হোটেলগুলির কড়াইয়ে মাছ আর আলুভাজির অবশেষ জমে আছে এখানে-সেখানে। বীয়ারের ধারা এসে গড়িয়ে পড়েছে পথে—জমাট বেঁধে আছে। এখনো ঝোড়ো-হাওয়া গর্জাচ্ছে, হুমকি দিচ্ছে। ওরা মঁতসুর আলোর মালা পিছনে ফেলে চলে এল, এবার কালো আলকাতরার মতো পথঘাট। ওদের স্খলিত হাসি চড়ছে ক্রমেই। গমের খেতে পাকা ছড়া দুলছে—সেখান থেকেও বুঝি ভেসে আসছে কামনার নিঃশ্বাস—হয়তো আজ রাতে বহু সন্তানের জন্ম হ'ল গর্ভের অন্ধকারে। ছত্রভঙ্গ হয়ে ওরা ফিরল ধাওড়ায়। মেয়ু আর লেভাকের খিদে নেই। রাতের খাওয়াটা তেমন জুতসই হ'ল না। সকালের রান্না মাংস খেতে খেতেই ওরা ঘুমিয়ে গেল।

এতিয়েঁ সাভালকে আর-এক গেলাস খাওয়াবার জন্যে রাসেনারের হোটেলে ধরে নিয়ে এল।

আখেরী-তহবিলের কথা তুলতেই সাভাল বললে, আমি তোমার সঙ্গে আছি। নাম লিখে নাও। মেরা আচ্ছি দোস্ত—মেরা সাঙাৎ!

এতিয়েঁর চোখ নেশায় পিটপিট করছে। সে চেঁচিয়ে উঠল,

হাঁ, আমরা সাঙাৎ—সাথী। নিজেদের হকের দাবির জন্যে আমি ছুঁড়ি আর মদ—দুই-ই ছাড়তে পারি। শুধু একটা জিনিসই আমার মন এখন জুড়ে আছে—আমরা ঐ বুর্জোয়াদের উড়িয়ে দেব, ফুঁয়ে উড়িয়ে দেব।

তিন

আগস্ট মাসের মাঝামাঝি মেয়ুদের বাড়িতে গিয়ে আস্তানা পাতল এতিয়েঁ। জাচারির বিয়ে হয়ে গেছে। কোম্পানি গাঁয়ে তাদের একখানা খালি বাড়ি দিয়েছে। ফিলোমেন আর তার বাচ্চারা উঠে এসেছে সেখানে। এতিয়েঁ আস্তানা পাতল বটে, কিন্তু ক্যাথেরিনকে দেখে তার বিব্রত ভাবটা প্রথমে কাটল না। দুদিন পরে সবই ঠিক হয়ে গেল।

পরম ঘনিষ্ঠ হয়েই ওরা আছে। ওর বড় ভাইয়ের জায়গাটা সে সর্বদিক দিয়েই দখল করে বসেছে।

বড় বোনের বিছানার পাশে জাঁলিনের খাটে সে শোয়। শোয়া, পোষাক ছাড়া, পোষাক পরা সবই তার সামনে করতে হয়। সেও ক্যাথেরিনকে স্কার্ট খুলতে আর পরতে দেখে। যখন শেষ পোষাকটা ক্যাথেরিন খুলে ফেলে, তার চামড়ার বিষণ্ণ শুভ্রতা দেখা দেয়, কেমন যেন রক্তহীনতা আছে সেখানে। স্বচ্ছ-তুষারের মত সাদা বলে মনে হয় তার শরীর। সে ওর মুখ আর হাতের রং-জ্বলা শুভ্রতার সঙ্গে এই স্বচ্ছ শুভ্রতা মিলিয়ে দেখতে গিয়ে একটু বা বিব্রত হয়। পায়ের গোড়ালি থেকে গলা অবধি ও যেন দুধের সাগরে স্নান করে উঠেছে—তার পরেই ওর চামড়া রোদে-পোড়া—দেখে যেন মনে হয় ওর গলায় কে দুলিয়ে দিয়েছে আম্বারের মালা। সে বহুবার মুখ ফিরিয়ে নিতে চেয়েছে, ভান করেছে। কিন্তু ওর দেহ সম্বন্ধে এতিয়েঁর জ্ঞান ধীরে ধীরে বাড়ছে।

প্রথমে ওর পা দুখানার হদিস সে গেল, তার পরে পেল হাঁটুর সংকেত।

ও যখন লেপের ভিতরে শুয়ে পড়তে যায়, তখনি ওদের দেখা যায় চকিতে। আর ভোরে যখন ধোয়া-পাখলার টবের সামনে ঝুঁকে পড়ে, ওর ছোট ছোট খাড়া দুটি স্তন দেখা যায়। ক্যাথেরিন কিন্তু তার দিকে ফিরেও তাকায় না, তবে চটপট সেরে নেয়। শোবার সময় পোষাক ছাড়তে দশ সেকেন্ডও দেরি হয় না, তার পরেই আলাঝিরের পাশে এলিয়ে পড়ে। যেন হিলহিলে এক সাপ—এমনি তার ক্ষিপ্রতা। এতিয়েং জুতো খুলতে-না-খুলতে ও মিলিয়ে যায়—ওর দিকে পেছন ফিরে থাকে। শুধু ওর বিনুনীটা দেখা যায়।

না—ক্যাথেরিনের ওর সম্বন্ধে কোন নালিশ নেই। শোয়ার সময় ওকে দেখার নেশা এতিয়েংকে পেয়ে বসেছে একথা ঠিক। দেখতে না চাইলেও চোখ দুটো বাগ মানে না। কিন্তু হাসি-তামাশা ভুলেও করে না, কোন রকম খুন-সুটিও করতে যায় না। ওর বাপ-মা পাশেই থাকে। তাছাড়া ওর সম্বন্ধে এতিয়েং'র যেমন ঘৃণা, তেমনি আছে বন্ধুর সহানুভূতি, ওকে তাই সে জ্বালায় না—সান্নিধ্যে ওরা যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হলেও ও তাকে পেতে চায় না। এই একীভূত জীবনে পোষাক-পরা, খাওয়া, একসঙ্গে কাজ করা আর কিছুই গোপন নেই—এমন কি ওদের ব্যক্তিগত গোপন প্রয়োজনগুলোর কথাও ওদের পরস্পরের জানা। শুধু পারিবারিক লজ্জা-সরম গিয়ে ঠেকেছে প্রাত্যহিক স্নানের ব্যাপারে। ক্যাথি এখন স্নান করতে উপরে চলে যায়, আর পুরুষরা একে একে নীচে টবের জলে স্নান করে।

প্রথম মাসটা কেটে যেতেই এতিয়েং আর ক্যাথেরিনের পরস্পরের প্রতি কৌতূহল রইল না। কেউ আর কারো উপর নজর রাখে না। মোম না নিবিয়ে দিয়েই ওরা পোষাক ছেড়ে ঘরে উদোম হয়ে ঘুরে বেড়ায়। ক্যাথেরিনও পোষাক ছাড়তে গিয়ে তড়িঘড়ি করে না। আগের মতো বিছানায় বসে-বসে চুল বাঁধে, শেমিজটা হাঁটুর উপরে উঠে-উঠে আসে। আর এতিয়েং ট্রাউসার ছেড়ে ফেলেও স্বচ্ছন্দে ওর চুলের কাঁটা খুঁজে দেয়। নগ্নতার চেতনা অভ্যাস-বশে হারিয়ে গেছে। অমনি ন্যাংটো হয়ে এ-ওর সুমুখে দাঁড়াতে ওদের আর লজ্জা নেই। এ তো স্বাভাবিক। ওরা তো কোন অন্যায় করছে না, আর এতে তাদের অপরাধই বা কোথায়? এক ঘরে এতগুলো মানুষকে এক সঙ্গে থাকতে হলে তো এমনিই হয়। কিন্তু তবু মাঝে মাঝে অপরাধ-বোধই বুঝি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ওরা হঠাৎ লজ্জিত হয়। তারপরে আর রাতের পর রাত ক্যাথেরিনের বিবর্ণ নগ্নতা সে দেখে না। হঠাৎ তার মনে হয়, ওর নগ্ন দেহটা কি সাদা—এই শুভ্রতা ওর নিজের দেহখানাকে শিউরিয়ে তোলে। ও মুখ ফিরিয়ে থাকে—কি জানি যদি হঠাৎ ওকে দুবাহু দিয়ে টেনে নেবার কামনা উদ্দাম হয়ে ওঠে! আবার এক-এক রাতে—ক্যাথেরিনের ভারি লজ্জা দেখা দেয়। কোন মানেই নেই। সে ছুটে গিয়ে বিছানার লেপের তলায় ঢোকে। ওর মনে হয় ঐ পুরুষের হাত দু'খানা বুঝি এখনি ওকে চেপে ধরবে। তার-পর যখন মোমখানা নিবিয়ে দেয়, ওরা দু'জনেই টের পায়, কেউ ঘুমোয়নি। শত ক্লান্তির ভিতরেও ওরা পরস্পরের কথাই ভাবছে। এতে ওরা অস্থির হয়ে ওঠে, পরদিন মুখ গোমড়া করে থাকে; তারপরে আবার শান্তি ফিরে আসে। রাতগুলি বেশ কাটে। ওরা আবার সাথীর মতো সহজ হয়ে ওঠে।

এতিয়েং শুধু জাঁলিন সম্বন্ধে নালিশ করে। ওর শোয়াটা খারাপ; কেমন

বলের মতো কুঁকড়ে শোয়। আলঝিরের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ একরকম শোনাই যায় না, খুব লক্ষ্মী হয়ে ঘুমোয় মেয়েটা। লেনোর আর আঁরিকে ভোরে উঠে দেখা যায় এ-ওকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে। এমনিভাবেই ওরা ঘুমোয়। আঁধার বাড়িতে মেয়ু আর মেয়ু-বৌয়ের নাকডাকানির শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না। হাপরের গর্জনের মতো নিয়মিত বিরতিতে গর্জন করে ওঠে। মোটামুটি এতিয়েং রাসেনারের ওখান থেকে এখানে ভালই আছে। বিছানাখানাও চলনসই, ফি-মাসে একবার চাদরও বদলানো হয়। সুরুয়াও এখানকার ভাল, তবে মাংসের টুকরোই যা খুঁজে পাওয়া ভার। কিন্তু সকলেরই তো সমান দশা। পঁয়তাল্লিশ ফ্রাঁ দক্ষিণায় সে রোজ খাবার সময়ে আর খরগোশের মাংস তো দাবি করতে পারে না। ঐ টাকা ক'টায় একটা পরিবারের ভারি উপকার হয়েছে। এতেই ওরা কোনক্রমে চালিয়ে নিচ্ছে —তবে কতকগুলো খুচরো দেনা আর শোধ হচ্ছে না। মেয়ুরা বাসাড়ের উপর ভারি কৃতজ্ঞ। ওরা ওর কাপড়-চোপড় কেচে দেয়, রিপুও করে দেয়, আবার জামায় বোতাম পরায়—এককথায় ওর দেখাশুনো করে। এতিয়েং টের পায় —নারীর সেবা যত্ন ওকে যেন ঘিরে আছে।

মগজে যে আদর্শবাদ এতদিন ঘুরপাক খাচ্ছিল, এতিয়েং এবার তার মানে বুঝতে পারল। এতদিন বিদ্রোহ ছিল তার কাছে এক প্রবৃত্তির শামিল, চারদিকে সাথীদের মূক অসন্তোষের মাঝে এ প্রবৃত্তি তো ফুঁসে উঠবেই। কত প্রশ্ন তখন তার মনে জেগেছে; কেন কতগুলি লোকের জন্য দারিদ্র্য আর কতগুলি লোকের জন্যে সমৃদ্ধি? দরিদ্র কেন ধনীর পায়ের তলায় পিষে যাবে—কেন ওদের ধনী হবার অধিকার মিলবে না? নিজেকে এমনি প্রশ্ন করতে করতে সে বুঝল, সে কিছু জানে না। তার পর থেকে এক গোপন লজ্জা, এক গোপন দুঃখ তাকে পেয়ে বসল; যে কথা তার মনে জাগত, সে কথা বলার তো তার সাহস ছিল না। কি করে বলবে—সে তো কিছু জানে না। সে জানতো —মানুষ সবাই সমান—আর এই সমান অধিকার পেয়ে মানুষ পৃথিবীর সবকিছুরই উচিত মতো ভাগ পাবে—কিন্তু কি করে পাবে সে বুঝতে পারত না। তাই এতিয়েং পড়াশুনো শুরু করে দিলে। কিন্তু বিজ্ঞানের বাই পেয়ে বসলে মূর্খরা এমনি এলোমেলোভাবে পড়াশুনোই করে। এখন প্লুচার্তের সংগে নিয়মিত তার চিঠিপত্র চলে। সে তার চেয়ে অনেক বেশি জানে—সোশালিজমের আন্দোলনেও সে এগিয়ে গেছে ঢের বেশি। ওকে সে বই পাঠায়, ও না বুঝে পড়ে, বদহজম হয়। আর এই বদহজমিতে মগজে আরো উত্তেজনা বেড়ে যায়। একখানা ডাক্তারি বই তো সবচেয়ে বেশি ওকে উদ্দীপ্ত করে তোলে—বইখানির নাম খনির মজুরদের স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান। একজন বেলজিয়ামবাসী ডাক্তার এই বইখানিতে খনির মজুরদের যে সব দুষ্ট রোগ নিঃশেষ করে দিচ্ছে তারই আলোচনা করেছেন। তাছাড়া আছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নানা বই। সেগুলি পরিভাষার জটিলতায় সমাকীর্ণ—দুর্বোধ্য। আর আছে সন্ত্রাসবাদীদের পুস্তিকা —ওগুলো পড়ে তার ভাবনা ওলট-পালট হয়ে যায়। আর পুরানো খবরের কাগজগুলি—সেগুলি সে ভবিষ্যতের তর্ক-বিতর্কের জন্যে সযত্নে রেখে দেয়। সুভেরিনও তাকে বই পড়তে দেয়। তার মধ্যে সমবায় সম্বন্ধে একখানা বই পড়ে ও একমাস ধরে এক সারা দুনিয়ার উপযোগী বিনিময় প্রথার স্বপ্ন দেখেছে।

তাহলে টাকার প্রচলন একেবারে বরবাদ করে দেওয়া যায়, মেহনতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে সমাজ-জীবন। আস্তে আস্তে ওর অজ্ঞানতার লজ্জা দূরে যাচ্ছে, নতুন উপলব্ধি গর্বে তাকে উদ্দীপ্ত করে তুলছে। সে বোঝে, সে জানে এখন তার চিন্তা করবার মতো শক্তি আছে।

প্রথম ক'মাস এতিয়েং নতুন দীক্ষিতের আবেগ ছাড়া আর কিছুই পেলে না। তার বুকখানা তখন অত্যাচারীর বিরুদ্ধে এক মহৎ ক্রোধে ভরে গেছে। অত্যাচারীর আসন্ন পরাজয়ের আশায় তখন সে উদ্দীপ্ত। পড়াশুনো এখনো তার তেমন নয়—এখনো সে জোড়াতালি দিয়ে একটা সুষ্ঠু পদ্ধতি খাড়া করতে পারে নি। রাসেনারের দাবি আর সুভেরিনের প্রচণ্ড ধ্বংসাত্মক নীতি—দুয়েরই যেন মিশেল ঘটেছে তার ভিতরে। রোজ আঁভাতাসে এসে সে জোটে, ওদের সঙ্গে মিশে কোম্পানির উপর প্রচণ্ড গাল দেয়। কিন্তু যখন আঁভাতাস থেকে বেরিয়ে আসে, তখন যেন নিশায় পাওয়া মানুষের মতো চলতে থাকে। স্বপ্ন দেখে—দুনিয়ার সমস্ত মানুষ একেবারে বদলে গেছে—এক সম্পূর্ণ নব জন্ম হয়েছে তাদের। কিন্তু এই জন্মলগ্নে একখানা জানালাও ভাঙেনি, এক ফোঁটা রক্তও ঝরেনি। কিভাবে যে এই জন্মক্ষণ এল, সেকথা সেও জানে না—পদ্ধতি বলে কোন কিছুর বালাই তার নেই। সে বিশ্বাস করতে চায়, ব্যাপারটা এমনি এমনি ঘটে যাবে। কারণ, যখনি একটা খসড়া করতে যায়, মনের ভাবনায় ঘূর্ণি ঝড় ওঠে। কখনো কখনো বা ওর চিন্তাধারা যুক্তিহীনতার পথই আঁকড়ে ধরে; ও মাঝে মাঝেই বলে ওঠে; আমাদের সামাজিক সমস্যা থেকে রাজনীতিকে বাদ দিতে হবে। এই কথাটা ও সম্প্রতি পড়েছে, গয়ার-তোলা খনির মজুরদের জমায়েতে এ-কথাটা বার বার বলা দরকার—এই-ই ওর ধারণা।

মেয়ুদের বাড়িতে রোজ রাতে এখন শুতে যেতে আধঘণ্টা দেরিই হয়ে যায়। এতিয়েং ঐ একটা কথাই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে রোজ তোলে। তার নিজের রুচি এখন অনেকখানি মার্জিত হয়ে গেছে, তাই সে ধাওড়ার নীতিবাদের শিথিলতা দেখে বিরক্ত হয়। ওরা কি গরু-ভেড়া নাকি—মাঠে যেমন গরু-ভেড়া পালে পালে চরিয়ে বেড়ায়, তেমন কি ওদেরও চরানো যায়? ওরা একটার উপর একটি এমন গাদাগাদি ঠেসাঠেসি করে আছে যে, একজন কামিজ খুলে ফেললে, পাশের লোককে পিঠ না দেখিয়ে উপায় থাকে না। স্বাস্থ্যের পক্ষে এ তো হানিকর; ছেলে মেয়েরা এমনি করেই একসঙ্গে আবর্জনা আর পাপের মধ্যে বেড়ে উঠছে।

হেই ভগমান! মেয়ু জবাব দেয়, যদি বেশি টাকা পাওয়া যেত, য়্যায়সা আরামে থাকা যেত! এভাবে একজনের উপরে আর একজন হুমড়ি খেয়ে পড়ে তো আর থাকা যায় না! এতে তো মরদগুলো মাতাল হয়, আর ছুঁড়ি-গুলো পেটউলী হয়ে ওঠে।

তার পরেই গোটা পরিবার বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। সবাই বলে নিজের নিজের কথা। কেরোসিন তেলের বাতিটা ঘরের হাওয়া বিষিয়ে দেয়। বাসি ভাজা পেঁয়াজের বদবু ওঠে। না গো, জীবনটা তামাশা নয়। ভারবাহী পশুর মতো মেহনত করে যেতে হয়। এ যেন কয়েদীর শাস্তি। কেউ কেউ বা কাজ করতে করতেই মরে যায়। কিন্তু এত যে মেহনত করে তবু তো রাতে খাবার সময় এক টুকরো মাংসও জোটে না। খাওয়া জোটে বটে—তবে বড় কম। আর

ঐ কম খেয়েই বেঁচে থাকে, বেঁচে থাকার ভোগান্তি সইতে হয়। ধোঁকে তবু একেবারে মরে না। ধার দেনায় ডুবে যায়। এমন ভাবে জীবন কাটায় মনে হয় হাত-পা বাঁধা। মেহনতের রুটি বুঝি ওরা খায় না—এ ওদের চুরি-করা রুটি। রোববার এলে ওরা ক্লান্তিতে গা এলিয়ে দেয়, সারাদিনই ঘুমোয়। শুধু মাতাল হওয়ায় ওদের একমাত্র আনন্দ, আর বৌয়ের পেটে ছেলেমেয়ে পয়দা করা একমাত্র বিলাস। বীয়ার গিলেগিলে ওরা মাতাল হয়—আর তারই ফলে ওদের ভুঁড়ি বেড়ে বেড়ে ওঠে। আর ওদের একমাত্র বিলাসের ফল ছেলেমেয়ের দল বড় হয়ে উঠলে তাদের কথা আর একবারও ভাবে না। না, জীবন মোটেই ঠাট্টা-তামাশা নয়!

মেয়ু-বৌ এসেও যোগ দেয়।

মোদের এই পোড়া বরাত নাকি আর বদলাবে নি, একথা মনে হলে আর তো সয় না বাপু! যখন তাকত ছিল, তখন ভাবতাম—সুখ একদিন বরাতে হবেই। কত আশা করতাম। কিন্তু সেই যে পোড়া দুঃখু, সে তো আর গেল না। একেবারে দম বন্ধ করে দিলে গা! কারো ক্ষেতি করতে চাই না গো, কিন্তু এ অন্যায় তো সইতে নারি। ক্ষেপে উঠি, পাগলা হয়ে যাই।

সবাই চুপচাপ। নিঃশ্বাস পড়ে ঘন ঘন—দিগন্ত যেন ওদের বেড়াজালে ঘিরে ফেলেছে—তাই হাঁফ ধরেছে, অস্বস্তি ভোগ করছে। বুড়ো দাদু বনেমোর থাকলে সে অবাক হয়ে চোখ পিটপিট করে তাকায়। তার কালে কেউ এমন অধীর হয়ে উঠত না। তারা কয়লার ভিতরে জন্মাত, কয়লার স্তরে গাঁইতি চালাত। বেশি কিছু চাইত না। কিন্তু হাওয়া এখন ভিন্ন দিকে বইছে। তাই কয়লাখনির মজুরদের এখন আশা আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে।

সে বিড়বিড় করে বলে, সব কিছুতেই অমন নাক সিটকে থেকোনি বাপু ভাল বীয়ার, সব সময়েই ভাল। মালিকগুলো সময় সময় পাজী হয় বটে, কিন্তু মালিকানা তো আর উবে যাবে না—কি তাই না? এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি হবে বাপু!

এতিয়েঁ এ কথা শুনে অমনি উত্তেজিত হয়ে ওঠে। কি, কি বললে! মজুররা কি নিজেদের কথাও ভাববে না—তার কি সে দাবিও নেই? তার সে-দাবি আছে বলেই শীগগীর সব ওলট-পালট হয়ে যাবে। মজুররা এখন ভাবতে শুরু করেছে নিজেদের কথা—তাইত মালিকের যত বেচাল সব ভেস্তে যাবে। বুড়োর আমলে খনির মজুররা জন্তুর মতো থাকত—তারা যেন ছিল কয়লা তোলার যন্ত্রবিশেষ। খনির নীচে থেকে থেকে কান আর চোখ ওদের বুজে গিয়েছিল। বাইরের দুনিয়ার খবর ওরা রাখত না। তাই ঐ ধনী শাসকশ্রেণী খুশিমত ওদের বেচা-কেনা করেছে, চুষে খেয়েছে ওদের মেদমজ্জা।

মজুররা তা টেরও পায়নি। কিন্তু এখন খনির অন্ধকারে মজুররা জেগে উঠছে। বীজের মত ওরা অঙ্কুরিত হয়ে উঠছে, একদিন দেখা যাবে, মাঠের শস্যের চারার মতো ওরা মাটিফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। হাঁ, মানুষ তো কয়লা-খনির অন্ধকার ছিঁড়েখুঁড়ে ফুঁড়ে বেরিয়ে আসবেই—উঠে আসবে জংগী ফৌজের দল—ওরা দুনিয়ায় ফিরিয়ে আনবে ন্যায়ের রাজ্য। বিপ্লবের পর থেকে মানুষ কি সমান হয়ে যায় নি—তারা কি একসংগে ভোট দেয় না? মালিক তাকে মজুরি দেয় বলে, মজুর কি তার দাস হয়ে থাকবে? ঐ বড় বড়

কোম্পানিগুলো তাদের বড় বড় কলের চাপে সবকিছু গুঁড়িয়ে দিচ্ছে; সাবেকি আমলে যেটুকু নিরাপত্তা ছিল—আজ আর তাও নেই। তখন আত্মরক্ষার জন্য সমপেশার মানুষরা গড়ে তুলেছিল তাদের প্রতিষ্ঠানগুলি—আর এই সংহতি শক্তি নিয়েই তারা নিজেদের রক্ষা করেছিল। এই যে বিরাট প্রাকার খাড়া হয়ে উঠেছে, এতো একদিন চুরমার হয়ে যাবে। এর জন্যে শিক্ষাকেই ধন্যবাদ দিতে হয়। ধাওড়ার চারপাশে তাকিয়ে দেখ! বুড়ো দাদুরা তো নাম সই করতেও জানত না, বাপেরা এখন ঐ নাম-সইটুকুই শিখেছে—আর ছেলেরা ?—ওরা তো মাস্টারের মতোই লিখতে-পড়তে দড়ো। আস্তে আস্তে অংকুর মাটি ঠেলে উঠছে, ফুঁড়ে বেরুচ্ছে—সম্ভাবনাময় হয়ে উঠছে—এবার আসবে এক বিরাট জংগী জনতা—তারাই তো ফসল—সূর্যের খরতাপে তারা এখন পেকে-পেকে উঠছে! এখন তো আর মানুষ সারা জীবনের মতো নিজের ঠাঁইটুকুতেই বন্দী হয়ে নেই—তারাই বা কেন বজ্রমুষ্ঠি দিয়ে আঘাতের পর আঘাত হানবে না—কেনই বা তারা জানাবে না মালিকানার দাবি ?

মেয়ু এসব কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে ওঠে, কিন্তু মনের সংশয় তবু যায় না।

সে বলে, তোমরা যেই একটু নড়া-চড়া শুরু করবে, অমনি তোমাদের কাট্ ওরা ফেরত দেবে।

বুড়ো ঠিকই বলে; মজুররা খালি দুঃখুই সইবে—মাঝে মাঝে একখানা ভেড়ার ঠ্যাংও ওদের বরাতে নেই।

মেয়ু-বৌ বহুক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপরে যেন স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠে,

পাদরী বাবারা যা বলে যদি সাঁচ্চা কথা হয়—গরীব-গুর্বোরা এই দুনিয়ায় দুখধান্দা করছে, পরের দুনিয়ায় তো তারাই হবে বড় মানুষ—তাই না গা ?

ওরা হেসে ওঠে কথা শুনে। এমন কি ছেলেমেয়েরাও মাথা নাড়ে। দুনিয়ার দুঃখকষ্টের ঘূর্ণা হাওয়ায় ওদের বিশ্বাস উবিয়ে নিয়ে গেছে। খোলা হাওয়ায়, খনির অন্ধকারের ঊর্ধ্বে ওদের আর কোন বিশ্বাস নেই। খনির নীচে শুধু আছে ভূতের গোপন ভয়। ওরা সেখানে ভয়ে জুজু হয়ে থাকে—কিন্তু আকাশের দিকে তাকিয়ে ঠাট্টা করতে ছাড়ে না।

মেয়ু চেঁচিয়ে ওঠে, যত সব বাজে কথা পাদরীবাবার! ও-কথা বিশ্বাস করলে এ-দুনিয়ায় আধপেটা খেয়ে, উপোস করে থাকতে হবে। আর হাড়ভাঙা মেহনত আরো বেড়ে যাবে। এমনি করে যদি সেই আর-এক দুনিয়ায় একটু আরামের ঠাঁই মিলে যায় তো ভাল ? না গো না, মরলেই গেলে—ওর পরে আর কিছুই নেই।

মেয়ু-বৌ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, ভগমান—ভগমান!

হাত দু'খানা হাঁটুর উপর রেখে মনমরা হয়ে বসে থাকে।

তা যদি সাচ্ হয় তো, আমরা গেছি......

ওরা পরস্পরের দিকে তাকায়। বুড়ো দাদু রুমালে গয়ার ফেলে। মেয়ু নিবন্ত পাইপটা ঠোঁটে চেপে ঠায় বসে থাকে। টানতেও ভুলে গেছে। লেনোর আর আঁরি পড়েছে ঘুমিয়ে, তাদের মাঝখানে বসে আলঝির কান পেতে শোনে। ক্যাথেরিন চিবুকে হাত দিয়ে শোনে, আয়ত চোখ দুটি এতিয়েঁর উপর থেকে একবারও ফেরায় না। এতিয়েঁ প্রতিবাদ করে, নিজের আদর্শের কথা জাহির

করে—তার সমাজ-স্বপ্নের এক মোহময় ছবি তুলে ধরে। তাদের চারপাশে ধাওড়া ঘুমে বিভোর; শুধু মাঝে মাঝে ভেসে আসে শিশুর কান্না, অথবা বিলম্বে-আগত কোন মাতালের স্খলিত অভিযোগ। নীচে ঘড়িটা টিকটিকিয়ে ধীরে ধীরে চলে, গুমোট গরম ঘরে, তবু বালির মেঝে থেকে একটা স্যাঁতসেঁতে ঠান্ডা চুইয়ে পড়ে।

এতিয়েঁ বলে, যত সব বাজে কথা! সুখের জন্যে ঈশ্বর আর স্বর্গের দরকার কি? তোমরা কি এ-দুনিয়ায় নিজেদের সুখ গড়ে তুলতে পার না?

সে শুধু কথার পর কথা বলে যায়। মনে হয় ওর উপর যেন কি ভর করেছে! ও-কথা বলে যায়, বলে যায়—আর হঠাৎ সকলের মনে হয়—যে-বন্ধ সংকীর্ণ দিগন্ত ওদের ঘিরে ছিল সে যেন বিস্ফূর্ত হয়ে পড়ল। গরীবের এই অন্ধকার জীবন ধারায় যেন আলোর ফিনকি ছিটিয়ে দিলে—খুলে গেল আলোর দুয়ার। এই চিরন্তন দারিদ্র্য, এই পশুর মত মেহনতি, পশমের জন্য যে-জন্তুগুলিকে হত্যা করা হয়, তাদেরই মতো ভাগ্য তাদের। ওর কথায় এই দুঃখ যেন এক নিমিষে মুছে যায়—এক বিরাট আলোর ধারা যেন এসে চল্‌কে পড়ে—আর ন্যায় যেন স্বর্গ থেকে রূপকথার ঝলমলে স্বপ্নের মতো নেমে নেমে আসে। ঈশ্বর তো মৃত, তাই এখন ন্যায়ের পালা, সাম্যের পালা। সেই তো মানুষকে দেবে সুখ, দেবে সাম্য—এক-ভ্রাতৃত্বের রাজ্য কায়েম হবে। যেমন স্বপ্নে হয়, তেমনি এক লহমায় গড়ে উঠবে নতুন সমাজ—সে এক বিরাট বিস্তৃত নগর—মরীচিকার মতোই সে মায়াময়, মোহময়—সেখানে নাগরিকরা স্বাধীন শ্রমের অন্ন খেয়ে বাঁচবে, সবার আনন্দেই ভাগ নেবে সবাই। পুরানো পৃথিবী তখন পচে গলে ধূলায় মিশিয়ে যাবে। এক নব মানবতার জন্ম হবে পাপ শুদ্ধি হয়ে—তারা গড়ে উঠবে শ্রমিকের এক বিরাট জাতিরূপে—তাদের জীবনের আদর্শ—যার যেমন মূল্য সে তেমনি পাবে, মানুষের মূল্য নিয়ন্ত্রিত হবে তার কাজের দ্বারা। স্বপ্ন আরো মহৎ হয়ে ওঠে, সুন্দরতর, মায়াময়, মোহময় হয়ে ওঠে। স্বপ্ন ঊর্ধ্ব, আরো ঊর্ধ্বে উড়ে যায়—অসম্ভবের রাজ্যে মিলিয়ে যায়।

মেয়ু-বৌ প্রথমে এসব কথা শুনতে চাইত না। তার কেমন যেন ভয়-ভয় করত। না, না—এযে বড় সুন্দর গো—একে এমন জাঁকিয়ে বসতে দেওয়া চলে না—শেষে তো আসল জীবনযাত্রাই দুঃসহ হয়ে উঠবে। সুখের জন্যে সব কিছু ভেঙে-গুঁড়িয়ে ফেলতে হবে। ও যখন দেখলে, ওর স্বামীও প্রথমটা দোমনা হয়ে ছিল, তার পরে ঐ স্বপ্ন তাকে পেয়ে বসল—চোখে স্বপ্নের ছোঁয়া লেগে ঝলমল করে উঠল দৃষ্টি—সে অস্থির হয়ে উঠল। সে এতিয়েঁর কথায় বাধা দিত ঃ

দেখ গো, ওর কথা শুনো না। ও তো শুধু কিস্সা বলে। তোমার কি মনে হয়, মালিকরা কখনো মোদের মতো মেহনত করতে চাইবে?

কিন্তু আস্তে আস্তে মোহ তাকেও পেয়ে বসেছে। কল্পনা এখন জেগে উঠেছে, সে এতিয়েঁর আজব আশায় ভরা পৃথিবীর ছাড়পত্র পেয়েছে। এই কঠোর বাস্তবকে কিছুক্ষণের জন্য ভুলে থাকতেও ভাল লাগে! পশুর মতো মাটির দিকে হেঁট হয়ে তাকিয়ে যারা বাঁচে, তাদের তো একটু মোহ দিয়ে গড়া নীড় চাই—সেখানে তারা জীবনে কোনদিন যা পাবে না, তারই সম্ভোগে মশগুল

হয়ে থাকবে। এ তো আছেই, তাছাড়া সে এতিয়েঁর মতে সায় দিয়েছে, তার ন্যায়ের আদর্শের কথায় সে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে।

সে বলে, সাঁচ্ কথা বললে গো! ব্যাপারটা যদি খাঁটি হয়, আমাকে কুচি-কুচি করে ফেল, তবু আমি রা'টি কাড়ব না।...হক্ কথা...আমাদেরও পালা আসতে হবে।

মেয়ুও উত্তেজিত হয়ে ওঠে,

সাঁচ্ কথা! —কিন্তু অমন ব্যাপারটা যেদিন হবে যেন দেখে যেতে পারি। আমি বড়মানুষ নই, কিন্তু এর জন্যে পাঁচ ফ্রাঁ দিতে রাজি আছি। উঃ, সে কি ব্যাপার হবে! কিন্তু জলদি হবে তো সাঙাৎ? আমরা কি করে কি করব বলে দাও না!

এতিয়েঁ আবার শুরু করে। পুরানো সমাজ-ব্যবস্থায় চিড় ধরেছে; আর ক'মাস মাত্র তার আয়ু,—ও ধ্রুব বিশ্বাস নিয়েই বলে যায়। কিন্তু যখন পন্থার কথা ওঠে, ওর কল্পনা খেই হারিয়ে ফেলে—এলোমেলো পড়াশুনো তালগোল পাকিয়ে যায়। শ্রোতারা অজ্ঞ বলেই সে ব্যাখ্যা করতে ভয় পায় না। নিজের কথা নিজেই গুলিয়ে ফেলে। সমস্তগুলো পন্থা সে আমদানি করে বসে। নিজের যুক্তি যে সহজেই জয়যুক্ত হবে একথা সে জানে বলেই—এক বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের মিলন-চুম্বনের কথায় এসে যায়—সেই চুম্বনে যত শ্রেণী-বৈষম্য সব ঘুচে যাবে। মালিকশ্রেণীর যে এ ব্যাপারে ঘোর অনিচ্ছা;—ওদের যে দরকার হলে জোর করে স্বমতে আনতে হবে—একথা ওর মনেই থাকে না। মেয়ুরা এমনভাবে চেয়ে থাকে যেন ভারি বুঝদার, ওর এই আজব সমাধান নতুন দীক্ষিতের অন্ধবিশ্বাসে মেনে নেয়। ওরা যেন সেই গোড়ার দিকের খৃষ্টান-দের মতো—তারা তো পুরানো পৃথিবীর পচা-গলা আবর্জনার উপর এক সুন্দর, শোভন সমাজের আশায় বসে থাকত। খুদে আলঝিরও কয়েকটা কথা বুঝেছে। তার কাছে নতুন পৃথিবীর সুখের পরিমাপ একখানি সুন্দর বাড়ি—উষ্ণ তার পরিবেশ। ছেলেমেয়েরা সেখানে যত খুশি খেলতে পারে, যত খুশি খেতেও পারে। ক্যাথেরিন তো নড়ে চড়ে না; চিবুকে হাত রেখে ঠায় বসে থাকে—তার আয়ত দৃষ্টি এতিয়েঁর চোখের উপর লেপটে থাকে। এতিয়েঁ থামতেই ওর দেহে ওঠে শিহরণ। সে কেমন বিবর্ণ হয়ে যায়। মনে হয় ঠান্ডা লেগেছে।

মেয়ু-বৌ শেষে ঘড়িটার দিকে তাকায়।

ন'টা বেজে গেছে। সত্যি? কাল আর উঠতেই পারব না।

মেয়ুরা নিরাশ হয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ে। মনে তাদের ক্ষোভ। ওদের মনে হয়, এতক্ষণ ওরা ছিল ধনী—আর এখন তো ওরা কাদায় গড়াগড়ি যাচ্ছে। বুড়ো দাদু পিটে রওনা হয়। সে গজর গজর করে বলে, ওসব গল্পে সুরুয়ার তার বাড়বে না; আর সবাই সার বেঁধে উপরে উঠে যায়। দেয়ালের ঠান্ডা স্যাঁতস্যাঁতানি অনুভব করে। আর গুমোট হাওয়ার গরম ঝাপটা। উপরে উঠে আসে ওরা। চারদিকে ঘুমন্ত কুলি-ধাওড়া। সবাই একে-একে যে যার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। ক্যাথেরিন সবার শেষে শোয়। সে আলোটা নিবিয়ে দেয়। এতিয়েঁ কান পেতে শোনে—ঘুমোবার আগে অস্থির হয়ে এ-পাশ ও-পাশ করছে ক্যাথেরিন।

পাড়া-পড়শীরাও এই বৈঠকে প্রায়ই এসে জোটে। লেভাক তো সবার সমান অধিকারের আদর্শে উৎসাহী হয়ে উঠেছে; পিয়েরোঁও আসে—তবে কোম্পানির সমালোচনা উঠলেই সে বুদ্ধিমানের মতো উঠে যায়—বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ে। হঠাৎ এক-একদিন জাচারি এসেও উদয় হয়, রাজনীতি তার কাছে একঘেয়ে লাগে। সে তাই অমনি এক গেলাস টানতে আঁভাতাসে চলে যায়। সাভাল সবার উপরে টেক্কা দেয়, সে চায় রক্তের বদ্‌লা রক্ত দিয়ে নিতে। মেয়ুদের বাড়িতে রাতে ঘণ্টাখানেক সে প্রায়ই কাটিয়ে যায়। ওর এই নিয়মিত হাজরের মূলে আছে ঈর্ষা—অবশ্য এ-কথা সে স্বীকার করে না। তার ভয়—কবে সে ক্যাথেরিনকে হারায়। মেয়েটাকে নিয়ে সে হাঁফিয়ে উঠেছিল, কিন্তু এখন একটা মরদ ওর পাশে ঘুমোয়, ওকে সে রাতে পেতেও পারে—এই ভেবেই ও সারা। ক্যাথির দামও ওর কাছে এখন বেড়ে গেছে। সে এখন মহামূল্য সম্পদ।

এতিয়েঁর প্রতিপত্তি বেড়ে চলল, দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল তার প্রভাব। ক্রমেই সে কুলি-ধাওড়াকে বিপ্লবী করে তুলতে লাগল। ওর প্রচার অদৃশ্য—কিন্তু ধ্রুব, ও এখন গাঁয়ের সবার শ্রদ্ধার পাত্র। মেয়ু-বৌ গৃহিণীপনায় পাকা হলেও ওকে একটু বেশি যত্ন-আত্তি করে। ছোকরা নিয়মিত খরচ দেয়, মদ খায় না, জুয়ো খেলে না; সব সময়ে বইয়ের উপর মুখ ঠুসে বসে থাকে। আর মেয়ু-বৌয়ের দৌলতে ছোকরার আশেপাশের মেয়েদের মহলে শিক্ষিত বলে পসারও বেশ। ওদের চিঠিপত্র সে লিখে দেয়। আইনের সলা-পরামর্শ দেয়, যেকোন ব্যাপারে পরামর্শ দেয়। মজুর পরিবারগুলি যেমন চিঠিপত্র লেখায় ওকে বিশ্বাস করে, আবার বিপদে পড়লে ওর কাছে এসে ধরনা দেয়।

সেপ্টেম্বর মাসে ওর সেই সাধের আখেরী-তহবিল শেষে সত্যি সত্যিই তৈরি হ'ল। প্রথমে সেটা ছোটখাটো ব্যাপারই হ'ল, সভ্যসংখ্যা কুলি-ধাওড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল। কিন্তু ওর আশা, যতগুলো খনি আছে, সব জায়গার মজুর-মজুরণীর সমর্থন ও পাবে। যদি অবশ্য কোম্পানি এমনি নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে আর বাধা না দেয়। সে এখন এই তহবিলের সেক্রেটারী, কাগজপত্র লেখার জন্যে এমনকি ওর সামান্য একটা ভাতাও ঠিক হয়েছে। এতে সে বলতে গেলে বড়মানুষই হয়ে গেছে। একটি বিবাহিত মজুরের সংসার কোনরকমে চলে না, কিন্তু একা মানুষ সে। তার উপরে কেউ নির্ভর করে নেই—সে বেশ কিছু জমাতেও পারে।

এবার যেন আস্তে আস্তে এতিয়েঁ বদলে যেতে লাগল। নিজের চেহারার উপর একটু যত্ন নিতে শুরু করলে। এটা অবশ্য স্বাভাবিক ব্যাপার। মার্জিত জীবনধারার দিকে এখন তার নজর। এ জীবনের ধারণা তো দারিদ্র্যে চাপা পড়েছিল, এবার বিকশিত হয়ে উঠল। কয়েকটা ভাল পোষাক-আষাক সে কিনে ফেললে, আর হালফ্যাশানের দামী জুতো। এতেই ওর পসার আরো বেড়ে গেল, সমস্ত গাঁয়ের লোক এখন ওর চারপাশে ঘিরে থাকে। ওর আত্মপ্রসাদ বেড়ে গেল; ও এখন তৃপ্ত—জনপ্রিয়তার সুরায় ও এখন মত্ত; মাথা ওর ঝিমঝিম করে; নেশা চড়ে যাচ্ছে। ভেবে গর্ব হয়—ও তো ছোকরা; এই সেদিনও ছিল আনাড়ী মজুর; আর এখন ও দলের সেরা। হুকুমও দিতে পারে। এতে আরো উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে এতিয়েঁ—আসন্ন বিপ্লবের স্বপ্নে ও বিভোর হয়ে থাকে।

ভাগ্য ওকে ঠেলে নিয়ে চলেছে, ও সেখানে নেবে এক বিরাট ভূমিকা। মুখের চেহারাও পালটে গেছে; এখন ও ধীর গম্ভীর, মনে হয় সব সময়েই বড় বড় কথা ভাবে। নিজের গলার স্বর শুনতে ভাল লাগে। তার আকাঙ্ক্ষা এখন প্রবলতর হয়ে উঠছে—মতবাদে পড়ছে শান, সে এখন জঙ্গী হয়ে উঠছে তার আদর্শে।

হেমন্তকাল এখন পরিণতির দিকে চলেছে। অক্টোবরের তুষারে ধাওড়ার খুদে ফুলের কেয়ারীগুলোকে ধ্বংস করে ফেলেছে। এখন সেখানে ধূসর ঠুঁটো গাছপালার সার। পিটের মজুর-ছোকরারা আর লাইলাক ঝোপের আড়ালে শেডের ছাদে মেয়েদের চিত করে ফেলে না। এখন আর বসন্তের কোন চিহ্ন নেই—শুধু শীতের শাকসবজি দেখা যায়। বাঁধাকপির গায়ে জমে থাকে মুক্তোর মতো সাদা তুষার; আছে লীক (পেঁয়াজ জাতীয় সবজি) আর সালাদ পাতার চারাগুলি। আবার বর্ষা ধারা লাল টালির ছাদে পড়তে লাগল; জল ঝরতে লাগল কোণা-কানাচের টবে-টবে, প্রবল ধারা বয়ে গেল নর্দমার ভিতর দিয়ে। প্রতি বাড়িতে উনুনে এখন গাদা-করা কয়লা চাপানো—নিবতে দেওয়া হয় না আঁচ। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় বিষিয়ে ওঠে বদ্ধ রান্নাঘর। আবার এল দুঃখ-দুর্দশার দিন।

অক্টোবর মাসে, এক তুষার-ঝড়ের রাতে এতিয়েঁ নীচে থেকে উপরে এসে ঘুমোতে পারল না। তার মন তখনো তর্ক-বিতর্কের উত্তেজনায় ভরপুর। সে চেয়ে দেখলে, ক্যাথেরিন বিছানায় শুয়ে পড়ল, আলো নিবিয়ে দিলে। ও যেন অভিভূত, অধীর; ওর আবার সেই সরমের বাই দেখা দিয়েছে। এখন চটপট গিয়ে বিছানায় ঢুকে পড়ল। এটা তো স্বাভাবিক নয়। ক্যাথেরিন মৃতের মত অন্ধকারে শুয়ে আছে। কিন্তু এতিয়েঁ বুঝতে পারল, ও তারই মতো ঘুমোয় নি। সে যেমন ওর কথা ভাবছে, ও তেমনি ভাবছে তার কথা। এই যে মূক নৈকট্য—এই যে নিঃশব্দ যোগাযোগ—এতো আগে এমন অধীর করে তুলতে পারে নি তাদের। মুহূর্তের পর মুহূর্ত চলে গেল। ওরা একটুও নড়ল-চড়ল না। শুধু নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। বন্ধ করার প্রচেষ্টায় সেও যেন অধীর হয়ে উৎক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে। দু-দুবার এতিয়েঁ উঠে পড়ে তাকে কোলে টেনে নিতে চাইলে—তাকে গ্রহণ করবে সে। দুজনেরই পরস্পরের প্রতি কামনা প্রবল, কিন্তু নিবৃত্তি কখনো হবে না—এতো মূর্খতা—ঘোর মূর্খতা। ওরা যা চায়—কেন তাকে এমন জোর করে ঠেকিয়ে রাখবে—কেন গুমরে গুমরে মরবে? ছেলেমেয়েগুলো ঘুমোচ্ছে। ক্যাথেরিন তো সম্পূর্ণ রাজি। এতিয়েঁ জানে, ও তারই অপেক্ষায় আছে। নিঃশ্বাস ওর রুদ্ধ হয়ে আসছে। ও কাছে গেলেই ক্যাথেরিন নিঃশব্দে ওকে বাহু দিয়ে ঘিরে ধরবে। দাঁতে দাঁত চেপে প্রতীক্ষা করবে। প্রায় এক ঘন্টা কেটে গেল। এতিয়েঁ তার কাছে তাকে গ্রহণ করতে এল না। সেও ফিরে তাকাল না—কি জানি যদি ওকে ডেকেই ফেলে! ওরা যত পাশাপাশি থাকছে, দিনের পর দিন তত উঁচু হয়ে উঠছে লজ্জার প্রাকার। কেমন এক ঘৃণা দেখা দিয়েছে আসঙ্গের প্রতি, আর বন্ধুত্বের সুকুমার আবেগ তীব্র হয়ে উঠছে। কেন এমন হয়, একথা তারা জানে না, বোঝে না—বোঝাতে পারে না।

চার

মেয়্-বৌ তার স্বামীকে বললে, ভাল কথা, মজুরি নিতে তো ম'তসু যাচ্ছই, আমার জন্যে এক পাউন্ড কাফি আর কিছুটা চিনি এনো। কি, আনবে গা?

মেয়ু জুতো সেলাই করছিল। মুচির কাছে আবার ছুটতে হয় না তাহলে। সে মুখ না তুলেই বললে, আচ্ছা!

কষাইয়ের ওখানেও যেতে বলতাম গো...কিছুটা কচি বাছুরের মাংসও আনতে? অনেকদিন তো ওসব চোখে দেখ নি।

এবার মেয়ু মুখ তুলে তাকালে।

তুমি কি ভাবছ আমি দুশো-পাঁচশো—হাজার-হাজার টাকা পাচ্ছি?...এবারে তো মজুরি বড় কম। বেটারা তো বার বার কাজ বন্ধ করে দিয়েছে—পুরো হপ্তা আর কি করে মিলবে?

দুজনেই চুপচাপ। শনিবার, ছোট হাজরির পরেই কথা হচ্ছিল। অক্টোবর মাস প্রায় শেষ হয়-হয়। কোম্পানি মাইনের দিনে কাজে গোলমাল হয় এই ওজুহাতে সবগুলো পিটের কাজ আজ বন্ধ করে দিয়েছে। শিল্প-সংকট দিন দিন বাড়ছে, এই তাদের ত্রাসের কারণ। মালও বহু জমা হয়ে আছে, তাই আর মাল তুলতে তারা চায় না—এমনি সামান্য অজুহাতে দশ হাজার মজুরকে প্রায়ই তারা ছুটি দেয়।

মেয়ু-বৌ বললে, তুমি তো জান গা—এতিয়েঁ তোমার জন্যে রাসেনারের সরাইখানায় বসে থাকবে। ওকে সঙ্গে নিও। তোমার মজুরি ওরা কেটে-কুটে নিলে ও ঠিক ধরতে পারবে। খুব চালাক-চতুর।

মেয়ু সায় দিলে।

তোমার বাপের কথাটা ঐ ভদ্দর আদমীদের ব'লো। ডাক্তারের তো ম্যানেজারের সঙ্গে হলাহলি-গলাগলি ভাব। ডাক্তার কিন্তু সাচ্চা কথা বলে নি। তুমি আর দাদু দুজনেই এখনো মেহন্নত করতে পার।

আজ দশদিন ধরে বুড়ো বনেমোর চেয়ার থেকে নড়তে পারেনি—সে বলে, পা তার অবশ হয়ে গেছে। মেয়ু-বৌ কতবার গিয়ে শুধিয়েছে কি হ'ল, বুড়ো অমনি খেঁকিয়ে উঠেছে।

সে বলে, মেহন্নত আলবৎ করব। পা দুটোয় সোঁত ধরেছে বলে কাম করব না! ওরা একশো আশী ফ্রাঁ পেনশন দিতে চায় না বলেই তো ঐসব বলছে।

মেয়ু-বৌয়ের ভাবনা—বুড়োর দু-হপ্তার চল্লিশটা করে সু-ও গেল। সে তাই কাঁদতে বসে গেল।

হেই ভগমান, এমনি হাল হলে তো মোরা নিকেশ হয়ে যাব!

মেয়ু বললে, নিকেশ হলে তো তবু ভাল, উপোস করে থাকতে হবে না।

কয়েকটা পেরেক ঠুকে নিলে জুতোয়—এবার সে বেরিয়ে পড়বে। ২৪০নং ধাওড়ার মাইনে বেলা চারটের আগে হবে না। তাই কারো তেমন তাড়া নেই। ঘুরঘুর করছে এখানে-সেখানে। এবার একে একে রওনা হ'ল। মেয়েরা এসে জটলা করছে দোরগোড়ায়, বার বার মিনতি করছে, ওরা যেন মাইনে নিয়ে সোজা ফিরে আসে। কেউ কেউ আবার নানা ফরমায়েস করছে—যাতে মরদরা ভাটি-খানায় বসে না যায়।

এতিয়েঁ রাসেনারের ওখানে বসেই খবর পেলে। চারদিকে জোর গুজব;

কোম্পানি নাকি কাঠের ব্যাপারটায় খুব চটে গেছে। মজুরদের জরিমানা করছে চড়া হারে। এবার সংঘাত তো অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এটা সত্যিই মুখপাতের কথা, আসল কথা নয়। মুখপাতের নীচে আরো কত জটিল ব্যাপার আছে। সেগুলি সত্যিই ভয়ানক!

মঁতসু থেকে ফিরতি পথে ওরই এক সাঙাৎ এসে ঢুকেছে সরাইখানায়। এতিয়েঁ ঢুকেই তার কাছে শুনলে—ক্যাশিয়ারের আফিসে এক নোটিস লটকে দেওয়া হয়েছে। সে অবশ্য জানে না কিসের নোটিস। আর একজন এসে ঢুকল, তার পরে আর একজন। সবারই মুখে ভিন্ন ভিন্ন গল্প। তবে মনে হয় কোম্পানি একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছে।

এতিয়েঁ সুভেরিনের টেবিলে এসে বসল। তার এক মাত্র 'পানীয়' এক প্যাকেট তামাক নিয়ে সে বসে আছে। সে তাকে শুধাল,

কি সাঙাৎ, রকম-সকম কিছু বুঝছ?

সুভেরিন অনেকক্ষণ ধরে একটা সিগারেট পাকিয়ে নিয়ে বললে,

এ বোঝাটা শক্ত কি। তোমাদের একেবারে ক্ষেপিয়ে তুলতে চায়।

সে একাই এই পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করতে পারে, তার যথেষ্ট বুদ্ধি আছে। আস্তে আস্তে সে তাৎপর্য বোঝাতে লাগল। কোম্পানির অবস্থা শিল্পসংকটে একেবারে লবেজান হয়ে পড়েছে, ডুবতে না হয় তার জন্যে সে তার খরচ কমাচ্ছে —আর মজুরদের যে এবার পেটে বেল্ট কষাবার সময় এল এটা তো সহজ কথা। কোম্পানি একটা-না-একটা ছলছুতো করে ওদের মজুরি খুবলে খুবলে নেবে। বেশির ভাগ পিটে কাজ চলছে না, ইয়ার্ডে কয়লা দুমাস ধরে গাদা হয়ে পড়ে আছে। কোম্পানি তো এভাবে ঠায় বসে থাকতে পারে না—কাজ না চালু করলে যে ধ্বংস অনিবার্য এই ভেবে সে ভয় পেয়েছে। তাই ধরেছে মধ্যপন্থা —হোক না একটা ধর্মঘট—মজুররা একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে বেরিয়ে আসবে —ওদের মজুরিও কমে যাবে সঙ্গে সঙ্গে। তাছাড়া নয়া আখেরী-তহবিলের ব্যাপারটায়ও উদ্বেগ মজুরদের কম নয়। একটা ধর্মঘট শুরু হলেই এই সামান্য তহবিল ফাঁকা হয়ে যাবে।

রাসেনার এতিয়েঁর পাশে বসে আছে, দুজনেই শুনে শিউরে উঠল। জোরে ওরা এখন বাত্‌চিত করতে পারে। রাসেনার-গিন্নী ছাড়া ঘরে এখন কেউ নেই। সেও এখন কাউন্টারে বসে আছে। হোটেলওয়ালা বিড়বিড় করে বললে, কি আজব কান্ডকারখানা বাপু! এর মানে কি বুঝি নে। কোম্পানির ধর্মঘট করিয়ে কোন লাভ নেই, মজুরদেরও নেই। একটা সমঝোতা হলেই তো আচ্ছা হয়।

কথাটা বিজ্ঞজনের মতো। রাসেনার সবসময়েই যুক্তিপূর্ণ দাবির পক্ষে। তার আগেকার ভাড়াটের জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, সে তাই এই সম্ভাব্য অগ্রগতির ব্যবস্থাটাকে একটু রং ফলিয়েই উড়িয়ে দেয়। সে প্রায়ই বলে, তারা যদি একসঙ্গে সবকিছু চায়, তাহলে এই দাঁড়াবে যে কিছুই তাদের মিলবে না। ওর চেহারাটা যেমন মোটা, বুদ্ধি টাও তাই—আসলে সে ভালমানুষ। কিন্তু বীয়ারের লালনে-পালনে-তোষণে তার ভিতরে এক গোপন ঈর্ষা জন্ম নিচ্ছে। এটা আরো বেড়ে উঠেছে, মজুররা তার সরাইখানায় আর তেমন আসে না বলে। এখন ভোরো থেকে কালে ভদ্রে দু-একজন মজুর এসে উদয় হয়, ওর

কথা কেউ শোনে না। তাই এখন সে মাঝে মাঝে কোম্পানির পক্ষ সমর্থনই করে বসে, পুরানো মজুরের ক্রোধের কথা ভুলে যায়। ওকে যে একদিন কোম্পানি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, সেকথাও ভুলে যায়।

রাসেনার-গিন্নী কাউন্টার থেকেই চেঁচিয়ে উঠল, তাহলে তুমি ধর্মঘটের বিপক্ষে?

ও জোর গলায় জবাব দিলে, হাঁ—বিপক্ষে! রাসেনার-গিন্নী স্বামীকে থামিয়ে দিলে।

তোমার তো কত মুরদ! তুমি থামতো বাপু! এই ভদ্দর লোকরাই বলুন।

এতিয়েঁ ভাবছিল; তার দৃষ্টি গেলাসে নিবন্ধ। এবার সে মুখ তুললে।

আমাদের সাঙাৎ যা বলেছে সবই ঠিক, সবই সম্ভব। ওরা যদি জোর করে ধর্মঘট করাতে চায়, তাহলে আমাদের তো না করে উপায় নেই।...প্লুচার্ত এই নিয়ে আমাকে চিঠি লিখেছে—তার পরামর্শ ভালই। সেও ধর্মঘটের বিরুদ্ধে, এতে মালিকদের চেয়ে মজুররাও কম নাজেহাল হবে না—আর এতে কিছু হবেও না। তবে এই এক মস্ত সুযোগ—এতে আমাদের মজুরদের দলে টানা যাবে। এই তো চিঠিখানা রয়েছে।

আসল কথা, প্লুচার্ত মঁতসুর মজুরদের সন্দেহ-সংশয় দেখে বড়ই হতাশ হয়ে পড়েছে। আন্তর্জাতিকের প্রতি তাদের ঘোর অবিশ্বাস। তার আশা, যদি কোম্পানির বিরুদ্ধে লড়তে বাধ্য হয় তাহলে তারা এককাট্টা হতে শিখবে। কিন্তু শত চেষ্টা করেও এতিয়েঁ একখানা সভ্য হবার কার্ড কাউকে গছাতে পারে নি। তবে আখেরী-তহবিলের জন্যই সে মেহনত করেছে বেশি, আর তাতে মজুরদের খানিকটা সমর্থনও পেয়েছে। কিন্তু এই তহবিল এখনো সামান্য, এক নিমেষে ফাঁকা হয়ে যাবে। সুভেরিন তো বলে—সেটা ভালই হবে। শূন্য তহবিল নিয়ে তো আর ধর্মঘট চালানো যায় না—তাই ওরা এসে শ্রমিক-সংস্থায় যোগ দেবে—দুনিয়ার দেশে দেশে তাদের সাথীরা আছে, তারাই তাদের উদ্ধার করবে।

রাসেনার শুধালে, তবিলে কত উঠেছে?

টেনেটুনে তিন হাজার ফ্রাঁ হবে, এতিয়েঁ জবাব দিলে। জান তো পরশু উপরওয়ালারা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। ওরা খুব ভদ্রতা দেখালে; বার বার বললে, খনির মজুরদের ওরা আখেরী-তহবিল করতে বাধা দেবে না। কিন্তু বুঝলাম—ওরা এটারও মালিক হতে চায়। নিজেদের ইচ্ছে খুশি চালাবেন। এই নিয়েই আমাদের একটা লড়াই বাঁধবে দেখো!

সরাইখানার মালিক পায়চারি করতে লাগল, বিদ্রূপভরে শিস দিচ্ছেঃ তিন হাজার ফ্রাঁ তো পুঁজি—ঐ ক'টা টাকা নিয়ে কি করবে! ছ' দিনের রুটির খরচাও হবে না! তাছাড়া ইংলন্ডে যারা থাকে সেই বিদেশীদের উপর নির্ভর করবে? তার চেয়ে শুয়ে শুয়ে নিজের জিভ চেটে খিদে মেটাও না সাঙাৎ! না—এ ধর্মঘট তো বোকামি!

এবার দুজনে তুমুল তর্ক শুরু হ'ল, এই প্রথম কড়া কথার তোড় বয়ে গেল। ওরা যতই তর্ক করুক, শেষ অবধি ওরা একমত হয়েছে। ধনবাদের প্রতি ঘৃণা ওদের মিলিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা ঘোরাল হয়ে উঠল।

এতিয়েং সুভেরিনের দিকে তাকিয়ে বললে, আচ্ছা, কি হয় দেখা যাবে—তুমি কি বল?

সুভেরিন তেমনি অভ্যাসগত ঘৃণায় ফুঁসে উঠল—ধর্মঘট! সে তো বোকামি!

ক্রোধে ওরা নীরব হয়ে গেছে। এবার সুভেরিনই বললে,

তোমাদের যদি এতেই আনন্দ হয়, আমি 'না' বলব না। এতে কি হবে জান, একদল ফোঁত হয়ে যাবে, আর-একদল মরবে—এই তো মোটামুটি লাভ! এমনি হারে চললে অমন হাজার বছর লাগবে তামাম দুনিয়াকে নতুন করে গড়তে। তার চেয়ে যে জেলখানায় বসে ধুঁকে ধুঁকে মরছ—সেইটাকেই একেবারে উড়িয়ে দাও না—তাহলেই তো সব চুকে-বুকে যায়?

সে তার সরু হাতখানা নেড়ে খোলা দরজাটা দেখিয়ে দিলে। দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে লা-ভোরোর বাড়িগুলো। হঠাৎ এক অদৃশ্য স্পর্শে সে বাধা পেল। পোষা খরগোশ পোল্যান্ড বাইরে গিয়েছিল, কতগুলি খালাসী-ছোঁড়ার ঢিল খেয়ে ছুটে এসেছে। ভয়ে সারা হয়ে ওর দুখানা পার ভিতরে আশ্রয় নিলে—লেজ খাড়া হয়ে উঠেছে তার। ওকে আঁচড়াচ্ছে আর অনুরোধ জানাচ্ছে—ও তাকে কোলে তুলে নিক। সুভেরিন ওকে কোলে নিয়ে বসল। দুহাত দিয়ে ধরে আছে—এবার এসেছে দিবাস্বপ্ন। ওর নরম লোমের উষ্ণতায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে রোজই ওর এমনি হয়।

ঠিক এই সময়ে মেয়ু এসে ঢুকল। রাসেনার-গিন্নী ভদ্রভাবে পেড়াপীড়ি করলেও সে কিছু পান করলে না। রাসেনার-গিন্নী বীয়ার বিক্রি করে না যেন খাওয়ায়। এতিয়েং উঠে পড়ল ওকে দেখে, দুজনে এবার মঁতসুর পথে রওনা হ'ল।

কোম্পানির মাইনের দিন মঁতসুর চেহারাই বদলে যায়। এ যেন রোববারের মেলার দিন। সবগুলি ধাওড়া থেকে দলে দলে মজুররা এসে হাজির হয়। ক্যাশিয়ারের আফিস-কামরা বড় ছোট, তাই কেউ বা দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে, কেউ বা ফুটপাথে জটলা করে। ভিড় ক্রমাগতই বাড়তে থাকে—চলা-ফেরায় বাধা সৃষ্টি হয়। ফেরিওয়ালারা এই সুযোগ ছাড়ে না—ওদের পসরা খুলে বসে। চীনেমাটির বাসন-কোসন থেকে শুরু করে রান্না মাংস অবধি বিক্রি হয়। কিন্তু সরাইখানা আর রেস্তরাঁগুলোরই এই সময়ে মরশুম পড়ে যায়। মাইনে পাবার আগেই কাউন্টারে এসে তারা ধৈর্য ধরে থাকবার জন্য মদে ডুবে যায়। তারপরে মাইনে পকেটে পুরেই আবার এসে নতুন করে শুরু করে। শুধু যাদের কাণ্ডাকাণ্ডি জ্ঞান আছে, তারা আর খায় না। ভাল্‌কানে গিয়ে তারা একটু আমোদ-আহ্লাদ করে।

মেয়ু আর এতিয়েং ভিড়ের ভিতর দিয়ে চলছিল। বিক্ষোভের আবহাওয়া সম্বন্ধে তারা সচেতন। উদাসীনভাবে ওরা আর মাইনে নিচ্ছে না, ফুঁকে দিচ্ছে না ভাটিখানায়, হাত মুঠো-পাকানো—মুখে মুখে অশ্রাব্য গালাগাল।

পিকেৎ-এর সরাইখানার সুমুখে সাভালের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মেয়ু তাকে শুধালে, তাহলে খবর সত্যি? ওরা আমাদের সঙ্গে চালাকি খেলছে?

সাভাল শুধু রাগে গর্জে উঠল, এতিয়েঁর দিকে আড়চোখে সে তাকাচ্ছে। কাজের নতুন চুক্তিনামা হবার পর থেকে সে আর এক গ্যাঙে (মজুরের দল)

কাজ করছে। নতুন লোকটার উপর তার ঈর্ষা দিন দিন বেড়েই চলেছে। কোথা-কার কে উড়ে এসে একেবারে দলের নেতা হয়ে বসেছে, আর সমস্ত কুলি-ধাওড়া ওরই পা চাটছে। ওর এই ঈর্ষা আরো জটিল হয়ে উঠেছে প্রেমের প্রতি-দ্বন্দ্বিতায়। এখন রিকুইলারের পরিত্যক্ত খনিতে ক্যাথেরিনকে নিয়ে যেতে যেতে রোজই সে অশ্রাব্য গালাগাল দেয় আর অভিযোগ করে—সে তার ঐ মার ভাড়াটের সঙ্গে শোয়। এই ঈর্ষায় ওর কামনা চাগিয়ে ওঠে—আদরে সোহাগে ও ক্যাথির দম বন্ধ করে দেয়।

মেয়ু তাকে আবার শুধালে,

এবার কি লা-ভোরোর পালা নাকি ?

ও মাথা নেড়ে চলে গেল। এবার ওরা ঠিক করলে, ইয়ার্ডে ঢুকবে।

ক্যাশিয়ারের আফিস একখানা ছোটো চৌকো কামরা। আবার সেখানা লোহার শিক দিয়ে দু' ভাগ করা। দেয়ালের পাশে পাতা সারি সারি বেঞ্চি। তাতে এখন পাঁচ-ছ জন মজুর বসে আছে। ক্যাশিয়ার কেরানীর সাহায্যে শিকের সামনে টুপি-পরা মজুরটিকে মাইনে দিচ্ছে। বেঞ্চির উপরে বাঁ দিকের দেয়ালে একখানা হলদে নোটিস ঝুলছে। দেয়ালের ধোঁয়ার দাগে কালো আস্তরে একেবারে ঝকঝক করছে নোটিসখানা। সারা সকাল ধরে এর সামনে দিয়ে কত মানুষ অবিরাম আসছে যাচ্ছে। দু'জন-তিনজন করে ওরা ঘরে ঢুকছে, একবার নোটিসখানার সুমুখে দাঁড়াচ্ছে; আবার নিঃশব্দে চলে যাচ্ছে। কাঁধ ঝাঁকুনি দিচ্ছে। মনে হয় আবার বুঝি নতুন বোঝা চাপল ওদের পিঠে।

দুটি মজুর এখনো নোটিসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, একটি ছোকরা—মস্ত তার মাথাটা, আর একজন হাড়-জিরজিরে বুড়ো—বয়েস তার অনেক—তাই মুখে কোন ভাবলক্ষণ ফোটে না। দু'জনের একজনও পড়তে পারে না, কিন্তু ছোকরা বানান করে-করে পড়তে চেষ্টা করছে; বুড়ো শুধু ফ্যাল্‌ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। এমনি অনেকেই আসছে, দেখছে, কিন্তু বুঝতে পারছে না লেখা।

মেয়ু নিজেও পড়তে পারে না, তাই বললে, আমাদের পড়ে শোনাও তো সাঙাৎ।

এতিয়েঁ বিজ্ঞপ্তিখানা পড়তে লাগল। সবগুলি পিটের মজুরদের উদ্দেশ্যে কোম্পানির এই নোটিসখানা। ওদের জানানো হচ্ছে, কাঠের ব্যাপারে তেমন নজর দেওয়া হয় না, আর এই নিয়ে মজুরদের জরিমানা করে করে কোম্পানি হাঁপিয়ে উঠেছেন। তাই কয়লা তোলার মজুরি দেবার পদ্ধতি এখন থেকে বদলে যাবে। এখন থেকে কোম্পানিই ভালভাবে কাজ করবার জন্যে যতখানি কাঠের দরকার তার দাম আলাদাভাবে দেবেন। কিন্তু কয়লার গাড়ির দাম সেই অনুসারে কমে যাবে—কাটিং-এর দূরত্ব এবং জটিলতা অনুসারে দাম পঞ্চাশ থেকে চল্লিশ সেন্টের মধ্যে ধার্য হবে। কোম্পানি এও দেখিয়েছেন যে, এই যে দশ সেন্ট মজুরি থেকে কাটা হ'ল—এটার ক্ষতিপূরণ হবে কাঠের দামে। কোম্পানি আরো জানিয়েছেন, সবাই যাতে বুঝতে পারে এতে সুবিধে হয়েছে —তাই কোম্পানি এই নিয়ম সোমবার পয়লা ডিসেম্বরের আগে চালু করছেন না।

ক্যাশিয়ার চেঁচিয়ে উঠল, এই—অত জোরে পোড়ো না! আমাদের নিজেদের কথা শুনতে পাচ্ছি না।

এতিয়েং এই মন্তব্যে কান দিলে না। সে পড়া শেষ করল। স্বর তার কাঁপছে, যখন সে শেষ ছত্রে এল—সবাই তখন স্থিরদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে নোটিসখানার দিকে। বুড়ো আর ছোকরা মজুররা চেয়ে আছে ফ্যালফ্যাল করে—এর চেয়ে বেশি ওরা আশা করেছিল। কিন্তু উপায় তো নেই। ওরা ফিরে চলেছে নিরাশ হয়ে। যেন দলে-পিষে গেছে।

হা ঈশ্বর! মেয়ু বিড়বিড় করে উঠল।

সে আর তার সঙ্গী বসে পড়েছে। মিছিল চলে যাচ্ছে হলদে নোটিসখানার সুমুখ দিয়ে সারবন্দী হয়ে। মাথা তাদের নোয়ানো, হিসেব কষছে। কোম্পানি ওদের পেয়েছে কি? গাড়ির মজুরি থেকে যে দশ সেন্ট বাদ গেল, কাঠের দাম দিলেই কি সেই দশ সেন্ট আর পুরা হবে। বড়জোর আট সেন্ট পেতে পারে। তাহলে কোম্পানি ওদের কাছ থেকে দু' সেন্ট ঠকিয়ে নিলে! তাছাড়া হুঁশিয়ার হয়ে কাজ করতেও কত সময় যাবে। কোম্পানি এমনি করে প্রতারণা করে ওদের মজুরি কমাচ্ছে! মজুরের পকেট মেরে ওরা ব্যয়-সংকোচ করছে!

হা ঈশ্বর, মেয়ু মুখ তুলে তাকিয়ে বললে, আমরা যদি ওদের এই কারসাজিতে ভুলে যাই তো আমাদের মতো বুদ্ধু আর দুটো নেই!

এবার জানালা খালি হয়ে গেছে। সে মাইনে নিতে গেল। শুধু যারা ঠিকাদার তারাই মজুরি নেয়, তারপর নিজের গ্যাঙে ভাগ করে দেয়। এতে সময় কম লাগে।

মেয়ুর গ্যাঙ, কেরানী বললে, ফিলোনিয়ে স্তর, সাত নম্বর কাটিং।

তালিকায় খুঁজছে কেরানী। রোজ কত গাড়ি একটা স্তর থেকে খালাস হয়, সর্দার তার হিসেব দেয়। সেই হিসেব খতিয়ে দেখে এখানে মজুরি দেওয়া হয়। কেরানীটি আবার বললে,

মেয়ুর গ্যাঙ। ফিলোনিয়ে স্তর—সাত নম্বর কাটিং—একশো পঁয়ত্রিশ ফ্রাঁ। ক্যাশিয়ার টাকা দিয়ে দিলে।

মেয়ু অবাক হয়ে বললে, মাপ করুন গো—আপনার তো ভুল হয়নি হিসেবে?

টাকা তুলে না নিয়ে সে তাকিয়ে রইল। বুকখানা থরথর করে কাঁপছে। এত কম তো হতে পারে না। হয়তো হিসেবেই ভুল হয়েছে। জাচারি, এতিয়েং আর সাভালের বদলী যে এসেছে তাকে দিয়ে বুড়ো বাপ, ক্যাথি, জাঁলিন আর নিজের পঞ্চাশ ফ্রাঁর বেশি থাকবে না।

কেরানী বললে, না, না, হিসেবে ভুল হয়নি। দু-দুটো রোববার গেছে, আর চার-চারটে গেছে জিরান—তাতে দু'হপ্তায় তোমাদের কাজ হয়েছে মাত্র ন' দিন।

মেয়ুও আস্তে আস্তে হিসেব শুরু করলে। ন' দিনে তার মজুরি হয় তিরিশ ফ্রাঁর মতো, ক্যাথির আর জাঁলিনের ভাগে পড়ে আঠারো আর নয় ফ্রাঁ। বুড়ো বাপ তো মাত্র তিন রোজের মাইনে পাবে। কিন্তু জাচারি আর আর-দু'জনের নব্বুই ফ্রাঁ এর সঙ্গে যোগ দিলে বেশি ছাড়া কম তো হবে না।

কেরানীটি বললে, জরিমানার কথাটা ভুলে গেলে চলবে না। কাঠের জন্য বিশ ফ্রাঁ জরিমানা হয়েছে।

হতাশ হয়ে গেল মেয়ু। বিশ ফ্রাঁ জরিমানা, তার উপরে চারদিন জিরান! তাহলে হিসেব মেলে বটে! আগে তো দু-হপ্তার মজুরি একেবারে পুরো-পুরি দেড়শো ফ্রাঁ ঘরে আনত। তখন জাচারি আলাদা ঘর বাঁধেনি, বুড়ো বাপও পুরো মজুরি পেত। কি দিনই গেছে!

তুমি নেবে-কি নেবে না বল? দোমনা হয়ে দেরি করিয়ে দিয়ো না, ক্যাশিয়ারের ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে, সে চেঁচাচ্ছে। দেখছ না—আর সবাই দাঁড়িয়ে আছে। না নিতে চাও, বললেই হয়!

মেয়ু থলের ভিতরে টাকা পুরে নিচ্ছে। হাত তার কাঁপছে। কেরানীটি বললে, একটু সবুর কর। তোমার নাম এখানে রয়েছে। তুসান্ত মেয়ু—না? সেক্রেটারী তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান। যাও, উনি এখন একা আছেন।

হকচকিয়ে গেছে মেয়ু। সে এসে এক আফিস-কামরায় ঢুকে পড়ল। মেহগনি কাঠের পুরানো আসবাব, তাতে আবার বিবর্ণ সবুজ অড় পরানো। জেনারেল সেক্রেটারী একরাশ কাগজপত্রের আড়াল থেকে কথা কইছেন। কানে শুধু ভন্‌ভন্ করে ঘুরপাক খাচ্ছে স্বর, শুনতে সে পাচ্ছে না। সে কোন-রকমে আঁচ করে নিলে—ব্যাপারটা তার বাপের। দেড়শো ফ্রাঁ তার পেনশন হবার কথা আটান্ন বছর তার বয়েস হয়েছে, পঞ্চাশ বছর কেটেছে খনির কাজে (এখানে জোলা কোথাও চল্লিশ, কোথাও পঞ্চাশ বলেছেন। পঞ্চাশ বছরই ঠিক বলে ধরে নিতে হবে। বাপের আটান্ন বছর বয়েসটা অবশ্য ঠিক—মেয়ুর বয়েস এখন বিয়াল্লিশ'—অনু)। ওর যেন মনে হ'ল, সেক্রেটারীর স্বর রুক্ষ হয়ে উঠছে। তিনি ভর্ৎসনা করছেন। সে নাকি আজকাল রাজনীতি করে। সেক্রেটারী তার ভাড়াটের কথা, আখেরী তহবিলের কথাও তুললেন। শেষে পরামর্শ দিলেন, সে যেন এসব বাজে ব্যাপারে না থাকে—সে খনির একজন সেরা মজুর। মেয়ু প্রতিবাদ করতে চাইল, কিন্তু অসংলগ্ন কতগুলি কথাই মুখ থেকে বেরিয়ে এল। শেষে টুপিটা দোমড়াতে দোমড়াতে আমতা-আমতা করতে-করতে বেরিয়ে এল ঃ—

ঠিকই হুজুর...আপনাকে হলফ করে বলছি...

এতিয়েঁ অপেক্ষা করছিল। তার কাছে ফিরে এসে সে ফেটে পড়ল,

ইস—আমি কি ভীতুরাম! ওর কথার পালটা জবাব দেওয়া উচিত ছিল। একে রুজি জোটে না, তার উপরে আবার এই অপমান! হাঁ, তোমার উপরেও ছুরি চালিয়েছে। ও বলছিল, ধাওড়াকে ধাওড়া নাকি তুমি বিষিয়ে তুলছ। এখন দোহাই তোমার, বলত কি হবে? ভুঁয়ে লুটিয়ে পড়ে সেলাম করে বলব—বহুৎ আচ্ছা হুজুর। আপনার মর্জি। এই-ই বোধহয় ঠিক।

মেয়ু চুপ করে গেল। ভয় আর রাগে সে দিশেহারা। এতিয়েঁ গম্ভীর হয়ে কি ভাবছে, আবার ভিড়ের ভিতর দিয়ে ওরা চলেছে। বিক্ষোভ বেড়ে উঠছে জনতার। ওরা নিরীহ মানুষ তাই বিক্ষোভে উন্মাদনা নেই, প্রচণ্ডতা নেই। তবু দূরাগত বজ্রের গর্জনের মতোই সে ঝরে পড়ছে। ঘন জনতার গম্ভীর মুখ এখন আরো গম্ভীর। এ যেন ঝড়ের সতর্ক সংকেত। যারা হিসেব বোঝে তারা শুরু করেছে গুণতে—কোম্পানি যে নয়া বন্দোবস্তে দু' সেন্ট লাভ করছে—একথা ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। যারা হিসেবে আনাড়ী তারাও এখন ক্ষিপ্ত। এই যে মজুরি কাটা হ'ল এতেই বিক্ষোভ এখন সর্বত্র

ছড়িয়ে পড়েছে—এ উপবাসীদের বিক্ষোভ ভুরিভোজীদের বিরুদ্ধে—বেকারত্ব আর জরিমানার বিরুদ্ধে—মালিকের বিরুদ্ধে। এমনি ঘরে খাবার নেই—আবার যদি মজুরি কমে তো কি উপায় হবে? সরাইখানায় সরাইখানায় বাক-বিতণ্ডার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। তাদের গলা ফেটে যাচ্ছে রাগে—যেক'টা টাকা পেয়েছে কাউন্টারেই ঢেলে দিচ্ছে।

বাড়ি ফেরার পথে এতিয়েঁ আর মেয়ুর মধ্যে কোন কথা হ'ল না। মেয়ু বাড়ি ঢুকে দেখলে, বৌ ছেলেমেয়েদের নিয়ে বসে আছে। সে নজর করে দেখলে, খালি হাতে ফিরেছে স্বামী।

আচ্ছা লোক তো!—মেয়ু-বৌ খেঁকিয়ে উঠল—কফি কোথায়, চিনি আর মাংস কোথায়? একটুকরো মাংস আনলে আর তোমার মস্ত নোকসানি হোত না।

মেয়ুর মুখে রা নেই। সে আবেগ সংযত করছে। পিটে মেহনত করে করে ওর মুখখানায় পড়েছে কঠোর রেখা—মুখখানা গম্ভীর হয়ে উঠেছে—সেই মুখ এখন হতাশায় বিকৃত। চোখ তার সজল, ধারা নেমেছে গাল বেয়ে। চেয়ারের উপর সে ঝুপ করে ভেঙে পড়ে শিশুর মতোই কাঁদতে লাগল। পঞ্চাশ ফ্রাঁ ছুঁড়ে দিলে টেবিলের উপর।

দেখ গো, ফুঁপিয়ে উঠল মেয়ু, ঐ তো সব নিয়ে আলাম...মোদের মেহন্নতের মজুরি!

মেয়ু-বৌ এতিয়েঁর দিকে তাকালে। সেও বিষাদিত নিস্তব্ধতায় ডুবে গেছে। মেয়ু-বৌ কেঁদে উঠল। ন'টা মুখের গ্রাস কি করে জোটাবে পঞ্চাশ ফ্রাঁয়? বড় ছেলেটা চলে গেছে, বুড়োর পা ফুলে উঠেছে; নড়তে পারে না; এর পরে তো আছে মৃত্যু। আলঝির মাকে কাঁদতে দেখে তার গলা জড়িয়ে ধরল। এস্তেল কাঁদছে, লেনোর আর আঁরিও ফোঁপাচ্ছে।

সমস্ত কুলি-ধাওড়া থেকে ঐ একই চীৎকার উঠছে। দুর্দশাগ্রস্ত নরনারীর ক্রন্দন। পুরুষরা ফিরে এসেছে, আর সংসারের সবাই কাঁদছে মজুরি-কাটার কান্না। দরজার পর দরজা খুলে গেল, মেয়েরা বাইরে এসে চীৎকার করে কাঁদতে লাগল। যেন তাদের এই অভিযোগ ছাদের নীচে ঐ অপরিসর ঘরে আর রোধ করে রাখা যাচ্ছে না। মিহিগুঁড়োয় বৃষ্টি পড়া শুরু হ'ল, কিন্তু কারো ভ্রূক্ষেপ নেই। পথ থেকে একে অপরকে ডেকে ডেকে আনছে—হাতের মুঠো ফাঁক করে দেখাচ্ছে মজুরির টাকা।

দেখ গো, দেখো—মোর মরদকে এই ক'টা টাকা দিয়েছে! মোদের কি ওরা বোকা বানাতে চায়?

দু-হপ্তার রুটির খরচও তো কুলোবে না গো।

আর মোর টাকা ক'টা গুনে দেখ গো। বুঝি দেনার দায়ে কাপড়-চোপড়, নীচে পরবার নেংটি অবধি বিকোতে হবে।

মেয়ু-বৌ আর সবার মতোই বাইরে এসেছে। লেভাক-বৌকে ঘিরে এক ভিড় জমে গেছে। সে তর্জন-গর্জন করছে সবচেয়ে বেশি। তার মাতাল স্বামী এখনো ফেরেনি। সে তাই আঁচ করছে—সে যা পেয়েছে হয়তো ভাল্‌কানেই ফুঁকে দিচ্ছে। ফিলোমেন মেয়ুর জন্যে ওত পেতে বসে আছে, তার ভয় জাচারির হাতে টাকা না পড়ে। শুধু পিয়েরোঁ-বৌই চুপচাপ, শান্ত।

পিয়েরোঁ চালাক মানুষ—সে একটা-না-একটা ব্যবস্থা করবেই। কিন্তু কি করে কে জানে! সর্দারের খাতায় সে ঠিক অন্যের চেয়ে মেহনতের ঘণ্টা বাড়িয়ে লেখায়। ব্রুল জামাইয়ের এই হীন চাতুরী সহ্য করতে পারে না। তাই সেও এসে জুটেছে বিক্ষোভকারিণীদের দলে। ভিড়ের মধ্যে তার ঢ্যাঙা শরীরখানা দেখা যাচ্ছে। মঁতসুর দিকে তাকিয়ে ঘন ঘন মুঠো-করা হাত নাড়ছে।

হানাবুদের নাম না করে সে চেঁচিয়ে উঠল—ভাব তো একবার, আজ ভোরেই দেখনু—ওদের ঝিটা গাড়ি চড়ে যাচ্ছে! হাঁ, রাঁধুনী আর দুটো ঝি মার্সিয়েনেয় চলেছে মাছ কিনতে। আমি বাজি রাখতে পারি।

আবার সোরগোল পড়ে গেল, আবার গালাগাল। সাদা ঝাড়ন জামায় এঁটে মনিবের গাড়িতে চাকরাণী চলেছে বাজারে—একথা ভাবতেও ওদের গা রাগে রি-রি করে উঠল। মজুররা উপোস করে মরছে, আর ওদের এখনো মাছ না হলে খাওয়া রোচে না! তা যুগ যুগ ধরে তো আর এমনি মাছ-মাংস খাওয়া চলবে না, গরীব-গুর্বোদেরও পালা আসবে। রোস না। এই বিদ্রোহের জিগিরে এতিয়েঁর ছড়ানো মতবাদের বীজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল—বিকশিত হ'ল। প্রতিশ্রুত স্বর্ণযুগ তারা দেখতে চায়—তারা অসহিষ্ণু। এই দরিদ্রের ক্লেদসিক্ত দিগন্তরালের বাহিরে তাদের সুখ-স্বর্গের ভাগীদার তারা হতে চায়। দারিদ্র্য তো তাদের কবরখানার মতোই ঘিরে আছে। পাপের ভরা তো পূর্ণ হচ্ছে, অবিচার-অন্যায় বেড়ে চলেছে দিন দিন। এখন তো ওরা ছিনিয়ে নিলে তাদের মুখের গ্রাস—এবার তাই তারা তাদের দাবি জানাবে—চীৎকার করে জানাবে। মেয়েরা তো এখুনি তাদের সেই মায়াময় প্রগতি-নগরে সবলে ঢুকতে চায়—সেখানে তারা তো আর গরীব থাকবে না। চির সমৃদ্ধি সেখানে ছেয়ে আছে—সেই স্বপ্নময় নগরীতে। রাত হয়ে এল। বৃষ্টি জোরে পড়ছে। এখনো চীৎকার উঠছে ধাওড়া থেকে—বর্ষণ-মুখর রাত ছাপিয়ে উঠছে চীৎকার। ছেলেমেয়েরাও চেঁচাচ্ছে ওদের সঙ্গে।

আঁভাতাস-এর সরাইখানায় ওরা সেই রাতে ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে। রাসেনার আর বাধা দিলে না। সুভেরিন বিপ্লবের প্রথম সোপান হিসেবে তাকে মেনে নিলে। এতিয়েঁ এক কথায় পরিস্থিতিটা সবাইকে বুঝিয়ে দিলে —কোম্পানি যদি সত্যিই ধর্মঘট চায়, তাহলে ধর্মঘটের আঘাতই হানবে মজুরেরা।

পাঁচ

এক সপ্তাহ কেটে গেছে। সংঘাত আসন্ন হয়ে আসছে দিন দিন। কাজ চলছে, সন্দেহ-সংশয়ের দোলা উঠছে—গম্ভীর হয়ে গেছে মুখের সার।

পরের পক্ষকালের মজুরি আরো কমবে বলেই মেয়ুদের ভয় হ'ল। মেয়ু-বৌ এমনি ঠাণ্ডা, বুদ্ধিও রাখে—কিন্তু সেও বিরক্ত হয়ে উঠেছে। তার মেয়ে ক্যাথেরিন একদিন রাতটা বাইরে কাটিয়ে এল। পরের দিন এমন ক্লান্ত হয়ে ফিরল তার রাতের অভিসারের পর যে, আর কাজে যেতে পারল না। সে কেঁদে-কেটে বললে, তার দোষ নয়, সাভাল তাকে আটক করে রেখেছিল।

পালাতে চাইলে ওকে বেধড়ক পিটবে বলে নাকি সে শাসিয়েছিল। লোকটা ঈর্ষায় ক্ষেপে গেছে, এতিয়ে'র বিছানায় সে যেতে না পারে তাই তাকে আটক রেখেছিল। সে বলে, সে নাকি জানে ওর মা-বাপই এতিয়ে'র বিছানায় ওকে জোর করে পাঠায়। মেয়্যু-বৌ রাগে গর্জে উঠল। সে বারণ করে দিলে, অমন জানোয়ারের সঙ্গে তার মেয়ে যেন আর দেখা না করে। শুধু এতেই হ'ল না। ম'তসুতে গিয়ে ওর কানে একটা ঘুষো কষিয়ে দেবে একথাও সে বললে। যাই হোক, একটা রোজ তো বাতিল হয়ে গেল! আর মেয়েটাও এমনি—পিরিতের মানুষ সে পেয়েছে—তাকে আর সে বদলাবে না এই তার ইচ্ছে।

দুদিন পরে আর-একটা ব্যাপার ঘটল। সোম আর মঙ্গলবার জাঁলিন খনির কাজে ব্যস্ত থাকে বলে সবাই জানে। কিন্তু সে খনি থেকে পালিয়ে বেবের্ত আর লিদিকে নিয়ে চলে গেল ভান্দামের জলায়-জঙ্গলে। ও ওদের ফুসলে নিয়ে গেল। তারা কোথায় চুরি-বাটপারি করলে, বা ইঁচড়ে-পাকা ছেলে-মেয়েদের মতো কোন্ যৌন অপরাধের খেলায় লিপ্ত রইল, কেউ জানে না। সে মার কাছে কড়া শাস্তি পেল। মা তাকে মেরে বাইরে বার করে দিলে। সারা ধাওড়ার ছেলেমেয়েরা তাকিয়ে দেখলে ভয়ে বিহ্বল হয়ে। এমনি কাজ! এই তার ছেলেমেয়ে! বিয়োনো থেকেই তো ওদের পিছনে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢালছে, এখন তো তাদের কিছু রোজগার করে আনা দরকার। ফেটে পড়ল মেয়্যু-বৌ। সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের কঠোর শৈশবের কথা মনে পড়ল। ওয়ারিশান সূত্রে ওরা পেয়েছে দারিদ্র্য—আর তাই ওদের গর্ভের অন্ধকারে সন্তান যখন জন্মায়—তারা তো মেহনতি মজুর হয়েই জন্মায়।

পুরুষরা আর মেয়েটা সেদিন ভোরে পিটে চলে যেতে মেয়্যু-বৌ বিছানায় উঠে বসে জাঁলিনকে বললে,

ওরে খুদে জানোয়ার, আবার যদি ওসব করিস তো তোর পাছার ছাল তুলে নেব!

নতুন ঠিকের কাজে মেহনতি বড় বেশি। এখানে এসে ফিলোনিয়ে স্তরটা এমন সরু হয়ে গেছে যে, দেয়াল আর ছাদের মাঝখানে মজুররা একেবারে লেপটে থাকে। কাজ করতে গিয়ে ওদের হাত ছড়ে যায়। তা ছাড়া বড় ভিজে জায়গাটা, কখন নতুন জলের তোড় বইবে তার ভয়েই তারা অস্থির। এমন এক-একটা হঠাৎ তোড় আসে যে, পাথর খসে পড়ে, মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এই তো আগের দিন, এতিয়ে' একটা জোর আঘাত হেনে তার গাঁইতিখানা তুলে নিলে, অমনি ঝরনাধারার মতো জল তার মুখে এসে পড়ল। কিন্তু এতো হুঁশিয়ারি মাত্র; কাটিংটা ভিজে স্যাঁতসেঁতে হয়ে থাকে—স্বাস্থ্যও এখানকার খারাপ। তাছাড়া সে এখন আর সম্ভাব্য দুর্ঘটনার কথাও ভাবে না, বিপদের কেয়ার না করে সে তার সাথীদের সঙ্গে সব কিছু ভুলে থাকে। ফায়ার-ড্যাম্পের ভিতরে তারা থাকে, তাদের চোখের পাতা যে ভারি হয়ে আসে, চোখের পক্ষ্মে যে মাকড়সার জালের মতো ঝুল লেগে লেগে থাকে তাও টের পায় না। আলোটা যখন বিবর্ণ নীলচে হয়ে আসে তখন হয়তো মনে পড়ে সে-কথা। তারপরে একজন মজুর কয়লার স্তরের উপর কান পেতে গ্যাসের মৃদু আওয়াজ শোনে —প্রতিটা ফাটল দিয়ে যেন বাতাসের বুদবুদ আওয়াজ তোলে। ওদের সব-সময়েই ভয়, কখন হুড়মুড় করে ধসে পড়বে পাথর মাথায়। ঠেকনো তো সব-

সময়েই তাড়াতাড়ি লাগানো হয় বলে নড়বড়ে হয়ে থাকে। তাছাড়া মাটিই ভিজে ভিজে নরম হয়ে গেছে, চাঙড়, যে কোন মুহূর্তে খসে পড়তে পারে।

দিনে তিনবার মেয়ু ঠেকনো মজবুত করার কাজে সবাইকে লাগিয়ে দেয়। এখন আড়াইটে বাজে, এবার ওরা উঠবে উপরে। এতিয়েঁ পাশ ফিরে শুয়ে পড়েছে, একটা চাঙড় আলগা করে দিয়ে তার কাজ শেষ হয়েছে। এমন সময় দূরাগত বজ্রগর্জনে সারা খনি কেঁপে উঠল।

গাঁইতি ফেলে দিয়ে সে ডাকলে, কি হ'ল আবার।

তার মনে হ'ল তার পিছনে সমস্ত গ্যালারিটাই ধসে পড়েছে।

মেয়ু এরই মধ্যে গড়াতে গড়াতে এগিয়ে গেছে কাটিং-এর কাছে—সে চেঁচিয়ে উঠল—

ধস নেবেছে, জলদি, জলদি !

সবাই হুমড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ল তাড়াতাড়ি—বাঁচতে হবে এই প্রেরণায় তারা উদ্বুদ্ধ। বাতি তাদের হাতে, শিখা নাচছে এই মৃত্যুময় স্তব্ধতায়। ওরা এক সারে পিঠ কুঁজিয়ে ছুটে চলেছে গলিপথ ধরে—মনে হয় যেন চারপায়ে লাফিয়ে ছুটছে। লাফিয়ে ছুটতে-ছুটতে ওরা পরস্পরকে শুধাচ্ছে প্রশ্ন, আবার সংক্ষিপ্ত উত্তর দিচ্ছে। কোথায় হ'ল ব্যাপারটা ? বোধহয় কাটিং-এ। না, নীচ থেকে শব্দটা এল ; না কয়লা-ঝাড়াই শেড থেকে। চোঙের কাছে এসে ওরা তার ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কার ছড়ে গেল-না-গেল সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

কাল চাবুক খেয়ে জাঁলিনের পিঠের চামড়ায় এখনো লাল দাগ হয়ে আছে। সে আজ আর পিট থেকে পালায় নি। গাড়িটার সঙ্গে সঙ্গে খালি পায়ে সে ছুটছিল—আর হাওয়া-আসার ঝাঁঝরির দরজাগুলো দিচ্ছিল বন্ধ করে-করে। যখনি সর্দারের এসে পড়বার ভয় না থাকে, সে শেষ গাড়িটায় চড়ে বসে। এতে নিষেধ আছে—কি জানি কখন ঘুমিয়ে পড়ে এক ফ্যাসাদ বাধাবে। তার সবচেয়ে মজা লাগে, যখন গাড়িটা সরে গিয়ে অন্য গাড়িটাকে যেতে দেয়। সে তখন সামনে বেবের্ত যেখানে রাশ ধরে থাকে, সেখানে গিয়ে জোটে। বাতিটা না নিয়ে পা টিপে টিপে সে গিয়ে তার সাথীকে হয় চিমটি কাটে, নয়তো আর কোন বাঁদুরে ফন্দি আঁটে। তার হলদে চুল, বড় বড় কান, সরু মুখখানা—কিন্তু চোখ দুটো খুদে হলেও শয়তানি ভরা। যখন সে এসব করে, তখন তার খুদে চোখ দুটো অন্ধকারে জ্বলতে থাকে। বড় বেশি পাকা জাঁলিন—ও যেন এক মানবীর গর্ভডিম্ব—কিন্তু ওর বুদ্ধি রহস্যময়, দেহে আছে অদ্ভুত চাতুর্য—মনে হয় সেই আদিম পশুত্বের পথেই সে চলেছে।

বুড়ো মোকে বিকেলে বাতাইলকে নিয়ে এল। এবার টবে জোতার পালা তার, একপাশে দাঁড়িয়ে ঘোড়াটা জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছিল ; এমনিসময় জাঁলিন এসে বেবের্তের পাশে দাঁড়াল। শুধালে,

এই বেতো ঘোড়াটা অমন করছে কেন রে ? ভয় লাগে—আমার পাদুখানাই বুঝি ভেঙে দেবে !

বেবের্ত জবাব দিতে পারল না। সে বাতাইলের লাগাম ধরে আছে। একটা গাড়ি আসতে দেখে ঘোড়াটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সে দূর থেকে তার মিতে এমপেতের গায়ের গন্ধ পেয়েছে। যেদিন থেকে এমপেৎ পিটে এসেছে, সেদিন

থেকেই তার প্রতি বাতাইলের গভীর স্নেহ। এ যেন বৃদ্ধ দার্শনিকের স্নেহ-মিশ্রিত করুণাও বলতে পারা যায়। যুবক-বন্ধুকে সে তার নিজের ধৈর্য আর বশ্যতার শিক্ষা দিচ্ছে। এমপেৎ এখনো তার এই ভাগ্যকে মেনে নিতে পারেনি। সে গাড়ি টানে বটে, কিন্তু টানায় তার মন নেই—অন্ধকারে অন্ধ হয়ে মুখ নীচু করে থাকে—সবসময়েই সূর্যের জন্য তার দুঃখ। তাই যখনি বাতাইলের তার সঙ্গে দেখা হয়, সে তার মাথা বাড়িয়ে দেয়, ডাকে, ওকে সোহাগে অভিষিক্ত করে দেয়।

বেবের্ত বলে উঠল, দেখ, দেখ, ওরা দুজনে দুজনের গা চাটছে!

এমপেৎ পাশ দিয়ে চলে গেল। এবার বাতাইলের কথায় এল বেবের্ত।

ভারি পাজী এই বুড়ো ঘোড়াটা...ও যখনি এমনি চুপ করে যায়—একটা-না-একটা বিপদের গন্ধ পায়—কি জানি কোথায় ধস নামবে, নয় তো কোথাও গর্ত আছে। ও অমনি হুঁশিয়ার হয়ে যায়। নিজের হাড়গোড় ভাঙতে রাজি নয়। কি জানি আজ দরজা দিয়ে ঢুকতেই ওর কি হ'ল। দরজা ধাক্কাচ্ছে আর ঠুঁটোটি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে,...তুই কিছু দেখলি নাকি রে?

না তো, জাঁলিন বললে, শুধু জলে থই থই করছে। একেবারে হাঁটু অবধি জল।

আবার গাড়ি চলেছে। কিন্তু দু-দুবারের বারও বাতাইল হাওয়া-আসার ফোকরটার দরজাটা খুলে ফেলে আর এগুতে চাইলে না। সে খালি কাঁপছে আর চিঁ-হি-হি করছে। শেষে সে মনস্থির করে বিজ্‌লীর মতো ছুটে চলে গেল।

দরজা বন্ধ করলে জাঁলিন, সে পিছনেই আছে, সে নুয়ে পড়ে কাদাজলের দিকে তাকিয়ে আছে। এবার বাতিটা তুলে ধরলে। জল ঝরছে এখানে অবিরাম, কাঠ সরে গেছে। এবার একজন গাঁইতি-চালিয়ে তার কাটিং থেকে এসে হাজির হ'ল। নাম তার বার্লোক, সবাই চিকোত বলে ডাকে। সে এসে থেমে পড়ল, ঝুঁকে পড়ে কাঠের অবস্থাটা দেখে নিলে। জাঁলিন আবার তার গাড়ি ধরতে ছুটবে, হঠাৎ এক প্রচণ্ড শব্দ—মজুর আর ছেলেটা ধস চাপা পড়ল। গভীর নীরবতা। ধস নামতেই হাওয়ায় এক রাশ ঘন ধুলো বয়ে গেল খনির রন্ধ্র পথে পথে। অন্ধ, দম বন্ধ হয়ে খনির মজুররা ছুটে এল খনির নানা দিক থেকে—দূর দূর স্তর থেকে। হাতে তাদের বাতি দুলছে—ক্ষীণ আলোয় কালো কালো মানুষগুলোর নীচে ছোটাছুটি দেখা যাচ্ছে। আর একদল নীচের একটা কাটিং থেকে এসেছে। ওরা ধসের ওপারে এসে দাঁড়িয়েছে। গ্যালারির পথ রুদ্ধ। এবার দেখা গেল অনেকটা ছাদ ভেঙে পড়েছে। ক্ষতি খুব হয় নি। কিন্তু ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে মৃত্যুর ঘড়ঘড়ানি শুনে ওরা চমকে উঠল—ব্যথায় ভরে গেল ওদের বুক।

বেবের্ত তার গাড়ি ফেলে ছুটে এসেছে, বার বার বলছে,

জাঁলিন চাপা পড়েছে গো, জাঁলিন চাপা পড়েছে!

মেয়ুও এরই মধ্যে জাচারি আর এতিয়েনকে নিয়ে বেরিয়ে এল। শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল হতাশায়, মুখ দিয়ে শুধু বেরুল,

হেই ভগমান, ভগমান!

ক্যাথেরিন, লিদি আর মোকে-ছুঁড়িও ছুটে এসেছে। অন্ধকারে এই ধ্বংস

লীলা যেন আরো ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। ভয়ে ফোঁপাচ্ছে, চীৎকার করে উঠছে। পুরুষরা ওদের থামাতে চেষ্টা করলে, কিন্তু ওরা তো ক্ষেপে গেছে। হতভাগ্য দুই শিকার ধসের নীচ থেকে কঁকিয়ে উঠছে মৃত্যু-যন্ত্রণায় আর ওরা জোরে, আরো জোরে আর্তনাদ করে উঠছে।

দু নম্বর সর্দার রিসোম তাড়াতাড়িই ছুটে এল, কিন্তু সে ভারি ভয় পেয়ে গেছে। এখন তো পিট-ইঞ্জিনিয়ার নিগ্রেল নেই, হেড সর্দার দাঁসারও নেই। ধসের উপরে কান পেতে সে রইল, শেষে বললে, এ গোঙানি বাচ্চার হতে পারে না। একটা জোয়ান মরদও চাপা পড়েছে। মেয়ু এরই মধ্যে জাঁলিনকে বহু-বার ডেকেছে, কিন্তু সাড়া পায় নি। ছেলেটা হয়তো পিষে গেছে।

গোঙানি একটানা চলেছে। ওরা মুমূর্ষুকে ডাকলে, তার নাম জিজ্ঞেস করলে—শুধু গোঙানিতেই এল জবাব।

রিসোম এরই মধ্যে উদ্ধারের ব্যবস্থা করেছে। সে বললে, জলদি কর, জলদি কর, পরে যত খুশি বাত্‌চিত করা যাবে'খন।

ধস নেমেছে, মজুররা চারদিক থেকে শাবল আর গাঁইতি নিয়ে সেই ধসটাকে আক্রমণ করে বসল। মেয়ু আর এতিয়েঁর পাশে নিঃশব্দে কাজ করে চলেছে সাভাল। জাচারি মাটি তোলার ব্যাপারে আছে। উপরে ওঠার সময় এসে চলে গেল; কেউ কিছু খায়ও নি। তোমার সাথী যখন বিপন্ন, তখন কি তুমি তাকে ফেলে খাবার খেতে যেতে পার? কিন্তু এও ওদের মনে হয়েছে, ধাওড়ায় কেউ-না-কেউ না ফিরলে সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়বে। তাই মেয়েদের বাড়ি পাঠানো ঠিক হ'ল। কিন্তু ক্যাথেরিন, মোকে, এমন কি লিদিও নড়বে না। ওরা কি হয়েছে জানবার জন্য অধীর হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। এই উদ্ধারের ব্যাপারে ওরাও চাইছে সাহায্য করতে।

লেভাক শেষে বাইরে ধাওড়ায় ব্যাপারটা জানাবার ভার নিলে। সে গিয়ে বলবে উপরে ধস নেমেছিল, একটা সামান্য দুর্ঘটনা ঘটেছে—এরই মধ্যে জায়গাটা মেরামত করা হয়ে গেছে। চারটে বাজে। এক ঘণ্টাও হয় নি এর মধ্যে তারা পুরো রোজের মেহন্নতি করেছে; ছাদ থেকে আরো পাথর গড়িয়ে না পড়লে অর্ধেক মাটি এরই মধ্যে ওরা সরিয়ে ফেলতে পারত। মেয়ুর জিরান নেই, সে শুধু কাজই করে চলেছে। একজন এক মুহূর্তের জন্য তাকে একটু বিশ্রাম নিতে বললে, কিন্তু সে নারাজ। জোরে মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে তাকে বিদায় দিলে।

রিসোম এবার বললে, আস্তে-আস্তে। আমরা কাছে এসে গেছি। ওদের যেন সাবাড় করে না দিই!

সত্যিই গোঙানি এখন স্ফুট হতে স্ফুটতর হয়ে উঠছে। অবিরাম গোঙানিই মজুরদের দিয়েছে মৃত্যু সংকেত। এখন তো মনে হয়—ওদের গাঁইতি আর শাবলের ঠিক নীচে থেকেই ভেসে আসছে মুমূর্ষুর আর্তনাদ। হঠাৎ থেমে গেল।

ওরা নীরবে এ-ওর দিকে তাকালে। শিউরে উঠল। হিমশীতল মৃত্যু বুঝি অন্ধকারে ওদের ছুঁয়ে দিয়ে গেল। ওরা অনুভব করছে। আবার খোঁড়া শুরু হ'ল। ঘর্মাক্ত শরীর, মাংসপেশীতে লেগেছে টংকার—ছিঁড়েই বুঝি যাবে। এবার একখানা পা দেখা গেল। হাত দিয়ে এবার মাটি সরাচ্ছে ওরা।

একে একে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে মুক্ত করছে। না, মাথায় চোট লাগেনি। বাতি-গুলি তুলে ধরল ওরা। চিকোতের নাম এখন মুখে মুখে। এখনো গা বেশ গরম, শিরদাঁড়া ধস পড়ে ভেঙে গেছে।

ওর উপরে একটা কিছু চাপা দিয়ে গাড়িতে তুলে দাও—সর্দার হুকুম দিলে। এবার বাচ্চাটার খোঁজ কর! কর—জলদি কর!

মেয়ু শেষ আঘাত হানল—একটা গর্ত দেখা দিয়েছে। ওপাশে যারা খুঁড়ছে তাদের কাছ-বরাবর চলে গেছে গর্তটা। ওরা চেঁচিয়ে বলে উঠল, এইবার জাঁলিনকে পাওয়া গেছে। অচেতন হয়ে সে পড়ে আছে। দুখানা পা-ই তার ভাঙা, তবে এখনো নিঃশ্বাস পড়ছে। বাপ গিয়ে ওকে কোলে করে তুলে আনল। দাঁতে দাঁত চেপে শুধু সে বললে—ভগমান! দুঃখ মূর্ত হয়ে উঠল তার এই আহ্বানে। ক্যাথেরিন আর অন্যান্য মেয়েরা আবার কঁকিয়ে কেঁদে উঠল।

সার বেঁধে দাঁড়াল কুলি আর কুলি-কামিনের দল—যেন এক বিরাট মিছিল। বেবের্তে বাতাইলকে নিয়ে এল। গাড়িতে সে জোতা। প্রথমে চিকোতের লাশ এতিয়েঁ শুইয়ে দিলে গাড়িতে। মেয়ু হতচেতন জাঁলিনকে কোলে করে নিয়ে বসে আছে। দরজার পর্দার একটুকরো পশমী কাপড়ে তার শরীর ঢাকা। ওরা আস্তে আস্তে রওনা হ'ল। প্রতি গাড়িতে লাল তারার মতো একটি করে বাতি। তার পিছনে মজুরদের সার—প্রায় পঞ্চাশটি ছায়া এক সারে চলেছে। ক্লান্তিতে ওরা অভিভূত, তাই পা টেনে টেনে চলছে, পিছলে পড়ছে কাদায়। ওরা যেন শোকার্ত গরু-ভেড়ার দল—মড়ক লেগেছে ওদের পালে। পিটের মুখে এসে পেঁছতে প্রায় আধ ঘণ্টা লেগে গেল। শোকযাত্রা চলছিল ঘুরে ঘুরে আঁকাবাঁকা গ্যালারির পথে পথে—মনে হচ্ছিল এ শোকযাত্রা বুঝি এমনি বিরামহীনভাবে চলবে চিরদিনের জন্যে—পথ বুঝি আর ফুরাবে না।

রিসোম আগে আগে যাচ্ছিল। পিটের মুখে এসে সে একটা শূন্য খাঁচা তৈরী রাখতে হুকুম দিলে। পিয়েরোঁ এরই মধ্যে দুটো গাড়ি খালি করে দিলে। একটায় মেয়ু তার আহত বাচ্চাকে কোলে নিয়ে উঠে বসল, আর একটায় চিকোতের লাশ নিয়ে বসল এতিয়েঁ। আর একটা খাঁচায় গাড়িতে গাড়িতে উঠে বসল আর সবাই। এবার উঠে এল খাঁচা। দু-মিনিট লাগল। কাঠের তক্তার ফাঁক দিয়ে জল ঝরে পড়ছে—বরফ-ঠাণ্ডা জল—ওরা দিনের আলোর মুখ চেয়ে বসে রইল অধীর হয়ে।

বরাত ভাল। যে ছেলেটি ডাক্তার ভান্দারহাগেনকে ডাকতে গিয়েছিল, সে তাঁকে একেবারে নিয়েই এসেছে। সর্দারের ঘরে জাঁলিন আর মৃতকে নিয়ে যাওয়া হ'ল। এখানে সারা বছর ধরেই আগুনের কুণ্ড জ্বলে। পা ধোওয়ার জন্যে এক সার গরমজল-ভরা কলসীও এনে রাখা হ'ল। দুটি গদি পাতা হ'ল মেঝেয়। সেই গদির উপর শোয়ানো হ'ল মৃত মানুষ আর শিশুকে। মেয়ু আর এতিয়েঁই শুধু ভিতরে গেল। আর বাইরে দাঁড়িয়ে রইল মজুর আর মজুরণীরা। ওরা চাপা স্বরে কথা কইতে লাগল।

ডাক্তার চিকোতের দিকে একবার তাকিয়েই বললেন,

শেষ হয়ে গেছে। ওকে ধোয়া-পাখলা শুরু করে দিতে পার।

দুজন ওভারসিয়ার ওর পোষাক-আষাক খুলে স্পঞ্জ দিয়ে গা মুছিয়ে দিতে

লাগল। লাশটা কয়লায় কালো হয়ে আছে—এখনো মেহনতির ঘামে নোংরা হয়ে আছে গা-গতর।

ওর মাথায় চোট লাগেনি, ডাক্তার জাঁলিনের গদির উপর হাঁটু গেড়ে বসে বললেন, বুক ঠিক আছে...পায়েই চোট লেগেছে।

নিজেই নিপুণা সেবিকার মতো জাঁলিনের পোষাক খুলতে লাগলেন। টুপির ফাঁসটা খুলে দিলেন; ট্রাউসার আর সার্ট খুলে ফেললেন। জাঁলিনের অপুষ্ট শরীর বেরিয়ে পড়ল। পোকার মতোই সে রোগা, কয়লার ধুলো আর গেরুয়া মাটি মাখামাখি হয়ে আছে সারা গায়ে, আবার মর্মর পাথরের মতো এখানে-ওখানে রক্তের দাগ। শরীরখানাই দেখা যায় না; ওরও গা ধোয়ানো দরকার। গা মুছে দিতে ওকে আরো রোগা লাগছে। ওর চামড়া এমন বিবর্ণ আর স্বচ্ছ যে, নীচের হাড় ক'খানাও দেখা যায়। উপবাসী শ্রমিক জাতির বংশধরের এই অবনতি দেখে করুণা হয়। ও যেন মানুষই নয়—ওর যেন ক্ষীণ অস্তিত্ব—তবু দুঃখের দাবদাহ ওকে সইতে হচ্ছে—আবার এখন তো ধসে দলে-পিষে গেছে। ধোয়া-পাখলা করতেই ওর হাঁটুর ক্ষতটা চোখে পড়ল—সাদা চামড়ায় দুটো রক্তাক্ত ক্ষত।

জাঁলিনের চেতনা ফিরে এসেছে। সে গোঙিয়ে উঠল। মেয়ু ওর সুমুখে দাঁড়িয়ে আছে, তার চোখ দিয়ে গড়াচ্ছে জল।

ডাক্তার চোখ তুলে তাকিয়ে বললেন, তুমিই ওর বাপ? কেঁদো না, ও মরে নি। আমার কাজে বরং একটু হাত লাগাও দিকি!

দুখানা হাড় ভেঙেছে মাত্র। কিন্তু ডান পাখানা নিয়েই ভাবনা। হয়তো কেটে ফেলতেও হতে পারে।

এবার ইঞ্জিনিয়ার নিগ্রেল আর দাঁসার খবর পেয়ে রিসোমের সঙ্গে এসে হাজির।

ইঞ্জিনিয়ার তো ছোট সর্দারের কথা শুনে ফেটে পড়লেন। সেই তক্তা নিয়েই আবার এই কাণ্ডটা হ'ল। তিনি কি অমন একশোবার বলেন নি যে, সবাই ওখানে একদিন চাপা পড়ে মরে থাকবে? তক্তাগুলো একটু মজবুত করতে বলা হ'লে অমনি ধর্মঘটের হুমকি দেখায় জানোয়ারগুলো। এ বড় খারাপই হ'ল; কোম্পানিকে এখন খেসারত দিতে হবে। মঁসিয়ে হানাবু তো খুশীতে একেবারে ফেটে পড়বেন!

দাঁসার চাদরে-ঢাকা লাশটার সুমুখে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। সে বললে, এটা আবার কে?

ওভারসিয়ার জবাব দিলে, চিকোত—আমাদের একজন পয়লা নম্বরের মজুর। ...তিনটে ওর বাচ্চাকাচ্চা আছে...আহা, বেচারী!

ডাঃ ভান্দারহাগেন জাঁলিনকে তখুনি বাড়ি নিয়ে যেতে হুকুম দিলেন। ছটা বাজে, এরই মধ্যে আঁধার হয়ে এসেছে। লাশটাও এখনি নিয়ে যাওয়া ভাল। ইঞ্জিনিয়ার গাড়িতে ঘোড়া জুততে হুকুম দিলেন। একখানা স্ট্রেচার আনারও ব্যবস্থা হ'ল। আহত জাঁলিনকে স্ট্রেচারে শুইয়ে দেওয়া হ'ল। আর লাশটা গদিতে করেই গাড়িতে তুলে দিলে।

মেয়েরা এখনো দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। যে-সব মজুর শেষ পর্যন্ত রয়ে গেছে, তাদের সঙ্গে আলাপ করছে। এবার ছোট সর্দারের কামরার দরজা খুলে

গেল। সবাই চুপচাপ। আবার নতুন মিছিল। প্রথমে গাড়ি, তারপরে স্ট্রেচার, তার পরে দর্শকের জটলা। আস্তে আস্তে কয়লা-কুঠি থেকে বেরিয়ে এল মিছিল, ধাওড়ার খাড়া পথ ধরে চলেছে। নভেম্বরের প্রথম দিকে প্রচণ্ড শীতে বিস্তৃত উপত্যকা এখন রিক্ত, হতশ্রী। রাত আস্তে আস্তে এসে ছেয়ে ফেলল উপত্যকা। মনে হ'ল ছাইরঙা আকাশ থেকে কে যেন ফেলে দিলে শবাচ্ছাদন-বস্ত্র মাটিতে—প্রান্তর ঢেকে গেল, ছেয়ে গেল।

এতিয়েঁই মেয়ুকে কানে কানে পরামর্শ দিলে, ক্যাথেরিন আগে গিয়ে মেয়ু-বৌকে সব কথা বলুক—ওতে আঘাতটা কম লাগবে। শোকার্ত বাপ স্ট্রেচারের পিছনে চলতে চলতে ঘাড় নেড়ে সায় দিলে। ক্যাথি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছুটে চলে গেল। ওরা প্রায় পেঁাছে গেছে ধাওড়ায়। কিন্তু এরই মধ্যে গাড়িটা সবাই দেখে ফেলেছে। গাড়ি তো নয়, মৃত্যুর কালো বাক্স—ওটাকে সবাই চেনে, সবাই ভয় করে। মেয়েরা অমনি ছুটে এসে দাঁড়াল বাইরে। তিন-চারজন খ্যাপার মতো ছুটছে, খালি মাথায়। দেখতে-দেখতে জন তিরিশেকের ভিড় জমে গেল, তারপরে জন পঞ্চাশেক। সবাই ভীত, তাহলে কেউ খুন হয়েছে? কে? লেভাকের মুখে খবরটা শুনে ওরা নিশ্চিন্ত হয়েছিল, কিন্তু এখন তো ওদের আশংকা অতিরঞ্জিত হয়ে উঠল এবং দুঃস্বপ্নের মতো এসে হানা দিলে। একটা লোক খুন হয়নি, অমন—দশ-বিশটা হয়েছে। ঐ কালো গাড়িটা একে একে তাদের বয়ে আনবে, ঘরে ঘরে পেঁাছে দিয়ে যাবে।

ক্যাথেরিন এসে দেখলে, মা ভাবনায় অস্থির। কিছু বলবার আগেই মেয়ু-বৌ বলে উঠল,

কি—বাপ বুঝি খুন হ'ল?

মেয়ে কত প্রতিবাদ করলে, জাঁলিনের কথা বললে, কিন্তু মেয়ু-বৌ না শুনেই ছুটে বেরিয়ে এল। গির্জার উল্টো দিক থেকে গাড়িখানাকে বেরুতে দেখে মুখ শুকিয়ে গেল, ফিট হয়ে পড়ে আর কি মেয়ু-বৌ। মেয়েরা দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে গলা বাড়িয়ে দেখছে। নির্বাক ভীতি ওদের—আবার কেউ কেউ ছুটছে মিছিলের পিছনে। তারা ভয়ে সারা—কার দোরগোড়ায় গিয়ে থামবে ঐ কালো গাড়ি?

গাড়ি চলে গেল। মেয়ু-বৌ দেখলে, স্ট্রেচারের পিছনে পিছনে আসছে মেয়ু। ওদের দরজার সামনে স্ট্রেচার নামানো হ'ল। মেয়ু-বৌ দেখলে, জাঁলিন বেঁচে আছে, তবে পা ভেঙে গেছে। প্রতিক্রিয়া হ'ল ভীষণ, রাগে গলা বুজে এল, কোনরকমে বললে—ওঃ এই হয়েছে? মোদের কচি-কাঁচাগুলোকে ওরা খোঁড়া করে দিলে! দুটো ঠ্যাংই গেছে। এখন ওকে নিয়ে কি করব বলতো? ওরা ভাবে কি?

ব্যান্ডেজ বাঁধতে এসেছেন ডাক্তার, তিনি থামিয়ে দিলেন, চুপ, চুপ! ও যদি ঐখানেই থেকে যেত, তাহলে বুঝি ভাল হোত?

মেয়ু-বৌ আরো যেন ক্ষেপে উঠছে। আলঝির, লেনোর আঁরি জুড়ে দিয়েছে মরা কান্না। রোগীকে উপরে নিয়ে যেতে মেয়ু-বৌ সাহায্য করলে, ডাক্তারের ফাই-ফরমায়েস খাটছে। আবার নিজের বরাতকে গাল দিচ্ছে। বল তো, এখন সে কোথা থেকে খোঁড়াকে খাওয়াবার টাকা যোগাড় করবে? বুড়ো তো আছেই —তাতেই যথেষ্ট হ'ল না—এবার বাচ্চাটারও পা দুখানা জন্মের মতো গেল!

সে বক্‌বক্‌ করেই চলেছে। আর কাছেই এক বাড়ি থেকে উঠছে কান্না। চিকোতের বৌ আর ছেলেমেয়েরা কাঁদছে তার লাশের উপর আছড়ে পড়ে। এবার আঁধার ঘোর হয়ে এল। গাঁয়ের ওপর নেমে এসেছে থম্‌থমে নীরবতা। শুধু কান্নার রোল সেই নীরবতাকে খান খান করে দিচ্ছে। ক্লান্ত মজুরের দল এবার খেতে বসেছে রাতের খাওয়া।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে চলল। পা আর কেটে দিতে হয়নি। জাঁলিনের দুখানা পা-ই রয়ে গেল, তবে এখন থেকে সে জন্মের মতো খোঁড়া। কোম্পানি থেকে তদন্ত হয়ে ঠিক হয়েছে ও পঞ্চাশ ফ্রাঁ ভাতা পাবে। সে সুস্থ হয়ে উঠলে খনির উপরে কোন কাজ তাকে দেওয়া হবে—এমন প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে। কিন্তু এতে তাদের অভাব তো মিটবে না, বরং আরো বেড়ে যাবে। তাছাড়া বাপের উপর দিয়ে যে ধকল গেছে, তাতে সে প্রচণ্ড জ্বরে বিছানায় এলিয়ে পড়ল। মেয়ুদের অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে উঠল।

কয়েক সপ্তাহের পরের কথা। মেয়ু গত বৃহস্পতিবার থেকে কাজে লেগেছে। আজ রোববার। সন্ধ্যায় এতিয়েঁ ওদের কাছে পয়লা ডিসেম্বরের কথা বললে। পয়লা ডিসেম্বর তো আসছে, দেখা যাক কোম্পানি কি করে। ওরা দশটা অবধি ক্যাথেরিনের জন্য অপেক্ষা করলে। সে হয়তো সাভালের সঙ্গে মশগুল হয়ে আছে। কিন্তু ক্যাথেরিন বাড়ি ফিরল না। মেয়ু-বৌ আর কোন কথা না বলে সশব্দে দরজায় খিল এঁটে দিলে। এতিয়েঁ বহুক্ষণ জেগে রইল। আলঝির বিছানায় সামান্য জায়গা জুড়ে আছে—বাকিটা একেবারে খালি। সে চেয়ে চেয়ে দেখলে—তার অস্বস্তি বেড়ে গেল।

পরের দিনও ক্যাথেরিনের কোন পাত্তা নেই। শেষে পিট থেকে ফিরে এসে সন্ধ্যেয় মেয়ুরা খবর পেল, ক্যাথেরিন সাভালের ওখানে আছে। সে কাল এমন কেলেঙ্কারি করেছে যে, ক্যাথেরিন তার সঙ্গে থাকবে বলে রাজি হয়ে গেছে। গালিগালাজ এড়াবার জন্যে সে ভোরোর কাজ ছেড়ে দিয়েছে, গিয়ে জাঁ-বর্তে নাম লিখিয়েছে। মঁসিয়ে দেনেউলিঁ ঐ খনির মালিক। ক্যাথেরিনও কয়লা চালুনি কামিন হয়ে গেছে তার সঙ্গে। এখানে মঁতসুতে পিকেতের সরাইখানায়ই ওদের ডেরাটা আছে। পরে অন্য কোথাও নতুন ঘরকন্না পাতবে।

মেয়ু প্রথমে চটেই উঠল। সে লোকটার সঙ্গে কাজিয়া করবে, তার পরে মেয়েটার পাছায় লাথ্‌ মারতে মারতে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। কিন্তু রাগ খানিকক্ষণ পরেই হতাশায় মিলিয়ে গেল। ফায়দা কি? এমনিই তো চিরটা কাল হয়; ছুঁড়িরা যখন জোড় গাঁথতে চায়, তখন কেউ তাদের বাধা দিতে পারে না। তার চেয়ে ওরা বিয়ে-থাওয়া করা অবধি চুপ করে থাকাই ঠিক। কিন্তু মেয়ু-বৌ অমন শান্তভাবে ব্যাপারটা নিতে পারলে না। কেন—ছুঁড়িটা অমন করলে গা! ও যখন সাভালের সঙ্গে জোড় গাঁথলে, আমি কি ওকে মেরেছিলাম? সে এতিয়েঁকে শুধাল। সে চুপচাপ শুনে যাচ্ছে। তুমি তো বাছা, দুনিয়ার হালচাল জান—ওর মোরা লাগাম ছেড়ে দিনু—তাই না? না দিয়েই বা কি করব, চেরটাকাল এই তো হয়। এই তো মোর কথা ধর না—ওর বাপ যখন বে' করলে, তখন আমার পেট হয়েছে। তাই বলে বাপ-মাকে ছেড়েছুড়ে পালিয়ে যাইনি। নিজের মজুরি নিয়ে আর-একটা মরদের পায়ে উজাড় করে দিইনি।

ভারি বিচ্ছিরি ব্যাভার গো! এতে কি আর কেউ ছেলেমেয়ে বিয়োতে চাইবে গা!

এতিয়েং জবাব দিল না, শুধু মাথা নাড়ল। মেয়ু-বৌ আবার নালিশ শুরু করলে—ছুঁড়িটা তো রোজ রাতে ঢলাতে যেত—কেউ কি ওকে বাধা দিয়েছে? ওর হঠাৎ কি হ'ল? ভাবতো একবার, এমন আকালের কালে একটু তর সইল না গা?—মোদের তো শাচ্চয় হোত—তারপরে মোরাই বিয়ে-থাওয়া দিতুন। কিন্তুক কি কান্ডটি করলে বল তো? মেয়ে তো কামের জন্যিই বিয়োনো—তাই না? কিন্তু দেখছো তো, মোদের ভালমানষি খুব কিনা—ওকে যেতে না দিলেই ঠিক হোত—কি রকম মরদের সঙ্গে মজা লোটে দেখে নিতুম! আর বোলো না—অমনিই ছুঁড়িরা—ওদের নাই দাও, অমনি মাথায় চড়বে।

আলঝির সায় দিলে। লেনোর আর আঁরি এই খন্ডপ্রলয়ে ভয় পেয়ে গেছে, তাই অস্ফুট স্বরে চেঁচিয়ে উঠল। মা এবার দুঃখের ফিরিস্তি দিতে বসে গেল—পয়লাই জাচারি গেল—ওর বিয়েতে মত দিতে হ'ল—তারপর বুড়ো দাদুর পা সোঁতে অবশ হ'ল—এখন তো চেয়ার ছেড়ে উঠতে পারে না। তারপরে জাঁলিন—আরো দশদিন কাজে বেরুতে পারবে না—এখনো ওর হাড় জোড়া লাগেনি—আর এবার তো শেষ ঘা হানল ঐ ছেনাল ছুঁড়িটা। ওটা তো কুত্তিরও অধম। একটা মরদের সঙ্গে উধাও হয়ে গেল! সংসার তো তছনছ হতে বসেছে। শুধু এখন বাপ মেহন্নত করবে। কি করে সাত-সাতটা পেটকে সে তিন ফ্রাঁয় গেলাবে—এস্তেলের কথা না হয় না-ই ধরল। তার চেয়ে ওরা সবাই মিলে গিয়ে খালের জলে ঝাঁপ দিলেই হয়।

মেয়ু বিড়বিড় করে বললে, ভাবনা করে আর কি হবে। এখনো আরো কত বাকি!

এতিয়েং মেঝের দিকে তাকিয়ে ছিল, এবার সে মুখ তুলে তাকালে। সে যেন ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর। চোখে তারই ঘোর লেগেছে। আস্তে আস্তে সে বলে উঠল,

সময় হয়েছে! এবার সময় হয়েছে!
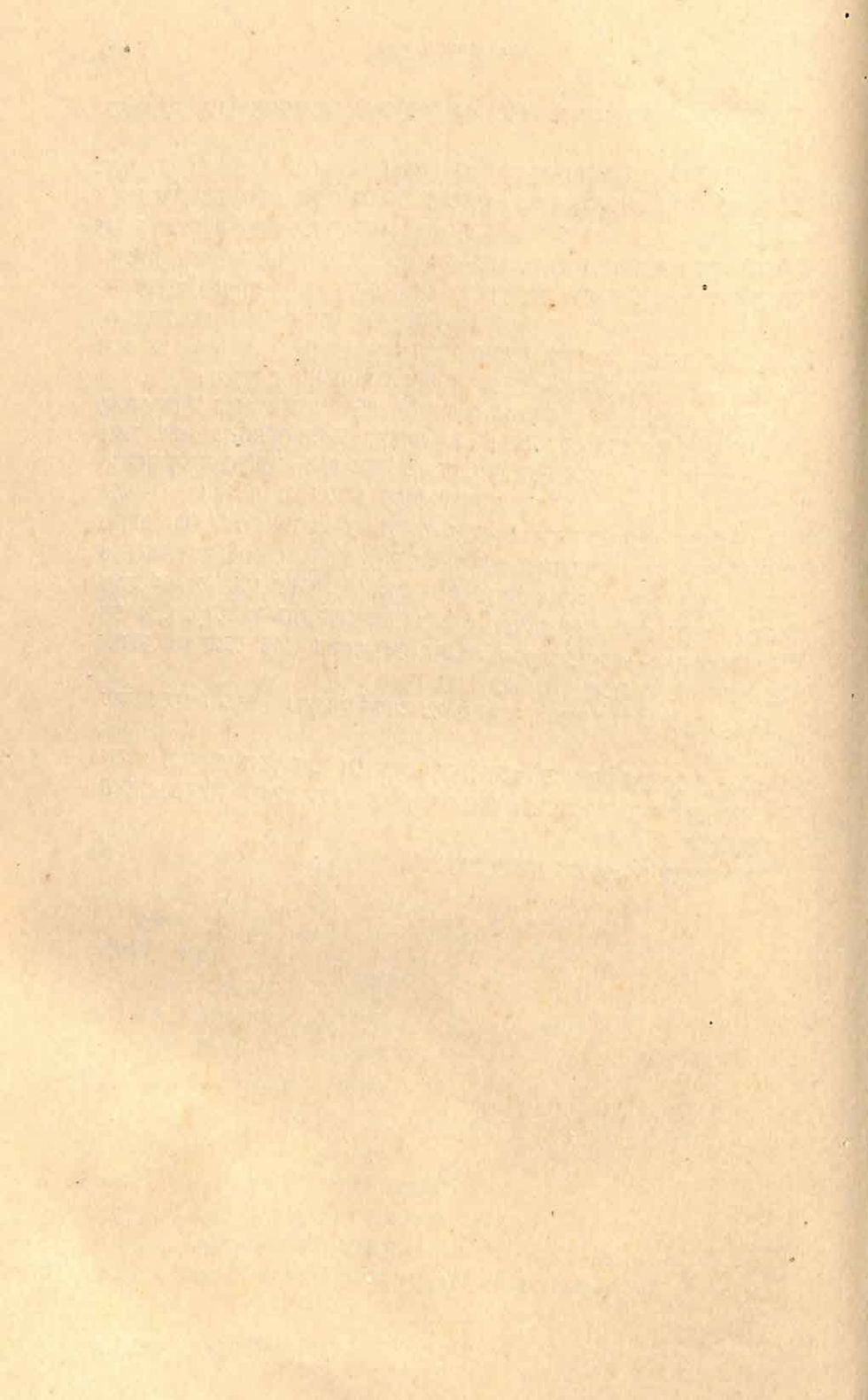
চতুর্থ খণ্ড

এক

সোমবারে হানাবুরা গ্রিগোয়েরদের মা-বাপ আর মেয়েকে দুপুরে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করলেন। বেড়াতে যাবারও বন্দোবস্ত করা হ'ল। খাওয়া-দাওয়া হলেই পল নিগ্রেল মেয়েদের নিয়ে সাঁ-তমাস খনি ঘুরিয়ে নিয়ে আসবে। দর্শনীয় স্থান হিসেবে ওটিকে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু এটা অতি মোলায়েম ছল-ছুতো ছাড়া কিছুই নয়। হানাবু-গিন্নী, সিসিলি আর পলের বিয়েটা তাড়াতাড়ি এগিয়ে নিয়ে আসার জন্যে এই ফন্দিটা ঠাউরিয়ে রেখে-ছিলেন।

আর সেই সোমবারেই, ভোর চারটেয় ধর্মঘট শুরু হয়ে গেল। কোম্পানি পয়লা ডিসেম্বর মজুরির নয়া ব্যবস্থা চালু করে দিলে, মজুরদের মধ্যে কোন চাঞ্চল্য দেখা গেল না। 'দু-এক পক্ষ' পরে মাইনের দিন, কেউ টুঁ শব্দটি করলে না। ম্যানেজার থেকে একেবারে নিম্নতম ওভারসিয়ার অবধি ভাবলে, এই নয়া ব্যবস্থা ওরা মেনে নিয়েছে। কিন্তু ভোরবেলা এই লড়াইয়ের ঘোষণায় সবাই হকচকিয়ে গেল। লড়াইয়ের প্রস্তুতি এতদিন চলছিল গোপনে গোপনে কূট কৌশলে—মজুরদের সংহতিশক্তি থেকে বোঝা যায়, জঙ্গী নেতৃত্বে ওরা সুনিয়ন্ত্রিত।

ভোর পাঁচটায় সর্দার দাঁসার এসে মঁসিয়ে হানাবুকে জাগিয়ে খবর দিলে—লা-ভোরোর খাদে একটা মজুর এখন পর্যন্ত নামেনি। সে এইমাত্র দুশো চল্লিশ নম্বর ধাওড়ার ভিতর দিয়ে এল। সেখানে এখনো সবাই ঘুমে বিভোর। দরজা-জানালা সব একেবারে আঁটো করে আঁটা। ম্যানেজার বিছানা ছেড়ে উঠলেন, এখনো তাঁর চোখ ঘুমে ঢুলুঢুলু। কিন্তু সেই থেকেই শুরু হ'ল খবরের পর খবর—একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লেন। পনোরো মিনিট অন্তর-অন্তর আসছে লোক—খবর দিচ্ছে—শিলাবৃষ্টির মতো কাগজপত্র এসে জমতে লাগল

টেবিলে। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন, লা-ভোরোর খাদেই এই বিদ্রোহ সীমাবন্ধ, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে ঘোরালো হয়ে উঠছে পরিস্থিতি—জোরালো হয়ে উঠছে খবর। মিরো আর ক্রেভেকুরেও হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেছে। মাদেলিনে শুধু গাড়ি-টানা ঘোড়ার সইসরাই হাজির; লা ভিক্তর আর ফিউৎরি-কাঁতেলের মজুররা বেশ পোষ-মানা—শান্তশিষ্ট, নিরীহ—কিন্তু সেখানেও তিন ভাগের এক ভাগ মজুর মাত্র খাদে নেমেছে। শুধু সাঁ-তমাসের সবাই এসেছে—আন্দোলনের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ নেই বলেই মনে হয়। ন'টা অবধি বহু জরুরী চিঠি লেখালেন, চার দিকে তার করলেন। লিল-এর পুলিসের বড় সাহেব, কোম্পানির ডিরেকটরগণ—কেউ বাদ পড়লেন না—কর্তৃপক্ষের কাছে চাইলেন নির্দেশ। তারপর নিগ্রেল-কে পাঠালেন আশে-পাশের খাদগুলিতে সঠিক খবর নিতে।

হঠাৎ মঁসিয়ে হানাবুর দুপুরের নিমন্ত্রণের কথা স্মরণ হ'ল। তিনি পরিচারককে পাঠিয়ে খবর দিতে যাচ্ছিলেন যে, ওটা আজ স্থগিত থাকবে। কিন্তু দ্বিধা এল। থেমে গেলেন। সামরিক কাটছাঁট চোস্ত পরিভাষায় তিনি লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। তাঁর কিনা এল দ্বিধা! তিনি উপরে স্ত্রীর কাছে চলে এলেন। তখন ঝি পোষাক-কামরায় বসে তাঁর কেশ-বিন্যাস সবে সমাধা করেছে।

নিমন্ত্রণের কথা জিজ্ঞেস করায় তিনি নির্বিকারভাবে বললেন, তাহলে ওরা ধর্মঘট শুরু করেছে—তাতে আমাদের কি এল, গেল? তার জন্যে আমরা তো খাওয়া-দাওয়া আর ত্যাগ করতে পারিনে?

তিনি বারবার বললেন নিমন্ত্রণে কত হাঙ্গামা হতে পারে, আর সাঁ-তমাসেও যাওয়া হবে না—কিন্তু বৃথা চেষ্টা! হানাবু-গৃহিণী যেন বাই ধরে বসেছেন—সবকিছুর জবাব তাঁর ঠোঁটের ডগায়। নিমন্ত্রণটা বাদ যাবে কেন—এদিকে যে রান্নাবান্না সব সারা? আর খাদ দেখার কথা—যদি তেমন-কিছু হয় তো বাদ দিলেই চলবে!

ঝি চলে যেতে বললেন, তাছাড়া, ওদের কেন ডেকেছি তা তো জান, তোমার কুলিদের এই বোকামি নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে বরং ওদের বিয়েটার দিকে একটু মন দাও!...যাহোক, আমার এই কথা—আমাকে বাধা দিও না।

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইলেন মঁসিয়ে হানাবু, শিহরণ উঠছে দেহে। সুষ্ঠু জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত মানুষের গাম্ভীর্য আর দৃঢ়তা তাঁর মুখে—কিন্তু এখন সেখানে ভগ্নহৃদয় মানুষের গোপন দুঃখই ফুটে উঠেছে। স্ত্রীর কাঁধ দুটি অনাবৃত—এরই মধ্যে যৌবন পূর্ণতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে কিন্তু এখনো তিনি সুন্দরী—কামনার ধন। সেরেসের ('গ্রীক দেবী ডেমেটার বা সেরেস—কৃষির অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে খ্যাত'—অনু) মতোই সুগোল তার বক্ষ—তবে হেমন্তের ছোঁয়া লেগেছে সেখানে,—বুঝিবা এসেছে শিথিলতা। পাশব কামনা জেগে উঠল—ওকে তিনি জোর করে চেপে ধরবেন—ওঁর ঐ উন্মুক্ত স্তন-যুগের ভিতরে মুখ ডুবিয়ে দেবেন। উষ্ণ কক্ষ—এক কামময়ী বিলাসিনী নারীর ব্যক্তিগত বিলাসের সামগ্রীতে ভরপুর—উত্তেজনাময় কস্তুরী গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু সরে এলেন—আজ দশ বছর ওঁরা আলাদা ঘরে আছেন।

বেরিয়ে যেতে-যেতে বললেন, বেশ তো! ঐ কথাই থাক। অদল-বদলের দরকার নেই!

মঁসিয়ে হানাবু আর্দেনের অধিবাসী। তিনি প্রথম বয়সে কপর্দকহীন অনাথ ছিলেন, প্যারীর পথে নিঃসম্বল হয়ে ঘুরে বেড়াবার দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন। মাইনিং স্কুলে বহু কষ্টে পড়াশুনো শেষ করে তিনি চব্বিশ বছর বয়সে সাঁ-বার্বারা কয়লা-কুঠির ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গ্রান্ড কোম্বেতে যান। তিন বছর পরে তিনি পাস-দ্য-ক্যালের মার্লে খনির বিভাগীয় ইঞ্জিনীয়ার পদে অধিষ্ঠিত হন। এইখানেই তাঁর বিয়ে হয়। ভাগ্যগুণে তিনি আরাস-এর কাপড়ের কলের মালিকের মেয়েকে বিয়ে করে ফেলেন। এই খনির ইঞ্জিনিয়ারদের এমনি বরাত হামেশাই দেখা যায়। পনেরো বছর ধরে ঐ মফস্বল শহরেই তাঁরা কাটান—তাঁদের একঘেয়ে জীবনযাত্রার তাল একটি দিনের জন্যও কোন ঘটনায় কেটে যায়নি—এমন কি নব জাতকের উদয়ও হয়নি। হানাবু-গিন্নী লালিত-পালিত হয়েছিলেন টাকার পুজার ভিতরে। তিনি যে টাকার পূজারী হবেন আশ্চর্য কি! কঠোর পরিশ্রম করে সামান্য মাইনে পান—এমন স্বামীর প্রতি তাঁর ছিল ঘোর অনুকম্পা—এতে তো ইস্কুলের মেয়ের গর্বের স্বপ্ন সার্থক হয় না। এতেই স্ত্রী বিরক্ত হয়ে আস্তে আস্তে দূরে সরে গেলেন। হানাবু ছিলেন ঘোর সাধু, কখনো ভাগ্য নিয়ে সুরতি খেলতে বসেননি; বরং সৈনিকের মতোই অচল-অটল হয়ে অধিষ্ঠিত ছিলেন নিজের পদে। এতে মনের অমিল বাড়তে লাগল—কামনার অদ্ভুত অসঙ্গতিতে তা আরো বেড়ে চলল। এই অসঙ্গতি বড় মারাত্মক—এতে সবচেয়ে উষ্ণরক্তও তুষার-শীতল হয়ে যায়। তিনি স্ত্রীকে বলতে গেলে পূজা করতেন, আর স্ত্রীর ছিল স্বর্ণকেশী কামনাময়ী নারীর উদ্দামতা। শয্যা আলাদা হ'ল, একটুতেই খিটিমিটি বেঁধে যেতে লাগল, একে-অপরকে আঘাতে-আঘাতে অস্থির করে তুললেন। সেই থেকেই হানাবু-ঘরনীর এক প্রেমিক জুটল, কিন্তু তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ রইলেন মঁসিয়ে হানাবু। অবশেষে পাস-দ্য ক্যালে ছেড়ে প্যারীর অফিসে বদলী হলেন। তাঁর আশা ছিল—গৃহিণী এবার কৃতজ্ঞ হবেন। কিন্তু প্যারীতে এসে তাঁদের বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হ'ল। প্রথম যখন খেলার পুতুল পান, সেদিন থেকেই হানাবু-গৃহিণী প্যারীর স্বপ্ন দেখতেন। তাই নিজের গায়ের মফস্বলী যা-কিছু চিহ্ন একেবারে ঝেড়ে ফেলে পুরোদস্তুর নাগরিকা আর বিলাসিনী মহিলা হয়ে উঠলেন—আর সে-যুগের বিলাসের উদ্দাম স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সেখানে দশ বছর কাটল এক বিরাট কামনার তুঙ্গে, একজনের সঙ্গে তাঁর অবৈধ সম্বন্ধ চলল পূর্ণ উদ্যমে, প্রকাশ্যে—সে ত্যাগ করে চলে যেতে ভদ্রমহিলা প্রায় অর্ধমৃত হয়ে পড়লেন। এবারে স্বামী আর তাঁর স্ত্রীর প্রণয়-লীলার অজ্ঞতা অটুট রাখতে পারলেন না। কয়েকটা তুমুল কাণ্ডের পর তিনি নিরুপায় হয়ে মেনে নিলেন। তখন তিনি স্ত্রীর এই শান্ত স্বৈরাচারে উপায়হীন। স্ত্রী-তো যেখানে কামনা-পরিতৃপ্তির সুবিধে পেতেন সেখানেই ছুটতেন। এই অবৈধ সম্বন্ধের পর্ব ইতি হতে তিনি দেখলেন, স্ত্রী ভয়ানক মুষড়ে পড়েছেন। এই সময়েই তিনি মঁতসুর তত্ত্বাবধানের ভার নিলেন। মনে আশা ছিল, কয়লা-কুঠির দেশের নিঃসঙ্গ সহবাসে হয়তো স্ত্রী শুধরেই যাবেন।

মঁতসুতে এসে হানাবুরা সেই প্রথম বিবাহিত জীবনের বিরক্তিকর এক-

ঘেয়েমির ভিতরে ফিরে এলেন। এখানকার অসীম সমতল প্রান্তরের একঘেয়ে বিস্তারে যেন শান্ত হলেন গৃহিণী—হয়তো সান্ত্বনা পেলেন তার পরিপূর্ণ প্রশান্তিতে; তিনি ডুবে গেলেন এই প্রশান্তির গভীরে—মনে হ'ল সমাজ তাঁর কাছে মিছে হয়ে গেছে। জীবন থেকে তিনি যেন বিচ্যুত, মৃত। মোটা হয়ে পড়তে লাগলেন; কিন্তু তাতেও ভ্রূক্ষেপ নেই। কিন্তু এই আপাত প্রতীয়মান উদাসীনতার আড়ালে কামনার শেষ স্ফুরণ আবার বিস্ফুরিত হয়ে পড়ল। আবার বাঁচার তাগিদ অনুভব করতে লাগলেন। অথচ ছ' মাস এসব ভুলে থাকার জন্যেই ম্যানেজারের ছোট বাংলোখানি নিজের রুচি অনুসারে সাজাতে গোছাতে শুরু করেছিলেন। এবার খুঁত ধরতে শুরু করলেন: 'বাংলোটা তো বিশ্রী; পর্দা, আসবাবপত্র আর বিলাসের অন্যান্য শিল্প-সামগ্রী তাঁর কাছে বিরক্তিকরই ঠেকতে লাগল। অথচ তাঁর খ্যাতি তখন লিল্ অবধি পরিব্যাপ্ত। কয়লা-কুঠির দেশ জাগাল তাঁর ক্রোধ—ঐ মাঠ-ঘাট চলেছে তো চলেছেই—শেষ নেই—ঐ চিরন্তন কালোয় কালো পথগুলোয় একটাও গাছপালা নেই—আর আছে সব বীভৎস জীবের দল। ওদের দেখে তো ঘৃণা আর ভয় হয়। তিনি যে নির্বাসন ভোগ করছেন এ নালিশ শুরু হয়ে গেল—স্বামীকে দুষতে লাগলেন—তিনি তাঁকে চল্লিশ হাজার ফ্রাঁ মাইনের মোহে বলি দিয়েছেন। এত কম এ মাইনে—এতে সংসার চালানো দুঃসাধ্য। অন্যে যা করছে, তিনি কি তা করতে পারেন না? বখরাদারি দাবি করলেই হয়, শেয়ার কিনলেই হয়—একটু গুছিয়ে বসলে কি হয় না? ঘ্যানঘ্যানানি শুরু হয়ে গেল। ওয়ারিশান সূত্রে বহু টাকা আমদানি-করা স্ত্রীর মতো তিনি নিষ্ঠুর হয়ে উঠলেন। আর স্বামী—তিনি স্ত্রীর এই উন্মত্ততায় রাশ টেনে চললেন। তিনি ব্যবসায়ীর স্থিত প্রাজ্ঞতার কাছে আত্মসমর্পণ করলেন—কিন্তু এ প্রাজ্ঞতা তো ছলনাই করল। তিনি স্ত্রীর প্রতি এক উদ্দাম কামনায় জ্বলে-পুড়ে মরতে লাগলেন। এ কামনা তো প্রৌঢ়ত্বে মানুষের দেখা দেয়। কখনো তিনি তাঁকে প্রেমিকা হিসেবে পাননি; এখন তো সেই প্রেমিক-প্রেমিকার লীলাই তাঁকে হানা দিতে লাগল। এ হানা তো অবিরাম-অবিশ্রাম। অপরের কাছে স্ত্রী যেমন করে নিজেকে বিলিয়ে দেন—তেমনি করে তিনিও তাঁকে একটিবার পাবেন। প্রতিদিন ভোরেই তিনি ভাবতেন, আজ রাতে ওকে জিনে নেব; কিন্তু তারপরেই স্ত্রী যখন নিস্পৃহ দৃষ্টি মেলে তাঁর দিকে তাকাতেন; মনে হোত, স্ত্রীর সমস্ত অন্তরাত্মা যেন তাঁকে গ্রহণ করতে চাইছে না; এমন কি তিনি তাঁর হাতও কখনো ধরতেন না। এ রোগের তো সম্ভাব্য দাওয়াই নেই। তাঁর স্বাভাবিক গাম্ভীর্যের আড়ালে স্নেহার্ত হৃদয় ভেঙেচুরে যেতে লাগল। দাম্পত্য জীবনে সুখ মিলল না। ছ' মাস পরের কথা। বাড়ি সাজানো-গোজানো তখন শেষ—হানাবু-ঘরনীর আর সেদিকে মন নেই। তিনি একঘেয়েমিতে ঝিমিয়ে পড়লেন। নির্বাসনে তিনি তখন মৃতপ্রায়। শুধু মরলেও বাঁচেন এমনি তাঁর দশা।

এই সময়ে পল নিগ্রেল এসে মঁতসুতে উদয় হ'ল। তার মা প্রভেন্সের সামরিক বিভাগের এক ক্যাপটেনের বিধবা। অভিগনোন-এ সামান্য আয়ে থাকতেন, নিজে নিষ্ঠে জল আর রুটি খেয়ে ছেলেকে পলিটেক্‌নিক স্কুলে পাঠিয়েছিলেন। খুব কম নম্বর পেয়েই ছেলে পাস করে। তার মামা মঁসিয়ে হানাবু তাকে লা-ভোরোর ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি দিয়ে নিয়ে এলেন। সেই থেকে

সেও পরিবারের একজন। একটা গোটা কামরা পেয়েছে। হানাবু-পরিবারের সংগেই থাকে—মাকে মাইনের তিন হাজার ফ্রাঁ থেকে অর্ধেকটা মাসে মাসে পাঠায়। মঁসিয়ে হানাবু তাঁর এই দাক্ষিণ্যটা জানতে দেননি—তিনি শুধু বলেছেন, ইঞ্জিনিয়ারদের যে খুদে কুঠিগুলো দেয়—তাতে একা একা একজন যুবকের পক্ষে সংসার পাতাতে গেলে বিষম বিভ্রাটেই পড়তে হয়। হানাবু-গৃহিণীরও ঐ এক কথা। তিনি অমনি স্নেহময়ী মামী-মার ভূমিকা গ্রহণ করে বসলেন। আপনজনের মতো ব্যবহার করতে লাগলেন, তার সুবিধে-অসুবিধের প্রতি লক্ষ্যও রাখলেন। প্রথম ক'মাস তিনি তাঁর মাতৃস্নেহের পরাকাষ্ঠা দেখালেন ঃ কোন ছোটখাটো বিষয়েও তাকে পরামর্শে ভারাক্রান্ত করে তুলতেন। কিন্তু তিনি তো নারী, তাই অন্তরংগতা হতে দেরি লাগল না। ছেলেটি একেবারে কম বয়েসী, তাহলে কি হবে, কান্ডজ্ঞান আছে। বুদ্ধিও রাখে যথেষ্ট। সে তাঁর কাছে প্রেম সম্বন্ধে নিজস্ব দার্শনিক মতবাদ জাহির করে বসল; তাছাড়া নৈরাশ্যের আবেগে শান দেওয়া তার শুকনো মুখ আর খাড়া নাক দেখে তাঁর ভালই লাগল। নৈরাশ্যেও উদ্দামতা আছে যুবকের। তারপর যা হয় তাই। এক সন্ধ্যেয় যুবক দেখলে, তাঁর আলিংগনে সে ধরা পড়েছে। দয়া করেই যেন তিনি নিজেকে সঁপে দিলেন পল নিগ্রেলের কাছে; মুখে বললেন—তাঁর হৃদয় বলে আর কিছু অবশিষ্ট নেই—প্রেমহীন তিনি—শুধু বন্ধুত্বই তাঁর কাম্য। সত্যই ঈর্ষা তাঁর ছিল না, কিন্তু কয়লা-কুঠির কুলি-কামিন নিয়ে ওকে অতিষ্ঠ করে তুলতেন। ওদের তিনি কিম্ভূত জীব বলেই মনে করেন। আবার এই বলে পলকে ভর্ৎসনাও করতেন—তার যৌবনে এমন কোন রসালো কাহিনী নেই—যা সে তাঁকে বলতে পারে। তারপরে পলের বিয়ে দেওয়ার জন্যে তিনি মেতে উঠলেন—নিজেকে তিনি না হয় বলিই দেবেন এক ধনীর দুলালীর জন্যে। এতেই তখন তাঁর আত্মপ্রসাদ। কিন্তু যৌন সম্বন্ধে তাই বলে ইতি পড়েনি। সে তো ক্ষণিক স্ফূর্তি—তার ভিতরে অলস বিলাসিনীর কামনার শেষ স্ফুলিংগটি তিনি জ্বালিয়ে রাখেন মাত্র। নইলে যৌন-সম্ভোগ তো তাঁর শেষ হয়ে গেছে।

দু' বছর এমনি করে কেটে গেল। একদিন রাতে মঁসিয়ে হানাবুর সন্দেহ হ'ল। শুনলেন, কে যেন খালি পায়ে তাঁর ঘরের দরজার সামনে দিয়ে চলে গেল। স্ত্রীর এই সর্বশেষ প্রণয়-লীলা তাঁর কাছে অসহ্য ঠেকল। তাঁর নিজের বাড়িতে বসে এই কান্ড—এ যেন মাতাপুত্রের ব্যাভিচার! কিন্তু ঠিক পরদিনই স্ত্রী জানালেন, ভাগনের জন্যে তিনি সিসিলি গ্রিগোয়েরকে পাত্রী মনোনীত করেছেন। বিয়ের ব্যাপারেও তাঁকে যথেষ্ট উৎসাহী দেখা গেল। মঁসিয়ে হানাবু নিজের এই বীভৎস কল্পনায় নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়লেন। বরং যুবকের কাছে কৃতজ্ঞ রইলেন—তাঁর বাড়িখানির গুমোট ভাবটা সে একটুখানি কাটিয়ে দিয়েছে।

সাজঘর থেকে বেরিয়ে এলেন মঁসিয়ে হানাবু। এসে দেখলেন, পল নিগ্রেল এইমাত্র ফিরে আসছে। তিনি এই ধর্মঘটের ব্যাপারে যথেষ্ট উদগ্রীব হয়ে উঠেছেন।

কি খবর? মামা শুধালেন।

সারা ধাওড়া ঘুরে এলাম। ওরা বেশ শান্তই আছে। কাণ্ডজ্ঞান হারায়নি। ওরা প্রথমে আপনার কাছে একদল প্রতিনিধি পাঠাবে।

এরই মধ্যে হানাবু-গিন্নীর স্বর দোতলায় শোনা গেল।

কে—পল নাকি? এস, এস—খবর বলে যাও! কি ব্যাপার দেখ দিকি—ওরা যে এমন কাণ্ড বাঁধাবে কে জানতো! দিব্যি তো সুখে আছে!

ম্যানেজারের খবর জানার আর আশা নেই। গৃহিণী দূতকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন। তিনি এবার এসে বসলেন টেবিলে—কাগজপত্র এখনো স্তূপাকার হয়ে আছে। গ্রিগোয়েররা এসে পৌঁছলেন এগারোটায়। তাঁরা এসে দেখেন, পরিচারক হিপোলাইট সান্ত্রী সেজে পাহারা দিচ্ছে। পথের দু'প্রান্তে উদ্বিগ্ন-ভাবে তাকিয়ে সে ওঁদের তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতরে ঢুকিয়ে দিলে। বসবার ঘরের পর্দা ফেলা। ওদের তখনি অফিস-কামরায় নিয়ে যাওয়া হ'ল। মঁসিয়ে হানাবু তাঁদের যোগ্য অভ্যর্থনা করতে পারেননি বলে একদফা ক্ষমা চেয়ে নিলেন। তিনি এও বললেন, বসবার ঘরটা পথের দিকে মুখিয়ে আছে বলে তিনি ওঁদের এখানে আসতে বলেছেন। শুধু-শুধু ধর্মঘটীদের উত্তেজনার খোরাক জুগিয়ে তো লাভ নেই। তাই না?

ওঁদের অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে বললেন, সে কি! আপনারা জানেন না?

মঁসিয়ে গ্রিগোয়ের ধর্মঘটের কথা শুনে ধীরভাবে ঘাড় নাড়লেন। ও-একটা ব্যাপারই নয়। মানুষগুলো ভাল। গ্রিগোয়ের-গৃহিণীও সায় দিলেন স্বামীর কথায়। খনির গোলামদের চিরন্তন দাস্যতার প্রতি তাঁর ঘোর বিশ্বাস। সিসিলিও খুব খুশী; আগুন রঙের পোষাকে তাকে আগুনের মতো দেখাচ্ছে। 'ধর্মঘট' কথাটা শুনে সেও হাসলে। দয়া-দাক্ষিণ্য করতে কুলি-ধাওড়ায়-ধাওড়ায় ঘুরবে, চোখের সুমুখে সেই স্বপ্ন ভেসে উঠল।

এবার হানাবু-গৃহিণী কালো রেশমের গাউন পরে এসে ঢুকলেন, পিছনে নিগ্রেল।

দরজা দিয়ে ঢুকতে-ঢুকতে বললেন, দেখুন তো, বিরক্তি লাগে না! ওদের যেন আর দেরি সইল না! জানেন তো, পল আমাদের সাঁ-তমাসে আর নিয়ে যেতে পারবে না।

মঁসিয়ে গ্রিগোয়ের বললেন, তা না হয় এখানেই থাকব। আমরা এতেও অখুশী হব না।

পল এসে সিসিলি আর তার মাকে নমস্কার করলে। নিজেকে এমন চুপ করে থাকতে দেখে নিজেরই রাগ ধরে গেল। মামী চোখ ঠেরে বুঝিয়ে দিলেন—মেয়েটির দিকে এবার তাকে একটু মনোযোগ দিতে হবে। ওরা দু'জন হাসি-গল্পে মশগুল হয়ে গেল। ওদের হাসি শুনে মায়ের বাৎসল্য-ভরা চোখে তাকিয়ে রইলেন।

এর মধ্যে মঁসিয়ে হানাবু কাগজপত্র পড়া শেষ করেছেন—কয়েকখানা চিঠির জবাবও দিয়েছেন। তাঁর চারপাশে চলছে গল্প। স্ত্রী অতিথিদের বলছেন—তিনি অফিস-কামরার কোন সংস্কার করেননি। এখনো দেয়াল-কাগজ তেমনি বিবর্ণ লাল, মস্ত মস্ত মেহগনি কাঠের আসবাব—তেমনি জীর্ণ কার্ডবোর্ডের ফাইলগুলি। পনেরো মিনিট পরে ওঁরা খেতে যাবার উদ্‌যোগ করলেন,

এমন সময় চাকর এসে জানাল—মঁসিয়ে দেনেউলিঁ এসেছেন। তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ঢুকে হানাবু-গৃহিণীকে অভিবাদন জানালেন।

গ্রিগোয়েরদের দেখে বলে উঠলেন, আরে, তোমরাও এখানে আছ দেখছি! এবার ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ শুরু হ'ল।

তাহলে শেষটায় সেই ব্যাপারই হ'ল!...এইমাত্র আমার ইঞ্জিনিয়ারের কাছে শুনলাম। আমার কুলিরা ভোরেই খাদে নেমেছে, কিন্তু ব্যাপারটা ছড়িয়ে পড়তে পারে। আমি নিশ্চিন্ত নই। আপনার এখানকার কি খপর?

ঘোড়সওয়ার হয়ে এসেছেন দেনেউলিঁ, তাঁর জোরালো স্বরে, ভঙ্গীতে উদ্বেগ সুস্পষ্ট, তাঁকে দেখে অশ্বারোহী সেনাদলের অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারী বলে মনে হয়।

মঁসিয়ে হানাবু তাঁকে কি হয়েছে তাই-ই বলতে লাগলেন—এদিকে হিপোলাইট খাবার ঘরের দরজা খুলে দিয়েছে। তাই তিনি থেমে পড়ে বললেন, আমাদের এখানে দুপুরে খেয়ে যান। খাওয়ার পরে মিষ্টি মুখ করতে-করতে আপনাকে সব কথাই বলব।

দেনেউলিঁ বলে উঠলেন, বেশ তাই-ই হবে। তিনি উৎকণ্ঠায় অধীর—তাই আর ভদ্রতা না করেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

কিন্তু হঠাৎ নিজের অভদ্রতা সম্বন্ধে খেয়াল হ'ল। হানাবু-গৃহিণীর দিকে ফিরে তাকিয়ে ক্ষমা চাইলেন। হানাবু-গৃহিণী তো সৌজন্যে যেন গলে পড়ছেন। সপ্তম থালাখানা পড়ল টেবিলে। তিনি এবার অতিথিদের বসিয়ে দিলেন। গ্রিগোয়ের-গৃহিণী আর সিসিলি বসলেন তাঁর স্বামীর পাশে; মঁসিয়ে গ্রিগোয়ের আর দেনেউলিঁ তাঁর নিজের ডান আর বাঁ পাশে; পলকে তিনি বসিয়ে দিলেন সিসিলি আর তার বাবার মাঝখানে। সবাই এবার খাওয়া শুরু করে দিতেই হানাবু-গৃহিণী হেসে বললেন,

আমাকে মাপ করুন। আমি আপনাদের অয়েস্টার পরিবেশন করতে চেয়েছিলাম। অস্তেঁদের অয়েস্টার সোমবারে মার্সিয়েনেয় আমদানি হয় একথা আপনারা জানেন। রাধুনীকে গাড়ি করে আনতে পাঠাচ্ছিলাম—কিন্তু ওর ভারি ভয়—যদি কেউ ঢিল ছুঁড়ে বসে। তাই......

হাসির রোল পড়ে গেল। সবাই ভাবছেন, খুব ঠাট্টা করেছেন হানাবু-গৃহিণী।

চুপ, চুপ! মঁসিয়ে হানাবু উদ্বিগ্ন হয়ে জানালার দিকে তাকালেন। জানালা দিয়ে রাস্তা দেখা যায়। আজ যে আমাদের বাড়িতে অতিথি এসেছেন, এ খবর কাউকে না জানানোই ভাল।

মঁসিয়ে গ্রিগোয়ের বলে উঠলেন—বাঃ, সসেজ তো চমৎকার। এর ভাগ ঐ মজুরদের দিতে আমি রাজি নই।

আবার হাসির ধুম পড়ে গেল, তবে এবার বেশ খানিকটা সংযম দেখা দিল।

ঘরে সবাই বেশ আরামেই বসেছেন—পর্দা আর সার্বেক আমলের ভারী ওক কাঠের আলমারিতে সাজানো ঘর। আলমারির কাঁচের পাল্লার ভিতর দিয়ে রুপার বাসন-কোসনের ঝলমলানি দেখা যায়।

একটা তামার মস্ত বড় ঝাড় লণ্ঠন ঝুলছে ঘরে, তার ঝকঝকে সুগোল গায়ে ছায়া পড়ছে পাম আর আসপিদিস্ত্রার। কারুকাজ করা ইতালীর তৈরি

টবে সেগুলো লাগানো। বাইরে তুষারময় ডিসেম্বরের দিন, প্রবল উত্তর-পূবাল হাওয়া বইছে। ভিতরে তার একটি দমকা ঝলকও আসতে পারছে না; বন্ধ ঘরে সযত্নরক্ষিত উদ্ভিদ-গৃহের উষ্ণতা। কাঁচের পাত্রে রক্ষিত ফালি-করা আনারসের গন্ধে ঘর ম-ম করছে।

গ্রিগোয়েরদের একটু ভয় দেখাবার জন্যে নিগ্রেল বললে, পর্দা ফেলে দেব? ভৃত্যকে পরিবেশনে সাহায্য করছিল একটি দাসী—সে নিগ্রেলের কথাকে হুকুম মনে করে গিয়ে পর্দাগুলো ফেলে দিলে। এবার ঠাট্টা-তামাশার ঢেউ বয়ে গেল; একটা গেলাস, একটা কাঁটা বা একখানা প্লেট রাখতে গিয়েও হুঁশিয়ারির ভান করছে সবাই; প্লেট ভরতি খাবার এসে হাজির হতেই তাকে অবরুদ্ধ শহরের লুণ্ঠিতসামগ্রীর ভিতর থেকে উদ্ধার করা দ্রব্য বলে সংবর্ধনা জানানো হচ্ছে। কিন্তু এই জোর-করে-আনা স্ফূর্তির আড়ালে রয়েছে এক অকথিত ভীতি। নিজেরই অজান্তে পথের দিকে চাইতেই সে ভয় মুখেচোখে ফুটে উঠছে। এক বুভুক্ষু সেনাদল বুঝি এই খাদ্যসম্ভারে পূর্ণ টেবিলের দিকে তাকিয়ে আছে লোলুপ দৃষ্টিতে।

শাকপাতার সঙ্গে ফেটানো ডিম খাওয়া হয়ে গেল; এবার এল মাছ। আলাপ এবার মোড় ঘুরল শিল্প-সংকটের দিকে। আঠারো মাস ধরে ক্রমেই ঘোরাল হয়ে উঠছে পরিস্থিতি।

দেনেউলি' বললেন, এ তো হবেই, ক'বছর অঢেল সমৃদ্ধির পর এ ব্যাপার তো অবশ্যম্ভাবী। কত টাকা রেলপথে, খাল আর ডকে ঢালা হ'ল—কত বাজে ব্যবসায় টাকা উজাড় হয়ে গেল। বীট যত না ফলল, তার চেয়ে তিনগুণ বসল চিনির কল। তারই ফলে টাকায় এখন ঘাটতি পড়েছে। লাখে লাখে টাকা ঢালা হয়েছে, তার সুদের আশায় বসে থাকা ছাড়া এখন আর উপায় কি! এরই ফলে ব্যবসা-পত্র এখন বন্ধ হবার দশা।

মঁসিয়ে হানাবু একথা মানতে রাজি নন, কিন্তু কয়েকবছরের সমৃদ্ধিতে মজুররা যে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে এবিষয়ে তিনি একমত।

তিনি বললেন, এই তো দেখুন না, আমাদের পিটগুলিতে ওরা আগে রোজ পেত ছ' ফ্রাঁ—এখনকার চেয়ে দ্বিগুণ মজুরি! ওরা ভালভাবে থেকেছে, কিছুটা বা-বিলাসী হয়েও পড়েছিল। এখন তো আগেকার সেই কষ্ট ওরা আর করতে চায় না।

হানাবু-গৃহিণী এবার বললেন, মঁসিয়ে গ্রিগোয়ের, আর-একটা মাছ নিন? ভাল হয় নি বুঝি?

কিন্তু ম্যানেজার চুপ করলেন না, বলে চললেন,

এ কি আমাদের দোষ? আমাদের উপরও তো মন্দা বাজারের ধাক্কা এসে পড়েছে......কারখানাগুলোর দরজা একটার পর একটা বন্ধ হচ্ছে। আমাদের মজুদ মাল বিক্রি করবার প্রচণ্ড অসুবিধে ভোগ করছি। চাহিদা কমে গেছে বলে মালের দর কমাতে বাধ্য হচ্ছি। কিন্তু মজুররা সেকথা বোঝে না।

বিরতি। ভৃত্য প্যাট্রিজ পাখী ভাজা দিয়ে গেল। দাসী ঢেলে দিচ্ছে গ্লাসে গ্লাসে সুস্বাদু মদ্য।

দেনেউলি' ধীরে ধীরে বললেন,—যেন আপন মনেই বলছেন,—ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ চলছে। আমেরিকা আর লোহার ফরমায়েস দিচ্ছে না, এতে আমাদের

লোহা গালাই-ঢালাইয়ের কারখানাগুলোর অবস্থা কাহিল হয়ে পড়েছে। সব কিছুই একই সঙ্গে গাঁথা,—দূরে যদি একটা ভূমিকম্প হয় সারা পৃথিবী কেঁপে ওঠে। ভাবুন তো একবার, আমাদের সরকার, এই যে ব্যবসায়ের চড়া তেজী বাজার চলছে এর জন্যে গর্বিত!

পাখীটার উপর এবার তিনি আক্রমণ চালালেন ছুরি-কাঁটা সহযোগে, এবার স্বর চড়ছে,—

সব চেয়ে খারাপ ব্যাপার হচ্ছে, মালের দাম কমাতে হ'লে হয় উৎপাদন বাড়াতে হবে—নয় তো মজুরি থেকে কাটতে হবে। মজুররা তো সেদিক থেকে ঠিকই বলে—ক্ষতিপূরণ চিরদিন ওরাই করে থাকে।

তিনি খোলাখুলি বলে ফেললেন, সঙ্গে সঙ্গে তর্ক বেঁধে গেল। মহিলাদের কাছে ব্যাপারটা অতিমাত্রায় একঘেয়ে। তাছাড়া, সবারই খিদের সময় প্লেটের দিকেই মন পড়ে আছে। ভৃত্য ফিরে এসে, কি যেন বলতে গিয়ে ইতস্তত করছে।

কি ব্যাপার? হানাবু জিজ্ঞেস করলেন। যদি চিঠিপত্র থাকে তো আমাকে দাও! জবাবের জন্য বসে আছি।

না হুজুর, মঁসিয়ে দাঁসার হলঘরে এসে বসে আছেন। উনি এখানে এসে আপনাদের ব্যাঘাত করতে চান না।

মঁসিয়ে হানাবু অতিথিদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন এক প্রস্থ, তারপর দাঁসারকে নিয়ে এলেন। বিরাট বপু সর্দারের, খবর সে এনেছে—আর তারই ভারে বুঝি রুদ্ধশ্বাস হয়ে আছে। সে জানালে, ধাওড়া এখন চুপচাপ; শুধু ওরা এক প্রতিনিধিদল পাঠাবে বলে ঠিক করেছে। আর কয়েক মিনিটের ভিতরে এখানে তারা এসে যাবে।

মঁসিয়ে হানাবু বলে উঠলেন, বেশ, বেশ! আমি তোমার কাছে সকাল আর সন্ধ্যেয় খবর চাই—বুঝলে?

দাঁসার চলে যেতেই আবার ঠাট্টা-তামাশা শুরু হয়ে গেল। আবার রুশ সালাদের উপর চলছে আক্রমণ। ও'রা ঘোষণা করলেন, যদি ভোজন-পর্ব সমাধা করতে চান তো এই সময়। মুহূর্ত বিলম্ব করলে চলবে না। নিগ্রেল দাসীর কাছে রুটি চাইতেই আবার হাসির ধুম পড়ে গেল। দাসী চাপা গলায় জবাব দিলে, জী, হুজুর! যেন ওর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে সৈন্যদল—ধর্ষণ আর খুন করতে তারা প্রস্তুত।

হানাবু-গৃহিণী মিষ্টি করে বললেন, তুমি স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পার—এখনো ওরা এসে চড়াও হয়নি বাছা!

আবার একগাদা চিঠিপত্র এসে হাজির হ'ল। হানাবু একখানা চিঠি সবাইকে পড়ে শোনাতে চাইলেন। পিয়েরোঁর লেখা। সে সম্ভ্রমভরে অনেক ভনিতা করে লিখেছে, উৎপীড়িত হবার ভয়ে সে তার সাথীদের সঙ্গে ধর্মঘটে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছে। প্রতিনিধিদলে যোগ না দিয়েও উপায় নেই। কিন্তু এই নীতিতে তার মন সায় দেয় না। মঁসিয়ে হানাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, এরই নাম বুঝি শ্রমের স্বাধীনতা—মেহনতের আজাদী!

ধর্মঘটের কথায় আবার ফিরে এল আলাপ-আলোচনা। সবাই ধর্মঘট সম্বন্ধে তাঁর মতামত জিজ্ঞেস করলে।

তিনি উত্তর দিলেন, এর আগেও বহু ধর্মঘট হয়েছে। এক হপ্তা, বড়

জোর এক পক্ষ নিষ্কর্মা হয়ে ওরা বসে থাকতে পারে। আগের বারে তো তাই-ই হয়েছিল। ওরা গিয়ে ভাটিখানায় বসে মদ গিলবে, হুটোপুটি খাবে—তার পরে যখন পেটে টান পড়বে—তখন ঠিক এসে পিটে হাজ্‌রে দেবে।

দেনেউলিঁ মাথা নাড়লেন,

আপনার মতো অতো নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। এবার ওরা আগের চেয়ে সংঘবদ্ধ। ওদের আখেরী-তহবিল আছে না?

আছে বটে, তবে আমানতি টাকা তিন হাজার ফ্রাঁও হবে কিনা সন্দেহ। ঐ ক'টা টাকা নিয়ে ওরা কি করবে? আমি একটা লোককে সন্দেহ করি—সে-ই ওদের দলের নেতা। নাম এতিয়েঁ লাতিয়েঁ। মজুর হিসেবে কাজের মানুষ, ওকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে আমার কষ্টই হবে। অমনি বরখাস্ত করে তো ঐ রাসেনারটাকেও তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। ও তো এখনো কয়লা-কুঠির মুখে বসে বীয়ার আর বাজে মতবাদ দিয়ে মজুরদের বিষিয়ে তুলছে। যাহোক, অর্ধেক মজুর এক সপ্তাহ পরেই কাজে ফিরে আসবে, আর এক পক্ষ যেতে না যেতে আবার পুরোপুরি দশহাজার মজুরই কাজে লেগে যাবে।

তিনি নিশ্চিন্ত। তাঁর এক উদ্বেগ, যদি ডিরেক্টর বোর্ড তাঁকেই ধর্মঘটের জন্য দায়ী করে বসেন। তাহলে মুশকিলে পড়তে হবে বটে! কিছুদিন ধরেই মনে হচ্ছে—তিনি তাঁদের কুনজরে পড়েছেন। তাই চামচে-ভরতি রুশ সালাদ ত্যাগ করে তাঁকে চিঠি নিয়ে বসতে হ'ল। বার বার পড়ে দেখলেন প্যারীর কর্তাদের নির্দেশ—হুকুমনামা। তার ছত্রে ছত্রে অক্ষরে-অক্ষরে লুকানো-মানে খুঁজতে লাগলেন। সৌজন্য-বিগর্হিত ব্যাপার, তবু অতিথিরা ক্ষমাই করলেন। ভোজন-পর্ব যেন এখন ফৌজীখানায় পরিণত—তোপ দাগার আগে যেন কোন-রকমে গিলে নিচ্ছে সেনাদল।

আলাপে মহিলারাও যোগ দিলেন। গ্রিগোয়েরে-গিন্নীর গরীবদের উপর ভারি দরদ। আহা, ওরা উপোস করে থাকবে! সিসিলি মনে মনে ছক কাটছে, সে ফলাও করে দয়া-দাক্ষিণ্য দেখাবে—বস্তিতে বস্তিতে বিতরণ করবে রুটি আর মাংস। কিন্তু হানাবু-গৃহিণী মঁতসুর মজুরদের দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। ওদের বরাত খুব ভাল—তাই না? ওরা মাথা গোঁজার আস্তানা, জ্বালানি আর ডাক্তার পাচ্ছে কোম্পানির খরচায়! ওরা তাঁর কাছে জানোয়ারেরই শামিল; তিনি ওদের প্রতি উদাসীন—তিনি শুধু প্যারী থেকে আগত অতিথিদের কাছে ওদের সম্বন্ধে মুখস্ত-করা বুলি আওড়ান। এমনি আওড়াতে-আওড়াতে নিজেই সে বুলি বিশ্বাস করে বসে আছেন। তাই ওদের অকৃতজ্ঞতা দেখে জ্বলে উঠলেন।

নিগ্রেল কিন্তু মঁসিয়ে গ্রিগোয়েরকে ভয় দেখিয়েই চলেছে। সিসিলিকে তার ভাল লাগে নি, তবে মামীকে খুশী করার জন্যে বিয়েতে আপত্তি নেই। ওর ভিতরে যেন কামনার সে-জ্বালা নেই—সে-মত্ততা নেই। নিজে সে দুনিয়ার হালচাল জানা হুনরী মানুষ—মাথা তার একটুতেই খারাপ হয় না, রাজনৈতিক মতবাদের দিক থেকে সে নিজেকে গণতন্ত্রী বলে জাহির করে—কিন্তু তাই বলে মজুরদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে বাধে না। ভদ্রমহিলাদের সুমুখে এখন তো সে তাদের নিয়ে ঠাট্টাই করছে।

সে বললে, মামার আশাবাদে আমি বিশ্বাস করি না। আমার তো ভয়,

একটা ভয়ানক কিছু হবে। মঁসিয়ে গ্রিগোয়ের—বলি কি, লা-পিয়োলে'র দরজায় কুলুপ আঁটুন! কখন লুঠ হয় বলা তো যায় না।

লুঠ হবে—আমার বাড়ি! সভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন গ্রিগোয়ের। আমার বাড়ি ওরা কেন লুঠ করবে?

কেন, আপনি মঁতসু খনির অংশীদার নন? আপনি তো মেহনত করেন না, অন্যের মেহনতির উপর বসে বসে খান। এক কথায়—আপনি অভিশপ্ত পুঁজিবাদী মুনাফাখোর—সেই তো যথেষ্ট অপরাধ। আপনি নিশ্চিত জানবেন, যদি বিপ্লব জয়যুক্ত হয়, চুরি-করা ধন হিসেবে আপনার টাকা ওরা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করবে।

মঁসিয়ে গ্রিগোয়েরের বালসুলভ প্রশান্তি অন্তর্হিত হ'ল। যে উদাসীনতায় নিজেকে ঘিরে রেখেছিলেন আর তা রইল না। তিনি আমতা-আমতা করে বললেন,

চুরি-করা টাকা! আমার টাকা! আমার ঠাকুর্দার বাবা কি এ টাকা রোজগার করেন নি। আর মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই করেছেন। সেই টাকা তিনি খনিতে খাটিয়েছেন। আমরা তো সবরকম ঝুঁকি নিয়েই কাটাচ্ছি। আর আমি কি এ টাকা বাজেভাবে ওড়াচ্ছি?

হানাবু-গৃহিণী মা আর মেয়ের ফ্যাকাশে মুখ দেখে শঙ্কিত হলেন। বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, পল, আপনাদের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করছে।

কিন্তু মঁসিয়ে গ্রিগোয়ের যেন ক্ষেপে গেছেন। ভৃত্য ক্রে-মাছের ('চিংড়ি মাছের মতো শক্ত খোলা এক জাতের মাছ'—অনু) থালা নিয়ে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করছিল, তিনি তিনটে মাছ থালা থেকে তুলে নিলেন। তারপর অজান্তে মাছের শক্ত দাড়াগুলো দাঁত দিয়ে ভাঙতে লাগলেন।

এ কথা বলব না, অংশীদারদের মধ্যে এমন কেউ নেই যিনি টাকা ওড়ান না! এই তো ধরুন, শুনেছি কোম্পানির অনেক কাজে আসেন বলে মন্ত্রীরা মোটা শেয়ার ঘুষ হিসেবে পেয়ে থাকেন। নাম বলব না—শুনেছি খনির সবচেয়ে বড় অংশীদার—'এক ডিউক'—তাঁর জীবনে তো উচ্ছৃঙ্খলতার সীমা নেই—অবিদ্যা আর তুচ্ছ বিলাসের উপকরণের পেছনে লাখে লাখে টাকা ওড়াচ্ছেন... কিন্তু আমরা জাঁকজমক—ঠাট-ঠমক করিনে, সাধারণ ভদ্রভাবেই তো থাকি। আমরা ফাটকা খেলিনে, যা পাই তা দিয়েই বুঝেশুনে সংসার চালাই—আবার গরীবকেও কিছুটা দয়া দাক্ষিণ্য দেখাই!—তবে শুনুন, আপনার ঐ মজুররা যদি ডাকাত হয় তো আমাদের উপর চড়াও হবে। আমাদের একটা আলপিন লুঠ করে নিলেও আমরা ওদের তাই-ই বলব। নিগ্রেল এবার মঁসিয়ে গ্রিগোয়েরকে বুঝিয়ে ঠান্ডা করলে। কিন্তু ওঁকে রাগিয়ে দিয়ে সে খুশী। এখনো ক্রে মাছ পরিবেশন চলছে। খোলা ভাঙার মৃদু শব্দ। এবার আলাপের মোড় ঘুরল রাজনীতির দিকে। মঁসিয়ে গ্রিগোয়ের এখনো কাঁপছেন রাগে, ভয়ে—তবু তিনি নিজেকে উদারপন্থী বলেই জাহির করলেন। তিনি লুই ফিলিপির (ফ্রান্সের রাজা। ইনি ১৮৪৮ সালে বিপ্লবের পর ইংলন্ডে পালিয়ে যান'—অনু) জন্যে হা-হুতাশ করলেন। দেনেউলিঁ শক্তিশালী সরকারের পক্ষে। বলে বসলেন, সম্রাট এখন প্রজাদের সুবিধা-দানের বিপজ্জনক ঢাল বেয়ে গড়িয়ে চলেছেন।

'৮৯ সালের কথা ভাবুন একবার, তিনি বললেন। অভিজাতরাই যোগ দিয়ে সে-বিপ্লব সার্থক করেছিলেন—তাঁদের ছিল নতুন ভাবধারার প্রতি রুচি। সেই একই খেলা আজ মধ্যবিত্তরা খেলছেন। উগ্র উদারপন্থীর ধ্বজা ওড়াচ্ছেন। এ তো রীতিমতো নির্বুদ্ধিতার খেলা! তাঁরা তো ধ্বংস চান, তাই জনগণকে তোয়াজ করছেন। কিন্তু এই উদারপন্থীরা একবারও ভাবছেন না—দৈত্যের দাঁতে তাঁরা শান দিচ্ছেন, সেই দৈত্যই একদিন তাঁদের গ্রাস করবে। হাঁ, নিশ্চিত গ্রাস করবে।

ভদ্রমহিলারা ওঁদের চুপ করতে বললেন, মেয়েদের খবর জিজ্ঞেস করে কথাবার্তার মোড় ঘুরিয়ে দিতে চাইলেন। খবর ভালই! লুসি মার্সিয়েনেয় আছে, এক বন্ধুর সঙ্গে গান গাইছে; জাঁ এক বুড়ো ভিখিরীর ছবি আঁকছে। কিন্তু এসব আনমনা হয়ে বলে গেলেন। তাঁর চোখ ম্যানেজারের দিকে। তিনি কাগজপত্রে মগ্ন, অতিথিদের কথা ভুলেই গেছেন। এই কাগজপত্রের আড়ালে আছে প্যারী আর পরিচালক সভা—তাঁরা ধর্মঘটের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করবেন। মঁসিয়ে দেনেউলিঁ কিন্তু আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলেন,

আপনি কি করবেন ঠিক করলেন?

মঁসিয়ে হানাবু চমকে উঠলেন; কিন্তু ব্যাপারটা চাপা দিতে চাইলেন, দেখা যাবে কি করা যায়!

দেনেউলিঁ প্রকাশ্যে ভাবনায় বিভোর: আপনাদের কি? আপনারা কায়েম হয়ে বসেছেন, দু-দিন সবুরও করতে পারেন। কিন্তু আমার কথা বলি—যদি ভান্দামে গিয়ে এ হিড়িক পৌঁছোয়, আমার তো দফা-রফা হয়ে যাবে। জাঁ-বার্তের পিটে নতুন সরঞ্জাম এনেছি, একেবারে আধুনিক করে তুলেছি। টিকে থাকতে হলে এই পিট থেকে আমাকে অবিশ্রাম কয়লা তুলতে হবে। আমার সময় যে ভাল নয়, একথা আপনাদের বলতে পারি।

মঁসিয়ে হানাবু এই অনিচ্ছাপ্রণোদিত স্বীকৃতিতে নতুন একটা পথ আবিষ্কার করলেন। তিনি শুনছেন, আর তাঁর মনে পরিকল্পনা গজিয়ে উঠছে। যদি ধর্মঘট খারাপের দিকেই যায়, তাহলে সে-পরিস্থিতিটার সুবিধে নিতে দোষ কি? আরো ঘোরালো করে তুলতে হবে অবস্থা—এমনি করেই তাঁর পড়শী মঁসিয়ে দেনেউলিঁ সর্বস্বান্ত হবেন—আর তখন একরকম বিনে পয়সায়ই পিটটা কিনে নেওয়া যাবে। পরিচালক মণ্ডলীর নেকনজর এমনি করেই ফিরে পাওয়া যাবে। ওঁরা তো বছরের পর বছর ধরে ভান্দামের এই পিটটা দখল করবার স্বপ্ন দেখছেন।

তিনি হেসে বললেন, যদি জ্যাঁ-বার্ত নিয়ে এতই আপনার ভাবনা, আমাদের দিয়ে দিন না?

দেনেউলিঁ নিজের আশংকার কথা ফাঁস করে দিয়ে নিজেই দুঃখিত। বললেন,—

কখনো তা হবে না!

তাঁর উত্তেজনায় সবাই হেসে উঠলেন; এর মধ্যে মিষ্টি আর ফলমূল এসে গেল। ধর্মঘটের কথা সবাই ভুলে গেলেন। আপেলের মোরব্বার প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ। মহিলারা আনারসের মোরব্বা তৈরি করতে কি কি লাগে

তাই নিয়ে আলোচনা জুড়ে দিয়েছেন। আনারসের মোরব্বাও নাকি চমৎকার হয়েছে। ভূরিভোজনের পর এসেছে স্নিগ্ধ অবসাদ; আর সেই স্নিগ্ধ অবসাদে মধুরতার যোগান দিচ্ছে আঙুর, আর দালিম। খোশগল্প চলছে। ভৃত্য ঢেলে দিচ্ছে রাইন অঞ্চলের সুস্বাদু মদ—শাম্পেনের বদলে এরই ব্যবহার চলছে অভিজাত সমাজে। শাম্পেন তো এখন মামুলী পানীয়।

এই মিষ্টি আর ফলমূল-আহারের স্নিগ্ধতায় পল আর সিসিলির বিবাহ প্রস্তাব বেশ কিছুটা এগিয়ে গেল। মামী ইশারায় এমন কড়া তাগিদ দিলেন যে, ভাগ্নে বিনয়ে গলে গেল। তার মধুর ব্যবহারে গ্রিগোয়েরদের সে জিনে নিলে। তাঁরা তো তার লুঠের গল্প শুনে মুষড়েই পড়েছিলেন। মঁসিয়ে হানাবু মুহূর্তের জন্য আবার সেই সাংঘাতিক সন্দেহে কণ্টকিত হয়ে উঠলেন—স্ত্রী আর ভাগনের চোখ ঠারাঠারির আড়ালে দৈহিক ব্যভিচারের যেন সংকেত পাওয়া গেল। কিন্তু তাঁর সামনে বিয়ের প্রস্তাব পাকাপাকি হয়ে যেতে আবার আশ্বস্ত হলেন।

হিপোলাইট কাফি পরিবেশন করছিল, এর মধ্যে দাসী ছুটে এসে ঘরে ঢুকল। ভয়ে সে অধীর।

হুজুর, হুজুর—ওরা এয়েছে!

প্রতিনিধি দল এসে গেছে। দরজায় করাঘাত; আশেপাশের কামরাগুলোতে ছড়িয়ে পড়ছে ভীতির নিঃশ্বাস।

টেবিলে অতিথিরা এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছেন। অস্থির হয়ে পড়েছেন। নিস্তব্ধতা। হাসি-ঠাট্টা করার চেষ্টা চলল; ওঁরা বাকি চিনিটুকু পকেটে পোরার ভান করছেন; থালা লুকিয়ে ফেলতে চাইছেন। কিন্তু ম্যানেজার গম্ভীর। হাসি মিলিয়ে গেল ফিসফিসানিতে। আর শোনা যাচ্ছে প্রতিনিধি-দলের ভারী পায়ের শব্দ। তারা পাশের ঘরে পাতা গালচের উপর পা ফেলে এগিয়ে আসছে।

হানাবু-গৃহিণী স্বামীকে চুপিচুপি বললেন,

কফি খাওয়া শেষ করবে না?

নিশ্চয়ই! ওরা অপেক্ষা করুক।

তিনি অধীর; কান পেতে শুনছেন আওয়াজ, যদিও দেখাচ্ছেন যেন কফি খাচ্ছেন।

পল আর সিসিলি উঠে পড়ল। পল তাকে জোর করে দরজায় চাবির গর্তের ভিতর দিয়ে তাকাতে বাধ্য করালে। ফিসফিস করছে, হাসি চাপতে চেষ্টা করছে।

দেখতে পাচ্ছ?

হাঁ, একটা মোটাসোটা লোককে দেখছি, সঙ্গে দুটো বেঁটে লোক।

ওদের মুখ দেখে ভয় হয় না?

না, না, ওরা তো ভাল লোক।

মঁসিয়ে হানাবু হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। কফি বড় গরম, পরেই তিনি খাবেন। তিনি বেরিয়ে যাবার সময় ঠোঁটে আঙুল দিয়ে সবাইকে চুপ করে থাকতে বলে গেলেন। সেইটেই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। আবার সবাই

এসে বসলেন টেবিলে, নির্বাক, নীরব, নড়া-চড়ারই সাহস নেই। কান পেতে আছেন। এসে বাজছে পুরুষের রুক্ষ কন্ঠস্বর।

দুই

আগের দিন রাসেনারের ওখানে বৈঠকে এতিয়েং আর তার সাথীরা ম্যানেজারের কুঠিতে পরদিন যাবার জন্য প্রতিনিধি বেছে নিয়েছে। মেয়ু-বৌ রাতে শুনলে, তার স্বামী নাকি এই দলে আছে। সে তো হতাশ হয়েই পড়ল। বারবার বললে, সে কি ওদের শেষ অবধি পথেই দাঁড় করাবে নাকি? মেয়ু নিজেও অনিচ্ছায় রাজি হয়েছিল। তাদের দুঃখ-দুর্দশা যতই অন্যায় হোক, কিন্তু সংগ্রামের সময় এলে তারা নিজেদের শ্রেণীর সেই ঐতিহ্যগত বশ্যতার কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে। আগামী কালের কথা ভেবে দিশেহারা হয়। তার চেয়ে পিঠ কুঁজিয়ে জোয়াল কাঁধে চাপানোই শ্রেয় বলে মনে করে। সাংসারিক ব্যাপারে সাধারণত মেয়ু বৌয়ের কথা শোনে। পরামর্শ সে খাঁটিই দেয়। কিন্তু এবারে সে ফুঁসে উঠল। তার নিজের এসম্বন্ধে গোপন ভীতি আছে বলেই এমনধারা হ'ল।

বিছানায় শুয়ে পড়ে পাশ ফিরে বললে, দেখ্, আমাকে জ্বালাসনি। মুখ বুজে থাক্! এখন সাঙাৎদের ফেলে পালাব নাকি? আমার কাজ আমি করছি।

বেশ তো—যাও না! কিন্তু বুড়ো—মোরা যে ম'লাম!

দুপুরে ওরা খেয়ে নিলে। আঁভাতাসের সরাইখানায় বেলা একটায় জমায়েত হবার কথা। সেখান থেকে ওরা যাবে মঁসিয়ে হানাবুর কুঠিতে। খাবারের মধ্যে আছে শুধু আলু। একফোঁটা মাখন মাত্র আছে—তাই কেউ আলু ছুঁলও না। রাতে রুটির সঙ্গে আলু খাওয়া হবে।

এতিয়েং হঠাৎ মেয়ুকে বললে, তুমিই আমাদের হয়ে কথা কইবে। তোমার উপরই ভরসা।

অভিভূত হয়ে পড়ল মেয়ু, আবেগে মুখে কথা নেই।

মেয়ু-বৌ বললে, না গো, অতো সইবে না গো! ও যাক, কিছু বুলব নি, কিন্তুক পালের গোদা হতে দেবনা গো! ও কেন বুলতে যাবে—আর কেউ নেই নাকি গা?

এতিয়েং এবার বক্তৃতা শুরু করে দিলে। মেয়ু পিটের কুলি-সর্দারদের মধ্যে সব চেয়ে সরেস, সবচেয়ে জনপ্রিয়তা তার—আর ইমানদারও বটে! সে যে ভাল মানুষ সেকথা তো সবাই বলে। ও যদি বলে তাহলে কুলিদের দাবির ওজন বাড়বে, মূল্য বেড়ে যাবে। প্রথমে এতিয়েং নিজেই বলবে ভেবেছিল; কিন্তু মঁতসুতে সে বেশীদিন আসেনি—আর ম্যানেজার হয় তো পুরানো মজুরের মুখ থেকেই দাবি উঠলে কান পেতে শুনবেন। সাথীরা তাদের স্বার্থ সবচেয়ে সেরা লোকের হাতেই সঁপে দিয়েছে, এখন অস্বীকার করলে তো চলবে না; এ তো ভীরুতাই হবে।

মেয়ু-বৌ হতাশ হয়ে পড়ল।

যাও গো মরদ, যাও—গিয়ে ওদের জন্যে মর—খুন হও! কি আর করব গো! মোর যেমন বরাত—সায় দিতেই হবে। বেগড়া দেব নি।

মেয়ু আমতা-আমতা করে বললে, কিন্তু বলতে যে পারব না। শেষে কি-না-কি বলে ফেলব!

এতিয়েং ওকে রাজি করাতে পেরে খুশী—সে পিট চাপড়ে দিয়ে বললে, যা মনে হবে তাই-ই বলবে। ভুল হবে না।

বুড়ো দাদু বনেমোরের সোঁতে ফুলো একটু কমেছে। সে মুখ-ভরতি খাবার নিয়ে হাঁ করে শুনছে আর ঘাড় নাড়ছে। সব চুপচাপ। আলু খাওয়া শেষ, ছেলেমেয়েরা শান্ত হয়েছে। এখন আর ঝগড়াঝাটি করছে না। বুড়ো এবার মুখের খাবার গিলে ফেলে বিড়বিড় করে বললে,

যা-খুশি বলে যাবি—ওখানে বলাও যা, না-বলাও তাই। কত দেখলাম এসব কান্ড—কত দেখলাম! চল্লিশ বছর আগে ম্যানেজারের কুঠি থেকে ওরা আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছিল, তাও আবার এমনি নয়—তলোয়ার দেখিয়ে! এবার হয় তো ঢুকতে দেবে, কিন্তু জবাব দেবে না। পাথুরে দেয়ালের কাছ থেকে যেমন জবাব মেলে না—তেমনি ওরা! তোদের আশা-ভরসা কিসের? ওদের টাকা আছে, ওরা তোদের কেয়ার করবে কেনরে?

আবার নীরবতা। মেয়ু আর এতিয়েং উঠে চলে গেল। পরিবারের আর সবাই শূন্য থালার সামনে গুম্ হয়ে বসে রইল। ওরা বেরিয়ে গিয়ে পিয়েরোঁ আর লেভাককে ডেকে নিলে। এবার চারজনে এসে হাজির হ'ল রাসেনারের সরাইখানায়। সেখানে আর আর ধাওড়া থেকে দুজন-তিনজন করে আসছে প্রতিনিধিরা। বিশজন প্রতিনিধিই হাজির। ওরা কোম্পানির শর্তের বিরুদ্ধে কি কি পালটা শর্ত দাখিল করবে তারই ছক করে নিলে। তার পর রওনা হ'ল মঁতসুর দিকে। পথে বয়ে যাচ্ছে জোরালো উত্তর-পূবাল বাতাস—যেন ঝেঁটিয়ে চলেছে পাথুরে পথ। ওরা বেলা দুটোয় গিয়ে হাজির হ'ল ম্যানেজারের কুঠিতে।

পরিচারক এসে অপেক্ষা করতে বলে ওদের মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিলে। তারপরে আবার ফিরে এসে বসবার ঘরে নিয়ে গেল। পর্দা তুলে দিলে। জালি পর্দার ভিতর দিয়ে চোলাই হয়ে আসছে মৃদু আলো। ঘর ভরে গেছে। মজুরের দল একা; তারা বসতে ভয় পাচ্ছে—জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের পরনে রবিবারের পোষাক, দাড়ি কামানো—হলদে চুল আর গোঁফ মুখে। হাতে টুপি নিয়ে দোমড়াচ্ছে আর আড়চোখে তাকাচ্ছে গৃহসজ্জার দিকে। সবরকম আসবাবপত্রেরই এখানে ভিড়—পুরানো দিনের আসবাবের মোহে এমনিধারা ব্যাপার ঘটেছে। দ্বিতীয় হেনরীর যুগের আরাম কেদারা, পঞ্চদশ লুই-এর আমলের দু-একখানা কেদারা, একটা সপ্তদশ শতাব্দীর ইতালীয় আলমারি, পঞ্চদশ শতাব্দীর টেবিল—তাকের কাজ করছে একটা উপাসনা বেদীর সামনের দিকটা—আর আছে পর্দায় সাবেকি আমলের মূল্যবান কারুকার্য।

এগুলি সাবেকি আমলের কোন ঐশ্বর্যময় গির্জার আসবাবপত্র; পুরানো দিনের সোনার ঔজ্জ্বল্য আর রেশমের জেল্লায় যেন সে অতীতকে আবাহন করে আনছে এই ঘরে। তাই বুঝি ওরা অভিভূত হয়ে পড়েছে—মনে সম্ভ্রমজনিত

অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। প্রাচ্যের গালচের পশমে যেন পা বেঁধে বেঁধে যাচ্ছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি লাগছে গরম। আগুনের কুণ্ড থেকে উঠে আসছে উষ্ণতা, ওরা তার স্পর্শ পাচ্ছে পথের তুষার হাওয়ায় হিম হয়ে যাওয়া গালে, চমকে চমকে উঠছে। পাঁচ মিনিট কেটে গেল। বাইরের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন এই সুসজ্জিত ঘরের আরামে বেড়ে উঠছে ওদের অধীরতা। অবশেষে হানাবু ঢুকলেন, তাঁর কোটে সামরিক কেতায় বোতাম আঁটা—কোটের বুকে সম্মান-চিহ্ন ঝক্‌ঝক করছে। তিনিই প্রথম কথা বললেন।

তোমরা তাহলে এসে গেছ দেখছি, হুঁ—মনে হচ্ছে যেন তোমরা ক্ষেপে গেছ। হুঁ—

তিনি কথাটা শেষ না করেই সৌজন্য সহকারে বললেন, ব'স। আলাপ-আলোচনাই আমি করতে চাই।

মজুররা চারদিকে তাকাল—বসবার আসন খুঁজছে। কেউ কেউ সাহস করে গিয়ে চেয়ারে বসল, কেউ বা কারুকাজ করা রেশমের গদির দিকে তাকিয়ে বসতে সাহসই পেল না। তারা ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। মঁসিয়ে হানাবু আগুনের কুণ্ডের কাছে আরাম কেদারাখানা টেনে নিয়ে গেলেন। তিনি ওদের দেখছেন, মুখ চিনতে চেষ্টা করছেন। পিয়েরোঁকে চিনে ফেললেন, সে শেষ সারে লুকিয়ে ছিল। এতিয়েঁ সামনেই বসেছে। তার উপর তাঁর দৃষ্টি পড়ল।

শুধালেন, হুঁ—তোমরা কি বলবে বল ?

ভেবেছিলেন, ছোকরাই কথা কইবে, কিন্তু মেয়ুকে এগিয়ে আসতে দেখে অবাক হলেন। তাড়াতাড়ি বললেন,

আরে! তোমার মতো অমন কাজের মজুরও দলে ভিড়েছে! তোমার তো চিরদিনই কাণ্ডজ্ঞান আছে। আর তোমরা তো মঁতসুর আদি বাসিন্দে—এখানে যখন প্রথম কয়লার স্তরে গাঁইতির ঘা পড়ে তখন থেকেই তো কাজ করছ! তোমাকে এই খ্যাপা মজুরের দলের নেতা হতে দেখে আমি দুঃখিত—সত্যিই দুঃখিত।

মেয়ু শুনছে, চোখ তার নীচু দিকে। সে এবার শুরু করলে। প্রথমে আস্তে আস্তে বলতে লাগল, স্বরে তার কুণ্ঠা মেশানো।

হুজুর, আমি নিরীহ মানুষ—আমার বিরুদ্ধে কারো নালিশ নেই—তাই আমাকে সাঙাতেরা বাছাই করে বার করেছে। এর থেকেই বুঝবেন—ঘোঁট-পাকানো মানুষের কাজ নয়—বাজে লোক এসে ফ্যাসাদ বাঁধাচ্ছে—তাও নয়। আমরা চাই ন্যায় বিচার। উপোস করে-করে আমরা মরতে বসেছি—এখন একটা সমঝোতা না হলে আমরা যে বাঁচি না হুজুর! আর কিছু না খাই, রোজ তো রুটি খেতেই হবে।

আস্তে আস্তে স্বর চড়তে লাগল। চোখ তুলে সোজা সে ম্যানেজারের দিকে তাকাল।

আপনারা নয়া রেট চালু করলেন। আমরা তো তাতে গর্‌রাজি। আমরা নাকি রোলার কাজ ভাল করে করিনি। তা হক্‌ কথা বলব—আমরা রোলার কাজে তেমন সময় দিতে পারি নি। তেমন সময় দিলে, আমাদের রোজ তো কমে যেত। একেই তো এতে এখন পেট ভরে না—তার উপরে ঐ রোলার কাজ নিয়ে থাকলে ঠায় উপোস করে মরতে হোত। ওতেই আপনার মজুররা সাবাড়

হয়ে যেত। আমাদের ঠিকমতো মজুরি দিন, আমরা রোলার ঠেকনো ভাল করে দেব—মাল-কাটার কাজে সব মেহন্নত খরচ না করে আমরা তখন রোলার কাজে বেশি সময় দিতে পারব, এখন তো মালকাটাই আমাদের একমাত্র রোজগারের পথ।......আর তো কোন পথ নেই হুজুর; যদি রোলার কাজ করাতে হয়, তার জন্যে আলাদা মজুরি দিতে হবে।......কিন্তু হুজুর আপনারা কি করলেন? আমরা তো ভেবেই কূল পাইনে। আপনারা ফি-টব-গাড়ি পিছু মজুরি কমিয়ে দিলেন—তারপরে গরীব-গুরবোদের ধোঁকা দিয়ে বললেন যে, রোজকার কাজের মজুরি দিয়ে ক্ষতিপূরণ করে দিচ্ছেন। কিন্তুক হুজুর এই যদি সাঁচ্চা জবান হয়, তাহলে আমরা তো ম'লাম—রোলার কামে তো বহুৎ দেরি হবে। তা ছাড়া এও তো সাঁচ্চা জবান নয়; কোম্পানি তো ক্ষতি পূরণ করছে না, শুধু ফি-টব-গাড়ির থেকে দু আনা কেটে নিয়ে নিজের পকেটে পুরছে।

হানাবু সজোরে হাত নেড়ে প্রতিবাদ করতে যাচ্ছেন দেখে অন্যান্য প্রতিনিধিরা মৃদু স্বরে সায় দিলে, হাঁ, এই তো ঠিক বাত্...

মেয়ুই ম্যানেজারের কথায় বাধা দিলে। একবার শুরু করে দিয়েছে, এখন আপনা থেকে কথা ঝরে পড়ছে। মাঝে মাঝে সে নিজের কথা শুনে নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছে। মনে হয়, কোন অচেনা লোক যেন তার ভিতরে বসে বলে যাচ্ছে। ওর বুকে বুঝি জমে উঠেছিল এই কথা—সে নিজেও তো বুকের এই পুঞ্জীভূত কথার ভার টের পায়নি—এখন প্রবল ভাবাবেগে সেই কথার স্রোতই উৎসারিত হয়ে পড়ছে। মজুরদের চিরন্তন দারিদ্র্যের কথা সে বলতে লাগল। কঠোর মেহনতির জীবন—পশুর জীবন—বস্তিতে বস্তিতে ছেলেমেয়ে আর স্ত্রীদের বুভুক্ষু চীৎকার। সে বর্ণনা করে চলল হপ্তার দিনের ভয়াল দৃশ্য—মজুরি ভয়ানক কমে গেছে, জরিমানায় আর ছুটিছাটায় মজুরির বেশির ভাগই খেয়ে নিয়েছে। তারা সেই সামান্য মজুরি নিয়েই ফিরছে ঘরে—আর সেখানে পরিবারে পরিবারে উঠছে কান্নার রোল। তাদের ধ্বংস করে ফেলবে বলেই কি কোম্পানি ঠিক করেছে?

সে এবার এই বলে শেষ করল, হুজুর, আমরা আপনাকে জানাতে এয়েছি, যদি বাচ্চাকাচ্চা আর জরু নিয়ে উপোসই করতে হয়, তাহলে বিনা কামেই উপোস করব—ফৌত হয়ে যাব। তাতে হাঙ্গামা-হুজ্জুত কম! আমরা পিট থেকে উঠে এলাম—কোম্পানি মোদের দাবি না মানলে আর ঐ পিটে নাবব না। কোম্পানি টব-গাড়ির দাম কমিয়ে রোলার কামের আলাদা দাম দিতে চায়। আমরা তা হতে দেব না। যা চালু আছে, তাই-ই চলুক! ফি-টব-গাড়ি পিছু মোদের পাঁচ সেন্ট করে জ্যায়দা দিতে হবে এই আমাদের দাবি। এখন আপনি হুজুর যদি ন্যায়-ধর্মের পক্ষে হন, যদি মজুরদের উপর আপনার নেকনজর থাকে, তাহলে আপনিই যা হয় করুন!

মজুরদের স্বরে ওর কথারই প্রতিধ্বনি উঠল,...

সাঁচ্চা কথা বলেছ...মোদের কথাই বলেছ...মোদের যা নায্য দাবি তাই আমরা চাই!

যারা কথা বলছে না, তারাও সায় দিচ্ছে। এই স্বর্ণ আর কারুকার্যখচিত বিরাট বিস্তৃত কক্ষ আর তার সাবেক আমলের আসবাবপত্র যেন অদৃশ্য হয়ে

গেছে। ওদের পুরু জুতোর নীচে গালচের স্পর্শ পর্যন্ত ওরা টের পাচ্ছে না।

মঁসিয়ে হানাবু অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন, আমাকে জবাব দিতেও কি দেবে না?

শোন—কোম্পানি টব-পিছু দু' সেন্ট বাঁচাতে চান না। এস না—হিসেবটা খতিয়ে দেখা যাক।

তর্ক শুরু হয়ে গেল। ওদের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করার জন্যে ম্যানেজার এবার পিয়েরোঁকে ডাকলেন। পিয়েরোঁ বিড়বিড় করে কি বললে বোঝা গেল না। জোর দাবিদারদের পান্ডা এখন লেভাক। জোর গলায় এমন সব কথা বলছে, যাতে নিজেদের দাবির শর্তগুলিই ঘুলিয়ে ফেলছে। বন্ধঘরের পরিবেশে ওদের চীৎকার যেন জমকালো পর্দার আড়ালে দলে-পিষে যাচ্ছে, মরে যাচ্ছে।

মঁসিয়ে হানাবু এবার বলে উঠলেন, একসঙ্গে যদি সবাই কথা বল, তাহলে সমঝোতা হবার কোন উপায়ই নেই।

তিনি এখন আত্মস্থ। সেই প্রশান্ত আর মালিকজনোচিত একটু রুক্ষ ভদ্রতা ফিরে পেয়েছেন। এ ভদ্রতায় রুক্ষতা আছে, কিন্তু তিক্ততা নেই। তিনি মালিকের প্রতিনিধি; হুকুম পেয়েছেন—সে হুকুম তাঁর শিরোধার্য। প্রথম থেকেই এতিয়েঁর উপর তাঁর দৃষ্টি—একবারও চোখ ফিরিয়ে নেননি। তিনি ছোকরার এই নীরবতা, এই একগুঁয়েমি ভাঙাতে চাইছেন। তাই দু' সেন্টের প্রশ্নটা হঠাৎ চাপা দিয়ে আলোচনার বিষয়টা ব্যাপক করে আনলেন।

তোমরা আসল কথাটা স্বীকার করতে চাইছ না কেন......যত সব বাজে লোকের ধাপ্পায় ভুলছ। এই একই রোগ আজকাল সবজায়গায় মজুরদের মধ্যে দেখা দিয়েছে, এমন কি সেরা মজুররাও এই রোগ থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারেনি।...না, না, তোমাদের কাছ থেকে জবানবন্দী আমি চাইছি না—কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তোমরা একেবারে বদলে গেছ। তোমরা তো আগে খুশী ছিলে। তোমাদের বোধহয় রুটির চেয়ে মাখনের দাবি এখন বেশি। তোমাদের হয়তো ঐ ঘোঁটপাকানো আন্দোলনকারীর দল বলে দিয়েছে—এইবার মালিক হবার পালা তোমাদের। হক্ কথা হচ্ছে—তোমরা এখন সেই জাঁদরেল আন্তর্জাতিক-সংস্থার সভ্য হয়েছ। ওরা তো পাজীর দল ছাড়া কিছুই নয়—ওদের স্বপ্ন হচ্ছে সমাজ ধ্বংস করা।

এতিয়েঁ এবার বাধা দিলে,

হুজুর, আপনি ভুল করছেন। মঁতসুর একটি মজুরও এখনো ওখানে নাম লেখায়নি। অবশ্য বাধ্য হলে তারা তা করবে বইকি—সবগুলো পিট থেকেই কুলি আর কুলি-কামিনরা নাম লেখাবে। এখন সেটা কোম্পানির উপর নির্ভর করছে।

এবার সংঘাত শুরু হ'ল মঁসিয়ে হানাবু আর এতিয়েঁর ভিতরে। অন্য মজুররা যেন সেখানে আর হাজির নেই।

কোম্পানি তো মজুরদের কাছে বিধাতার মতো, আর তোমরা কিনা সেই কোম্পানিকেই শাসাচ্ছ—ভয় দেখাচ্ছ। নতুন ধাওড়া তৈরি করতে কোম্পানি এবছর তিন লক্ষ ফ্রাঁ ব্যয় করেছে, এতে তার দু' পয়সাও মুনাফা হয়নি।

মজুরদের ভাতা, মাগ্‌না কয়লা, মাগ্‌না ওষুধপত্র আর ডাক্তারের ব্যবস্থা তো বাদই দিলাম। তোমাকে তো বুদ্ধিমান বলে মনে হয়—ক'মাসের মধ্যেই তুমি কাজে পাকা হয়ে গেছ—পাকা মজুরদের মধ্যে এখন তুমিও একজন। কোম্পানির এই দানের কথা প্রচার করলে কি ভাল হয় না? তা না, যতসব বদমায়েসের ধাড়ীর সঙ্গে মিশে তুমি তোমাদের সর্বনাশ ডেকে আনছ। হাঁ, আমি রাসেনারের কথাই বলছি। সোশালিস্টরা এসে পিটগুলিকে বিষিয়ে দিতে না পারে তার জন্যেই আমরা ওকে তাড়িয়ে দিয়েছি। তুমি সব সময়েই ওর ওখানে যাওয়া-আসা কর, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ও-ই তোমাকে আখেরী-তহবিলের ব্যাপারে খুঁচিয়েছে। যদি এই তহবিল শুধু মজুরদের টাকা জমাবার তহবিল হ'তো, আমরা রাজি হয়েই যেতাম। কিন্তু আমরা খতিয়ে দেখেছি এটা আমাদের বিরুদ্ধে একখানা হাতিয়ার। মালিকের সঙ্গে সংঘাতের আশঙ্কায় এই সংরক্ষিত তহবিল সৃষ্টি হয়েছে। আমি এ সম্বন্ধে এই কথাই বলে রাখি, কোম্পানি এই তহবিলের ভার নিজের হাতে রাখতে চান।

এতিয়েঁ চুপচাপ। কথা বলে যাচ্ছেন ম্যানেজার, তাঁর চোখের দিকে সে তাকিয়ে আছে—কিন্তু ঠোঁটদুটো নড়ে নড়ে উঠছে আবেগে। শেষ কথাটা শুনে সে হেসে বললে,

তাহলে আর-এক দফা নয়া দাবি আপনাদের তরফ থেকে এল হুজুর। এখন অবধি তো আপনারা ও-দাবি তোলেন নি। আমাদের বরাত হুজুর! আমরা বলি কি—কোম্পানি যেন আমাদের ব্যাপার নিয়ে একটু কম মাথা ঘামান। তাঁরা বিধাতাগিরি না ফলিয়ে আমাদের ন্যায্য পাওনা-গণ্ডা চুকিয়ে দিলেই আমরা খুশী হব। আমরা যে কোম্পানির মুনাফা বাড়াচ্ছি, তাঁরা তো তার সবটুকুই লুটেপুটে নিচ্ছেন। এ কি ভাল কথা হুজুর, যখনি সংকট আসছে, অংশীদারের মুনাফার ভাগ ঠিক রাখার জন্যে কোম্পানি মজুরদের উপোসে-উপোসে মরবার পথ খুলে দিচ্ছেন? আপনি যা-ই বলুন হুজুর—এই নয়া নিয়ম তো আসলে আমাদের মজুরি-ছাঁটাইয়ের চাল—তাই তো আমরা এরই বিপক্ষে রুখে দাঁড়িয়েছি। কোম্পানিকে যদি খরচ-খরচা কমাতে হয়, একা মজুরদের উপর সবটা উসুল করে নিলে তো চলে না!

ম'সিয়ে হানাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, হাঁ, এইবার আসল কথায় এসে গেছ! আমি এটারই অপেক্ষায় ছিলাম। মানুষগুলোকে উপোস করিয়ে তাদেরই মেহনতির রোজগারে পেট ভরাচ্ছে কোম্পানি—এই তো তোমাদের নালিশ? কিন্তু কি করে বোকার মতো এসব কথা তোমরা বল—তোমাদের তো বোঝা উচিত—কোম্পানি কত টাকা খাটাচ্ছেন—কত তার ঝুঁকি। আবার খনির ব্যাপারে তো এ ঝুঁকি যথেষ্ট—টাকার অঙ্কটাও ঢের বেশি! আজকের দিনে সাজ-সরঞ্জাম সুদ্ধ একটা পিটে পনেরো লাখ থেকে বিশ লাখ টাকা লাগে—তাছাড়া উদ্বেগ আর হাঙ্গামা তো আছেই। কত টাকা ঢেলে সামান্য লাভের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে বসে থাকতে হয়। ফ্রান্সের অর্ধেক কোম্পানিই তো দেউলে হয়ে গেছে—যে দু-একটা এখনো আছে তাদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ তো মিথ্যে। যদি তাদের মজুরদের হাল খারাপ হয়, তাদের দশাও তো খারাপ হবে। তোমরা কি মনে কর—তোমরাই এই সংকটে শুধু নাজেহাল হ'চ্ছ—আর কোম্পানির কিছুই ক্ষতি হচ্ছে না? যেমন খুশি মজুরির হার বেঁধে দিতে এখন আর

কোম্পানি পারে না—এখন পাল্লা দিয়ে হার বাড়াতে হয়—নয়তো কোম্পানির সর্বনাশ। এগুলো খতিয়ে না দেখে শুধু কোম্পানির দোষ দিলে তো চলে না! কিন্তু তোমরা তাই কর—তোমরা অবুঝ—তোমরা নালায়েক!

কথাটা ঠিক নয়, আমরা খাঁটি বুঝদার মানুষ, আমরা বুঝি, এমনিধারা চললে আমাদের আর ভালাই নেই। তাই তো মজুররা একদিন-না-একদিন এই নিয়ম পালটে দিয়ে নতুন নিয়মে চালাবে দুনিয়া!

মন্তব্য মোলায়েম করেই করলে এতিয়েং, স্বরও তার মৃদু। কিন্তু বিশ্বাসে সে অটল, ক্রান্তির আভাসে সে শিহরিত; সবাই চুপ করে আছে—অপ্রতিভ হয়ে গেছে, ভয় পেয়েছে। এখন এই ভদ্র পরিবেশে ছেয়ে আছে আশংকার আবহাওয়া। অন্যান্য প্রতিনিধিরা বুঝতে পারেনি তার কথার অর্থ—তারা ভাবছে—তাদের সাথী বুঝি ভদ্রমানুষের বিলাস-ব্যসনের দাবি জানিয়েছে—তাই আড়চোখে তাকিয়ে দেখছে বিচিত্রিত পর্দার দিকে—আরাম-কেদারার আরামের উষ্ণ স্পর্শের জন্য তারা লালায়িত। দেখছে বিলাস-সামগ্রীগুলি চোখ চেয়ে-চেয়ে—ও-গুলো বেচলে তাদের এক মাসের সুরুয়ার খরচ চলে যাবে।

মঁসিয়ে হানাবু একমুহূর্ত চুপ করে বসে রইলেন, তারপরে উঠে তাদের চলে যাবার নির্দেশ দিলেন। সবাই উঠে দাঁড়াল। এতিয়েং মেয়ুর কনুইয়ে গুঁতো মারলে। সে আবার তেমনি জড়ানো স্বরে আমতা-আমতা করে বলে উঠল,

হুজুর—তাহলে এই-ই আপনার জবাব...সবাইকে বলতে হবে—আপনি মোদের দাবি মানলেন না।

ম্যানেজার চীৎকার করে উঠলেন—বাপু, আমি দাবি মানা-না-মানার কে? আমি তোমাদেরই মতো মাইনের চাকর। তোমাদের পিটের সবচেয়ে বয়সে ছোট মজুরেরও যেটুকু বলার দাবি আছে—আমার তাও নেই। আমাকে হুকুম দেওয়া হয়েছে, আমার কাজ হচ্ছে হুকুম তামিল করা। আমার যা বলা উচিত ছিল, তোমাদের বলেছি—কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তো আমার হাতে নয়...... তোমরা তোমাদের দাবি এনে আমার সামনে হাজির করেছ—আমি পরিচালক-পরিষদে সে-দাবি পেশ করব—তাঁরা যা জবাব দেবেন তোমাদের জানিয়ে দেব।

নিখুঁত ম্যানেজারি ঢঙে বলছেন মঁসিয়ে হানাবু—ব্যক্তিগত আবেগে নিজেকে ভাসিয়ে দিচ্ছেন না। মালিকের যন্ত্র হিসেবে তিনি কথা বলছেন—কাটাছেঁড়া ভদ্রতায় রুক্ষ তার স্বর। মজুররা তাঁর দিকে সন্দেহভরে তাকাচ্ছে—তারা ভাবছে—কি আঁচ করে আছেন—ওদের কাছে মিথ্যে বলায় তাঁর লাভ কি—মালিক আর মজুরদের মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর কি ফন্দি হাঁসিল করতে চাইছেন? লোকটা নিশ্চয়ই ধাড়িবাজ; ওকে মাইনে দেওয়া হয় বটে—কিন্তু সে-মাইনেয় ও তো বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকে!

এতিয়েং এবার বললে, হুজুর, আপনি তো দেখতে পাচ্ছেন—আমাদের কি বরাত—নিজেদের কথা যে নিজেরা গিয়ে মালিকের কাছে বলব—তারও সুবিধে নেই। যদি পারতাম—আমরা অনেক কথাই বলতে পারতাম—অনেক নজির দেখাতাম—কিন্তু আপনার কাছে সেগুলি বলে তো লাভ নেই। যদি জানতাম হুজুর—কার সঙ্গে দেখা করলে সুরাহা হবে!

মঁসিয়ে হানাবু রাগ করলেন না। বরং হাসলেন।

দেখ, আমার উপর যদি বিশ্বাস না থাকে তাহলে তো ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে উঠবেই...তাহলে তো তোমাদের ওখানে ঐ মালিকদের কাছেই ছুটতে হয়।

প্রতিনিধিরা তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। তিনি জানালার দিকে হাত বাড়িয়ে হদিস দিচ্ছেন। 'ঐখানে'টা কোথায়? বোধহয় প্যারীই হবে। কিন্তু ঠিক করে কে বলবে! ওদের প্রশ্ন বুঝি কোন্ সুদূরে চলে গেছে—গিয়ে হাজির হয়েছে এক দুরধিগম্য স্থানে—যেখানে বিরাজ করছেন এক অজানা দেবতা—মন্দিরের অন্ধকার গহ্বরে তিনি তাঁর সিংহাসনে ওত পেতে বসে আছেন। এই দেবতাকে ওরা দেখতে কখনো পাবে না—কিন্তু তার ক্ষমতা ওরা অনুভব করছে—তাঁর অমোঘ দণ্ড এসে গুরুভার হয়ে দলে-পিষে দিচ্ছে মঁতসুর এই দশ হাজার কয়লার খনির গোলামদের। ম্যানেজার যখনি কথা বলছেন, এই লুক্কায়িত শক্তি তাঁকে ভর করে আছে—তিনি তাঁরই দৈববাণী করছেন মাত্র।

ওরা হতাশ হয়ে পড়ল। এমন কি এঁতিয়েঁও হতাশাভরে কাঁধে ঝাঁকুনি দিলে—তার ভাবভঙ্গী দেখে মনে হয়—চলে যাওয়াই এখন ভাল। মঁসিয়ে হানাবু মিতার মতো মেয়ুর হাতে টোকা দিয়ে জাঁলিনের কথা শুধালেন।

দেখ তো—তোমার কি শিক্ষাটাই না হ'ল। তুমিই না রোলার কাজের ব্যাপারে সব সময়েই বলতে—ঠেকনো ভাল আছে, চলে যাবে।...যাহোক, তোমাদের বন্ধু হিসেবেই বলি, আবার ভেবে দেখ! খতিয়ে দেখলে বুঝতে পারবে—ধর্মঘটে সবারই সমূহ ক্ষতি। এক সপ্তাহ যেতে-না-যেতে তোমরা উপোস করে-করে মরতে বসবে—তখন কি হবে? যাহোক, তোমাদের সুবুদ্ধির উপর আমার আস্থা আছে—আমার ধ্রুব বিশ্বাস—তোমরা সোমবারে ঠিক গিয়ে পিটে নামবে।

ওরা মাথা নীচু করে পশুর পালের মতো বসবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল, ওদের আত্মসমর্পণের আশার উত্তরে একটু কথাও বললে না; ম্যানেজার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এলেন। এই বলে তিনি আলাপ-আলোচনা শেষ করলেন—কোম্পানি একদিকে মজুরির নয়া হার চালু করেছে, আর অন্য দিকে মজুরদের দাবি ফি-টব-গাড়ি পেছু পাঁচ সেন্ট উপরি মজুরি। এ-ব্যাপারে মজুরদের তিনি হুঁশিয়ার করে দিচ্ছেন—তাদের এই দাবি পরিচালক-পরিষদ কিছুতেই মানবেন না।

ওরা চুপ করে রইল, তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে বলে উঠলেন—তাড়াহুড়ো করে একটা কাণ্ড না বাঁধিয়ে আগে ভেবে দেখো!

হলঘরে এসে পিয়েরোঁ ঘটা করে সেলাম জানালে, কিন্তু লেভাক টুপিটা মাথায় এঁটে দিলে। মেয়ু বিদায়ের সময় কি যেন বলতে চাইল, কিন্তু এতিয়েঁ তাকে খোঁচা মেরে থামিয়ে দিলে। অশুভ নিস্তব্ধতা জমে উঠেছে চারদিকে। ওরা একে একে চলে গেল। দরজা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

মঁসিয়ে হানাবু খাবার-ঘরে এসে দেখলেন অতিথিরা চুপ করে পানীয়ের পাত্র সুমুখে নিয়ে বসে আছেন। দু-কথায় দেনেউলিঁকে তিনি ব্যাপারটা বললেন, তাঁর মুখ আরো গম্ভীর হয়ে গেল। ঠাণ্ডা কাফিতে চুমুক দিলেন এবার হানাবু। সবাই এখন আলাপের মোড় অন্য দিকে ঘোরাতে ব্যস্ত। কিন্তু গ্রিগোয়েররাই আবার ধর্মঘটের কথা তুলে বসলেন। সরকার থেকে আইন করে

ধর্মঘট ভেঙে দেওয়া যায় না শুনে তাঁদের অবাক লাগছে। পল সিঁসিলিকে বললে, ভয় নেই, পুলিস আসছে।

এবার হানাবু-গৃহিণী পরিচারককে ডেকে বললেন,

হিপোলাইট—আমরা বসবার ঘরে যাওয়ার আগে দরজা-জানালাগুলো খুলে দিও—একটু হাওয়া ঢুকুক।

তিন

পক্ষকাল চলে গেছে। তৃতীয় সপ্তাহের প্রথম সোমবারে ম্যানেজারদের কাছে পাঠানো তালিকায় মজুরদের গরহাজিরার সংখ্যা আরো বেড়ে গেল। সবাই ভেবেছিল, এই দিন ভোর থেকেই কাজ শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু মজুররা পরিচালক-পরিষদের একগুঁয়েমিতে ক্ষেপে গেছে। শুধু লা-ভোরো, ক্রেভকুর, মিরো আর মাদেলিনের পিটগুলিই এখন নিষ্কর্মা হয়ে পড়ে নেই—লা ভিক্তরেও এখন সিকি ভাগ মজুর হাজিরা দেয় না। ফিউৎরি কাঁতেল আর সাঁ-তমাসেরও ঐ একই দশা। ক্রমেই ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ছে—ব্যাপক হয়ে উঠছে।

লা-ভোরোর ইয়ার্ডে এখন থমথমে নিস্তব্ধতা। এ যেন মৃত কারখানা—বড় বড় ইয়ার্ড শূন্য—যেন ঘুমিয়ে আছে। সব কিছু অচল এখানে। ডিসেম্বরের ধূসর আকাশের নীচে দু-তিনটে পরিত্যক্ত টব-গাড়ি লাইনের উপর দাঁড়িয়ে আছে—জড়পদার্থের মূক আকুতি ঝরে পড়ছে। তারই নীচে মাচার দুই খোঁটার মাঝখানে কয়লার স্তূপও কমে গেছে—এখন কয়লার গুঁড়োর নীচের কালো মাটি দেখা যাচ্ছে। আর একগাদা পিটের ঠেকনো এখন বৃষ্টিতে পচছে। খালের স্টীমারঘাটে একখানা লঞ্চ আধো বোঝাই হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নোংরা জলে ঘুমন্ত বলেই তাকে মনে হয়। পরিত্যক্ত পিটের পাড়ে বৃষ্টি সত্ত্বেও গন্ধকের ধোঁয়া উঠছে। একটা ঠেলা-গাড়ি উপরদিকটা শূন্যে তুলে পড়ে আছে। সবচেয়ে ঝিমন্ত মনে হয় বাড়িগুলি—যেন অবসাদের তুষারে ঢাকা পড়ে গেছে; স্ক্রিনিং শেডের শার্সিবন্ধ, হেড গীয়ারে আর পিটের মুখের ঘনঘোর শব্দ বেজে ওঠে না, বয়লার-ঘর এখন নিঃঝুম—বিরাট চোঙ আর উদ্‌গিরণ করে না বিরাট ধোঁয়ার কুণ্ডলী—শুধু দু-এক ঝলক—ধোঁয়ার ক্ষীণ ঝলক মাঝে মাঝে উগরে দেয়। ওয়াইন্ডিং-ইঞ্জিনটা শুধু সকালবেলার পালায় চালু থাকে। সইসরা ঘোড়ার জন্যে জাব পাঠায় আর সর্দাররা নামে খাদে কাজ করতে। ওরা আবার মজুর বনে গেছে—কাঁথিতে কি ভাঙচুর হ'ল দেখে। এখন তো আর এদিকে কারো নজর নেই, কখন কি দুর্ঘটনা হয় কে বলতে পারে! বেলা ন'টার পর থেকে আর ওয়াইন্ডিং-ইঞ্জিনের দরকার হয় না; তখন মই দিয়েই ওঠা-নামার কাজ চলে। এই মরা বাড়ির সার কালো কয়লার গুঁড়ো মেখে দাঁড়িয়ে থাকে। শুধু ভেসে আসে নিঃসরণী পাম্পের হাঁপানির শব্দ। পিটের জীবনের এই একমাত্র ব্যাঞ্জনা। এই হাঁপানি যদি থেমে যায় তাহলে পিটকে গ্রাস করে ফেলবে জলের স্রোত।

পিটের উপরে উলটো দিকে দুশো চল্লিশ নম্বর ধাওড়াও যেন মরে পড়ে

আছে। লিল্ থেকে এসেছিলেন পুলিস সাহেব, পুলিসরা টহল দিচ্ছিল পথে পথে। কিন্তু ধর্মঘটী মজুররা একেবারে ঠাণ্ডা, পুলিস সাহেব আর পুলিসের দল তাই চলে গেছে। এই বিস্তীর্ণ মজুর-এলাকায় এমনটি আর কখনো হয়নি। মরদরা আর সরাইখানায়—ভাটিখানায়ও যায় না; শুধু বাড়িতে পড়ে-পড়ে সারা দিন ঘুমোয়; মেয়েদের কফির বরাদ্দ কমে এসেছে, তাই বুঝে-শুনে চলে—আর বক্‌বক্‌ও করে না—ঝগড়াও বাঁধায় না। এমন কি ছেলে-পুলের পালও যেন বুঝদার। ওরাও শান্ত হয়ে গেছে। খালি পায়ে ছুটো-ছুটি করে, যতটা সম্ভব কম গোলমাল করে। হুকুম জারী হয়েছে বার বার—মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে—ওরা ঠাণ্ডা হয়েই থাকবে।

মেয়ুর বাড়িতে মানুষের আনাগোনা চলছে অবিরাম। এতিয়েঁ সম্পাদক হিসেবে আখেরী-তহবিলের তিন হাজার ফ্রাঁ যে-সব পরিবারের খুবই অভাব তাদের মধ্যে বেঁটে দিয়েছে। পরে আরো নানা জায়গা থেকে এসেছে কয়েকশো ফ্রাঁ—চাঁদা আর দান-খয়রাতীতে এই টাকা উঠেছে। কিন্তু এখন আর কোন জায়গা থেকে কিছু আসছে না; সব বন্ধ। আর ধর্মঘট চালু রাখার মতো টাকা নেই; উপোসের ভয় হুমকি দিচ্ছে। মাইগ্রাত এক পক্ষ ধরে সবাইকে জিনিস সরবরাহ করবে বলে রাজি হয়েছিল, কিন্তু সেও এক হপ্তা পরেই মত বদলেছে—জিনিস সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে। কোম্পানির হুকুম মেনে সে চলে, বোধহয় কোম্পানি ধাওড়াগুলিকে শুকিয়ে মেরে ব্যাপারটার ফয়সালা করতে চায়। সে আবার মর্জিমাফিক যা-তা শুরু করেছে। যেন অত্যাচারী শাসক। মেয়েদের চেহারা দেখে দেখে রুটি দিচ্ছে, আবার দিচ্ছেও না। মেয়ু-বৌয়ের তো মুখের উপরই দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়েছে। ক্যাথেরিনকে সে পায়নি বলেই রেগে উঠে ওর উপর এই শোধ তুলেছে। মড়ার ওপরে খাঁড়ার ঘার মতো তার উপরে প্রবল তুষারপাত শুরু হয়ে গেছে। মেয়েরা উদ্বিগ্ন হয়ে তাদের কয়লার দিকে তাকাচ্ছে। আস্তে আস্তে কমে আসছে কয়লার স্তূপ। তারা ভয়ে আকুল—মরদরা আর কাজে না গেলে কয়লা সরবরাহ হবে না।

মেয়ুদের বাড়িতে সবকিছুরই এখন অনটন। বুত্যেলুপের দেওয়া বিশ ফ্রাঁ দিয়ে লেভাকরা তবু এখনো খেয়ে আছে। পিয়েরোঁদের হাতে এখনো কিছু রেস্ত আছে, কিন্তু তাদের ভয়—বুঝি ধার দেবার জন্যে ডাক পড়বে। তাই আর সবার মতোই অভাবের মুখপাতটুকু তারা বজায় রেখেছে—তারাও মাইগ্রাতের কাছ থেকে ধারে কিনছে। পিয়েরোঁ-বৌ তার ঘাঘরাটা একটু তুলে ধরলে মাইগ্রাত তো তার দোকানখানাই তাকে উজাড় করে দিতে পারে। শনি-বারে এই পরিবার রাতের খাওয়া না খেয়েই শুয়ে পড়ল। দুর্দিন আসছে টের পাচ্ছে, কিন্তু কারো মুখে রা-টি নেই। শান্তভাবে নির্দেশ মানছে, সাহসে বুক বাঁধছে। সবকিছুর উপরে ছাপিয়ে উঠেছে সংহতিশক্তির প্রতি ওদের একান্ত বিশ্বাস। এ যেন এক ধর্ম। ওরা যেন এক উপাসক সম্প্রদায়, অন্ধ আত্মাহুতির পালা এসে গেছে ওদের। ন্যায়ের এক নতুন যুগের ছবি এনে ওদের সম্মুখে ধরা হয়েছে, ওরা পেয়েছে তার প্রতিশ্রুতি—তাই সকলের সুখের জন্য দুঃখ-দুর্দশা ওরা সইতে রাজি। বুভুক্ষা ওদের বুক এক রহস্যময় আনন্দে ভরে দিয়েছে: ওদের সংকীর্ণ বদ্ধ দিগন্তে সুদূরের

হাতছানি এমনি করে কখনো দেখা দেয়নি—দারিদ্র্যে কখনো এমন বিরাট মোহ তো সৃষ্টি হয় নি। ওদের শক্তি উপবাসে ক্ষীণ কিন্তু তবু ওরা ঐ দূরে হোথায় ওদের সেই স্বপ্নের আদর্শ নগরী দেখতে পাচ্ছে—, সে-নগরী এগিয়ে আসছে কাছে, বাস্তব হয়ে উঠছে। সেখানে মানুষ তো ভাই ভাই হয়ে থাকবে—শ্রমের আসবে স্বর্ণযুগ—সমান খাদ্য পানীয় হবে সবার। ওদের বিশ্বাসের ভিতে কে নাড়া দেবে? ওরা জানে সেই নগরীর উপকণ্ঠে এসে দাঁড়িয়েছে। এবার ঢুকে পড়বে। তহবিল শূন্য; কোম্পানিও তাঁর গো ছাড়বে না—দিনের পর দিন শুধু জটিল হতে জটিলতর হয়ে উঠছে পরিস্থিতি। ওরা তবু আশা জীইয়ে রাখছে, কঠিন বাস্তবকে হেসে উড়িয়ে দিচ্ছে তাচ্ছিল্য-ভরে। পায়ের নীচের মাটিও যদি দুভাগ হয়ে যায়, তবু ওরা যেন অলৌকিক উপায়ে বাঁচবে। ওদের এই বিশ্বাসই এখন ওদের রুটি, ওদের পাকস্থলীতে এই বিশ্বাসই যোগাচ্ছে খাদ্যের উষ্ণতা। মেয়ুরা আর অন্যান্য পরিবারগুলি এখন নিষ্ঠে জলের সুরুয়া খাচ্ছে, তাড়াতাড়ি হজম করেও ফেলছে। ওরা এখন তূরীয় অবস্থা প্রাপ্ত। এ যেন পুরানো যুগের আত্মনিবেদিত প্রাণ সাধকদলেরই মতো। তাঁরা তো নব জীবনের কামনায় দেহকে শ্বাপদের মুখে ছুঁড়ে ফেলে দিতেও দ্বিধা করতেন না।

এখন থেকে এতিয়েই ওদের অবিসংবাদিত নেতা। পড়াশুনোয় তার বুদ্ধিতে পড়েছে শান, সে এখন তাই সব ব্যাপারেই বেশ বলতে কইতে পারে। সারা রাত পড়াশুনো করে কাটায়। গাদা গাদা চিঠিপত্রও আসে তার কাছে, সে বেলজিয়ামের সোশালিস্টদের মুখপত্র লা ভেনগারের গ্রাহক হয়েছে। এ কিসিমের কাগজ আর কখনো এই ধাওড়ায় আসেনি, তাই তার সাথীদের ভিতরে তার সম্মানও খুবই বেড়ে গেছে। প্রতিদিনই তার জনপ্রিয়তা বাড়ছে আর সে উৎসাহিত হয়ে উঠছে। নিজেই গাদা-গাদা চিঠিপত্র লেখা লেখি করছে, প্রদেশের চারদিকে মজুরদের ভাগ্য নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছে। আবার যেমন পরামর্শ পাচ্ছে—লা ভোরোর মজুরদের যোগান দিচ্ছে। এই লা-ভোরোই এখন কেন্দ্রস্থল। তার মনে হয়, সারা দুনিয়ায়ই যেন এখন ওকে ঘিরে ঘুরছে—সে তো ছিল সামান্য মিস্ত্রী তার পরে কয়লার খনির নাল কাটা গাঁইতি চালিয়ে কুলি—হাতে পায়ে কয়লার গুঁড়ো মেখে থাকত। ওর এসব ভেবে এখন গর্বই হয়। সত্যই সে সমাজের মই বেয়ে ধাপে ধাপে উঠে চলেছে—এবার সে এসে পড়েছে ঘৃণ্য মধ্যবিত্তদের ধাপে। বুদ্ধিজীবীদের সন্তোষ এখন তার সারা মুখে, সারা দেহে আত্মতৃপ্তির ছাপ—কিন্তু নিজের কাছে স্বীকার করবার মতো সাহস তার নেই। এখনো এক অস্বস্তি বর্তমান—তার পড়াশুনো কম। সেকথা মনে হলেই সে অস্থির হয়ে ওঠে, কোন—ফ্রককোট আঁটা ভদ্রলোকের সামনে সে যেন কেমন অপ্রতিভ হয়ে যায়, কেমন যেন ভয় এসে দেখা দেয়। সে পড়াশুনো যথেষ্টই করে, কিন্তু কোন পদ্ধতি নেই বলে আসলে শেখা হয় কম। এমন গোলমাল বেঁধে যায় যে, বহু জিনিস হয় তো তার মনে থাকে, কিন্তু তাদের মানে বুঝতে পারে না। তাই আত্ম-সমালোচনার মুহূর্তে নিজের এই মহান উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ এসে দেখা দেয়। সে হতাশ হয়—দুনিয়া যে মানুষের অপেক্ষা করে আছে সে হয়তো সে মানুষ নয়। সে কাজের অযোগ্য। সে-লোককে হয় আইনজীবী হতে

হবে, নয়তো সে হবে পরম পণ্ডিত—বলতে কইতে কাজ করতে সে হবে দড়, সাথীদের সে কখনো বিপন্ন করবে না। কিন্তু আবার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। তার আত্মমর্যাদা ফিরে আসে। না—না—আইনজীবীকে দিয়ে হবে না। ওরা তো পাজী, ওরা নিজেদের বিদ্যা মানুষকে শোষণের জন্য ব্যবহার করে। যাই হোক, যে ভাবে হোক, মজুরদের ব্যবস্থা তাদের নিজেদেরই করতে হবে। আবার জননেতৃত্বের স্বপ্নে সে বিভোর হয়ে যায়, তার ক্ষোভ দূর হয়। মঁতসু তার পায়ের তলায়, প্যারী ঐ দূরে কুয়াশার আঁধারে বিছিয়ে আছে। কে বলতে পারে? হয়তো একদিন লোকসভার সদস্য সে হবে। সে স্বপ্ন দেখে—এক প্রশস্ত হলের মঞ্চে উঠে সে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করছে। সেই তো হবে লোকসভায় সর্বপ্রথম শ্রমিক-প্রতিনিধির বক্তৃতা।

কয়েকদিন ধরে সে যেন কেমন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। প্লুচার্ত চিঠির পর চিঠি লিখছে—সে মঁতসুতে এসে ধর্মঘটীদের নব অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে চায়। সে নির্দেশ দিয়েছে, একটা গোপন বৈঠক ডাকতে হবে—এতিয়েঁ সেখানে সভাপতিত্ব করবে। তার আসল উদ্দেশ্য এই ধর্মঘটকে কাজে লাগানো, আন্তর্জাতিকে সবাইকে ঢোকানো। এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিকের উপর মজুরদের সন্দেহ যায় নি। এতিয়েঁ হাঙ্গামার ভয় করছে; কিন্তু প্লুচার্তকে ঠেকানো যাবে না। তার নিজের ক্ষমতা আছে বটে, কিন্তু সরাইখানার মালিক রাসেনারের কথা না শুনে উপায় নেই। সে পুরানো লোক—এখনো খদ্দেরদের মধ্যে তার পক্ষসমর্থনকারীর অভাব নেই। তাই সে দোটানায় পড়েছে, কি জবাব দেবে প্লুচার্তকে।

আজ সোমবারেই চারটের সময় আর একখানা চিঠি এসেছে লিল্ থেকে। এতিয়েঁ তখন নীচে মেয়ু-বৌয়ের সঙ্গে কথা বলছিল। তার স্বামী নিষ্কর্মা হয়ে বসে থেকে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছিল। শেষে সে মাছ ধরতে গেছে। যদি খালের লকগেটের ওপাশে বরাতে একটা বড়সড়ো মাছ জুটে যায় তো, সেটা বেচে রুটি কিনতে পারবে। বুড়ো দাদু বনেমোর আর জাঁলিন একটু বেড়াতে বেরিয়েছে; বাকি ছেলেমেয়েরা এখন আলঝিরের কাছে—সে এখন কয়লার সন্ধানে পিটের খাড়া পাড়ের উপরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়। ওরা ঘরে নিবন্ত অগ্নিকুণ্ডের সামনে বসে আছে—সেটা উস্‌কে দেবারও উপায় তাদের নেই। মেয়ু-বৌ কাঁচুলির বোতাম খুলে একটা মাই বার করে এস্তেলকে দুধ খাওয়াচ্ছে। মাইটা তার পেট অবধি ঝুলে পড়েছে।

এতিয়েঁ চিঠিখানা ভাঁজ করে রাখতেই মেয়ু-বৌ শুধাল,

খবর ভাল তো? মোদের টাকাকড়ি পাঠাবে?

এতিয়েঁ মাথা নাড়ল, মেয়ু-বৌ আবার বলে চলল,

কি করে যে হপ্তাটা চালাব জানিনে বাপু...যাহোক করে মোদের টিকে তো থাকতেই হবে। যখন হকের দাবি মোদের, তাকত আপনা থেকেই আসবে—তাই না বাছা? শেষ অবধি মোরাই জিতবো—নিচ্চয় জিতবো!

এখন সে ধর্মঘটের পথে এসে গেছে। কাজে লেগে থেকে কোম্পানির কাছ থেকে দাবি আদায় করতে পারলে সেই-ই হোত সবচেয়ে ভাল। কিন্তু যখন ধর্মঘট করেই ফেলেছে, তখন শেষ না দেখে কাজে ভেড়া ঠিক নয়। হকের দাবি

মানুক কোম্পানি তবে তো আবার কাজ। এ ব্যাপারে মেয়ু-বৌ পুরোদস্তুর আপস-বিরোধী। যখন মানুষ ঠিকই করছে, তখন মালিকের দাপটে নিজের ভুল স্বীকার করা কেন—তার চেয়ে মরাও ভাল।

এতিয়েং বলে উঠল, এখন যদি একটা কলেরা লাগে আর সব মরে যায় তাহলে বড় ভাল হয়।

না গো না, মেয়ু-বৌ জবাব দিলে, কারো মরণ চাইতে নেই। এতে ভালাই হবেক না। আবার ওদের জায়গায় আর ক'টা গজিয়ে উঠবে। মোর কথা, ওদের বুদ্ধিশুদ্ধি ভাল হোক! আর দেখো তা হবেও—তেনারা তো কত ভদ্দর মানুষ। ঐ রাজনীতি-ফিতিতে আমি নেই।

এতিয়েং'র শানানো জিভের উষ্ণ কথা-বার্তা শুনে মেয়ু-বৌ সব সময়েই তাকে দোষে। ও ভাবে ছোকরাটা বড় উগ্রচণ্ডী। ন্যায্য মতো কাজের জন্য মজুরি চাইবে সে তো ভাল কথা কিন্তু ঐ যে সাত সতেরো কথা—বুর্জোয়া, সরকার—ওসবে কি দরকার? অন্যের কাজে বাগড়া দেওয়া কেন বাপু? তাতে যে নিজের ক্ষতি ষোল আনা। কিন্তু তবু ছোকরাকে মানে মেয়ু-বৌ। ছোকরা মদ খায় না, আবার পঁয়তাল্লিশ ফ্রাঁ মাস মাস ঠিক মতো গুনেও দেয়। মানুষটা যদি বেতর-বেখাপ্পা না হয়, তার সব দোষ-ঘাট মাপ করা যায়।

এতিয়েং এবার লোকায়ত রাষ্ট্রের কথা পেড়ে বসলে, সেখানে সবাই রুটি পাবে। মেয়ু-বৌ কিন্তু মাথা নাড়ছে, তার ১৮৪৮ সালের দুর্বছরের কথা মনে আছে। তখন তারা সবে সংসার পেতেছে, সে আর তাঁর মরদ তো একেবারে পোকার শামিল হয়ে গিছল। সেই ভয়ংকর দিনের কথা বলতে গিয়ে সে যেন সবকিছু ভুলে গেল। অসীম বিস্তৃতিতে তার দৃষ্টি হারিয়ে গেছে—স্তন তার উন্মুক্ত—স্বরে উদ্‌গত ক্রন্দনের রেশ। সে আঁকড়ে ধরে আছে এস্তেলকে। এস্তেল এখন ঘুমে বিভোর। এতিয়েং'ও ভাবনায় বিভোর—তার চোখ ঐ বিরাট স্তনের উপরে। স্তনের মৃদু শুভ্রতার সঙ্গে ওর ঐ হলদে মেটে মুখের রং যেন মানায় না।

মেয়ু-বৌ বিড়বিড় করে বলে চলেছে একটা পয়সাও তখন নেই গো! দাঁতে কাটি এমন খাবার নেই—সব পিটগুলোয় কাম বন্ধ। ঠিক এমনি দশা তখন।

দরজা খুলে গেল। ওরা অবাক হয়ে গেছে, মুখে রা নেই। ক্যাথেরিন এসেছে। যেদিন সাভালের সঙ্গে পালিয়েছে, সেদিন থেকে আর ধাওড়ায় ফেরে নি। আবেগে সে অধীর, দরজা বন্ধ করতে ও ভুলে গেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে মেয়ে। মাকে সে একা পাবে ভেবেছিল, এখন এতিয়েং'কে দেখে তার এত ভাল করে তৈরি-করা কথা মগজে গুলিয়ে গেছে।

মেয়ু-বৌ বসে বসেই বললে, তুই আবার এসেছিস কেন লা? তোর সঙ্গে তো মোদের জন্মের শোধবোধ হয়ে গেছে। যা—ভাগ্‌!

ক্যাথেরিন মনে করতে চাইছে তার তৈরি করা বক্তৃতা।

মা,...কাফি আর একটু চিনি আনলাম...বাচ্চাকাচ্চাদের জন্যেই নিয়ে আলাম ...ওভার টাইম পেনু কিনা...ভাবনু...

সে পকেট থেকে এক পাউন্ড কাফি আর এক পাউন্ড চিনির মোড়ক বার করে সাহস করে টেবিলের উপর রাখলে। লা-ভোরোর ধর্মঘটে সে বড়ই উদ্বিগ্ন; জাঁ-বার্তে সে কাজ করে। বাপ-মাকে সে এইভাবেই কিছুটা সাহায্য করতে চায়। কিন্তু তার এই দাক্ষিণ্যে মা একটুও গলে গেল না। সে রুখে উঠল,

ভারি মেঠাই এনেছে! তার বদলে এখানে থেকে রুজি রোজগার করলে মোদের পেট ঢের ভাল করে ভরত!

এবার অবরুদ্ধ ক্রোধ উথলে উঠল। গালিগালাজ করছে মেয়েকে—এই একমাস ধরে যত শাপান্ত করেছে মেয়েকে, সব যেন উগরে দিচ্ছে। অভাবি সংসার রইল পড়ে, আর মেয়ে কিনা একটা মরদের সঙ্গে উধাও হয়ে গিয়ে ষোলো বছর বয়সেই বাঁধা পড়ল! শুধু বেজন্মারাই এমন কথা ভাবতে পারে!

একবার একটু ঘাট হলে মাপ করা যায়, কিন্তু কোন মা মেয়ের এই কারসাজি মাপ করবে গা? ওরা যদি তেমন আঁটা-আঁটি বাঁধা-বাঁধি করতো, তাও না হয় কথা ছিল। তা তো করেই নি, বাতাসের মতো ছেড়ে দিয়েছিল মেয়েকে, শুধু বলেছিল যত লটঘটি করুক মরদকে নিয়ে—যেন রাতে বাড়ি ফেরে। এসে ঘুমোলেই তারা নিশ্চিন্ত।

বল্ তো, তোর এই বয়সে এ কি ধুকড়ির চাল শিখলি লা?

ক্যাথেরিন টেবিলের কাছে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। তার অপুষ্ট দেহখানা কেঁপে কেঁপে উঠছে। সে ভাঙা ভাঙা কথায় জবাব দিলে,

তুমি তো অমনিই ভাব শুধু ফুর্তি লুটলাম আমি, তাই না? কেন সেই মরদটার কথা তো বললে না! সেই তো লুটল। ও যদি জোর জুলুম করে তো কি করব—উপায় কি গো? তা ছাড়া ও তো তাগড়াই জোয়ান। কি করে কি হ'ল কে বুলবে গো? কিন্তু যা হয়ে গেছে, তার তো আর চারা নেই; একটা না একটা মরদ তো জুটেই যেত—না হয় ও-ই জুটেছে! ওকে এখন বে করতি হবে।

নিজের সে সাফাই গাইছে; কিন্তু তিক্ততা নেই। এ তো নিষ্ক্রিয় আত্মসমর্পণ। যে-মেয়েকে অল্প বয়সে পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়, তার তো এ ছাড়া উপায় নেই। এ তো স্বাভাবিক, তাই না? সে তো কখনো অন্য কথা ভাবেনি। পিটের পাড়ে বা পরিত্যক্ত খনিতে ধর্ষিত হবার কামনাই তার ছিল। তারপরে ষোলো বছরে আসবে মাতৃত্ব—তার পরে যদি প্রেমিক তাকে বিয়ে করে, সে পেতে বসবে দারিদ্র্য-প্রপীড়িত সংসার। এ ব্যাপারে লজ্জায় সে লাল হয়ে ওঠেনি। সে শুধু এই ভেবে কেঁপে উঠছে, এই ছোকরার সামনে কেন তার সঙ্গে বেশ্যার মতো ব্যবহার করছে মা! ওর উপস্থিতিই তার কাছে বিষম হয়ে উঠেছে—সে দুঃখে রাগে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

এতিয়েঁ এর মধ্যে উঠে পড়ে নিবন্ত আগুন ঘুঁচিয়ে দেবার ভান করছে। মা-মেয়ের কথায় সে থাকতে চায় না। মেয়ের কৈফিয়তেও সে বাধা সৃষ্টি করবে না। কিন্তু চোখে চোখ পড়ে গেল। ও ভাবলে, ইস কত রোগা হয়ে গেছে ছুঁড়িটা—কিন্তু এখনো ও সুন্দর! রোদে পোড়া তামাটে মুখে চোখ দুটো এখনো তার জ্বলজ্বল করছে। কেমন যেন এক আবেগে এতিয়েঁ অধীর; তিক্ততা আর নেই। তার কামনা—আহা, তার বদলে ও যে ভালবাসার মানুষ জুটিয়ে নিয়েছে, তাকে নিয়ে ও সুখী হোক! তবু ওর জন্য তার অনুরাগ নিঃশেষ হয়ে যাবে না; সে মঁতসুতে গিয়ে ঐ লোকটাকে বলবে—ওর সঙ্গে যেন সে ভাল ব্যবহার করে। কিন্তু এমন অগাধ স্নেহের আঁচ তো ক্যাথেরিন পেল না—সে শুধু দেখলে ও এখনো ওকে করুণা করে। ওর দিকে চেয়ে আছে কেমন করে দেখ না! ওকে সে ঘৃণাই করছে! ক্যাথেরিনের বুক আবেগে ভরা,

তাই তো গলার স্বর বুজে এল। সে বলবার মতো ভাঙাভাঙা কথাও খুঁজে পেলে না।

মেয়ু-বৌকে রুখবে কে! সে বলে চলল, থাম্ না ছুঁড়ি! যদি আজন্মের মতো এসে থাকিস তো, ঘরে এসে বোস! তা নয় তো ভাগ্ এখান থেকে! আর তোর বরাত ভাল মানবি যে, বাচ্চাটাকে মাই দিচ্ছি, তা নয় তো কোথায় লাথ্ মারতাম সে আমিই জানি।

মেয়ু-বৌয়ের শাসানি ধমকানির সত্যিই বুঝি ফল ফলল। ক্যাথেরিনের পাছার উপর হঠাৎ এসে পড়ল এক প্রচণ্ড লাথি, সে তো ব্যথায় বিস্ময়ে হতবাক। সাভাল এসেছে। খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে হিংস্র জানোয়ারের মতো সে তেড়ে এল। এতক্ষণ সে বাইরে থেকে ওকে দেখছিল।

সে চেঁচিয়ে উঠল, ওরে ঢেমনি! তোর পেছু পেছু ঠিক আলাম। জানি তো তুই ঐ ছোকরাটার কাছে পেট বাঁধাতে আসবি। আর তার জন্যে আবার টাকাকড়িও দিবি। মোর পয়সা থেকে তুই ওকে কাফি গেলাস এত তোর আস্পর্ধা!

মেয়ু-বৌ আর এতিয়েঁ যেন বাজ-পড়া মানুষের মতো হয়ে গেছে। ঠায় বসে আছে। সাভাল এদিকে ক্যাথেরিনকে দরজার দিকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল।

চল্, চল্ বলছি!

ক্যাথেরিন এক কোণে গিয়ে জড়সড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এবার সাভাল মেয়ু-বৌয়ের দিকে ফিরে তাকাল—

ফলাও ব্যবসা করছ মেয়ু-বৌ! কুটনী হয়ে পাহারা দিচ্ছ, এদিকে তোমার ঢেমনি ছুঁড়িটা উপর তলায় পা দাপিয়ে নীলা-খেলা করছে।

ক্যাথেরিনের হাত ধরে সে তাকে হেঁচকা টানে দরজার কাছে নিয়ে গেল। আবার মেয়ু-বৌয়ের দিকে সে ফিরে তাকাল। মেয়ু-বৌ স্তব্ধ হয়ে বসে আছে চেয়ারে, মাইটাও পুরে রাখে নি ব্লাউজের ভিতরে। এস্তেল তার মার পশমী ঘাঘরায় মুখ থুবড়ে ঘুমুচ্ছে। মাইটা মস্ত বড়—একটা বড়সড়ো গরুর বাঁটের মতোই ঝুলে আছে।

মেয়েকে তো আর পেলি নে, এবার মাকে নিয়েই মজা লুটে লে! সাভাল আবার চেঁচিয়ে উঠল। দেখা না কুটনী তোর মাল যা আছে দেখিয়ে দে না! তোর ঐ ভাড়াটে তো ওতেই খুশ্ হয়ে যাবে!

এতিয়েঁ ওকে মারবার জন্যে ছুটে গেল, ও এতক্ষণে ক্যাথেরিনকে যে ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়নি, শুধু ধাওড়ার মানুষদের জাগিয়ে দেবার ভয়ে। কিন্তু এবার ও ক্ষেপে গেল দু'জনে দু'জনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে দু-জোড়া চোখই রাগে জ্বলছে।

এতিয়েঁ দাঁতে দাঁত পিষে বললে, হুঁশিয়ার! নইলে দেব ঢিট্ করে!

দিয়ে দেখ্ না, সাভাল জবাব দিলে।

কয়েক মুহূর্ত দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল, আগুন ঝরে পড়ছে ওদের দৃষ্টিতে—একে অপরের তপ্ত নিঃশ্বাস অনুভব করছে। ক্যাথেরিন মৌন আকুতিতে হঠাৎ এসে হাত ধরল তার প্রেমিকের, তারপর টেনে নিয়ে এল বাইরে। ওরা আবার ধাওড়া ছেড়ে ছুটে চলেছে। পিছনে ফিরেও তাকাচ্ছে না।

মেয়ু-বৌ বসে আছে, নড়ছে চড়ছে না। একবার হাত তুললে মাত্র। এক

ব্যথাতুর নীরবতা ঘরে চুইয়ে পড়ছে। না-বলা কথার ভারে ভারী হয়ে উঠেছে মুহূর্তগুলি। এতিয়েং চেষ্টা করছে চোখ ফিরিয়ে নিতে, তবু চোখ ফিরে ফিরে আসছে মেয়ু-বৌয়ের স্তনের উপর। বিরাট শুভ্র মেদের স্তূপ—ঔজ্জ্বল্যে চোখ ধাঁধিয়ে দিলে। কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠল এতিয়েং। মেয়ু-বৌয়ের বয়েস নিঃসন্দেহে চল্লিশ বছর, অনেক ছেলেপুলে বিইয়ে বেঢপ হয়েও গেছে, কিন্তু এখনো শরীরের যে টুকু আঁটসাটো মজবুত ভাব আছে তাতে তারিফ করতেই হয়। আর ওর লম্বাটে মুখখানা তো সত্যিই সুন্দর। আস্তে আস্তে মাই দুটো হাত দিয়ে তুলে কাঁচুলির খোলের ভিতরে গলিয়ে দিলে। একটা মাইয়ের কালচে বোঁটাটা কিছুতেই ঢুকতে চায় না—আঙুল দিয়ে ও ঠেলে ঠেলে দিয়ে বোতাম এঁটে দিলে। এখন পুরানো কাঁচুলির আড়ালে মাইদুটো বেঢপ আর কালো দেখাচ্ছে।

ওটা একটা পাজী, মেয়ু-বৌ এবার বললে, জানোয়ার না হলে কেউ এমন আ-কথা-কু-কথা কয় গো! ও কি বললে, তাতে তো থোড়াই কেয়ার করি! ওকে আবার গ্রাহ্যি করে কে!

এতিয়েং'র দিকে চোখ রেখেই সোজাসুজি বললে,

তা দোষ-ঘাট যে করিনি, এমন তো নয় বাপু...কিন্তু তাই বলে পাপ করব! দুটো মরদ শুধু ছুঁয়ে ছিল। একটা ছিল খালাসী—পন্দেরো বচ্ছর বয়েস তখন মোর। তারপরে ঐ মেয়ু। ও যদি আর সবার মতো সরে পড়ত, মোর হাল কি হোত, কে বলবে। বে-থাওয়ার পর থেকে যে সতী হয়ে আছি, তাতেও মোর দেমাক নেই। জানি তো, পাপ করিনি, তার মানে তো পাপ করার সুবিধে পাইনি গো। হক্ কথা বলব বাছা—মোর পড়শীরা তো ঐ হক্ কথাটুকু বলতেও ভয় পায়। তাই না গো?

হাঁ, সাঁচ কথা বলেছ, এতিয়েং যাবার জন্যে উঠে পড়ল।

ও চলে গেল বাইরে, মেয়ু-বৌ আবার আগুন ধরাতে চেষ্টা করলে। এস্তেলকে সে দুটি চেয়ার জোড়া করে শুইয়ে দিলে। বাপ যদি মাছ ধরে বেচে আসতে পারে, তাহ'লেই তারা সুরুয়া খেতে পাবে।

বাইরে রাত হয়ে এল। তুষারময়ী রাত। এতিয়েং মুখ নীচু করে চলেছে। মন তার ভারী। ঐ মরদটার উপর রাগ নয়, বেচারী মেয়েটার জন্যে করুণা নয়। তার সেই মর্মান্তিক নিষ্ঠুরতার দৃশ্য তো মুছে গেছে, মিলিয়ে গেছে। কিন্তু এই দৃশ্যই তার মনকে বিশ্বের দুঃখ দুর্দশায় নিয়ে গিয়ে মিশিয়ে দিয়েছে। দারিদ্র্যের চরম অভিশাপ সে মর্মে মর্মে অনুভব করছে। সে মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছে, ধাওড়ায় খাবার নেই, স্ত্রীলোক আর ছেলেমেয়ের দল আজ রাতে উপোস করে থাকবে। উপোসী মানুষ এরা তবু লড়াই করে যাচ্ছে সমানে। এই ভয়াল গোধূলির আলো আঁধারিতে তার আবার সংশয় জেগে উঠল। এমনি সংশয় তো মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে—তাকে পীড়া দেয়—অস্বস্তিতে অধীর করে তোলে। কিন্তু আজকের মতো এমন তীব্র হয়ে তো সে কোনদিন আসেনি। কি এক গুরু দায়িত্ব সে কাঁধে তুলে নিয়েছে! ওদের কি আরো এমনি একরোখা প্রতিরোধের পথে ঠেলে নিয়ে যাবে? এখন তো টাকাকড়িও নেই—ধারও কারো কাছে আর পাবে না। যদি বাইরে থেকে সাহায্য না আসে কি হবে তাহলে? বুভুক্ষা যে সাহসকে নিস্তেজ করে দিচ্ছে, কুরে খাচ্ছে। হঠাৎ তার চোখের

সম্মুখে ভেসে উঠল সংকটের ছবি; ছেলেমেয়েরা ধুঁকতে ধুঁকতে মরছে, মায়েরা কাঁদছে, আর মরদরা তো রোগা হয়ে গেছে। ভূতের মতো দেখায় তাদের। ওরা আবার পিলপিল করে ফিরে চলেছে পিটে! এতিয়েং চলতে লাগল। চলেছে তো চলেছেই, পাথরের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে বার বার। তার মনে এক ভাবনা—কোম্পানির দাপট বজায় থাকবেই। সে তো শুধু তার সাথীদের জন্যে দুর্ভাগ্য বয়ে নিয়ে এল। মন ব্যথায় ভরে গেল তার।

সে মুখ তুলে তাকালে। সম্মুখেই লা-ভোরো। ঘনায়মান আঁধারে বাড়িগুলি বিরাট মিনারের মতো ফুঁড়ে উঠেছে। ফাঁকা ইয়ার্ড। তার মাঝখানে বিরাট অচল ছায়ার সার দেখে পরিত্যক্ত দুর্গের একটা কোণ বলেই মনে হয়। ওয়াইন্ডিং-ইঞ্জিন স্তব্ধ হয়ে গেলেই—এই দেয়ালঘেরা বাড়ির আত্মা যেন অন্তর্হিত হয়ে যায়। এখন এই রাতে তো জীবনের সাড়া নেই। একটা আলো জ্বলে না, একটা স্বর শোনা যায় না; নিঃসরণী নলের শব্দ এখন মুমূর্ষুর ঘড়ঘড়ানি। কোন-এক শূন্যতা থেকে সে ঘড়ঘড়ানি উঠে আসছে। ঐ শূন্যতা বুঝি একদিন ছিল পিট।

চেয়ে দেখলে এতিয়েং, আবার যেন রক্তস্রোত হৃৎপিণ্ডে বয়ে এল। মজুররা না হয় উপোস করে ধুঁকে ধুঁকে মরছে কিন্তু কোম্পানিও তো লাখ লাখ টাকার পুঁজি ভাঙিয়ে খাচ্ছে। পুঁজির বিরুদ্ধে মেহনতির লড়াই চলছে—এখানে কি কোম্পানিই জিতবে—এ কি অবশ্যম্ভাবী সত্য? যাই হোক, এই জয়লাভের জন্য চড়া দাম তাকে দিতে হবে—তাছাড়া হতাহতের সংখ্যাও ধনবাদের পক্ষে কম হবে না। আবার লড়াইয়ের মাতুনিতে সে মেতে উঠল—অনুভব করলে লড়াইয়ের প্রচণ্ডতা।—দুঃখ-দুর্দশার পালা সে নিঃশেষে চুকিয়ে দেবে এই তার কামনা—যদি তার দাম মৃত্যুও হয় সেওভি আচ্ছা। হয়তো ধাওড়াকে ধাওড়া সোজাসুজি মরতে পারে। মরুক না; ওরা তো অবিচার আর উপবাসে তিলে তিলে মরতে বসেছেই! তার বদহজমি পড়াশুনো আবার মগজে ফুট কাটতে লাগল। কত উদাহরণ! শত্রুকে প্রতিরোধ করবার জন্য কত মানুষ তো জ্বালিয়ে ছারখার করে দিয়েছে নিজেদের শহর আর নগর। মায়েরা সন্তানদের দাসত্বের নিগড় থেকে মুক্তি দেবার জন্যে পথে আছড়ে মাথার খুলি ভেঙে ফেলেছে; কত মানুষ স্বেচ্ছায় অত্যাচারীর রুটি-খাবার চাইতে প্রায়োপবেশনে প্রাণ দিয়েছে। কত অনুপ্রেরণাময় সে কাহিনী-গুলি! বিষাদের কালো মেঘের বদলে ফুটে উঠল এক রক্তিম আনন্দের বন্যা—নিজের ক্ষণিকের দুর্বলতায় নিজেরই লজ্জা হ'ল। বিশ্বাস এখন পুনরুজ্জীবিত—গর্বের দমকে হাওয়ায় তাকে ঊর্ধ্বে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। নেতৃত্বের আনন্দে সে বিভোর। ওর কথা রাখবার জন্যে ওরা জীবন অবধি উৎসর্গ করতে পারে। তার ক্ষমতার স্বপ্নে সে মশগুল—বিজয়ের রাতের স্বপ্ন এখন প্লাবিত করে দিয়েছে তার মন। কল্পনায় সে দেখছে এক মহান দৃশ্য! জাঁকজমক আছে, কিন্তু তবু অনাড়ম্বর। বিজয়ী নেতা সে, তবু ক্ষমতার রাশ ধরতে সে নারাজ—জনগণের হাতে সে সঁপে দিচ্ছে সর্বময় কর্তৃত্ব।

হঠাৎ মেয়ুর স্বরে সে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠল। সে তখন তার বরাতের কথা বলছে, একটা মস্ত মাছ ধরেছিল, সেটা বিক্রি করে পেয়েছে তিন ফ্রাঁ।

যা হোক রাতের খাবার জুটল। ধাওড়ায় চলে গেল মেয়ু। এতিয়েং বললে

সে পরে আসছে। সে এবার আঁভাতাসে গিয়ে বসে পড়ল। একজন খদ্দের বিদেয় নিতে রাসেনারকে সোজাসুজি বললে, সে প্লুচার্তকে চিঠি লিখে দিচ্ছে —সে যেন এখুনি চলে আসে। একটা বৈঠক বসাতে হবে। মঁতসুর মজুররা যদি আন্তর্জাতিক-সংস্থায় যোগ দেয় তাহলেই তাদের জয়লাভের আশা সুনিশ্চিত।

চার

ঠিক হ'ল—আসছে বৃহস্পতিবারে দুটোর সময় সভা বসবে—বিধবা দেসিরের বোঁ-জ্যো হোটেলে। তাঁর মজুর-সন্তানদের উপরে এই দুঃখ-দুর্দশা চাপিয়ে দিয়েছে কোম্পানি—এতে বিধবা মালিকানী ক্ষেপে গেছেন। আরও তাঁর রাগ—খদ্দের একেবারে নেই। এ রাগ তো এমনি-এমনি শান্ত হয় না। এমন ধর্মঘট একেবারে দেখা যায়নি—একেবারে তৃষ্ণার বালাই নেই। মাতাল যারা—তারাও বাড়িতে দরজা বন্ধ করে বসে আছে। কি জানি যদি প্রকৃতিস্থ থাকার হুকুম অমান্য করে বসে! মঁতসু পরবের দিনে ভিড়ে ভিড় থাকে এখন তো একেবারে চুপচাপ—ছন্নছাড়া। বড় বড় সড়ক বিছিয়ে আছে—লোকজন একেবারে নেই। আর কাউন্টার থেকে বীয়ারের ধারা ঝরে না, পেটেও পড়ে না। নর্দমাগুলো অবধি খটখটে শুকনো। পথ থেকে কাজিমির আর প্রোগ্রেসের সরাইখানার ভিতরটা দেখা যায়। লোকজন নেই—শুধু পানশালার পরিচারিকারা বিষণ্ণ মুখ তুলে পথের দিকে চেয়ে থাকে। মঁতসুতেও সারি সারি সরাইখানা ফাঁকা। লেফাঁত থেকে তিসোঁ-পিকেৎ পেরিয়ে তেতে-কুপে অবধি একেবারে সুনসান। সাঁ-ইলোয় যা একটু জমজমাট। সর্দাররা সেখানে এসে জমা হয়, দু-এক পাত্র চলে। ভালকান অবধি ছড়িয়ে পড়েছে নীরবতা—সেখানকার 'ভদ্রমহিলারা' এখন 'ভদ্রলোকদের' অভাবে বেকার জিরুচ্ছেন। যদিও দুঃসময়ে তাঁরা দশ সু থেকে পাঁচ সু-তে তাঁদের দক্ষিণা কমিয়ে আনতে রাজি আছেন। সমস্ত অঞ্চল যেন নিরাশার কালো মেঘে ডুবে গেছে।

হায় ঈশ্বর! বিধবা দেসির দু' হাতে উরু চাপড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, এ পুলিসের দোষ! ওরা আমাকে বেঁধে জেলে নিয়ে যাক, তবু আমি ওদের একবার দেখে তবে ছাড়ব!

তাঁর কাছে সমস্ত কর্তাব্যক্তি আর মালিকরাই পুলিস, এক ঘৃণার্হ বিশেষণ —জনগণের শত্রুদের এই নামেই তিনি ডাকেন। তাই এতিয়েঁ প্রস্তাব করতেই তিনি সানন্দে রাজি হয়ে গেলেন। তাঁর বাড়ি তো মজুরদের। ওরা বল নাচের আসরেই বৈঠক বসাতে পারে। মাগনাই পাবে। তবে আইন-মাফিক তাঁকেই নিমন্ত্রণ করতে হবে। তাছাড়া পুলিস যদি ব্যাপারটা ভাল চোখে না দেখে, না-ই দেখল। তিনি পুলিসের বিষ ঝেড়ে দেবেন না গাল দিয়ে! পরদিন এতিয়েঁ তাঁর কাছে পঞ্চাশখানা চিঠি নিয়ে এল সই করাতে। ধাওড়ায় যারা লিখতে পারে তাদের দিয়ে নকল করিয়ে এনেছে। সেই চিঠিগুলি প্রতিনিধিদের কাছে পাঠানো হ'ল। কয়েকখানা বা গেল পিটে পিটে ওদের সাথীদের কাছে। কার্যসূচী ঘটা করে জানিয়ে দেওয়া হ'ল—ধর্মঘট চালু রাখবার জন্যে আলাপ-

আলোচনা হবে; কিন্তু আসলে প্লুচার্তের জন্যেই বৈঠক ডাকা হ'ল। এতিয়েন'র আশা, ওর একটা বক্তৃতায় দলে দলে মজুর আন্তর্জাতিক সংস্থায় যোগ দেবে।

বৃহস্পতিবারের সকালে এতিয়েং উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল—তার পুরানো ফোর-ম্যান তখনো গরহাজির। অথচ চিঠিতে সে জানিয়েছিল, বুধবার সন্ধ্যায় পেঁাছবে। কি হ'ল? তার বিরক্তি ধরে গেল—ওর সঙ্গে বৈঠকের আগে একটা বোঝাপড়া করা হবে না। ন'টার সময় সে ম'তস্যুতে চলে এল। তার ধারণা, হয়তো প্লুচার্ত ভোরোতে না এসে সোজা সেখানেই গেছে।

বিধবা দেসির বললেন, না—তোমার মিতেকে তো দেখিনি গো। কিন্তু সব তৈরী। এস—দেখে যাও!

বল-নাচের কামরায় তিনি তাকে নিয়ে গেলেন। এখনো তেমনি আগেকার মতই সাজানো-গোছানো। কাগজের শিকলের মালা ঝুলছে ছাদ থেকে—মাঝ-খানে কাগজের ফুলের মালা—পিসবোর্ডের ঢালগুলি দেয়ালে সারি সারি সাজানো—আর তাদের উপরে সাধুসন্তদের নাম খোদাই-করা। শুধু বাজনদার-দের মঞ্চটি-ই নেই। সেখানে একখানা টেবিল পাতা। এক কোণে রয়েছে তিন-খানা চেয়ার। সুমুখে সারি সারি আসন।

চমৎকার, এতিয়েং বলে উঠল।

বিধবা বলে চললেন, এখানে বেশ আরামেই বসবে। যত ইচ্ছে চিল্লাও না! পুলিস যদি আসে তো আমার লাশ মাড়িয়ে তাদের ঢুকতে হবে।

উদ্বেগ তার যথেষ্টই, তবু বিধবাকে দেখে সে না হেসে পারল না; বিরাট তাঁর বপু, বিশাল দুটি স্তন। তার একটি জড়িয়ে ধরতেই একজন মানুষ লাগে। গুজব শোনা যায়, বিধবা নাকি আজকাল দুজন প্রেমিককে একসঙ্গে নিয়ে রাতে স্ফূর্তি করেন। দু'জন ছাড়া কে-ই বা তাঁর সঙ্গে যুঝবে!

এতিয়েং রাসেনার আর সুভেরিনকে ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে গেল। বিধবা মালিকানী এরই মধ্যে চলে গেছেন। বিরাট ফাঁকা হলঘরে এখন ওরা মাত্র তিন-জন। এতিয়েং বলে উঠল,

আরে—তুমিও এসে গেছ সাঙাৎ?

ভোরোর ইঞ্জিনম্যান যেন গত দু'দিন ধরে কেমন অস্থির। তার গোল-গাল মুখখানিতে সেই ভালমানষি-মাখানো হাসি আর দেখা যায় না।

এতিয়েং বললে, ভারি উদ্বেগে কাটাচ্ছি সাঙাৎ। প্লুচার্তের এখনো পাত্তা নেই।

সরাইখানার মালিক রাসেনার চোখ অন্যদিকে ফিরিয়ে বিড়বিড় করে বললে, আমি কিন্তু অবাক হইনি। সে যে আসবে না তা আমি জানি।

কি—কি বললে?

রাসেনার মন স্থির করে ফেলেছে। সোজা এতিয়েন'র মুখের দিকে তাকিয়ে সাহস করে বললে,

তোমাকে বলি সাঙাৎ। আমিও ওকে চিঠি দিয়েছিলাম—ওকে পেড়াপীড়ি করলাম, যাতে ও না আসে। তা দোস্ত—মোদের আপনা কাজ তো আপনা-আপনিই দেখেশুনে করতে হবে—একটা নিষ্ঠে পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকব কেনে?

এতিয়ে'র ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, সে রাগে কাঁপতে কাঁপতে সাথীর দিকে তাকাচ্ছে। মুখে রা সরছে না।

তাই বলে তুমি এই—এই—কাণ্ড করেছ?

আলবত করেছি! করব নি? প্লুচার্তের উপর আমার অঢেল আস্থা আছে। লোকটা যেমন চালাক-চতুর—তেমনি খাঁটি। এককাট্টা হবার মতো মানুষ। কিন্তুক তোমাদের ঐসব বুলি কপচানির দাম আমার কাছে এক আধলাও নয়। রাজনীতি—সরকার—ওসব লম্বা লম্বা বাত আমি থোড়াই কেয়ার করি! আমি চাই—মজুরদের ভালাই হোক্। বিশটা বচ্ছর খনির নীচে কাটালাম সাঙাৎ, খেটে খেটে হয়রানি হয়ে গেলাম—দুঃখ-ধান্দায় ধুঁকে ধুঁকে ম'লাম—কি হবে মোর ঐ বড় বড় বাতে! আমি কসম খেয়েছি, এখনো যারা নীচে পড়ে রইল—সেই গরীব-গুরবো সাঙাৎদের ভালাই করব। তোমাদের ঐ বুলিতে কিচ্ছু হবে না হে হবে না—তোমরা শুধু ওদের হাল আরো খারাপ করে দেবে। ওরা যখন ভুখা হয়ে আবার সুড় সুড় করে খনিতে গিয়ে সেঁধোবে—তখন তো ওদের দলে-পিষে দেবে মালিকরা। কোম্পানি ওদের লো চুষে-শুষে নেবে। আর ফেরার কুত্তাকে যেমন লাঠিপেটা করতে-করতে খোঁয়াড়ে নিয়ে যায়—তেমনি হবে ওদের হালত! কিন্তুক—বুঝলে সাঙাৎ—আমি তা হতে দেব না—না-না!

গ্যাঁট্টাগোট্টা জোয়ান রাসেনার দাঁড়িয়ে আছে। পা-দুখানা তার বেশ মোটা-সোটা, ভুঁড়ি বেরিয়ে আছে। স্বর তার চড়ছে ক্রমে ক্রমে। এই স্পষ্ট উক্তিতেই বোঝা যায় লোকটা ধীর-স্থির, বুদ্ধিশুদ্ধিও ঘটে আছে। কথার স্রোত তার স্বতঃস্ফূর্ত—নিজের বিশ্বাসেরই পরিচয় দেয়। দুনিয়ার হাল এক আঘাতে বদলে দেওয়া যাবে—মালিকের গদিতে গদিয়ান হয়ে বসবে মজুর—আপেলের মত ধন-বণ্টন হবে—একথা ভাবাও কি মূর্খতা নয়? সেদিন আসতে হয়তো এখনো হাজার হাজার বছর দেরি। তাই কেউ যেন তার কাছে ভেল্‌কিবাজির কথা না বলে! রাখ তো বাপু ওসব ভেল্‌কিবাজির কথা! সবচেয়ে বুঝদারের মতো কথা হচ্ছে—যদি নিজের নাক ভাঙতে না চাও সোজা পথে চল—সংস্কারের দাবি তোল—যতটা সম্ভব সংস্কার হোক! এক-কথায়, যখনি সুযোগ পাবে—মজুরদের হাল-হালতটা একটু-একটু করে ভাল করে তোল! সে নিজে সেই চেষ্টা-ই করছে—কোম্পানিকে দিয়ে দাবি-দাওয়া মানিয়ে নিতে হবে—এই তার কাজের খসড়া। আর মজুররা যদি একথা না বোঝে—শুয়োরের গোঁ ধরে বসে থাকে—তাহলে তো উপোস ছাড়া উপায় নেই!

সে বকে চলেছে অনর্গল। এতিয়ে'র রাগে মুখে রা সরছে না। অবশেষে সে চেঁচিয়ে উঠল,

ভগবানের দোহাই, তোমার শিরায় কি একফোঁটাও লো নেই?

ওকে চড় কষিয়ে দেয় আর কি, এতিয়েঁ অনেক কষ্টে রাগ চেপে হলের ভিতরে লম্বা লম্বা পা ফেলে সে ছুটে বেড়াতে লাগল। যেতে-যেতে দু'পাশের বেঞ্চগুলোর উপর রাগের ঝাল ঝাড়লে।

সুভেরিন বললে, দরজাটা বন্ধ করে দাও! সবাইকে একথা শোনাতে হবে না!

সে নিজেই দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে মঞ্চের উপরে একখানা চেয়ারে বসে

পড়ল। সিগারেট পাকাচ্ছে আর আড় চোখে তাকাচ্ছে দু'জনের দিকে, তার ঠোঁটে চাপা হাসি।

রাসেনার এবার বিজ্ঞজনের মতো বললে, তা যতই রাগ কর, কিন্তু এতে ফায়দা নেই সাঙাৎ! পয়লা ভেবেছিলাম—তুমি কিছুটা বুঝদার মানুষ। সবাইকে বললে চুপচাপ থাক, বাড়ি থেকে বেরুতেও বারণ করলে। যাতে হইচই না হয় নিজে তার ভার নিলে। কিন্তু এখন তো ওদের দিয়ে একটা হাঙ্গামা বাঁধাতেই চাইছ!

এতিয়েঁ ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে হলময়, সে ছুটে ছুটে একবার রাসেনারের কাছে আসছে, তার ঘাড় ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছে আর চীৎকার করে তার কথার জবাব ছুঁড়ে মারছে তার মুখের উপর।

চুলোয় যাক সব! আমি চুপচাপ থাকতে চাই। হাঁ, আমি ওদের সেই হুকুমই দিয়েছি। ওদের এখনো বুঝিয়ে বলেছি—ওরা যেন একটুও নড়ে-চড়ে না। কিন্তু ঐ মালিকরা যে তাই নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করবে তা হবে না। তুমি ঠাণ্ডা হয়ে থাকতে পার সে তো খুব ভাল কথা। কিন্তু আমার কখনো কখনো মনে হয়, বুঝি পাগল হয়ে গেছি।

এ তার স্বীকৃতি—প্রকৃত জবানবন্দী। সে নিজেকে নিয়ে বিদ্রূপে বাঙময় হয়ে উঠল। বিপ্লবের প্রথম পাঠ নিয়ে যে মোহ তার ভিতরে দেখা দিয়েছিল তা ভেঙে গেছে—তার সেই ধর্মোন্মাদনাময় এক বিশ্বভ্রাতৃত্বের স্বপ্ন আর নেই। কোথায় সেই নগরী—যেখানে ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে—যেখানে মানুষ ভ্রাতৃত্বের ডোরে বাঁধা পড়বে! এ এক চমৎকার স্বপ্ন—এক আজব পদ্ধতি—করজোড়ে বসে থাক—প্রতীক্ষা কর—আর দেখ—মানুষ মানুষকে গ্রাস করছে। অনন্তকাল ধরে চলছে এই লীলা! না-না, তোমাকে বাধা দিতে হবে, নইলে তো অবিচার চিরদিনের জন্য কায়েম হয়ে থাকবে—আর ধনীরা চিরকাল চুষে-শুষে খাবে গরীবের রক্ত। তাই তো ও নিজেকে ক্ষমা করতে পারে না। ও ছিল মূর্খ, জোর গলায় জাহির করেছিল—সামাজিক সমস্যা থেকে রাজনীতিকে দিতে হবে নির্বাসন। কিছুই তখন সে জানত না; এখন তো পড়াশুনো করেছে, বুদ্ধি পেকেছে, এখন ও গর্ব করে বলে—ওর একটা নিজস্ব মতবাদ আছে। কিন্তু বোঝাতে গিয়ে বিকৃত করে ফেলে—কতগুলি গোলমেলে শব্দ এনে হাজির করে। তাতে সবগুলো মতবাদেরই কিছু-না-কিছু থাকে। এই মতবাদের গোলকধাঁধা সে পেরিয়ে এসেছে, কিন্তু এগুলো এখনো তার বক্তৃতায় ফুট কাটে। তার নিজস্ব মতবাদের শিখরে অচল-অটল হয়ে বিরাজ করে কার্লমার্কস্-এর ভাবধারা;—পুঁজি চুরির-ই ফল, আর মজুরের কর্তব্য সেই চুরি-করা ধনের পুনরুদ্ধার। কিন্তু কার্যত সে প্রথমে গিয়ে ভিড়েছিল প্রুঁধোঁর (ফ্রান্সের বিখ্যাত সোশালিস্ট মতবাদী দার্শনিক'—অনু) দলে, পারস্পরিক আদান-প্রদানের স্বপ্নে বিভোর হয়েছিল—সে মতবাদ তো প্রতিষ্ঠা করবে বিনিময়-প্রথার এক বিরাট ব্যাঙ্ক—লেনদেন চলবে—দালালের কোন স্থান সেখানে হবে না। কিন্তু পরে লাসালের (জার্মান সোশালিস্ট মতবাদী দার্শনিক) সমবায় প্রথার দ্বারা সে আকৃষ্ট হ'ল। এই সমবায়ে সাহায্য করবেন রাষ্ট্র। এতে সারা দুনিয়াই একদিন এক বিরাট শিল্পপ্রধান নগরী হিসেবে গড়ে উঠবে। কিন্তু একদিন সমবায়-প্রথার উপর সে আস্থা হারিয়ে ফেললে—সেই একক নগরীর নিয়ন্ত্রণে আছে নানা

অসুবিধা একথা তার বার বার মনে হ'ল। সদ্য সে এসে পৌঁছেছে যৌথনীতিতে। তার দাবি—উৎপাদনের সবগুলি যন্ত্র যৌথ-মালিকানার হাতে তুলে দিতে হবে। কিন্তু সব ধারণাই তার অস্পষ্ট। স্বপ্ন কি করে সার্থক হবে সে জানে না। এখনো মানুষের অনুভূতি আর সততার উপর তার বিশ্বাস—আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রাদেশিক সম্পাদকের দৃঢ় প্রত্যয়ের সে ভাগিদার হতে পারেনি। সে তাই শুধু বলে—সরকার দখল করাই হচ্ছে প্রথম কাজ। তারপরে দেখা যাবে কি হয়।

কি হ'ল তোমার? তুমি ঐ বুর্জোয়াদের দলে গিয়ে ভিড়লে কেন? সে ছুটে ছুটে আসছে, আর রাসেনারকে চীৎকার করে জিজ্ঞেস করছে। তুমিই না বলেছিলে এর একটা হেস্তনেস্ত হওয়া দরকার!

রাসেনার একটু বা লজ্জিত।

হাঁ, সাফ জবাব আমার সাঙাৎ। যদি হেস্তনেস্তই করতে হয়, আমি ভীতুরাম হয়ে পেছিয়ে থাকব না, আগু বাড়িয়ে যাব। কিন্তু আমি সে আদমী নই সাঙাৎ, যারা জল ঘোলা করে করে ন্যাতাগিরির মাছটা গেঁথে তুলতে চায়।

এবার এতিয়ে'র লজ্জিত হবার পালা। ওদের চীৎকার থেমে গেছে। তবু প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ওরা শানিত হয়ে উঠেছে। পরস্পরের প্রতি ঘৃণায় ওরা অধীর, অস্থির। এ ওদের অতিরঞ্জিত মতবাদেরই ফলাফল। এই মতবাদগুলির স্রোতে একজন চরমপন্থী হয়ে দেখা দেয়, আবার আর-একজন প্রতিক্রিয়া হিসাবে অসাধু নরম পন্থা অবলম্বন করে। এমনি করে তাদের আসল মতবাদ থেকে দূরে সরে যায়। এর কারণও আছে। ওরা যে ভূমিকায় অভিনয় করে, তা তো নিজেদের বাছাই করা নয়। ওদের ভাবগতিক দেখে শুনে সুভোরিনের স্ত্রী মুখে ঘৃণার নিঃশব্দ ব্যঞ্জনা ফুটে উঠল। অজ্ঞাতবাস যে বরণ করে নিয়েছে, নিজে যে শহীদের মহিমাও দাবি করেনি—এ তেমনি মানুষের ঘৃণা। এ-ঘৃণা তো ভয়ংকর।

এতিয়েঁ বলে উঠল, ওঃ—আমাকেই বললে বুঝি? তোমার কি হিংসে হচ্ছে?

রাসেনার জবাব দিলে—কিসের জন্য হিংসে হবে বল তো? আমি হোমরা-চোমরা হতে চাইনে—ম'তসুতে একটা আফিস খুলে তার কর্তা হয়ে বসারও ইচ্ছে নেই।

এতিয়েঁ বাধা দিতে গেল। তার বাধা উপেক্ষা করে সে বলে চলল,

তুমি খোলাখুলি বলছ না কেন? ঐ আন্তর্জাতিক না কি—ওর জন্যে তোমার মাথা-ব্যথা হয়নি। তুমি চাও মোদের ন্যাতা হ'তে—তারপর ন্যাতা হয়ে বসে কেউকেটা আদমীর মতো চিঠি চালাচালি করবে।

বিরতি। এতিয়েঁ এবার কাঁপা গলায় জবাব দিলে,

বেশ, বেশ! আমার নিজের তো মনে হয়, দোষ করিনি। সব সময়েই তোমার কাছে পরামর্শ চেয়েছি, আমি তো জানি—আমার চেয়ে ঢের আগে তুমি লড়াই চালিয়েছ। তা তুমি যখন কাউকে সইতে পার না, এবার থেকে আমি একাই কাজ চালিয়ে যাব। পয়লাই তোমাকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, এ বৈঠক হবেই—প্লুচার্ত না এলেও হবে—তুমি না এলেও সাথীরা সবাই আসবে।

আসবে—আসবে! হোটেলওয়ালা বিড়বিড় করে বলে উঠল। বলা তো সহজ। এলেই বা কি হবে, ওদের কাছ থেকে এক পয়সা চাঁদা খসাতে পারবে?

না, খসাতে চাইও না। ধর্মঘটী মজুরদের জন্যে আন্তর্জাতিক থেকে সময় মঞ্জুর করার নিয়ম আছে। ওরা এখুনি আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে, চাঁদা পরে দিলেও চলবে।

রাসেনার একেবারে ক্ষেপে উঠল।

দেখা যাবে, দেখা যাবে!...আমি তো তোমাদের বৈঠকের একজন, আমি বৈঠকে বলব—সব কথা বলব। মোদের মিতাদের জানিয়ে দেব—তোমার বাত-চিতে ওদের মাথা ঘুরিয়ে দিতে দেব না। ওদের স্বার্থ কি বুঝিয়ে দেব। দেখি—ওরা কার পিছনে দাঁড়ায়—তোমার—না আমার? তিরিশ বছর ধরে যাকে চেনে তাকে ভুলে যে-লোকটা এক বছরের মাঝে সব ওলট-পালট করে দিলে—সব নড়চড় করে দিলে—তাকেই ওরা মেনে নেয় কি না? না না, ওসব জারিজুরি আর খাটবে না! দেখি—কে কাকে থেঁতলে-মাড়িয়ে যেতে পারে!

সে সানন্দে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। ছাদের সঙ্গে ঝুলানো কাগজের ফুলের শেকলগুলো দুলে-দুলে উঠল, দেয়ালে গিল্টি-করা ঢালগুলি উঠল লাফিয়ে। বিরাট হলে আবার নিস্তব্ধতা ঘনিয়ে এসেছে। ঘন নিস্তব্ধতা, ভারী নিস্তব্ধতা।

টেবিলের কাছে বসে সুভেরিন নিশ্চিন্তে টানছে সিগ্রেট। দু-এক মিনিট নিঃশব্দে হলঘরে পায়চারি করে বেড়াল এতিয়েঁ, তারপরে তার নিরুদ্ধ আবেগকে সে মুক্তি দিলে। মুষলধারে বর্ষণের মতো ঝরছে কথার ধারা। এ কি তার দোষ যে—কুঁড়ে, হোঁদলকুতকুত শয়তানটাকে ছেড়ে দিয়ে মানুষ-গুলোর তার দিকেই নজর পড়েছে? সে তো জনপ্রিয়তা চায়নি, কি করে যে এই জনপ্রিয়তা সে পেয়ে গেল, নিজেই জানে না। ধাওড়ায় এখন সবাই তার বন্ধু, মজুরদের তার উপর অগাধ আস্থা—এখন সে তাদের উপর খানিকটা প্রভাবও বিস্তার করেছে। কেউ যদি বলে সে নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশে এই গোলমাল খুঁচিয়ে তুলেছে, তাতে তার রাগই বেড়ে যায়। এই তো এখন সে রাগে অধীর হয়ে উঠেছে, বুক চাপড়াচ্ছে—ভাই-বেরাদারদের সঙ্গে সে যে এককাট্টা সেই হলপই করছে।

হঠাৎ সে সুভেরিনের সুমুখে এসে থেমে পড়ে বললে,

আমার কি মনে হয় জান, আমার কোন সাথীর যদি এক ফোঁটা রক্ত ঝরে, আমাকে আমেরিকায় সোজা ছুটে পালাতে হবে।

ইঞ্জিনম্যান একটু কাঁধ ঝাঁকুনি দিলে, আবার তার মুখে মুচকি হাসি।

সে বললে, রক্ত—রক্ত ঝরলে কি আসে যায়? এই মাটির কাছে যে দেনা আছে মানুষের—রক্ত ঢালতে হবে।

এতিয়েঁ অমনি যেন নিবে গেল। সে ওর মুখোমুখি চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। কনুই রেখেছে টেবিলে। সুভেরিনের সুশ্রী মুখখানি, স্বপ্নময় তার চোখ—কখনো কখনো সে চোখে লাল আলো ফুটে ওঠে—হিংস্র হয়ে ওঠে। ঐ চোখ দেখে তাই তার ভয়—ঐ চোখ যেন এতিয়েঁর ইচ্ছাশক্তির উপর প্রচণ্ড এক প্রভাব হয়ে জাঁকিয়ে বসেছে। সুভেরিন তো এখন চুপচাপ, তবু ওর ঐ

নীরবতারই যেন প্রচণ্ড শক্তি—সে যেন এতিয়েংকে জিনে নিয়েছে—সে যেন তার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছে।

সে শুধালে, তুমি আমার জায়গায় হলে কি করতে? আমি কি ঠিক করিনি? ঐ সমিতিতে নাম লেখানো কি ঠিক নয়?

সুভেরিন নিঃশব্দে একরাশ ধোঁয়ার মেঘ উগরে দিয়ে তার ধরতাই বুলি আওড়ালে, ঠিক না ছাই! এ তো বোকামি। যা হোক কিছুটা কাজেও লাগতে পারে। তাছাড়া ওদের আন্তর্জাতিকও শীগ্‌গীরই কাজ শুরু করবে। উনি তো তার ভার নিয়েছেন।

উনিটি কে?

তিনি।

সুভেরিন চাপা গলায় বললে। এ যেন ধর্ম-প্রণোদিত ভীতি—পুব দিকে সে তাকিয়ে আছে। সে বলছে ধ্বংসাত্মক লীলার নায়ক বাকুনিনের ('রুশিয়ার বিপ্লবী চরমপন্থী নেতা। সন্ত্রাসবাদে ইনি বিশ্বাসী ছিলেন'—অনু) কথা।

তিনিই শেষ আঘাত হানতে পারেন। তোমাদের ঐ বুদ্ধিজীবীর দল তো ভীরু—শুধু ক্রমিক অগ্রগতির বুলি কপচায়। তিন বছরও যাবে না, এর মধ্যে দেখবে তাঁর নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক সমস্ত পুরানো দুনিয়াটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে—তার নামটুকু অবধি মুছে ফেলবে।

এতিয়েং মন দিয়ে শুনছে—সে ঐ ধ্বংসের মতবাদ শুনতে চায়, জানতে চায়। কিন্তু ইঞ্জিনম্যান তো শুধু মাঝে মাঝে দু-একটা সংকেত দেয়—ভয়ংকরের আভাস দিয়ে যায়। সে যেন নিজের কাছে পুঁজি করে রাখতে চায় তার সবটুকু রহস্য।

কিন্তু তুমি তো কখনো বুঝিয়ে বল না? তোমাদের উদ্দেশ্য কি?

সবকিছু ধ্বংস করা। আর জাতি থাকবে না, সরকার থাকবে না, কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে না। ভগবান আর ধর্মও থাকবে না।

বেশ বুঝলাম। কিন্তু এতে কি হবে?

তাহলে আমরা সেই আদিম অবস্থায় পেঁছে যাব। সে-এক নতুন দুনিয়া—সেখানে কোন ব্যবস্থা নেই—বাঁধাবাঁধি নেই। আবার নতুন করে সব শুরু হবে।

কিন্তু কি করে তা সম্ভব হবে? কি উপায়ে?

আগুন দিয়ে, বিষ দিয়ে, ছুরি মেরে। প্রকৃত বীর তো হবে খুনী যে সেই। সে জনগণের হত্যার প্রতিশোধ নেবে খুনের বদলে খুন করে। সেই তো সক্রিয় বিপ্লবী। শুধু পুঁথির বুলি কপচায়—সে তো নয়। যারা শক্তিশালী শাসক—তাদের আমরা এই ভয়াবহ ধ্বংসলীলায় ভয় পাইয়ে দেব, আর সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠবে জনগণ।

বলতে বলতে সুভেরিন যেন ভয়ংকর হয়ে উঠল। আবেগে সে চেয়ারের উপর উঠে দাঁড়িয়েছে, তার নিষ্প্রভ চোখে ঝিলিক দিয়ে উঠছে এক রহস্যময় শিখা—তার শীর্ণ হাতে সে চেপে ধরেছে টেবিল—মনে হয় টেবিলটা বুঝি সে চাপ সইতে পারবে না—ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে। এতিয়েং অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। ভয়ে সে বিহ্বল। মনে পড়ছে সুভেরিনের মুখে আবছা শোনা গল্প—সে মাইন পুঁতেছিল জারের প্রাসাদের নীচে, পুলিসের বড় কর্তাকে বুনো শুয়োরের

মতো পেঁচিয়ে জবাই করেছিল। সুভেরিনের ছিল এক উপপত্নী—জীবনে সেই একটি মাত্র মেয়েকে সে ভালবেসেছিল—সেই মেয়েটিকে এক বর্ষার দিনের ভোরে সরকার ফাঁসি লটকে দিল। সে ছিল মস্কো শহরের সেই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে, চোখের দৃষ্টি দিয়ে শেষ চুম্বন এঁকে দিয়ে সে বিদায় নিলে।

এতিয়েঁ যেন হাত দিয়ে দূরে সরিয়ে দিলে এই ভয়ংকর ঘৃণ্য দৃশ্যাবলী—না, না! আমরা এখনো সেই ধাপে গিয়ে পেঁছুইনি। খুন আর আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া—কখনো তা হবে না! সে তো জানোয়ারের কাজ—ঘোর অন্যায়—সমস্ত সাথীরা ক্ষেপে উঠে খুনীকে গলায় ফাঁস লটকে মেরে সাবাড় করে দেবে। সে এখনো বুঝতে পারে না। তার শ্রেণীগত অন্ধ প্রবৃত্তি যেন এই পৃথিবী ব্যাপী ধ্বংসতাণ্ডবের দৃশ্যবলীর সামনে সংকুচিত হয়ে যায়। দুনিয়া যে রাইসরষের খেতের মতো দলে-পিষে ছারখার হয়ে যাবে। তার পরে কি হবে? আবার কি করে অভ্যুদয় হবে জাতিগুলির? সে তার জবাব চায়।

তোমাদের ছকটা কি বল? আমরা কোথায় ছুটে চলেছি জানতে চাই।

সুভেরিন তাকিয়ে আছে আনমনা হয়ে। চোখ তার যেন কুয়াশায় ঢাকা। সে শান্ত স্বরে এই বলে শেষ করলে,

ভবিষ্যত সম্বন্ধে যুক্তির অবতারণাই তো আমাদের মতে পাপ। ওতে বিশুদ্ধ ধ্বংসলীলা সম্পূর্ণ হবে না—বিপ্লবের গতি রুদ্ধ হয়ে যাবে।

এই উত্তরে এতিয়েঁর শিরদাঁড়া বেয়ে যেন হিম-স্রোত বয়ে গেল, তবু সে হেসে উঠল। এ-মতবাদে যুক্তি আছে এ-কথাও স্বীকার করে। এমন সহজ সরল উপায় যে মন সায় না দিয়ে পারে না। কিন্তু সাথীদের মধ্যে এ মতবাদ ছড়ালে রাসেনারের হাতের পুতুল হতে হবে। এখানে কার্যকরী উপায় ভাবতে হবে।

বিধবা দেসির এবার এসে প্রস্তাব করলেন, দুপুরের খাবার দেওয়া হোক। ওরা রাজি হয়ে দোকানে এসে বসল। ছুটিছাটার দিন ছাড়া হোটেল আর নাচঘর দুটোই বেড়া দিয়ে আলাদা করে দেওয়া হয়। এই বেড়া এবার সরিয়ে নিলেই দুটোর আর আলাদা সত্তা থাকে না। ডিম ভাজা আর পনীর খাওয়া শেষ হতেই সুভেরিন উঠে পড়তে চাইলে। এতিয়েঁ তাকে বসবার জন্যে পেড়াপীড়ি করতেই সে বললে,

কেন এখানে বসব বল তো—তোমাদের ঐ আজেবাজে কথা শুনতে? ওসব আমি ঢের দেখেছি। তাহলে আসি!

একগুঁয়ে লোকটা ঠোঁটে সিগারেট চেপে ধরে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।

এতিয়েঁর উদ্বেগ বেড়ে গেল। এখন একটা বাজে। প্লুচার্ত তাহলে নিজের কথা রাখলে না এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। দেড়টা বাজবার আগে থেকেই প্রতিনিধিদের আসা শুরু হয়ে গেল। সে নিজেই অভ্যর্থনার ভার নিয়েছে। কে আসে, কে ঢোকে দেখতে হবে। তার ভয়—কোম্পানি হয় তো তার পোষা গোয়েন্দা পাঠাবে। মজুরদের সব বৈঠকেই তো ওরা হানা দেয়। প্রতিটি নিমন্ত্রণপত্র সে পরীক্ষা করে দেখছে, কারা ঢুকছে টোক্ রাখছে। অনেকে নিমন্ত্রণপত্র নিয়ে আসে নি। তার চেনা হলে আর হাঙ্গামা নেই—তারা ঢুকে যাচ্ছে। দুটো বাজল। সে দেখলে, রাসেনারও এসে গেছে। সে কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে পাইপ টানছে আর গল্প করছে। তার তাড়া নেই। ওর এই

শান্ত ভাব দেখে এতিয়েং আরো উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। এই উদ্বেগ বেড়ে গেল যখন দেখা গেল রঙ্গ-তামাশা দেখতে জড়ো হয়েছে জাচারি, মোকে আর আরো অনেকেই। ওরা ধর্মঘটের কোন তোয়াক্কাই রাখে না। ঠুঁটো হয়ে বসে থেকে মজা দেখে। টেবিলে বসে ওরা আড্ডা দেয়, শেষ কপর্দকও উড়িয়ে দেয় মদে। সাথীদের দিকে তাকিয়ে মুখ ভেংচায়, ঠাট্টা করে। ওরা এসে জড়ো হয়েছে জঙ্গী সাথীদের বোকা বানাতে নয়, নিজেরা বোকা বনতে।

আরো পনেরো মিনিট কেটে গেল। হলঘরে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে জনতা। এতিয়েং এবার হতাশ হয়ে পড়ল। তবু ঠিক করল, সে ভিতরে গিয়ে ঢুকবে, বৈঠক শুরু করে দেবে। বিধবা দেসির পথের দিকে চেয়ে কি দেখছিলেন। তিনি এবার চেঁচিয়ে উঠলেন!

ঐ তো তোমার ভদ্দরলোক এয়েছেন গো!

সত্যই প্লুচার্ত এসে গেছে। যে-শ্যাকরা গাড়িতে সে এল, সেটায় বেতো বুড়ো ঘোড়া জোতা। সে গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল। বেশ ছিমছাম মানুষটি—একেবারে ফুল বাবুটি। তার চৌকো মাথাটা শরীরের আন্দাজে বড়। তার কালো ফ্রক-কোটে তাকে অবস্থাপন্ন মিস্ত্রী বলে মনে হয়। যেন রোববারের পোষাক গায়ে চড়িয়ে এসেছে। আজ থেকে পাঁচ বছর হ'ল মিস্ত্রীর কাজ সে ছেড়ে দিয়েছে। উকো আর ছোঁয়নি, নিজের চেহারার দিকেও নজর দিচ্ছে, চুলের উপর তো আরো কড়া নজর। বেশ নিখুঁতভাবে পরিপাটি করে বিন্যাস করে টেরি বাগায়। বক্তা হিসেবেও সে ভাল—আর তাই তার গর্বও যথেষ্ট। কিন্তু এখনো পুরোপুরি বাবু-ভায়া হতে পারেনি—এখনো হাঁটা-চলায় আড়ষ্টভাব আছে। তার চ্যাপ্টা আঙুলের নখগুলি এখনো গজায়নি—লোহায় সেগুলো খেয়ে গেছে। সে কর্মঠ, নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে সে গড়ে-পিটে রূপ দিচ্ছে। সারা অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে বেড়ানো আর নিজের মতামত ব্যক্ত করাই তার কাজ।

প্রশ্ন আর ভর্ৎসনার সুযোগ না দিয়ে দেখা হতে সে নিজেই বললে, আমার উপর চটে যেও না! কাল প্রিউলীতে বৈঠক ছিল সকালে, আবার সন্ধ্যেয় ছিল ভালেনকেতে সভা। আজ আবার মার্সিয়েনের সুভাগাঁৎদের ওখানে ছিল দুপুরে খাবার নেমন্তন্ন।......যাহোক কোনরকমে একটা গাড়ি যোগাড় করে চলে তো এলাম। আমি বড় ক্লান্ত—আমার স্বর শুনে ঠাহর পাচ্ছ না? যাহোক, ওদের কাছে তবু কয়েকটা কথা বলব।

বোঁ জ্যোর দোরগোড়ায় এসে সে আবার থেমে পড়ল।

এই দেখ দিকি! কার্ডখানা আনতে ভুলে গেছি। দেখ তো কাণ্ড!

আবার গাড়ির কাছে ফিরে গেল। গাড়োয়ান চলে যাচ্ছিল। কোচবাক্সের নীচ থেকে একটা ছোট্ট কালো রঙের বাক্স সে টেনে বার করলে। এবার বগল-দাবা করে আবার ফিরে এল।

এতিয়েং তার পেছু পেছু এল। সে উৎসাহে উদ্দীপ্ত। রাসেনার হকচকিয়ে গেছে। ওর সঙ্গে গিয়ে যে করমর্দন করবে—সে সাহসও তার নেই। কিন্তু প্লুচার্ত এরই মধ্যে ছুটে এসে তার হাত ধরে চিঠিটা সম্বন্ধে দু-একটা মন্তব্য করলে—কি ব্যাপার? বৈঠক বসবে না কেন? যখনি সম্ভব—বৈঠক বসাতে হবে। এবার হোটেলের বিধবা মালিকানী দেসির এসে শুধালেন, সে একটু

কিছু পান করবে কিনা—কিন্তু ও রাজি হ'ল না। যখন-তখন পান করার কোন মানে নেই—সে পান না করেই বক্তৃতা দিতে পারবে। চাঙ্গা হবার তার দরকার নেই, কিন্তু তার সময় অল্প, আজ সন্ধ্যের মধ্যেই তাকে জয়সেলে গিয়ে পৌঁছতে হবে। সেখানে গিয়ে লেগোজ্যর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করা দরকার।......ওরা এবার একসঙ্গেই হলে ঢুকে পড়ল। মেয়ু আর লেভাক দেরিতে এসেছে, ওরাও ওদের পেছু পেছু ঢুকে পড়ল।

এবার দরজায় চাবি পড়ল। কেউ এসে বিরক্ত না করে তাই এই ব্যবস্থা। এতে যারা রঙ্গ করতে এসেছে, তারা জো পেয়ে গেল। হাসির দমক আরো বেড়ে গেছে। জাচারি মোকেকে চেঁচিয়ে বললে, এমন যখন কাণ্ড, মনে হয় তাদের সকলের পেট করে ওরা ছেড়ে দেবে।

শ' খানেকের উপরে মজুর বন্ধঘরের গুমোট আবহাওয়ায় বেঞ্চিতে বসে আছে। শেষ নাচের উষ্ণ অনুভূতি যেন এখনো মেঝেয় ছড়িয়ে আছে। হঠাৎ কানাকানি উঠল ভিড়ে, সকলেই ফিরে তাকাল। শূন্য আসনে গিয়ে বসল নবাগতের দল। লিল-থেকে আগত ভদ্রলোকের দিকে সবাই তাকিয়ে আছে। তার কালো ফ্যাশন-দুরস্ত ফ্রক-কোট দেখে ওরা তো অবাক। বুঝি বা অস্বস্তিও ভোগ করছে।

এতিয়েঁ প্রথমেই একটা উপযুক্ত কার্যকরী সমিতি নির্বাচনের প্রস্তাব আনলে। সে একে একে নাম বলে গেল, সবাই হাত তুলে জানালে সমর্থন। প্লুচার্ত সভাপতি নির্বাচিত হ'ল, মেয়ু আর এতিয়েঁ ভোটে কার্যকরী সমিতির সদস্য পদ পেয়ে গেল। এখানকার চেয়ার ওখানে সরিয়ে নেওয়া হ'ল, এবার কার্যকরী সমিতির সদস্যরা মঞ্চের উপর স্ব স্ব আসনে অধিষ্ঠিত হলেন। ওরা সবাই দেখলে সভাপতি মহাশয় মুহূর্তের জন্য টেবিলের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেছেন। এমন কিছু ব্যাপার নয়। এতক্ষণ ধরে যে কালো বাক্সটা আঁকড়ে ধরে ছিলেন, সেইটেই তিনি এবার টেবিলের নীচে রাখলেন। এবার তাঁর পুনরাবির্ভাব হ'ল। টেবিলে হাত দিয়ে ঘা মেরে তিনি সকলের মনযোগ আকর্ষণ করলেন। তার পর ভাঙা গলায় শুরু হয়ে গেল ঃ

হে নাগরিকগণ!

এর মধ্যে, হলঘরের একটা ছোট্ট দরজা খুলে গেল। প্লুচার্তকে থামতে হ'ল। বিধবা দেসির রান্নাঘর থেকে একটা ট্রে-তে ছ' গ্লাস বীয়ার নিয়ে এসে হাজির হয়েছেন।

বললেন, আহা, বাগড়া দিলাম গো! তা কথা কওয়া কি কম মেহনত—তেষ্টায় তো গলা ফেটে যায়।

মেয়ু তাঁর হাত থেকে ট্রেটা নিয়ে নিলে। প্লুচার্ত আবার শুরু করলে। সে জানালে, মঁতসুর শ্রমিকদের কাছ থেকে দরদী অভ্যর্থনা পেয়ে সে গলে গেছে। আসতে দেরি হয়ে গেছে বলে ক্ষমা চেয়ে বললে, সে ক্লান্ত, তার গলা ভাঙা। এবার সাথী রাসেনারকে ডেকে সে জিজ্ঞেস করলে, সে কিছু বলবে কি না।

রাসেনার এরই মধ্যে টেবিলের কাছে এসে গেছে। ঠিক বীয়ারের গেলাস-গুলির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সেইটিকেই

বক্তৃতার মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করলে। অত্যন্ত সে উত্তেজিত, বলার আগে একবার গলা খাঁকারি দিলে।

ভাই সব!

পিটের মজুরদের উপর তার প্রভাব-প্রতিপত্তির মূলে আছে এই বাগ্মিতা। এমনি করে সে এক নাগাড়ে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে বলে যেতে পারে, একটুও হাঁপিয়ে পড়ে না। অংগভংগী সে করে না, ধীরস্থির হয়ে বলে যায়, মুখে ফুটে ওঠে হাসি। এমনি করে শব্দের তোড়ে ও মজুরদের ডুবিয়ে দেয়, মন্ত্রমুগ্ধ করে দেয়। ওরা একসংগে চীৎকার করে ওঠে—হাঁ, হাঁ, সাঁচ্চা জবান সাঙাৎ—সাঁচ্চা জবান! কিন্তু আজ প্রথম শব্দটি উচ্চারণ করতেই সে টের পেলে, তার বিরোধীরা দলে ভারী। তাই সে আস্তে আস্তে হুঁশিয়ার হয়ে বলতে লাগল। সে শুধু ধর্মঘট চালিয়ে যাবার কথা নিয়েই আলোচনা করতে লাগল—আশা, তুমুল হর্ষধ্বনি তাকে অভিনন্দন জানাবে। হর্ষধ্বনির সমর্থন পেয়ে সে আন্তর্জাতিক-সংস্থাকে আক্রমণ শুরু করবে। কোম্পানির শর্তে রাজি হয়ে গেলে তাদের আত্মসম্মানে লাগে একথাও ঠিক; কিন্তু আরো বেশি দিন এটা টেনে চললেই বা ভবিষ্যতে কি হবে! ভয়ংকর হয়ে উঠবে না! তাদের আত্মসমর্পণের স্বপক্ষে স্পষ্ট ওকালতি না করেও রাসেনার ওদের ভগ্নোৎসাহ করে দিলে। সে ছবির পর ছবি এঁকে চলল—ধাওড়াকে ধাওড়া বুভুক্ষায় ধুঁকছে—মরবার দাখিল হয়েছে। সে শুধালে, যারা প্রতিরোধের সমর্থন করেন—তারা কিসের উপর ভরসা করে তা করেন—সে তা জানতে চায়? তার তিন-চারজন বন্ধু তাকে বাহবা দিলে, হাততালিও পড়ল। কিন্তু এতে সারা হলঘরের থমথমে নীরবতা যেন আরো ভয়াল হয়ে উঠল। শ্রোতাদের বিরক্তি প্রতি মুহূর্তেই বাড়ছে—অ-সমর্থনের গুঞ্জন ধ্বনি আরো স্পষ্ট। হতাশ হয়ে পড়ল রাসেনার—নিজের দলে আর টানা যাবে না। এবার সে চটে উঠল। সে ভবিষ্যদ্‌বাণী করলে, বাইরের এই আন্দোলনকারীদের কথায় যদি মাথা ঘুরে যায়, তাহলে ওদের আর দুঃখের অবধি নেই। এরই মধ্যে শ্রোতাদের তিনভাগের দু-ভাগ উঠে দাঁড়িয়েছে। তারা চটে গেছে, আর কিছু ওকে তো বলতে দেবে না। সে তো তাদের অপমানই করছে। তাদের অপোগন্ড শিশুর শামিল মনে করছে—তারা যেন কিছুই জানেনা, বোঝে না। রাসেনার কিন্তু তবু থামলে না—তুমুল হুলুস্থুলের ভিতরেও সে বলে চলেছে। বারে বারে এক-এক ঢোক বীয়ার গিলে নিচ্ছে—সে জোর গলাবাজি করে জাহির করছে—তার কর্তব্য থেকে তাকে বিচ্যুত করে এমন মানুষ এখনো জন্মায় নি!

প্লুচার্ত এবার উঠে দাঁড়াল। সভাপতি হিসেবে তার কাছে ঘন্টি নেই—তাই সে টেবিল চাপড়ে ভাঙা গলায় চীৎকার করে উঠল,

হে রাষ্ট্রের নাগরিকগণ!

অনেক করে সভা কিছুটা শান্ত হ'ল। সভায় আলোচনার ফলে ঠিক হ'ল—রাসেনারকে আর বলতে দেওয়া হবে না। ম্যানেজারের সংগে সাক্ষাৎকারে যারা পিটের প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছিল—তারাই এবার নেতৃত্ব নেবে। মজুররা তো উপোসে-উপোসে ক্ষেপে আছেই তার উপরে এসেছে ভাবধারার উদ্দীপনা। ভোটে ওরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে এসে গেল।

লেভাক রাসেনারের দিকে তাকিয়ে মুঠো নেড়ে চেঁচিয়ে উঠল—তোর ঘরে খাবার আছে-কিনা—তুই তো থোড়াই কেয়ার করিস!

এতিয়েঁ ঝুঁকে পড়ে মেয়েকে ঠাণ্ডা করলে। সে রাসেনারের এই ভণ্ডামিতে চটে লাল হয়ে উঠেছে।

প্লুচার্ত আবার বলে উঠল, হে রাষ্ট্রের নাগরিকগণ, আমি কি কিছু বলতে পারি।

সঙ্গে সঙ্গে নীরবতা ছেয়ে গেল। প্লুচার্ত বলতে লাগল। ভাঙা স্বর। বোঝা যায়, বলতে কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু এ ব্যাপারে সে অভ্যস্ত। সব সময়েই সে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায়—তার কণ্ঠনালীর এই রোগ বক্তৃতারই এক অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আস্তে আস্তে গলার স্বর চড়ছে, দুঃখের ব্যঞ্জনা ফুটে উঠছে। সে দাঁড়িয়ে আছে হাত ছড়িয়ে দিয়ে, বক্তৃতার গমকের সঙ্গে সঙ্গে কাঁধে পড়ছে ঝাঁকুনি। তার বক্তৃতা যেন ধর্মযাজকের উপাসনা-বেদীর কথা মনে পাড়িয়ে দেয়। ধর্মের বাণী যেমন করে উচ্চারিত হয়, তেমনি ঢঙে সে তার প্রতি কথার শেষে গলার স্বর খাদে নামিয়ে আনছে, একঘেয়েমি দেখা দিচ্ছে, তবু সে এক-ঘেয়েমিতে আছে ধর্মোন্মাদনা—আছে দৃঢ়তা।

আন্তর্জাতিক-সংস্থার মহিমা আর সুবিধা-সুযোগ কেন্দ্র করেই তার বক্তৃতা; প্রতিটি নতুন জায়গায়ই সে ঐ আলোচনা দিয়েই শুরু করে। তাৎপর্য সে বোঝায়ঃ—শ্রমিকের মুক্তিই তার মহান লক্ষ্য। এর বিরাট কাঠামোটা সে চোখের সামনে তুলে ধরে। সবচেয়ে নীচে কমিউন—তার উপরে প্রদেশ—তার উপরে আছে জাতি—আর সবার উপরে সমগ্র মানবতা। আস্তে আস্তে হাতনাড়ে, একের পর এক ধাপগুলো দেখিয়ে দেয়—এমনি করে ভবিষ্য পৃথিবীর এক বিরাট উপাসনা মন্দির সে গড়ে তোলে। তার পরে আসে সংস্থার নিয়ন্ত্রণের কথায়। সে এর আইন-কানুনগুলো পড়ে শোনায়, কংগ্রেসের অধিবেশনগুলির কথা বলে—তার লক্ষ্য আর উদ্দেশ্যের তাৎপর্য বুঝিয়ে দেয়, কার্যসূচীর কথা বলে। মজুরি সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা বরবাদ করার ব্যাপারে এসে যায়—মজুরি-ব্যবস্থাটাই নাকচ করে দিতে চায়। হাঁ, তখন আর জাতি থাকবে না। দুনিয়ার মজুররা সাম্যের প্রয়োজনে—ন্যায় বিচারের প্রয়োজনে এক হয়ে উঠবে—পচাগলা মধ্যবিত্ত সমাজকে দূর করে দিয়ে সেখানে বসাবে স্বাধীন সমাজ। সেখানে যে কাজ না করবে, সে কিছুরই ভাগীদার হতে পারবে না! এখন তো সে গর্জাচ্ছে, তার নিঃশ্বাসে নানা রঙের কাগজের শিকলিগুলো নড়ে নড়ে উঠছে। নীচু ছাদে প্রতিধ্বনি তুলছে তার স্বর।

মুখের সমুদ্রে যেন জোয়ার এল। বিভিন্ন স্বরে উঠল চীৎকারঃ—

সাচ্চা জবান সাঙাৎ! আমরা তোমার দলে আছি!

প্লুচার্ত বলে চলেছে। তিন বছরের ভিতরে তামাম দুনিয়া দখল হয়ে যাবে। এরই মধ্যে যেসব দেশ দখল হয়েছে তারই হিসেব দাখিল করলে। চারিদিক থেকে নতুন করে সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। কোন ধর্মই এমন করে পৃথিবীতে দীক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে নি। যখন তারা প্রভু হবে, ঐ কল-কারখানার মালিকদের আইন-কানুন বদলে দেবে। টুঁটি টিপে ধরবার পালা আসবে তাদের।

হাঁ, হাঁ। ওরা তখন সুড়সুড় করে খাদে নাববে!

হাত নেড়ে প্লুচার্ত চুপ করতে বললে। এবার ধর্মঘটের কথায় এসে গেছে। নীতি হিসেবে সে ধর্মঘটের বিরুদ্ধে। এতে বড় ধীরে কাজ হয়, মজুরদের দুঃখ দুর্দশারও অবধি থাকে না। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত এর চেয়ে সেরা উপায় খুঁজে না পাওয়া যায়, ততদিন পর্যন্ত একে তো মেনেই নিতে হবে। ধর্মঘট অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলে মন দৃঢ় করে তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এর একটা সুবিধেও আছে। ধনবাদী কাঠামোটায় এতে খানিকটা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এবং ধর্মঘটের সময়ে এই আন্তর্জাতিক সংস্থাই ধর্মঘটীদের কাছে ভাগ্য-বিধাতার রূপ নিয়ে দেখা দেয়। সে কয়েকটা উদাহরণ দিলে। ব্রোঞ্জের কারখানার মজুররা যখন প্যারীতে সেবার ধর্মঘট করলে, মালিকদের সবগুলো দাবিই তৎক্ষণাৎ মেনে নিতে হ'ল। আন্তর্জাতিক-সংস্থা সাহায্য করছে জেনে ওরা ভয় পেয়ে গিয়ে দাবি মেনে নিলে। লণ্ডনেও এই সংস্থা খনির মজুরদের রক্ষা করেছিল। মালিকরা বেলজিয়াম থেকে একদল মজুর আমদানি করেছিল, তাদের এই সংস্থা থেকে রাহা খরচ দিয়ে আবার দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। শুধু এই সংস্থায় যোগ দিতে হবে মাত্র, তাহলেই কোম্পানি টলমলিয়ে উঠবে। আর মজুররা তখন আর একক হয়ে থাকবে না—তারা হবে বিরাট শ্রমিক বাহিনীরই এক অংশ। তারা পরস্পরের জন্য বরং মৃত্যু বরণ করবে, তবু ধনবাদী সমাজ-ব্যবস্থার দাস হয়ে থাকবে না।

তুমুল হর্ষধ্বনিতে বক্তৃতার স্রোতে বাধা পড়ল। রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে নিলে। মেয়ুর দেওয়া বীয়ারের গেলাসও প্রত্যাখ্যান করছে। যখন আবার সে শুরু করতে গেল, ফিরে-ফিরতি জিগির উঠল।

সে তাড়াতাড়ি এতিয়েঁকে বললে, ওদের বাগে এনেছি। জলদি জলদি কার্ড বার করি সাঙাৎ!

টেবিলের নীচে যেন ডুব দিয়ে সে সেই খুদে কালো বাক্সটা বার করে নিয়ে এল।

সে আবার চেঁচিয়ে উঠল, ভাইসব। এই সদস্য হবার কার্ড। তোমাদের প্রতিনিধিরা আমার কাছে আসুন, আমি তাঁদের হাত দিয়ে বিলি করার ব্যবস্থা করছি।......তার পরে অন্য সব বন্দোবস্ত হবে।

রাসেনার লাফিয়ে উঠে প্রতিবাদ জানালে। এতিয়েঁ উত্তেজিত; সেও এক বক্তৃতা দিলে। লেভাক হাওয়ায় ঘুষি মারছে, যুদ্ধং দেহি তার ভাবখানা। মেয়ুও দাঁড়িয়ে উঠে কি যেন বলছে। কিন্তু কেউ একটা কথা শুনতে পাচ্ছে না। এই হুলুস্থুল মেঝে থেকে ধুলো উড়ছে। গত নাচের আসরের জমা-করা ধুলা উড়ে উড়ে আসছে হাওয়া বিষিয়ে তুলছে খালাসী আর মাল-কাটা কুলির গায়ের গন্ধে।

হঠাৎ সেই খুদে দরজাটা আবার খুলে গেল। বিধবা দেসির দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর ভুঁড়ি আর স্তনে জুড়ে আছে দরজাখানা। বাজ-পড়া চীৎকারে তিনি সবাইকে বললেন,

দোহাই তোমাদের একটু চুপ কর তো বাপু! পুলিস এয়েছে!

এই তল্লাটের পুলিস সুপার এসে গেছেন। সভার একটা বিবরণী তৈরি করতে হবে, সভা ভেঙে দেওয়ারও তাঁরই উপরে হুকুম। তবে সে ব্যাপারে

দেরি হয়ে গেছে। চারজন পুলিস তাঁর সঙ্গে। বিধবা হোটেলওয়ালী পাঁচ মিনিটের জন্যে দরজায় তাদের দেরি করিয়ে দিলেন। তিনি জানালেন, নিজের বাড়িতে বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করে আনবার তাঁর এখতিয়ার আছে। কিন্তু পুলিস তবু জোর করে ঢুকে পড়ল। তাই তিনি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন তাঁর সন্তানদের হুঁশিয়ারি দিতে।

বললেন, এই পথে সরে পড় বাছারা! একটা পাজী উঠোনে ঘাঁটি আগলে বসে আছে। কিন্তু তাতে কি করবে, পেছনে গলির দিকে পথ আছে। জলদি কর!

সুপার এরই মধ্যে দরজায় জোরে জোরে ঘা মারতে শুরু করে দিয়েছেন। দরজা তবু বন্ধ। তিনি দরজা ভেঙে ফেলবেন বলে ভয় দেখালেন। কোন গোয়েন্দা হয়তো বৈঠকের কথা ফাঁস করে দিয়েছে। তাই তিনি চেঁচিয়ে বার-বার বলছেন, এ বৈঠক বে-আইনী। বহু মজুর এখানে নিমন্ত্রণ না পেয়েও এসে জড়ো হয়েছে।

হলঘরে গোলমাল বেড়ে গেল। এমনি করে পালাতে ওরা পারে না; আন্তর্জাতিকে যোগদান এবং ধর্মঘট চালু রাখা সম্বন্ধে এখনো ভোট নেওয়া হয়নি। সবাই একসঙ্গে কথা কইছে। শেষে সভাপতি ঘোষণার দ্বারা ভোট গ্রহণের রীতির উদ্ভাবনা করলেন। সারি সারি হাত উঠল—প্রতিনিধিরা চটপট জানালেন—তাঁদের অনুপস্থিত সাথীদের পক্ষ হয়েও তাঁরা আন্তর্জাতিকে যোগ দেবেন বলে সাব্যস্ত করেছেন। এমনি করে মঁতসুর দশ হাজার মজুর আন্তর্জাতিকের সভ্য হয়ে গেল। পশ্চাৎ অপসারণের পালা শুরু হয়ে গেল। তাদের অপসারণের পথ আগলে রইলেন বিধবা দেসির। দরজায় পিঠ দিয়ে তিনি দাঁড়ালেন। তাঁর পিছনে দরজার উপর পুলিসের রাইফেলের কুঁদোর দমাদম ঘা পড়তে লাগল। মজুরেরা বেঞ্চির সারি ডিঙিয়ে একে একে রান্না ঘরের দরজা দিয়ে পালাতে লাগল। রাসেনার পালাবার দলেও পয়লা। তার পিছনে পিছনে ছুটল লেভাক। সে যে তাকে কত গালমন্দ করছিল, সেকথাও এখন ভুলে গেছে। তার এখন পরিকল্পনা—কি করে রাসেনারের কাছ থেকে এক গেলাস বীয়ার আদায় করে নিজেকে চাঙ্গা করে তোলে। এতিয়েঁ খুদে বাক্সটা তুলে নিয়ে প্লুচার্ত আর মেয়ুর সঙ্গে দাঁড়িয়ে রইল। সব চেয়ে শেষে পালানোই সম্মানার্হ বলে ওদের কাছে মনে হ'ল। ওরা মিলিয়ে যেতেই, বন্ধ তালা খসে পড়ল। সুপার এসে একেবারে বিধবার মুখোমুখি দাঁড়ালেন। বিধবা তখনো স্তন আর ভুঁড়ি দিয়ে প্রতিরোধ-প্রাকার তুলে দাঁড়িয়ে আছেন।

তিনি বললেন, আমার বাড়ি তছনছ করে ভেঙেচুরে আপনার কি লাভ হ'ল? দেখুন তো কেউ নেই!

সুপার একটু ঢিলেঢালা গোছের মানুষ। হইচই ভাল বাসেন না। শুধু বিধবা হোটেলউলীকে হাজতে পোরার হুমকি দেখিয়েই ক্ষান্ত হলেন। তারপরে পুলিস চারজনকে নিয়ে বিবরণ লিখতে চলে গেলেন। জাচারি আর মোকে তো ঠাট্টাই শুরু করে দিলে—এমন হাতিয়ারধারী ফৌজদের কেমন বোকা বানিয়েছে সাঙাৎরা! কেমন জব্দ হয়েছে!

বাইরে গলিপথে বাক্সটা নিয়ে বড় বিপদেই পড়ল এতিয়েঁ। তবু সে সাথীদের পেছন-পেছন ছুটে চলল। হঠাৎ পিয়েরোঁর কথা মনে পড়ল—সে

শুধালে—পিয়েরোঁ এল না কেন? মেয়ুও ছুটছিল তার পাশে পাশে—সে বললে তার অসুখ করেছে। সময়মতো এমন অসুখ সবারই হয়। আসল কথা, সে নিজে হাঙগামায় জড়িয়ে পড়তে চায় না। প্লুচার্তকে ওরা থেকে যেতে বললে। সে তখনো ছুটছে। ছুটতে-ছুটতেই বললে, তার এখুনি জয়সেলে যাওয়া দরকার। সেখানে লোগেজ্যো তার পরামর্শের জন্য অপেক্ষা করছে। ওরা আর কি করবে, চেঁচিয়ে বিদায়-সম্ভাষণ জানালে। গতি একটুও না কমিয়ে ওরা মঁতসুর ভিতর দিয়ে পাঁই পাঁই করে ছুটে চলল। হাঁপাতে হাঁপাতে কয়েকটা কথা হ'ল মাত্র। এতিয়েঁ আর মেয়ু তবু খুশী—তারা তাদের জয়লাভ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত। হাসছে তারা। আন্তর্জাতিক যখন সাহায্য পাঠাবেন, তখন কোম্পানিকে এসেই তাদের কাজ শুরু করবার জন্য কাকুতি-মিনতি করতে হবে। এই যে আশা উথলে উঠছে বুকে, এই যে পাথুরে পথে জুতোর খটাখট আওয়াজ তুলে ওরা চলেছে—কিন্তু শুধু কি এই? আরো কিছু যেন আছে—সে যেন পরম গম্ভীর—সে যেন রুদ্র—প্রচণ্ড ঘূর্ণী হাওয়ায় তার চরম আওয়াজ উঠছে—সে বুঝি এই কয়লা-কুঠির দেশের ধাওড়ায়-ধাওড়ায় আগুন জ্বালিয়ে দেবে।

পাঁচ

পক্ষকাল চলে গেছে। জানুআরি মাসের এখন শুরু। বিস্তীর্ণ উপত্যকা কুয়াশায় কুয়াশায়—যেন অবসাদগ্রস্ত। দুঃখদুর্দশা চরমে এসে ঠেকেছে; ধাওড়াগুলি ঘণ্টায় ঘণ্টায় গোঙিয়ে উঠছে। আকাল বাড়ছে। আন্তর্জাতিক লণ্ডন থেকে পাঠিয়েছেন চার হাজার ফ্রাঁ—তাতে তিনদিনের রুটির খরচাও কুলোয় নি। তারপর থেকে তো হরিমটর চলছে। আন্তর্জাতিকের প্রতি বিরাট আশা আর আস্থা এখন মৃত, সকলের সাহস উবে গেছে। এখন কার উপর ভরসা করবে, তাদের সাথীরা তো তাদের ত্যাগই করে গেল? তারা যেন দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এই দুর্দান্ত শীতে দিশে হারিয়ে ঠুঁটো হয়ে বসে আছে।

মঙগলবার দিন ২৪০ নম্বর ধাওড়ার নাভিশ্বাস দেখা দিল। চরমে এসে পৌঁছেছে তাদের দশা। এতিয়েঁ আর প্রতিনিধিরা দ্বিগুণ উৎসাহে চেষ্টা করছে। আশেপাশের শহরগুলিতে চাঁদা তোলার নতুন তালিকা তৈরি হয়েছে। প্যারী অবধি গিয়ে তারা হাজির হবে। চাঁদা তোলা শুরু হয়ে গেল, সভা বসল। কিন্তু তবু কাজ তেমন হয়নি। কারণ, প্রথমে জনমতের প্রবল সাড়া মিলেছিল, কিন্তু ধর্মঘট ঢিমে তেতালা চালে চলতে দেখে তারা ঝিমিয়ে পড়েছে। এতদিনে একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটল না—এই তাদের আপসোস। সামান্য যা চাঁদা উঠেছে, তাতে সবচেয়ে গরীব পরিবারগুলোরও কুলোয় নি। বাকি যারা তারা কাপড়-চোপড় বাঁধা দিয়ে, বাড়ির জিনিসপত্র আস্তে আস্তে বেচে-বেচে চালাচ্ছে। সবকিছুই এখন দোকানে গিয়ে উঠছে—গদি থেকে পশম, রান্নাঘরের বাসন-কোসন এমন কি আসবাবপত্র অবধি। এমনি করে ঘরের জিনিসপত্র বেচে ওরা রক্ষা পাবে এই ছিল ওদের আশা। কারণ মাইগ্রাতের দাপটে মঁতসুর

অন্যান্য খুদে দোকানীরা একেবারে নাজেহাল হয়ে পড়েছিল। তারা খদ্দেরকে আবার ধার দিয়ে ফিরে আসার লোভ দেখাতে লাগল। এক হপ্তা ধরে মুদি ভার্দক আর রুটিওয়ালা ক্যারুবল, স্মেলতে দোকান খুলে জাঁকিয়ে বসল। কিন্তু তারা নিজেরাই বাজারে ধার পায়না—ধার দেবে কোথা থেকে! একে একে তিনটি দোকানেই ধারে বিক্রি বন্ধ হয়ে গেল। আদালতের পেয়াদার তো পোয়াবারো। এতে মজুরদের ঋণের বোঝা বাড়ল, এই ঋণ বছরের পর বছর ধরে মজুরদের কাঁধে চেপে রইল। আর কোথাও ধারদেনারও উপায় রইল না, বিক্রি করবার মতো বাকি রইল না একটা সস্‌প্যান অবধি; এখন তারা এক কোণে শুয়ে পড়বে-আর ধুঁকতে ধুঁকতে মরবে কুকুরের মতো।

নিজের গায়ের মাংস বিক্রি করতে পারলে এতিয়েঁ তাও করত। নিজের ভাতা সে নেয় না, ভাল কোট আর ট্রাউসার বাঁধা রেখেছে মার্সিয়েনের এক দোকানে। মেয়ুদের হাঁড়ি যে এখনো কিছুদিন চড়ছে এর জন্যে সে খুশী। শুধু রেখেছে জুতো জোড়া—কেন রেখেছে জিজ্ঞেস করলে বলে, ভাল করে দাঁড়াতে হবে তো। তার সব চেয়ে আপসোস, ধর্মঘট তাড়াতাড়ি এসে গেছে। আখেরী-তহবিলে তেমন টাকা জমতে পায়নি। তার মতে—এইটেই এই দুর্দশার জন্য দায়ী। মজুররা যদি প্রতিরোধ করবার মতো রুধির পায়, তাহলে তারা মালিককে ঢিট্ করে দিতে পারে। সুভৈরিনের কথাও মনে পড়ছে। সে বলেছিল, কোম্পানি এই ধর্মঘটটা বাঁধিয়ে দিয়ে আখেরী-তহবিলের আখের মাটি করে দেবে!

সারা ধাওড়া আর গরীব-গুর্বোদের দশা দেখে মন তার হতাশ হয়ে যায়। ওদের খাবার নেই, জ্বালানি নেই! হতাশ হয়ে ভাবতে ভাবতে সে বেরিয়ে পড়ে। দূরে দূরে চলে যায়, শ্রান্ত হয়ে পড়ে। একদিন সন্ধ্যেয় রিকুইলারের পাশ দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে সে দেখলে—পথের পাশে এক বুড়ী অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। নিশ্চয়ই উপোসে উপোসে মরতে বসেছে! সে তাকে তুলে নিলে, বেড়ার ওধারে একটি মেয়েকে দেখতে পেয়ে ডাকলে।

মোকে-ছুঁড়িকে চিনতে পেরে বললে, আরে তুমি! এস, এস আমার সঙ্গে একটু হাত লাগাও। বুড়ীকে একটু-কিছু খাওয়াতে হবে।

মেয়েটার চোখ করুণায় আর্দ্র হয়ে এল। সে ছুটে বাপের নড়বড়ে ডেরায় ঢুকে পড়ে কিছুটা জিন আর রুটি নিয়ে এল। জিন পান করে চাঙ্গা হয়ে উঠল বুড়ী। সে কথা না বলে রুটি গোগ্রাসে গিলছে। ঐ কর্গানির ওপাশে যে ধাওড়া আছে সেখানকার এক মজুরের মা এই বুড়ী। জয়সেল থেকে ফিরতি পথে সে এখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এক বোনের কাছে গিয়েছিল কয়েকটা টাকা ধার করতে, নিষ্ফল হয়েই ফিরছিল। এমন সময় এই কাণ্ড। রুটি খেয়ে বুড়ী চলে গেল। কিন্তু এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হয়নি। টলতে টলতে চলেছে।

এতিয়েঁ দাঁড়িয়ে রইল রিকুইলারের ধ্বংসস্তূপে—শেডগুলো ধসে পড়েছে, কাঁটাঝোপে আধখানা ঢাকা পড়ে গেছে।

মেয়েটা হেসে বললে, আসবেনি—একটু যাহোক কিছু মুখে দিয়ে যাবে নি? দ্বিধাগ্রস্ত এতিয়েঁ। জুজুর ভয় নাকি?

এতিয়েঁ ওর পেছু পেছু ডেরায় ঢুকে পড়ল। ওর হাসি তার মন কেড়ে নিয়েছে—ওযে এমন স্বচ্ছন্দে রুটি দাতব্য করতে পারে এতেও সে অভিভূত।

বাপের কামরায় বসিয়ে অতিথি সৎকার সে করলে না, নিজের কামরায় নিয়ে গেল। দুটো গেলাসে জিন ঢেলে নিলে। ভারি ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে ঘরখানা। এতিয়েঁ তো ওকে প্রশংসাই করলে। অভাব এ বাড়িতে নেই। বাপ এখনো লা ভোরোতে সইসের কাজ করছে। আর মেয়েটা বললে, ও নিজেও হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসে নেই। ধোপার কাজ নিয়েছে। এতে দিন গেলে তিরিশটা করে সু মেলে। মরদদের সঙ্গে স্ফূর্তি করে বেড়ায় বলে সে কুঁড়ের ধাড়ী নয়।

হঠাৎ সে এসে এতিয়েঁর কোমর জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, বল তো নাগর, আমাকে কেন তোমার মনে ধরে না?

এতিয়েঁও না হেসে পারলে না, এমন মিষ্টি করে বললে ছুঁড়িটা।

বাঃ রে, মনে ধরে না কে বললে! এতিয়েঁ জবাব দিলে।

না—ধরে না—আমি যেমন করে চাই—তেমনটি তো নয়...জান—আমি মরে যাচ্ছি। এস না নাগর...আমার যে কত ভাল লাগে!

সত্য কথা। ছ'মাস ধরে মেয়েটা ওকে চাইছে। ও জড়িয়ে ধরে আছে এতিয়েঁকে—এতিয়েঁ দেখছে। মুখ ওর দিকে তুলে ধরেছে মিনতি আর প্রেম-ভরে। এতিয়েঁ তো গলে গেল। ওর ঐ পুরন্ত গোলগাল মুখখানায় সৌন্দর্যের লেশমাত্র নেই—রংও ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, কয়লার খনির অন্ধকারে বিবর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু তবু চোখে তো দেখা দিয়েছে আগুনের শিখা। তার সমস্ত দেহ চুইয়ে ঝরে পড়ছে কামমোহ—তাই তো ওকে এতো তাজা, এত কচি লাগে। এমন কামময় বিনতি—এমন উৎসর্গ—একে কি সে ফিরিয়ে দিতে পারে?

মেয়েটি খুশীতে ডগমগ হয়ে উঠে বললে, তুমি রাজি নাগর—রাজি? সে এবার কুমারীর মূর্চ্ছাহত কুণ্ঠায় নিজেকে সঁপে দিলে। এ যেন তার প্রথম আস্বাদ—আগে আর যেন কোন পুরুষকে সে পায় নি। এতিয়েঁ চলে যাবে এবার। মেয়েটা নিজেই কৃতজ্ঞতায় অধীর হয়ে তাকে ধন্যবাদ জানালে, তার হাতে বার বার চুমু খেলে।

এতিয়েঁ এ সৌভাগ্যে একটু বা লজ্জাই পেল। মোকে-ছুঁড়িকে সম্ভোগ করে কেউ বড়াই করে না। সে পথে চলতে-চলতে বার বার দিব্যি গাললে, এমন ধারা কাণ্ড আর ঘটতে দেবে না। কিন্তু বন্ধুত্ব-মাখা স্মৃতি রয়ে গেল। বহুৎ আচ্ছা ছুঁড়ি!

ধাওড়ায় ফিরে খারাপ খবরই সে পেল। আর সঙ্গে সঙ্গে ভুলে গেল প্রেমের এই ক্ষণিক অভিযানের কথা। গুজব রটে গেছে, কোম্পানি নাকি কয়েকটা শর্ত মানতে রাজি আছে। যদি প্রতিনিধিরা ম্যানেজারের সঙ্গে আবার দেখা করার চেষ্টা করে তাহলেই নাকি ব্যাপারটার একটা সুরাহা হয়। অন্তত খনির সর্দাররা এই গুজবই রটাচ্ছে। আসল কথা এই যে, এই লড়াইয়ে খনির মজুরদের চেয়ে খনির মালিকদের ক্ষতি হচ্ছে ঢের বেশি। দু'পক্ষের এক-গুঁয়েমিই পরিস্থিতি ঘোরাল করে তুলছে। শ্রমিক মরছে উপোস করে, আর পুঁজিবাদ ধ্বংস হতে বসেছে। এক-এক দিনের কাজের বিরতিতে লাখো লাখো টাকার ক্ষতি হচ্ছে। প্রতিটা কল এখন মৃত। যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল নষ্ট হচ্ছে। যে-টাকা ঢালা হয়েছিল, সে-টাকা যেন বালিতে জলের ধারার মতো শুষে নিয়েছে।

পিটের ইয়ার্ডে-ইয়ার্ডে সঞ্চিত কয়লার স্তূপ এখন নিঃশেষিত; খদ্দেররা এখন ভাবছে কয়লার খোঁজে বেলজিয়ামে ছুটবে কিনা। তাহলে তো এক কান্ডই হয়। ভবিষ্যতে ওখান থেকেই প্রতি মুহূর্তে আসবে হুমকি। কোম্পানি সাবধানে চেপে রাখলেও সবচেয়ে তার ভয় হয়েছে, গ্যালারি আর খাদের দশা দেখে। সর্দাররা তেমন করে মেরামত করাতে পারছে না—রোলার কাজ ভাল হচ্ছে না—কাঠ খোয়ে যাচ্ছে। সবসময়েই তো ধস নামছে। শীগ্‌গীরই এমন দশা হবে যে, মাল-কাটা শুরু হবার আগে মাসের পর মাস ধরে মেরামত করতে হবে। এরই মধ্যে খবরটা চাউর হয়ে গেছে: ক্রেভেকুরে তিনশো গজ পথ নাকি বসে গেছে—সিকোঁ-পমেসের স্তরে ঢোকার পথ বন্ধ। মাদেলিনে মাউগ্রেতুত স্তরে ধস নেমেছে। সেখানে এখন থইথই জল। কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটা স্বীকার করতে নারাজ, কিন্তু হঠাৎ দু-দুটো দুর্ঘটনায় বাধ্য হয়ে তাঁদের স্বীকার করতে হয়েছে। এই তো সেদিন ভোরে, পিয়োলে'র উত্তরে কাঁথির উপরের মাটি ফেটে চৌচির হয়ে গেল। তার পরেই তো ধস নামল। তার পরের দিন লা ভোরোর খনি বসে গেল। ধাওড়ার একটা কোণ এমন কেঁপে উঠল যে দু'টো বাড়িই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

এতিয়েঁ আর তার সাথীরা পরিচালকদের মরজি না জেনে আর এগুতে সাহস পেল না। দাঁসারকে তারা জিজ্ঞেস করেছিল, কিন্তু সে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল। সে মাত্র বললে, মন কষাকষিটা বড় দুঃখের ব্যাপার। কিন্তু স্পষ্ট কিছু শোনা গেল না। শেষে ওরা ঠিক করলে, মঁসিয়ে হানাবুর কাছেই যাবে। এতে তাদের স্বপক্ষে যুক্তি থাকবে। কেউ বলতে পারবে না যে, কোম্পানিকে ওরা তার ভুল স্বীকার করবার সুযোগ দেয় নি। কিন্তু শপথ করলে, কোন বশ্যতা স্বীকার করবে না। তাদের দাবিদাওয়া তো ন্যায়সংগত, ঐগুলি তারা কিছুতেই ছাড়বে না।

মঙ্গলবার সকালে সাক্ষাৎকার হয়ে গেল। ধাওড়ার চরম দশা সেদিন ঘনিয়ে এল। প্রথম সাক্ষাৎকারের চেয়ে এখানে একটু সৌজন্যের ঘটাও দেখা গেল। এবারেও মেয়ুই বক্তা। সে বললে, উপরওয়ালারা নতুন কিছু বলতে চায় কিনা—সাথীরা তাকে তাই জানতে পাঠিয়েছে। প্রথমে মঁসিয়ে হানাবু অবাক হবার ভান করলেন। তাঁর কাছে তো কোন হুকুম আসে নি—যদি কুলিরা তাদের এই বিদ্রোহ না থামায় তাহলে কিছুই রদবদল হবে না।...উপরওয়ালার এই একগুঁয়েমিতে কুফলই ফলেছে। প্রতিনিধিরা যদি আপসের কথাও বলতে চায়—তাহলেও উপরওয়ালার ব্যবহারে তারা আরো চটে উঠবে। ম্যানেজার অবশেষে পারস্পরিক একটা আপসের ভিত্তি খুঁজেপেতে বার করতে চেষ্টা করলেন। ভিত্তিটা এই—মজুররা যদি রোলার কাজের জন্য আলাদা মজুরির শর্ত মেনে নেয়, তাহলে কোম্পানি তাদের মজুরি দু সেন্ট বাড়িয়ে দিতে রাজি আছেন। ওরা তো ঐ দু সেন্ট মুনাফা করছে বলে কোম্পানিকে দুষছে। কিন্তু তিনি একথাও বললেন, এটা তার সম্পূর্ণ নিজস্ব কথা—কোম্পানি এখনো কোন সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছন নি। নিজের মনে তাঁর এইটুকু আত্মপ্রসাদ আছে যে, প্যারীর কর্তাদের তিনি এই শর্তে রাজি করাতে পারবেন। কিন্তু প্রতিনিধিরা প্রস্তাবে রাজি হ'ল না—তাদের কথা, পুরানো নিয়মই চালু থাক—তবে প্রতি টব-গাড়ি পিছু পাঁচ সেন্ট করে বাড়িয়ে দিতে

হবে। এবার ম্যানেজারমশাই স্বীকার করলেন, তিনি এখনি আপসে রাজি। তাঁর উপরে সেই ভারই দেওয়া হয়েছে। স্ত্রী আর বাচ্চাকাচ্চাদের মুখ চেয়ে ওদের রাজি হয়ে যেতেই বললেন। কিন্তু ওরা অটল। মেঝের দিকে তাকিয়ে ওরা জবাব দিলে—না, তা হবে না। আবার প্রশ্ন, আবার হিংস্র উন্মাদনার জিগির উঠল—না, তা হবে না। অভদ্রভাবেই ব্যাপারটা শেষ হ'ল। মঁসিয়ে হানাবু দরজা সশব্দে বন্ধ করে দিলেন, এতিয়েঁ আর আর-সবাই পাথুরে পথে ভারী বুটের আওয়াজ তুলে চলে গেল। পরাজিত মানুষ ওরা, চরমে এসে পেঁৗছেছে ওদের দশা—মূক ক্রোধে ওরা ফুলে-ফেঁপে উঠছে।

বেলা প্রায় দুটোয় ধাওড়ার মেয়েরা মাইগ্রাতের ওখানে এক আবেদন নিয়ে গিয়ে হাজির হ'ল। এখন একমাত্র আশা, এই লোকটার মন গলিয়ে তার কাছ থেকে আরো এক সপ্তাহের ধার বাগানো। মেয়ু-বৌয়ের মাথায়ই এ-বুদ্ধি গজায়। মানুষের দাক্ষিণ্যের উপর তার অগাধ বিশ্বাস। ব্রুল-বুড়ী আর লেভাক-বৌকেও সে ধরে বেঁধে তার সঙ্গে নিয়ে চলল। কিন্তু পিয়েরোঁ-বৌ মাপ চাইলে—সে যেতে পারবে না। পিয়েরোঁকে ফেলে রেখে যাওয়া তো চলে না। বড় আস্তে আস্তে আরাম হচ্ছে পিয়েরোঁ। আর আর মেয়েরা এসে দলে ভিড়ল—এবার দল ভারী হয়ে উঠল। বিশজন হয়েছে। মঁতসুর বাসিন্দেরা ওদের আসতে দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে মাথা নাড়তে লাগল। ওদের মুখ গম্ভীর, দারিদ্র্যের শেষ দশায় ওরা এসে পেঁৗছেছে—পথ জুড়ে চলেছে মিছিল নিয়ে। বাড়িগুলির দরজা বন্ধ হয়ে গেল। একজন ভদ্রমহিলা নিজের রুপোর বাসন-কোসন লুকিয়ে রাখলেন। এমন ব্যাপার তাঁরা এই প্রথম দেখছেন। এর চেয়ে খারাপ আর কি হতে পারে। মেয়েরাই যদি এমনি করে পথে বেরিয়ে পড়ে, তাহলে কি আর বাকি রইল। সবই ধসে পড়বে! মাইগ্রাতের দোকানে এক তুমুল ব্যাপার। প্রথমে সে ওদের দোকানে ঢুকতে দিয়েছিল। ঠাট্টা করে বলেছিল, ওরা বুঝি তার ধার শুধতেই এসেছে। ভাল কথা! একজোটে যখন এসেছে, তখন এক কাঁড়িই টাকা মিলবে! পরে মেয়ু-বৌ যখন বলতে শুরু করলে, সে রেগে ওঠার ভান করলে। কি? ওরা কি ঠাট্টা-তামাশা করতে এসেছে নাকি? আরো ধার চাই? তাকে কি ভিখারী না বানালে আর চলছে না? না—একটা আলুও আর ধার পাবে না—একটুকরো রুটিও না। কেন তারা সেই ভাদুক মুদি আর ক্যারুবল আর স্মেলতেঁ রুটিওয়ালাদের কাছে যাক্ না। এখন তো ওদের সঙ্গেই তাদের কারবার। মেয়েরা ওর কথা শুনে আতঙ্কে জড়োসড়ো হয়ে গিয়ে মাপ চাইলে—এক ফোঁটা মায়া-দয়ার জন্যে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। আবার ঠাট্টা শুরু করলে মাইগ্রাত। বুড়ী ব্রুলকে বললে সে যদি তার ছোকরাকে ছেড়ে দিয়ে তাকে পিরিতের মানুষ বেছে নেয় তাহলে সে সমস্ত দোকানখানাই তার পায়ে ঢেলে দিতে পারে। সবাই ভীরু বনে গেছে; ওর ঠাট্টা শুনে হেসে উঠল। লেভাক-বৌ তো এককাঠি উপরে যায়। সে বললে, সে এখুনি রাজি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই গাল দিয়ে উঠল দোকানী। ওদের ধাক্কা মেরে বার করে দিতে গেল। ওরা কাকুতি-মিনতি করছে, এর মধ্যে সে একজনের উপর চড়াও হ'ল। আর সবাই দুড়দাড় করে পথে নেমে এসে চেঁচিয়ে উঠল—ও কোম্পানির দালাল। মেয়ু-বৌ শূন্যে হাত

তুলে ক্রোধে ফেটে পড়ে ওর মৃত্যু কামনা করলে। অমন লোকের খাওয়ারও নাকি কোন এখতিয়ার নেই।

ধাওড়ায় ফিরে এল মিছিল। বড় দুঃখে ফিরে এল। শূন্য হাতে ফিরলে মেয়েরা; মরদরা তাদের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিলে। আশা-ভরসা সব শেষ! দিন কাবার হয়ে যাবে, তবু এক চামচে সুরুয়া জুটবে না। আর-আর দিনগুলো তো পড়ে আছে তুষার-ঝটিকাময় অন্ধকারের গহ্বরে। আশা তো তিলমাত্র নেই। কিন্তু এই সম্ভাবনার জন্য তো ওরা প্রস্তুত, তাই আত্মসমর্পণের কথা কেউ তুললে না। দুঃখ বাড়ছে, ওরা আরো একগুঁয়ে হয়ে উঠছে। ওরা যেন তাড়া-খাওয়া জানোয়ার—নিজের গর্তে মরবে, তবু বেরুবে না। কেই বা সাহস করে আত্মসমর্পণের কথা প্রথম বলবে? ওরা সাথীদের সঙ্গে মিলে শপথ করেছে, এক হয়ে রুখে দাঁড়াবে। পিটে যখন ধসে কেউ চাপা পড়ে, তখন যেমন ওরা এককাট্টা হয়ে যায়—তেমনি করেই ওরা দাঁড়াবে। এই তো নিয়ম। পিট তো সেদিক থেকে এক বিরাট শিক্ষায়তন। ওরা না হয় আর এক সপ্তাহ পেটে বেল্ট কষে উপোস করে রইল—এ-আর এমন কি! বারো বছর বয়েস থেকে তো জল আর আগুন গিলে গিলেই ওরা মানুষ। ওদের এই যে পরস্পরের প্রতি আনুগত্য—এ যেন সৈনিকের গর্বেরই রূপান্তর। এ গর্ব তো সেই মানুষদলেরই আছে, যারা প্রতিদিন মৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়াই করে-করে জীবন উৎসর্গ করতে গিয়েও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

মেয়ুদের বাড়িতে সন্ধ্যে হয়ে এল। এক ভয়ংকর সন্ধ্যা। নিবন্ত আগুন ঘিরে ওরা চুপ করে বসে রইল। কয়লার গুঁড়ো পুড়ে পুড়ে যাচ্ছে—শেষ সঞ্চয় নিঃশেষিত হচ্ছে। গদি থেকে মুঠো মুঠো পশম নিয়ে বিক্রি করেছে, তার পর গতকাল ঠিক করেছিল ঐ কুহু-ডাকা ঘড়িটাকেই তিন ফ্রাঁয় বিক্রি করে দেবে। এখন তো ঘর একেবারে ফাঁকা—মরা; আর সেই চিরপরিচিত টিক্‌টিক্ শোনা যায় না। এখন শুধু বিলাস উপকরণের মধ্যে আছে গোলাপী রঙের কার্ড-বোর্ডের বাক্সটা। মেয়ু সেই কবে উপহার দিয়েছিল, মেয়ু-বৌ হীরে-জহরতের মতো এখনো আগলে আছে। ভাল চেয়ার ছিল মাত্র দুখানা—দুখানাই গেছে, বুড়ো বনেমোর আর ছেলেমেয়েরা এখন ঘুনেধরা একখানা বেঞ্চিতেই গাদাগাদি করে বসে আছে। বাগান থেকে সদ্য আমদানি হয়েছে বেঞ্চিখানা। ধূসর গোধূলি যেন শীত আরো বাড়িয়ে তুলছে।

উনুনের এক কোণে বসে মেয়ু-বৌ বললে, কি উপায় হবে গো?

এতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—দেয়ালে-লটকানো সম্রাট-সম্রাজ্ঞীর ছবি ক'খানা দেখছে। অনেক দিন আগেই ছিঁড়ে ফেলত, কিন্তু পরিবারের সবাই শোভা হিসাবে ও ক'খানা রাখতে চায়। সে বিড় বিড় করে বললে,

কি বরাত! ঐ যে বোকারামরা প্যাঁট প্যাঁট করে তাকিয়ে তাকিয়ে আমাদের উপোস করতে দেখছে—ওদের বেচে দু-পয়সাও মিলবে না।

যদি ঐ গোলাপী বাক্সটাই নিয়ে যাই? মেয়ু-বৌ সাহস করে বললে, তার মুখখানা বড় ম্লান।

মেয়ু টেবিলের উপর পা ঝুলিয়ে দিয়ে মাথা নীচু করে বসেছিল, সে লাফিয়ে উঠে বললে, খবর্দার না!

মেয়ু-বৌ উঠে পড়ে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। হা ভগবান! শেষে কি এমন

দশাও হ'ল! আলমারিতে রুটির টুকরো অবধি নেই। বিক্রি করারও আর কিছু নেই। কোথা থেকে যে রুটি জুটবে কে জানে। আগুনও তো নিবু-নিবু! আলঝিরের উপর চটে উঠল মেয়ু-বৌ। সকালে পিটের পাড়ে কয়লা কুড়োতে তাকে পাঠিয়ে ছিল, কিন্তু সে শূন্য হাতে ফিরে এসে বলে কোম্পানি কাউকে কয়লা কুড়োতে দিচ্ছে না। কেউ যেন কোম্পানিকে কেয়ার করে! কয়লার টুকরো তো ফেলে দেওয়া হয়েছে—সেইগুলো কুড়িয়ে নিলে বুঝি চুরি করা হয়? মেয়েটা কেঁদে কেঁদে বললে, একটা লোক তাকে মারবে বলে শাসালে। সে তবু কথা দিয়েছে, মার খাক আর যা-ই-ই হোক—সে কাল আবার গিয়ে চেষ্টা করে দেখবে।

মা আবার চেঁচিয়ে উঠল, আর ঐ পাজী জাঁলিনটা—ও কোথায় গেল শুনি? সালাদ-পাতা নিয়ে এতক্ষণে তো আসা উচিত ছিল। যাই হোক—জন্তু-জানোয়ারের মতো ঐ ঘাসপাতাই না হয় চিবোনো যেত। দেখবি—ও আসবে না। কাল ও তো রাত্তিরে বাইরে ছিল। কি করছে পাজীটা কে বলবে গো! ওর পেট তো যেন সবসময়েই টৈ-টুম্বুর।

হয় তো পথে দু-এক পয়সা কারো কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে নেয়, এতিয়েং সাহস করে বললে।

মেয়ু-বৌ রাগে ঘুষি তুললে—

কী, মোর কাচ্চাবাচ্চরা ভিখ মাগবে গো! তার চেয়ে ওদের খুন করে ফেলব নি! তার পরে নিজেও খুন হব!

মেয়ু আবার তেমনি মুখ নীচু করে আছে। লেনোর আর আঁরি অবাক হয়ে ভাবছে—আজ খাবার তৈরি হয় নি কেন। ওরা খিদের জ্বালায় ছটফট করছে, গোঙাচ্ছে। বুড়ো বনেমোর চুপ করে বসে আছে, বার বার জিভ চেটে খিদে তাড়াবার চেষ্টা করছে। কারো মুখে রা নেই। সবাই যেন পুঞ্জীভূত দুর্ভাগ্যে হতবুদ্ধি। ঠাকুর্দা কাশছে—কালো গয়ার ফেলছে—তার সেই পুরানো বাতের ব্যথা এখন সোঁতে দাঁড়িয়ে গেছে। বাপের হাঁপানি; হাঁটু অবধি জলের নীচে কাজ করে করে ফোলা। মা আর ছেলেমেয়েরা গলগণ্ড আর ওয়ারিশান সূত্রে পাওয়া রক্তহীনতায় জর্জর। এ তো ওদের মেহনতিরই অংগ। এ নিয়ে তো নালিশ ওরা করে না—শুধু খাবারের অভাব হলেই নালিশে ফেটে পড়ে। কিন্তু রাতের খাবার তো চাই। কি? কোথায় মিলবে? দোহাই—ভগবানের দোহাই! গোধূলির আলোয় ঘরখানা আরো অন্ধকার হয়ে এল। তার সঙ্গে মিলল ওদের দুঃখের অন্ধকার। এতিয়েং কি যেন ভেবে নিয়ে বললে,

একটু সবুর কর। আমি দেখছি...

সে বেরিয়ে গেল। মোকে-ছুঁড়ির কথা তার মনে পড়েছে। তার ঘরে নিশ্চয়ই রুটি আছে। সে স্বেচ্ছায় দেবে। কিন্তু এভাবে রিকুইলারে যেতে তার মন চাইছে না। ছুঁড়িটা কামুকী দাসীর মতো ওর হাতে চুমু খাবে। কিন্তু মিতাদের বিপদে তো চুপ করে থাকা যায় না। দরকার হয় তো এতিয়েং ওর উপর আবার সদয় হবে।

মেয়ু-বৌও বললে, যাই গো—আমিও দেখি। এমনি করে হাত-পা গুটিয়ে থাকলে কি মোদের চলবে?

আবার দরজা খুলে সে বেরিয়ে গেল। সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। আর

সবাই চুপচাপ বসে আছে। একেবারে নড়ে না চড়ে না। মোম জেবলে দিলে আলঝির। মোমের ক্ষীণ-আলোকে ওদের দেখা যায়। মেয়্-বৌ বাইরে গিয়ে একবার ভেবে নিলে। তার পরে লেভাকদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হ'ল।

দেখ গো মিতিন, সেদিন তোমাকে একখানা রুটি দিন্। আজ কি ফেরত দিতে পারবে গা! আর বেশি কথা বলা হ'ল না। সব দেখে শুনে তার আর উৎসাহ নেই। এ-বাড়ির দশা তার চেয়েও খারাপ।

লেভাক-বৌ নিবন্ত আগুনের দিকে তাকিয়ে আছে। ওর স্বামী পেরেক-মিস্ত্রীদের সঙ্গে খালি পেটে মদ গিলে পাঁড় মাতাল হয়ে এসে এখন টেবিলের উপর পড়ে ঘুমোছে। বুতেলুপ দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে ঘাড়ে হাত বুলাচ্ছে। ভালমানুষ সে—নিজের পুঁজি খেয়ে সাবাড় করে সে যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। তাকেও পেটে বেল্ট কষে থাকতে হবে—এতেই যেন সে অবাক।

বুটি! আ-আমার পোড়া কপাল, লেভাক-বৌ বললে, আমি তো তোমার কাছেই উলটে মাগুতে যাচ্ছিলাম।

স্বামী ঘুমের ভিতরে ক'কিয়ে উঠতেই সে তার মাথাটা টেবিলের সঙ্গে ঠুকে দিলে।

এই শুয়োর—ঘোঁত ঘোঁত করিস নি! তোর নাড়িভুঁড়ি যদি পুড়ে খাক হয়ে যায় তো ঠিক হয়। মাঙনা মদ গিলে না এসে লাগর কারো কাছ থেকে বিশ সু ধার করে আনতে পারিস নি! গালাগাল দিচ্ছে লেভাক-বৌ। ঘরদোর জঞ্জালে ভরা—একটা অসহ্য দুর্গন্ধ উঠছে মেঝে থেকে। তার কি—সমস্ত উড়ে পুড়ে খাক্ হয়ে যাক না! তার সেই পাজী ছেলে বেবের্তেরও সকাল থেকে পাত্তা নেই। সে চেঁচিয়ে বলছে—ও যদি আর না ফেরে তো ও বাঁচে! এবার গজর গজর করতে-করতে শুতে গেল, বিছানায় গিয়ে অন্তত একটু গরম হওয়া যাবে। বুতেলুপকে ঠেলা মেরে বললে,

চল মরদ, যাই! আগুন তো নিবে গেছে—ফাঁকা থালার দিকে তাকিয়ে থাকবার জন্যে আর মোম জবালাতে হবে নি। কি আসবে নাকি—? শুতে যাব। জড়াজড়ি করে দুজনে শুয়ে থাকি—যদি একটু সোয়াস্তি পাওয়া যায়। এই পাঁড় মাতালটা এখানে শুয়ে ঠান্ডায় মরুক!

মেয়্-বৌ বাইরে এসে এবার ফুলের বাগানের ভিতর দিয়ে পিয়েরোঁদের বাড়ির দিকে চলল। হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে। কিন্তু দরজায় ঘা পড়তেই হঠাৎ সব চুপচাপ। পুরো এক মিনিট পরে দরজা খোলা হ'ল।

পিয়েরোঁ-বৌ অবাক হবার ভান করে বললে, আরে—তুমি? আমি তো ভাবনু—ডাক্তার বুঝি!

পিয়েরোঁ আগুনের ধারে বসে আছে। ওকে কথা বলার ফুরসত না দিয়ে সে পিয়েরোঁর দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল,

ও তো আর সেরেই ওঠে না—মুখ দেখলে কে বলবে রুগী—কিন্তু পেটের ব্যামোতেই কাবু। আবার আগুন না পোয়ালেও চলবে না। তাই যা কয়লা ছিল সব বসে বসে পোড়াচ্ছি।

পিয়েরোঁকে কিন্তু বেশ সুস্থই দেখাচ্ছে। বেশ মোটাসোটা নধর গড়ন, রংটাও দিব্যি ফরসা হয়েছে। সে অসুখের ভান করে ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল; কিন্তু বৃথা চেষ্টা। তাছাড়া মেয়্-বৌ ঘরে ঢুকেই খরগোশের

মাংসের গন্ধ পেয়েছে। ওরা থালাটা নিশ্চয়ই লুকিয়ে ফেলেছে। টেবিলে রুটির টুকরো ছড়ানো, আর মাঝখানে রয়েছে একটা মদের বোতল। ওরা ওটা লুকোতে ভুলে গেছে।

পিয়েরোঁ-বৌ বললে, মা তো একটুকরো রুটির জন্যে মঁতসু গেছে। মোরা তো বসে থেকে থেকে হেদিয়ে গেলাম।

কিন্তু কথাটা গলায় বেধে গেল। পড়শীর চোখ পড়েছে বোতলের উপর, সে তা লক্ষ্য করেছে। অমনি সে সামলে নিয়ে আর একটা গল্প শুরু করে দিলে! হাঁগো, মদের বোতলই তো! ঐ লা পিয়োলে'র ওরা দিলে—ডাক্তার আবার একটু একটু মদ খেতে বলেছে কিনা। কৃতজ্ঞতা যেন উথলে উঠল পিয়েরোঁ-বৌয়ের—ওরা—আহা কি চমৎকার মানুষ! ঐ যে মেয়েটি—ও'র তো জুড়ি নেই। একটু দেমাক নেই—মজুরদের ঘরে আসে যায় নিজের হাতে জিনিস বিলায়।

মেয়ু-বৌ বললে, হাঁ গো—আমিও ওদের চিনি।

তার বুকখানা ব্যথায় ভরে গেল—ভাল জিনিস যারা তেমন গরীব নয়—তারাই পায়। এই তো নিয়ম। পিয়োলে'রা নদীর জলেই জল ঢালে! ওদের না সে ধাওড়ায় দেখেছে! ও'দের কাছ থেকে কিছু পেলেও পেতে পারে।

শেষে সে আসল কথা পাড়লে, দেখ গো, দেখতে এনু মোদের চেয়ে তোমার হাল-হালৎ একটু ভাল কিনা? তা কিছু সেমুই দিতে পারবে। ধার দেবে —আবার শোধ দেব।

পিয়েরোঁ-বৌ হতাশ হয়ে বললে,

বাছা, কিছুটি নেই। একটা দানাও না। মা তো এখনো এল না—ও-ও হয়তো কিছু পায়নি। খালি পেটেই মোদের গিয়ে শুয়ে পড়তে হবে।

এমনি সময় নীচের কুঠরি থেকে কান্নার শব্দ শোনা গেল। কে যেন দরজায় জোরে ঘা মারছে। এ সেই হতচ্ছাড়ী লিদি—পিয়েরোঁ-বৌ বললে। সারাদিন টো-টো করে ঘুরে সন্ধ্যে পাঁচটায় বাড়ি ফিরেছে বলে সে তাকে চাবি বন্ধ করে রেখেছে। মেয়েটা আর বাগ মানছে না, খালি ছুটে ছুটে পালায়।

মেয়ু-বৌ ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। সে যেন যেতে পারছে না—মন চাইছে না। বড় আগুনের কুণ্ডটা থেকে আগুনের তাত এসে ওর শরীরে লাগছে, মনে হয় পুড়ে যায় শরীর—তবু ভাল লাগে। তা ছাড়া এ বাড়িতে খাবার আছে একথা মনে পড়তেই পেট যেন আরো খালি হয়ে গেছে। এতো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ওরা বুড়ীটাকে সরিয়ে দিয়ে, মেয়েটাকে চাবি বন্ধ করে রেখে গোগ্রাসে খরগোশের মাংস গিলছে। ভাল, ভাল! একথা অস্বীকার করবার জো নেই—কোন মেয়ে যখন খারাপ হয়ে যায়, তখন তো বাড়ির বাড়বাড়ন্ত হয়।

আচ্ছা আসি বৌ, হঠাৎ সে বলে উঠল।

বাইরে রাত হয়ে এল। মেঘের আড়ালে চাঁদ উঠেছে। তারই নিষ্প্রভ আলো এসে পড়ছে মাটিতে। বাগানের ভিতর দিয়ে না গিয়ে মেয়ু-বৌ রাস্তা ঘুরে চলল। দুঃখের ভারে নুয়ে পড়েছে। নিজের ঘরে ফিরবার সাহস নেই। পথের দুপাশে সারি সারি বাড়ি—জীবনের সাড়া সেখানে নেই। প্রতিটি দরজা থেকেও যেন আকালের গন্ধ উঠছে—ফাঁপা আওয়াজ বেরুচ্ছে। কি হবে দরজায় ঘা মেরে? দারিদ্র্য—দারিদ্র্যের যৌথ কারবার বসেছে সর্বত্র। সপ্তাহের

পর সপ্তাহ ধরে কেউ এক বেলা ভরপেট খায়নি। পেঁয়াজের গন্ধও আর নেই। সেই যে বাসি পেঁয়াজের গন্ধ শুঁকলেই দূর থেকেও বোঝা যেত সুমুখেই কুলি-ধাওড়া আছে। এখন তো বন্ধ ঘরের সোঁদা গন্ধ—সেখানে কিছু নেই। অস্পষ্ট শব্দ এতক্ষণ শোনা যাচ্ছিল—এবার সে শব্দও মিলিয়ে যাচ্ছে। চেপে রাখা ফোঁপানি আর চাপা গালাগাল আর শোনা যায় না। নীরবতা গভীর হয়ে এল ক্রমে ক্রমে। এখন শুধু শোনা যায় উপবাসের ঘুম নেমে আসছে, বিছানায় এলিয়ে পড়ছে মানুষ। শূন্য পেটে দুঃস্বপ্ন দেখছে।

গির্জার পাশ দিয়ে যেতে-যেতে দেখলে, একটা ছায়া দ্রুত সরে যাচ্ছে আঁধারে। আশার ঝিলিক হেনে গেল; তাড়াতাড়ি সে পা চালিয়ে দিলে। মঁতসুর পাদরীবাবা আবি জ্যোরে-কে সে চিনতে পেরেছে। গাঁয়ের গির্জায় তিনি প্রতি রোববার উপাসনা করেন। হয় তো তিনি এই মাত্র গির্জা থেকেই বেরুলেন, ওখানে কি দরকারে এসেছিলেন। মাথা নীচু করে চলেছেন তাড়াতাড়ি। বেশ নাদুস-নুদুস মানুষটি—বড় আমুদে! দুনিয়ায় সকলের সঙ্গেই মানিয়ে চলেন। রাতে যে এসেছেন, তার মানে খনির মজুরদের হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়তে চান না। লোকে বলে, কিছুদিন হ'ল নাকি তাঁর পদোন্নতি হয়েছে। তাঁর জায়গায় যিনি আসছেন, তাঁকেও নিয়ে এসেছেন। রোগা-ঢ্যাঙা মানুষটি—চোখ দুটো যেন জ্বলন্ত কয়লা।

হেই বাবা গো—পাদরীবাবাগো!—মেয়ু-বৌ ভাঙা স্বরে হাঁক পাড়লে।

কিন্তু তিনি দাঁড়ালেন না।

তোমার ভাল হোক, ভাল থাক! এই বলে ছুটে চলে গেলেন।

মেয়ু-বৌ চোখ চেয়ে দেখলে, কখন তার নিজের দোরগোড়ায় এসে গেছে। আর তো পা চলে না; সে এবার কোনরকমে ঢুকে পড়ল।

ওকে দেখে কেউ একটু নড়েও বসল না। মেয়ু এখনো মাথা নীচু করে টেবিলের উপর বসে আছে। বুড়ো বনেমোর আর ছেলেমেয়েরা তেমনি গাদাগাদি করে বসে আছে। শীতে শরীর গরম রাখার এই-ই উপায়। কেউ একটা কথা বললে না। মোমবাতি নিবু নিবু হয়ে এসেছে, আর কিছুক্ষণের ভিতরে আলোটুকুও আর থাকবে না। দরজার শব্দে ছেলেমেয়েরা মুখ তুলে তাকাল। মা কিছু আনেনি দেখে ওরা নীচু দিকে তাকিয়ে কান্না চেপে রাখলে। কি জানি —হয়তো গাল দিয়েই উঠবে মা। মেয়ু-বৌ নিবন্ত আগুনের পাশে নিজের জায়গাটিতে গিয়ে বসল। কারো মুখে প্রশ্ন নেই। শুধু নীরবতা—ছেদহীন নীরবতা। সবাই বুঝেছে। কথা বলে মিছিমিছি হয়রানি হতে চায় না। ওরা এখন প্রতীক্ষায় ধুঁকছে—হতাশায়, ভীরুতায় ওরা নির্জীব। তবু এখনো শেষ আশা আছে হয়তো এতিয়েঁ কোথা থেকে কিছু যোগাড় করে নিয়ে আসবে। সময় কেটে চলল। আর তাদের সে ভরসাও নেই।

এমনি সময় এতিয়েঁ এসে দেখা দিলে। তার হাতে একটা ন্যাকড়া জড়ানো ডজনখানেক ঠাণ্ডা আলু।

সে বললে, এই ক'টাই পেলাম।

মোকেদের ওখানেও রুটি বাড়ন্ত, কিন্তু মেয়েটা তার নিজের খাবার একখানা ন্যাকড়ায় জড়িয়ে দিয়ে দিলে, আর আবেগভরে খেল চুমু।

মেয়ু-বৌ যখন তার ভাগ তাকে দিতে গেল, এতিয়েং বললে, না, আমাকে দিতে হবে না। আমি খেয়ে এসেছি।

কথাটা সত্য নয়। সে চেয়ে-চেয়ে দেখল, ছেলেমেয়েরা খাবারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ওদের বাপ-মাও খেলে না। ওরা বেশি করে খাক তাই-ই তারা চায়। কিন্তু বুড়ো দাদু এমন লোভী—সেই সবগুলো আলু খেয়ে নিলে। ওরা যাহোক করে একটা আলু ওর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে আলঝিরের জন্য রেখে দিলে।

এতিয়েং এবার বললে, সে শুনে এসেছে কোম্পানি ধর্মঘটীদের এক-গুঁয়েমি দেখে ক্ষেপে গিয়ে যারা মজুরদের মাথা—তাদের কার্ড ফেরত দেবে ঠিক করেছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কোম্পানি লড়াই চায়। আরো এক জোর গুজব উঠেছে। কোম্পানি নাকি জাঁক করে বলেছে, বেশির ভাগ মজুরই কাজে যোগ দিতে রাজি। লা ভিক্তর আর ফিউৎরি কাঁতেলের মজুররা নাকি কাল কাজে ভিড়ে যাবে। মাদলিন আর মীরুতেও তিন ভাগের এক ভাগ মজুর ফিরে যাবে। মেয়ুরা শুনে তো ক্ষেপে গেল।

মেয়ু চেঁচিয়ে উঠল—হা ভগবান—যদি ওরা দালাল হয়, আমরা ওদের দেখে নেব!

সে লাফিয়ে উঠে পড়ল। রাগে দুঃখ-দুর্দশায় সে দিশাহারা।

তাহলে কাল রাতে আমরা ঐ বনে বৈঠক বসাব।...বোঁ-জ্যোতে তো ওরা আমাদের কথা বলতে দিলে না, এবার জঙ্গলে গিয়ে সভা বসাব। সেখানে তো আর কেউ বাগড়া দিতে পারবে না।

বুড়ো বনেমোরের তন্দ্রা টুটে গেল। সে পেটুকের মত গেলবার পরে ঝিমুচ্ছিল। এই সেই সমবেত হবার সাবেককালের জিগির। এই ভান্দামের বনেই একদিন সে আমলের মজুররা রাজার ফৌজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল।

হাঁ, হাঁ, ভান্দামেই চল। যদি যাও তো, আমিও সাথে আছি।

মেয়ু-বৌ সজোরে হাত নেড়ে বললে।

আমরা যাব—যাব! এই অন্যায়, এই দালালির শেষ দেখতে হবে!

এতিয়েং ঠিক করলে, কাল রাতের বৈঠকের কথা জানিয়ে ধাওড়ায় ধাওড়ায় খবর দিতে হবে। এরই মধ্যে আগুন নিবে গেছে। লেভাকদের বাড়ির আগুনও এমনি করেই নিবে গিছল। মোম বাতিটাও হঠাৎ নিবে গেল। কয়লা নেই ঘরে, তেল নেই। ওরা হাতড়াতে-হাতড়াতে দুরন্ত শীতে কাঁপতে-কাঁপতে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। বাচ্চারা কাঁদছে।

ছয়

জাঁলিন সেরে উঠেছে, হাঁটতেও পারে। কিন্তু এমনভাবে জোড়া লেগেছে হাড় যে খুঁড়িয়েই চলে। ডান আর বাঁ—দুদিকেই হেলে-হেলে পড়ে—হাঁসের মতো তার চলাফেরা। কিন্তু এখনো দৌড়ধাপে সে ওস্তাদ। অপকারী আর চোর জন্তুদের মতোই তার স্বভাব।

সেদিন সন্ধ্যেয় রিকুইলার রোডের উপরে তার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু বেবের্ত আর লিদিকে নিয়ে সে ওত পেতে ছিল। সে একটা মুদিখানার দোকানের উলটো দিকে বেড়ার আড়ালে এক ফাঁকা জায়গায় লুকিয়ে আছে। জায়গাটা একটা গলির এক কোণে। মুদিখানার দোকানখানা এক বুড়ীর। সে প্রায় কানা। বাইরে দু-তিন বস্তা লেন্টিল (একরকম শস্যের দানা—অনু) আর বীন নিয়ে বসে আছে বুড়ী। দানাগুলো ধুলোয় কালো হয়ে গেছে। কিন্তু সেদিকে জাঁলিনের চোখ নেই। তার লোলুপ দৃষ্টি রয়েছে দরজায় ঝোলানো একটা শুঁটকি কডমাছের উপর—এই-ই তার লুণ্ঠনের লক্ষ্যবস্তু। শুঁটকি মাছটা বহু-দিনের, মাছি বসে বসে কালো হয়ে গেছে। দু-দুবার সে বেবের্তকে ওটা খসিয়ে নিয়ে আসতে পাঠিয়েছিল। কিন্তু তখনি পথের বাঁকে লোক এসে পড়েছে। সবসময়েই বাধা আসবে—কেউ যে কিছু করবে তার জো নেই।

একজন ভদ্রলোক ঘোড়সওয়ার হয়ে চলে গেলেন; ছেলেমেয়েরা অমনি বেড়ার আড়ালে শুয়ে পড়ল। ভদ্রলোকটিকে তারা চিনেছে। মঁসিয়ে হানাবু। ধর্মঘটের শুরু থেকেই এমনি তিনি ঘুরে বেড়ান—বিদ্রোহী কুলি-ধাওড়াগুলির ভিতর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যান। এমনিভাবে তিনি সরজমিনে এখানকার হালচালের তদন্ত করেন। সাহস তাঁর আছে, ধীর স্থির তিনি। কিন্তু কখনো একটা ঢেলাও তাঁর কানের পাশ দিয়ে বোঁ করে ছুটে যায় নি। শুধু মানুষগুলোর সঙ্গে দেখা হয়েছে। চুপচাপ মানুষগুলি—তাঁকে সেলাম ঠুকতে গিয়ে তারা ইতস্তত করেছে। প্রায়ই তাঁর দেখা হয়েছে জোড়গাঁথা প্রেমিক-প্রেমিকাদের সঙ্গে। ওরা রাজনীতির ধার ধারে না। গর্ত বা আনাচ-কানাচে ফুর্তি করছে। ঘোড়ার পিঠে তিনি চলে গেছেন, কাউকে বিব্রত করেন নি। কিন্তু বুকখানা ব্যথায় ভরে উঠেছে অতৃপ্ত কামনায়—এই স্বাধীন স্বচ্ছন্দ প্রণয়লীলার ভিতরে তাঁর নিজের অতৃপ্তিই বড় বেশি বেজেছে। বাচ্চা ছোকরাদের বাচ্চা মেয়েদের উপর স্তূপের মতো পড়ে থাকতে দেখে তিনি না তাকিয়ে পারেন নি। এই দুঃখ-দুর্দশায়ও ওরা স্ফূর্তি করছে। চোখ সজল হয়ে এসেছে তাঁর। রাশ টেনে সামরিক ঢঙে বোতাম আঁটা কোট পরে তিনি মিলিয়ে গেছেন।

পোড়া বরাত! জাঁলিন বলে উঠল। এ আর যাবে না। বেবের্ত যা—এবার ছুটে যা!

কিন্তু আবার দুজন দেখা দিলে। ছেলেটা একটা গাল পাড়তে গিয়ে থেমে গেল। তার ভাই জাচারির স্বর। সে মিতে মোকে-কে বলছে, কি করে ওর বৌয়ের ঘাগরায় সেলাই-করা দু-ফ্রাঁ পেয়ে গেছে। দুজনেই মহা খুশী, এ ওর কাঁধ চাপড়াচ্ছে। মোকে এবার প্রস্তাব করলে কাল ওরা যাবে ক্রস্ খেলতে। আঁভাতাস থেকে দুটোর সময় উঠে পড়বে—তার পর মঁতয়রে গিয়ে হাজির হবে। জায়গাটা মার্সিয়েনের কাছে। জাচারি রাজি হয়ে গেল। ধর্মঘট নিয়ে ভেবে কি হবে? যখন কাজকর্ম নেই—একটু স্ফূর্তি করলে দোষ কি? পথের বাঁক ঘুরতেই এতিয়েঁর সঙ্গে দেখা। সে খাল ধারের রাস্তা দিয়ে এসে হাজির। ওদের থামিয়ে সে বাত্‌চিত্‌ শুরু করে দিলে।

জাঁলিন ক্ষেপে গেছে, ওরা কি এখানেই শুয়ে পড়বে নাকি! রাত তো হয়ে এল, এবার বুড়ীটা বস্তা ক'টা ভিতরে নিয়ে যাবে।

আর একজন মজুর রিকুইলারের দিকে চলে গেল। এতিয়েং তার সঙ্গে চলেছে। ওরা যখন বেড়ার ধার ঘেঁষে যাচ্ছিল, জাঁলিন ভান্দামের বনের কথা শুনতে পেলে। বৈঠক আর একদিন দেরি করেই বসবে। কি জানি সবাইকে যদি এর মধ্যে খবর দেওয়া না যায়—তাই এই ব্যবস্থা।

সে তার সাথীদের কানে কানে বললে, কাল তাহলে জবর ব্যাপার হবে। আমরাও যাব। বিকেলেই চলে যাব।

এবার রাস্তা পরিষ্কার। সে আবার বেবের্তকে পাঠালে।

দ্যেৎ! একটু সাহস চাই! লেজটা ধরে টানিস! আর চারদিকে নজর রাখিস। বুড়ীর আবার মস্ত এক খ্যাংরা আছে।

ভাগ্য ভাল, আঁধার ঘন হয়ে এল। বেবের্ত লাফিয়ে শুঁটকি মাছটার লেজ চেপে ধরল—সঙ্গে সঙ্গে যে তারে সেটা ঝুলানো ছিল—সেই তারটাই ছিঁড়ে গেল। সে এবার ঘুড়ির মতো মাছটা নাড়তে নাড়তে চোঁচা দৌড়। পেছনে পেছনে আর দুজনও ছুটছে। যেন ঘোড়দৌড় আর কি!

বুড়ী দোকান থেকে বেরিয়ে এসে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। কিছুই সে বুঝতে পারছে না। আঁধারে ওদের চিনতেও পারলে না।

এই খুদে শয়তানগুলো এখন সারা তল্লাটে ভীতির কারণ হয়ে উঠেছে। বর্বর জাতিগুলোর মতোই ওদের আক্রমণের রীতি—তেমনি লুঠতরাজই ওরা করে। প্রথমে ওরা ভোরোর ইয়ার্ডে কয়লার স্তূপে গড়াগড়ি খেয়েই খুশী হয়েছিল, নয় তো কাঠের রোলার আড়ালে চোর-চোর খেলত। সেখানে এমন-ভাবে লুকিয়ে থাকত, মনে হোত যেন মানুষের গতিবিধিহীন বনে লুকিয়ে আছে। তারপরে ওরা পিটের খাড়া পাড় দখল করে নিলে। ওরা ঢালে বসে গড়িয়ে যেত নীচে—সেখানে তখনো খনির নীচের আগুনের তাত রয়ে গেছে। পিটের উঁচু পাড়ে গজিয়েছে কাঁটাঝোপ—সেখানে ওরা সারাদিন লুকিয়ে থাকতো। বদমায়েস ইঁদুরগুলোর মতো নানা ফন্দিফিকির আঁটতো—খেলা করত। এবার বিজয়ের ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়ে পড়ল। ওরা ইটের পাঁজার ভিতরে গিয়ে এবার লড়াই শুরু করে দিলে। সে সাংঘাতিক লড়াই—রক্তারক্তি তার ইতিহাস। মাঠেঘাটে ছুটে বেড়ায়, রস যাতে আছে এমন উদ্ভিদই ওদের খাদ্য। ওদের পেটেও দানা পড়ে না। ওরা শিকারের খোঁজে ঘুর ঘুর করে বেড়ায় খালের ধারে, কাদার ভিতরে হুটোপুটি করে মাছ ধরে, আর সেই কাঁচা মাছই খায়। তার পর ঘুরতে ঘুরতে যায় ভান্দামের বন অবধি—সেখানে বুনো জাম খেয়ে পেট ভরায় বসন্ত কালে, বাদাম খায় গ্রীষ্মে। দেখতে-দেখতে এই বিস্তীর্ণ উপত্যকাই তাদের এলাকা হয়ে উঠেছে।

কিন্তু মঁতসু থেকে মার্সিয়েনের সড়কে ওরা যায় চুরি-ডাকাতি করতে, খুদে নেকড়ের মতো জ্বলতে থাকে ওদের চোখ। জাঁলিন এই অভিযানগুলির নায়ক। সব রকম চুরি-ডাকাতিতেই সে তার সৈন্যদল পরিচালনা করে। পেঁয়াজের খেত চষে ফেলে, বাগিচাগুলোর ফল-পাকড় লুঠ করে, আবার দোকানেও হানা দেয়। এ তল্লাটের মানুষরা বলে—এ ধর্মঘটী কুলিদের কাজ। ওরা এক বিরাট সুনিয়ন্ত্রিত দলের কথাই তুলে বসে। এমন কি একদিন লিদিকে দিয়ে তার মার বোয়েম থেকে ডজনখানেক চিনির মণ্ডা চুরি করিয়ে আনালে, পিয়েরোঁ-বৌ জানালার উপরের তাকে রেখেছিল বোয়েমগুলো।

মেয়েটার যাকে বলে জ্যান্ত ছাল খসিয়ে নেওয়া হ'ল, তবু সে ওর নাম করলে না। জাঁলিনের তার দলের উপর এমনি প্রভুত্ব। কিন্তু সব চেয়ে খারাপ কথা, ওর নিজের জন্য বরাবরই সবচেয়ে বড় ভাগটা চাই। বেবের্তও লুঠের মাল এনে তার হাতে স'পে দেয়। সর্দার যদি ঘুষো মেরে সব না নিয়ে নেয় তো সেদিন ওর জোর বরাত।

কিন্তু কিছুদিন ধরে জাঁলিন প্রভুত্বের অপব্যবহার করছে। লিদিকে যেন ঘরের বিয়ে-করা মাগের মতো পেটায়। বেবের্তের তার উপরে বিশ্বাসেরও সে অপব্যবহার করে বসে। তাকে এমন সব ব্যাপারে পাঠায়, যাতে ফ্যাসাদে পড়ে যায় বেবের্ত। এ যেন তার কাছে মস্ত তামাশা—এই ধেড়ে ছেলেটাকে বোকা বানিয়ে ওর যেন দুশো মজা। ছেলেটা তো ওর চেয়ে গায়ে জোর রাখে ঢের ঢের বেশি—এক ঘুষোয় ওকে পেড়েও ফেলতে পারে। দুজনকেই ও ঘৃণা করে, নিজের বান্দা-বান্দী বলে মনে করে। সে ওদের কাছে জাঁক করে বলে, ওর পিরিতের মানুষ হচ্ছেন এক রাজকন্যা—ওরা তো তাঁর সুমুখে গিয়ে দাঁড়াবারও যোগ্য নয়। সত্যিই, গত সপ্তাহে সে হঠাৎ পথ থেকে কোথায় উধাও হয়ে গিছল, কখনো বা বাঁক ঘুরতেই ওকে আর দেখা যায় নি। কোথায় গেছে কে জানে! ওদের তো কড়া হুকুম দিয়ে বলেছে, ওরা ধাওড়ায় ফিরে যাক। কিন্তু লুঠের মাল আগে পকেটে তুলে তবে দিয়েছে ঢালাও হুকুম।

এবারেও তাই হ'ল।

রিকুইলারের কাছে রাস্তার মোড়ে ওরা তিনজনেই থেমে পড়ল। এবার সে কড়া হুকুম দিলে—দেরে—ওটা দে! মাছটা একরকম সাথীর হাত থেকে ছিনিয়েই নিলে।

বেবের্ত প্রতিবাদ করলে।

আমার ভাগ দিতে হবে, আমিই তো এনেছি।

ইল্লি! কি বললি! চেঁচিয়ে উঠল জাঁলিন, আমি দিলে তো ভাগ পাবি। আজ সেটি হবে নি। আজ ঢুঁ ঢুঁ! যদি কিছু থাকে তো কাল পাবি।

লিদিকে সে ঠেলে দিলে। ফৌজি ঢঙে সারবন্দী করে ওদের দাঁড় করিয়ে দিলে। যেন হাতিয়ার কাঁধে ফৌজ ওরা। তারপরে ওদের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল।

পাঁচ মিনিট এমনি করে থাকবি—খবর্দার ফিরে তাকাবি নে! ভগমানের দিব্যি, যদি ফিরে তাকাস তো তোদের জানোয়ারে গিলে খাবে!...তারপরে সিধে ঘরে যাবি। দেখ বেবের্ত, যদি লিদির সঙ্গে লাগতে যাস, তাহলে মজাটা টের পাবি! বেধড়ক ঠেঙাব!

সে এবার এমন করে ছায়ায় মিলিয়ে গেল, তার খালি পায়ের শব্দও শোনা গেল না। দুটি ছেলেমেয়ে কোন দিকে না তাকিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। তাদের ভয়, পাছে অদৃশ্য হাতের আঘাত এসে পড়ে তাদের উপর। দুজনেরই ওদের সমান ভয়, তাই ধীরে ধীরে ওদের মধ্যে এক গভীর মমত্ববোধ জন্ম নিয়েছে। বহুদিন ধরে বেবের্ত স্বপ্ন দেখছে, ওকে সে গ্রহণ করবে, জোরে নিজের দেহের সঙ্গে পিষে ফেলবে—আলিঙ্গন করবে। এমনি তো আর সবাইকে করতে দেখেছে। লিদিরও হয়তো ভালই লাগবে—অমন সোহাগ পেলে তারও চিরা-চরিত পাওয়া সোহাগের রীতি বদলে যাবে। কিন্তু কারো তো হুকুম নড়চড়

করবার উপায় নেই। ওরা চলতে লাগল এবার, পরস্পরকে ওরা চুমু অবধি খেলে না। অথচ তারা ভালবাসা জানাবার জন্যে গুমরে মরছে, কিন্তু তারা নিশ্চিত জানে—পরস্পরকে ছুঁলেই সর্দার পিছন থেকে আঘাত হানবে।

এতিয়েঁ এই সময়ে রিকুইলারে এসে গেল। গতকাল সন্ধ্যেয় মোকে আসার জন্যে খুবই অনুরোধ করেছিল। সে তাই ফিরে এসেছে। কিন্তু ভারি তার লজ্জা—নিজের অবৈধ কামনার কথা সে নিজের কাছেও স্বীকার করতে নারাজ। মেয়েটা তো তাকে সন্তের মূর্তির মতোই পূজা করে। কিন্তু এ সম্বন্ধ অবশ্যই ভেঙে ফেলতে হবে। সে দেখা করে বুঝিয়ে বলবে, সে যেন আর ওর পিছনে ঘুর ঘুর করে না বেড়ায়। সাথীদের দোহাই দিয়ে বলবে। এখন ঠাট্টা-তামাশা, খেলার সময় নয়। যখন আর সবাই উপোস করে করে মরছে, তখন এ আনন্দ সম্ভোগ আর যাই-ই হোক, উচিত তো নয়। কিন্তু ওকে বাড়িতে না পেয়ে সে ঠিক করলে অপেক্ষা করবে। প্রতীক্ষা শুরু হ'ল। চলমান ছায়ার দিকে তাকিয়ে রইল।

ভাঙাচোরা হেড গীয়ারের নীচে পুরানো স্যাফ্‌টা হাঁ করে আছে। অর্ধেকটা তার এখন দেখাই যায় না। আঁধার গর্তের উপরে একটা খুঁটি এখনো সোজা দাঁড়িয়ে—খানিকটা ছাদ তার উপরে এখনো ঝুলছে। দেখে ফাঁসিকাঠ বলেই মনে হয়। দুধারের ভাঙা দেয়ালে দুটো গাছ গজিয়েছে—রোওয়ান আর প্লেন গাছ—যেন মাটি ফুঁড়ে ওরা উঠে এসেছে। এ একটি পরিত্যক্ত কোণ—বনবাদাড়ে ভরা একেবারে নিরালা। ঘাসে ভরা ধারগুলি—তার পরেই বিরাট গহ্বর। সেখানে যত পুরানো ভাঙাচোরা কাঠ-কুঠরো পড়ে আছে। ব্ল্যাকথর্ণ আর হথর্ণের কাঁটা ঝোপে ভরতি—সেখানে বসন্তকালে স্পারো পাখীরা বাসা বাঁধে। কোম্পানি এটা চালু রাখার জন্যে যে বিরাট খরচা, সেটা দিতে নারাজ বলেই দশ-বছর আগেই বন্ধ করে দিয়েছে এখানকার কাজ। এই মৃত পিট তারপর থেকে এমনি করেই পড়ে আছে, ঝোপে ঝাড়ে ভাঙা কাঠ-কুঠরোয় ভরতি হয়ে উঠেছে। লা-ভোরোতে ভেন্টিলেশন সিসটেম চালু হলে এই পরিত্যক্ত পিটটা কাজে লেগে গেল। এর পুরানো স্যাফ্‌টা দিয়ে চোঙের কাজ হ'ল। কিন্তু তাই বলে মেরামতি কিছু হ'ল না। শুধু খুঁটি আড়াআড়ি করে দিয়েই তারা স্যাফ্‌টাকে খাড়া করে রাখলে। এতে কয়লা বার করে আনা চলবে না। উপরের কাঁথি-গুলোকে অবহেলা করে নীচের কাঁথিগুলোর উপরই নজর রাখলে। এই নীচেই ফার্নেস জ্বলতে লাগল। গনগনে লাল কয়লা এমন হাওয়ার সৃষ্টি করল যে আশেপাশের খনিগুলির ভিতর দিয়ে যেন হাওয়ার ঝড় বয়ে গেল। তাই পরিণামের কথা ভেবে হুকুম হ'ল, এই হাওয়া নির্গমনের স্যাফ্‌টটার সংরক্ষণ দরকার—এতে করে মানুষ ওঠা নামা করতে পারবে। কিন্তু ব্যাপারটা ভাগের—তাই মইগুলি পচে যাচ্ছে কতগুলি মাচা এরই মধ্যে ভেঙেচুরে ধসে পড়েছে। স্যাফট-এর মুখে এখন ঝোপঝাড় আটকে রেখেছে পথ। পহেলা মইটার কয়েক ধাপ নেই। ওখানে পেঁছিতে হলে ঐ রোয়ান গাছের ঝুরি ধরেই ঝুলে পড়তে হবে অন্ধকারের অতলে।

এতিয়েঁ একটা ঝোপের আড়ালে ধীরভাবে অপেক্ষা করছিল। সে ডালপালার ভিতরে শব্দ শুনতে পেল। বহুক্ষণ ধরে শব্দ চলছে। প্রথমে মনে হ'ল, ভয় পেয়ে হয়তো একটা সাপ পালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দেশলাইয়ের

হঠাৎ চকমকি দেখে সে অবাক বনে গেল। জাঁলিনকে দেখে তো আরো অবাক। জাঁলিন মোম জেবলে গহবরের ভিতরে ঢুকে পড়ছে। এতিয়েঁর কৌতূহল বেড়ে উঠেছে, সেও গহবরটার কাছে এগিয়ে এল। ছেলেটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। নীচের দু'নম্বর মাচা থেকে ক্ষীণ আলো এসে ঠিকরে পড়ছে। সে এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে ঐ গাছের ঝুরি ধরেই নেমে পড়ল। তার মনে হ'ল পাঁচশো আশী ফুট নীচে সে তলিয়ে যাবে। কিন্তু অবশেষে মইয়ের একটা ধাপ তার পায়ে ঠেকল। সে এবার আস্তে আস্তে নামতে লাগল। জাঁলিন বোধহয় কিছু টের পায় নি। এতিয়েঁ দেখতে পাচ্ছে, আলো ক্রমেই নীচে, আরো নীচে নেমে যাচ্ছে—আর ছেলেটার ছায়াটা বিরাট হয়ে দেখা দিয়েছে আলো-আঁধারিতে, বিকৃত অংগভংগীতে ছায়াটা নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। বানরের মতোই দক্ষতায় সে পা ছুঁড়ছে, হাত-পা চিবুক দিয়ে যেখানে ধাপ নেই সেখানটা আঁকড়ে ধরছে। মইগুলি লম্বা। একটার পর একটা রয়েছে। কতগুলো এখনো মজবুত, আরগুলো নড়বড়ে হয়ে গেছে—ভেঙে পড়ে আর কি! আবার আছে সরু সরু মাচার সার—সেগুলি এখন ছ্যাতলা-ধরা, পচেও গেছে। ওদের উপর দিয়ে চলতে গিয়ে শ্যাওলার আস্তরণ বলে মনে হয়। নীচে নামতে আবার আগুনের আঁচ অসহ্য হয়ে ওঠে—স্যাফ্ট-এর ফার্নেসটাই এজন্যে দায়ী। ভাগ্য ভাল, ধর্মঘটের জন্য আগুন এখন কমজোরি। অন্য সময়ে পাঁচ কিলোগ্রাম করে কয়লা রোজ ঐ ফার্নেসকে খাওয়ানো হয়, আর তখন নীচে নামতেও কেউ সাহস করে না। অবশ্য, জ্যান্ত ভাজা ভাজা হতে চাইলে সে আলাদা কথা।

এতিয়েঁ চাপা স্বরে গাল দিলে—বাচ্চা বটে! একেবারে জাত সাপ! কোথায় যাচ্ছে?

দু-দুবার সে পড়ে যাচ্ছিল। ছ্যাতলা-ধরা পিছল কাঠের উপর পা হড়কে গেল। ঐ বাচ্চাটার মতো একখানা মোমবাতি থাকলেও হোত। কিন্তু তাতো নেই। তাই প্রতি মুহূর্তে ঠোক্কর খাচ্ছে। আর তার পথ প্রদর্শক ঐ ক্ষীণ আলোর চকমকানি। ক্রমেই সে আলোর শিখা তো নীচে চলে যাচ্ছে। এখন হয়তো বিশ নম্বর মইয়ের কাছে সে এসে গেছে। সে আবার নীচে নামতে লাগল; গুনছে। একুশ, বাইশ, তেইশ,—নীচে, আরো নীচে নামছে। মাথা ঘুরছে গরমে, মনে হয় ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। যেন ফার্নেসের ভিতর গিয়ে সে পড়েছে। অবশেষে পায়ের তলায় শক্ত জমি ঠেকল। চেয়ে দেখলে, মোমখানা এবার একটা কাঁথির ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। তাহলে তিরিশখানা মই সে পেরিয়ে এল—তার মানে—দুশো দশ মিটার নীচে।

ও ভাবলে, আরো কতদূর নিয়ে যাবে পাজীটা! মনে হয় আস্তাবলেই ও ওর ডেরা পেতেছে।

কিন্তু বাঁ দিকে আস্তাবলের পথটা এখন ধস্ নেমে বন্ধ। আবার চলা শুরু হ'ল। পথ এখন দুর্গম চলতে কষ্ট হচ্ছে, বিপদও আছে। ভয় পেয়ে বাদুড়গুলো ডানা মেলে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে, কাঁথির ছাদ আঁকড়ে ধরে ঝুলে আছে। এতিয়েঁ পা চালিয়ে দিলে, আলোটাকে চোখে চোখে রাখতে হবে। একই কাঁথিতে সেও ঢুকে পড়ল। কিন্তু বাচ্চাটা যত সহজে হিলহিলে সাপের মতো এঁকে বেঁকে গলে চলে যাচ্ছে, সে তো তা পারছে না। তার তো গা ছড়ে যাচ্ছে চলতে গিয়ে। ভাঙাচোরা পথে এমনি তো হবেই। কাঁথিটা এবার সরু হয়ে

এসেছে। মাটির অবিরাম চাপে এমনি ক্রমাগত সরু হচ্ছে, কোথাও বা সরু হয়ে হয়ে নলের মতো তার দশা। হয় তো তাও আর বেশীদিন থাকবে না। এই যে অবিরাম চাপ পড়ছে এতে এখানে ওখানে ধরেছে চিড়-ফাট, আবার প্রপ-বা ঠেকনোগুলোও ভেঙে পড়েছে। এগুলি সত্যিই ভয়াল। যেন ওর হাড়মাস করাত-কাটা করবার জন্যে উঁচিয়ে আছে, নয়তো ভাঙাচোরা ঠেকনোর ফলাটা যেন তলোয়ারের ধারালো ডগার হুমকি দেখাচ্ছে। শুধু হামাগুড়ি দিয়ে, বুকে হেঁটে হুঁশিয়ার হয়েই চলছে, হাতড়ে-হাতড়ে অন্ধকারে পথ ঠাহর করে নিচ্ছে। হঠাৎ একপাল ইঁদুর ওর গায়ের উপর এসে পড়ল। গলা থেকে পা অবধি ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। ওরাও আচমকা ভয় পেয়ে পালাচ্ছে।

দূর ছাই! এখনো কি এসে যাই নি? ও গজর গজর করছে, পিঠে তো ব্যথা, দমও ফুরিয়ে এসেছে।

হাঁ, এসে পড়ল বইকি। এক রসি পথ অমনি নলের মতো সরু হয়ে গিয়ে এবার ছড়িয়ে পড়ল। কাঁথির এই দিকটা এখনো ভাঙেচোরেনি, ভালই আছে। মাল-কাটা হলে এই পথে সাবেক কালে নিয়ে আসা হোত। স্তর থেকে কুঁদে এটাকে একটা স্বাভাবিক গুহা তৈরি করা হয়েছে। এতিয়েঁ থেমে পড়ল। সে দেখলে, বাচ্চাটা দুখানা পাথরের মাঝখানে মোমখানা রেখে এবার বসে পড়েছে। ভারি খুশী, গা এলিয়ে দিয়েছে। যেন বাড়ি ফিরে এলে মানুষ এমনি খুশী হয়। কাঁথির এই দিকটা সে সাজিয়ে-গুজিয়ে একখানা আরামের নীড় তৈরি করে ফেলেছে। এক কোণে একগাদা খড় বিছিয়ে তৈরি হয়েছে নরম বিছানা, ভাঙা ঠেকনো জড়ো করে তৈরি হয়েছে টেবিল। প্রয়োজনীয় সবকিছুই সেখানে আছে—রুটি, আপেল, জিনের খোলা পিপে। একেবারে খাঁটি ডাকাতের ডেরা। বহুদিনের লুঠের মালে ভরতি। এমন কি অপ্রয়োজনীয় সাবান, জুতোর কালিও দেখা যায়। এগুলো চুরির জন্যে চুরি—চুরির আনন্দ বাড়াবার জন্যে চুরি। ছেলেটা যেন রাজার মতো জাঁকিয়ে বসে আছে একা এই লুঠের মালের ভিতরে। স্বার্থপর ডাকাত-সর্দারের মতো একক উপভোগে সে মত্ত।

এতিয়েঁ হাঁফ ছেড়ে সুস্থ হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, আচ্ছা ছেলে! কারো উপরে কি একটু মায়াদয়া নেই! তুমি এখানে এসে পেট ঠুসে গিলছ, আর আমরা উপোস করে মরছি বাড়িতে!

জাঁলিন ভয়ে কেঁপে উঠল। এতিয়েঁকে চিনতে পেরে সে তখনি সামলে নিলে। সে বলে বসল, এস, খানা খাও! এই যে শুঁটকি মাছও আছে। দেখ গো, কি করে তৈরি করি।

এখনো শুঁটকি মাছটাকে সে আঁকড়ে ধরে আছে। এবারে সে মাছটা ছাড়াতে শুরু করে দিলে। নতুন একখানা ছুরি দিয়ে—মাছি বসে কালো হয়ে যাওয়া জায়গাটুকুর ছাল কেটে কেটে বাদ দিলে। ছুরিখানার বাঁট হাড়ের। এই হাড়ের বাঁটের উপর আবার 'ভালবাসা' কথা লেখা।

বাঃ খাসা ছুরিখানা বাগিয়েছ তো? এতিয়েঁ বললে।

লিদি দিয়েছে, জাঁলিন জবাব দিলে। তারই নেতৃত্বে লিদি যে এখানা মঁতসুর তেতে-কুপ সরাইখানার সুমুখের এক দোকান থেকে হাত-সাফাই করেছিল, সেকথা এড়িয়ে গেল।

ছাল ছাড়াতে ছাড়াতে সে বেশ জাঁক করেই বললে,

দেখ না, কেমন খাসা ডেরা আমার! উপরের থেকে একটু গরম, তা গরম তো ভালই।

এতিয়েং বসল। ছেলেটাই কথা বলুক, সে শুনবে। আর তার রাগ নেই। বরং এই খুদে শয়তানটার উপর তার মায়া পড়ে গেছে। ও চুরি করছে বটে কিন্তু চুরিতেও স্ফূর্তি আছে, অধ্যবসায় আছে। সত্যই, এই গুহা আরামের নীড়। নিজেরই তার ভাল লাগছে। এখানে খুব গরম নেই। ঋতুর যত অদল-বদলই হোক, এখানকার আবহাওয়া একরকমই থাকবে। এযেন এক গরম জলের হামাম—উপরে ডিসেম্বরের তুষার গরীব-গুরবোদের গায়ের চামড়া ফাটিয়ে দিক না তাতে কি আসে যায়। কাঁথিগুলো পুরানো দিনের, তাই এখন আর বদ গ্যাসের গন্ধ ছাড়ে না। ফায়ার-ড্যাম্পগুলোও আর নেই। শুধু একমাত্র পচা কাঠের গন্ধই ছড়িয়ে আছে। যেন ইথারের মিষ্ট কটু গন্ধ, সঙ্গে আছে লবঙ্গের ফোঁড়ন। তাছাড়া কাঠগুলোও দেখতে অদ্ভুত; বিবর্ণ হলুদ মর্মরের মতো তাদের রং, দুধারে সাদা লেসের মতো ছ্যাতলা গজিয়েছে। যেন সূক্ষ্ম রেশম আর মুক্তোর কাজ করে দিয়েছে বলে মনে হয়। আবার কোথাও বা কাঠের উপর গজিয়ে উঠেছে ব্যাঙের ছাতা। সাদা পোকারা উড়ছে চারিদিকে, সাদা মাছি ভনভন করছে। আর আছে মাকড়সার দল। নিজেদের রং হারিয়ে বসে আছে বাসিন্দেরা। ওরা সূর্যের আলো কি বস্তু জানে না।

এতিয়েং শুধালে, ডর লাগে না?

জাঁলিন অবাক হয়ে তাকাল।

কিসের ডর? এখানে আমি তো নিষ্ঠে একা!

কড মাছটা এতক্ষণে ছাড়ানো হ'ল। কাঠ-কুঠরো দিয়ে আগুন জ্বাললে। তারপর বার করলে প্যান। মাছ ভাজা হচ্ছে। এবারে একখানা রুটি কেটে নিলে। একেবারে নুনে পোড়া ভোজ—তবু ভাল লাগছে।

এতিয়েংও তার ভাগ নিয়ে নিলে,

তুমি যেরকম মোটাসোটা হচ্ছ এতে আর তাজ্জব বনে যাব না। আমরা তো ডিগডিগে রোগা হয়ে যাচ্ছি। তুমি যে এই সব পেটে ঠুসছ, এটা যে খারাপ তা জান? আর সবাই কি করছে? তাদের কথা একবারও ভাববে না?

তা আর সবাই যদি বুদ্ধু হয়, কি করব!

তা লুকিয়ে এসব করে বেশ করেছ। বাপ চুরি করেছ জানতে পারলে তোমাকে দেখাবে।

কি! চুরি করেছি। বড় মানুষরা যেন চুরি করে না। তুমি তো নিজেই হরবখৎ ওকথা বল! মাইগ্রাতের দোকান থেকে এই যে রুটিখানা চুরি করনু, এ তো আমাদেরই পাওনা।

এতিয়েং নিঃশব্দে চিবুতে লাগল। সে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। ছেলেটার দিকে তাকিয়ে আছে। মুখখানা তার ছুঁচালো, সবজে চোখ, কান বড় বড় —দেখেই ওকে মানুষ বলে মনে হয়না—যেন মানুষের বিকৃতি—কিন্তু তবু স্বভাবগত বুদ্ধি আর চাতুর্য আছে। এ যেন আদিম বর্বর জাতির কয়েকটা গুণ, ক্রমিক অবনতির পথ ধরে এর থেকে পশুত্বে পরিণতি পেতে দেরি লাগে

না। পিট তাকে এমনি করে গড়ে পিটে নিয়েছে, আবার পিটই তার পা দুখানা পঙ্গু করে দিয়ে তাকে ভেঙেচুরে ফেলেছে।

এতিয়েং আবার শুধালে, লিদি কোথায়? ওকে এখানে কখনো আনিনি?

জাঁলিন বিদ্রূপের হাঁসি হাসল,

ঐ বাচ্চাটাকে! দোহাই ভগবানের! মেয়েরা যা বকে!

হাসছে বাচ্চাটা—বেবের্ত আর লিদির প্রতি ওর অসীম ঘৃণা। ওদের মতো ভীরু আছে নাকি! ওরা ওর গল্প শুনে শূন্য হাতে ফিরে গেছে, আর ও এখন দিব্যি আগুনের আঁচে বসে সমস্ত মাছটাই একা খাচ্ছে—একথা ভেবেই ও হেসে খুন। এবার ও খুদে দার্শনিকের মতো গম্ভীর হয়ে বললে,

একাই তো ভাল, ঝগড়া বাঁধবার জো নেই!

এতিয়েং রুটি শেষ করে এক ঢোক জিন খেল। একবার মনে হ'ল, এমন অতিথিবৎসল গৃহস্বামীর উপর অকৃতজ্ঞ হয়ে তাকে কান ধরে টেনে-হিঁচড়ে উপরে নিয়ে যাবে কিনা! তাকে জানিয়ে দেবে—সে যদি আবার অভিযানে বার হয়, তাহলে তার বাপকে জানানো ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু এই ডেরাটা দেখে তার একটা কথা মনে হ'ল। হয়তো একদিন তার নিজের বা তার সাথীদের কারো এটার প্রয়োজনও হতে পারে। যদি তেমন কোন ব্যাপার ঘটে তো তাও অসম্ভব কিছু নয়। তাই শুধু সে জাঁলিনকে দিয়ে দিব্যি করিয়ে নিলে—সে সারা রাত কখনো বাইরে কাটাবে না। এমন তো মাঝে মাঝে হয়। জাঁলিন খড়ের বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। রাত কেটে যায়। ছোট্ট এক টুকরো মোমবাতি হাতে নিয়ে প্রথমে রওনা হ'ল এতিয়েং। জাঁলিন তখন ঘর গোছাতে ব্যস্ত।

মোকে-ছুঁড়িটা উদ্বিগ্ন হয়ে প্রতীক্ষা করছে। দুরন্ত শীত—তবু বাইরে একটা কাঠের উপর বসে আছে। তাকে দেখেই ও ছুটে এসে গলা জড়িয়ে ধরল। এতিয়েং বললে, সে ঠিক করেছে, আর দেখা করবে না। মেয়েটার বুকে যেন ছুরির ঘা পড়ল। দোহাই তোমার—কেন বল? কেন সেকি এতিয়েংকে যথেষ্ট ভালবাসে না? এতিয়েং ভয় পেল—কি জানি যদি কামনার বশে সে তার সঙ্গে ওদের বাড়িতেই গিয়েই ঢুকে পড়ে! তাই সে তাকে পথে নিয়ে এসে যতটা মোলায়েম করে সম্ভব বুঝিয়ে দিলে যে, সে তাকে সাথীদের চোখে খাটো করে তুলছে—তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিচ্ছে। অবাক হয়ে গেল মেয়েটা; এর মধ্যে আবার রাজনীতি কোথা থেকে এল? তার পরেই মনে পড়ল, তার সঙ্গে প্রেম করতেই এতিয়েংর যত লজ্জা। তা সে তো মোটেই দুঃখিত নয়—এই তো স্বাভাবিক। সে তো সামনেই দু'ঘা কষিয়ে দিতে বলেছে, তাতে সবাই মনে করবে ওদের আশনাই চুকেবুকে গেছে। তারপরে যদি কখনো-সখনো ওর কাছে আসতে চায় তো আসবে। ও কাকুতি-মিনতি করতে লাগল; শপথ করলে, চোখের আড়ালেই থাকবে। তবে আজ এতিয়েংকে আসতেই হবে। পাঁচ মিনিটের বেশী দেরি হবে না। এতিয়েং অভিভূত তবু অস্বীকার করলে। এ তার প্রয়োজন। যখন বিদায় নিলে, ইচ্ছে হ'ল, একটা চুমু খায়। ওরা প্রায় মঁতসুর বাড়িগুলোর কাছে এসে পড়েছে। আকাশে উঠেছে বিরাট গোলগাল চাঁদ—তারই নীচে ওরা পরস্পরকে জড়িয়ে

ধরে আছে। একটি স্ত্রীলোক ওদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে চমকে উঠল। পাথরে যেন সে হোঁচট খেয়েছে।

কে? এতিয়েং উদ্বিগ্ন হয়ে শুধালে।

ক্যাথি, মেয়েটা জবাব দিলে, জ্যাঁ-বার্ত থেকে ফিরছে।

স্ত্রীলোকটি মাথা নীচু করে চলে যাচ্ছে। সে বুঝি বড় ক্লান্ত, তাই পদে পদে খাচ্ছে হোঁচট। এতিয়েং তাকিয়ে দেখছে। ও যে দেখে গেল, এতেই তার দুঃখ, কেন যেন অসঙ্গত অনুশোচনা ঘনিয়ে এল। সে একটা পুরুষের সঙ্গে ঘর বাঁধেনি? এই রিকুইলারে আর একজনের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে সে এমনি করেই তার মনে দাগা দেয়নি? তবু—তবু-ওকে সেই দাগা আবার ফিরিয়ে দিয়ে ওর মন অনুতাপে ভরে গেল।

বলব, বলব? মোকে চোখের জলে ভেসে বিদায় নেবার সময় ফিসফিসিয়ে বললে; আর কাউকে চাও—তাইত আমাকে চাওনা।

দিনটা চমৎকার হয়েই দেখা দিল, পরের দিন। আকাশ পরিষ্কার। শীত-কালে এমন চমৎকার দিন খুবই কম। যখন এমনি দিন দেখা দেয়, কঠিন মাটি স্ফটিকের মতো পায়ের নীচে বেজে বেজে ওঠে। বেলা একটার সময় জাঁলিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। বেবের্তের জন্যে তাকে গির্জার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ল বহুক্ষণ। লিদির মা নাকি তাকে আবার সেলারে পুরে রেখেছে। তাই তারা তাকে ফেলেই রওনা হতে যাচ্ছিল। এমন সময় মুক্ত হয়ে এল লিদি, একটা ঝুড়ি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তার কাঁধে। সালাদ পাতা ভর্তি করে না আনতে পারলে আবার তাকে পুরে রাখা হবে এ ভয়ও দেখিয়েছে সৎ-মা। সেলারে আছে একপাল ইঁদুর, তাদের সঙ্গেই তাকে রাত কাটাতে হবে। ভয় পেয়েছে লিদি, তাই সালাদের পাতার খোঁজে চলেছে। জাঁলিন তাকে অনেক বাধা দিলে; সালাদ পাতার খোঁজ না হয় পরে করা যাবে। ক'দিন থেকে রাসেনারের খরগোশ পোল্যান্ডের উপর জাঁলিনের নজর। তারা আঁভাতাস-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় পোল্যান্ড রাস্তায় বেরিয়ে এল। জাঁলিন ঝাঁপিয়ে পড়ে তার কান ধরে তাকে লিদির ঝুড়ির ভিতরে পুরে দিলে। তারপর তিনজনেই প্রাণপণে ছুট। বন অবধি খরগোশটাকে কুকুরের মতো দৌড় করিয়ে ওরা মজা লুটবে এই ওদের ইচ্ছে।

কিন্তু থেমে পড়তে হ'ল। জাচারি আর মোকে আর দুজন মিতার সঙ্গে দু-এক পাত্র টানবার পর ওদের ক্রসে খেলা শুরু করে দিয়েছে। বাজি রেখেছে একটা নতুন টুপি আর একখানা রেশমী রুমাল। দুটোই রাসেনারের কাছে গচ্ছিত আছে। চারজন খেলোয়াড় দুটি দলে বিভক্ত। ভোরো থেকে পালিয়োর খামার অবধি তাদের হুদ্দা। সাতটি আঘাতে বল গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দিলে জাচারি। সেই জিতল। মোকে আট আঘাতে বল নিয়ে গেল। ব্যাপারটা এমনি হ'ল—ওরা বলটা এনে প্রথম রাখলে পথের উপর। এক দিকটা একটু উঁচু হয়ে রইল। খেলোয়াড়দের সবারই হাতে একখানা কার ক্রস-ব্যাট—তার মাথাটা লোহায় বাঁধানো—আর লম্বা বাঁটে ভাল করে তার জড়ানো। দুটো বাজতেই ওরা বেরিয়ে পড়ল। জাচারি প্রথমেই বলটাকে চারশো গজ দূরে এক আঘাতে নিয়ে গেল। বীটখেত পেরিয়ে গেল বল। গাঁয়ের ভিতরে বা পথে খেলা নিষিদ্ধ। কি জানি বল পড়ে লোক মারা যেতে পারে। মোকেও

তুখোড় খেলোয়াড়। সে বলটা দেড়শো গজ দূরে আবার পিছিয়ে দিলে। এমনি করেই খেলা শুরু হয়ে গেল।

একদল এগিয়ে নিয়ে যায় বল, আর-এক দল পিছিয়ে নিয়ে আসে। বরফঢাকা চষা খেতের উপর দিয়ে ওরা ছুটছে—পায়ে লাগছে ওদের।

প্রথমে জাঁলিন, বেবের্ত আর লিদিও খেলোয়াড়দের পিছনে পিছনেই ছুটছিল। ওদের ব্যাট হাঁকড়াবার কায়দা দেখে তারিফ করছিল। কিন্তু পোল্যান্ডের কথা মনে পড়ে গেল। ঝুড়ির ভিতরে ওলট-পালট করছে খরগোশটা। ওরা তাই খেলা দেখা বাদ দিয়ে খরগোশটাকে ঝুড়ি থেকে বার করলে। কত জোরে ছোটে তাই দেখতে চায়। খরগোশটা ছুটল—ওরা তার পিছনে। একঘণ্টা জোর কদমে ছুটছে, সব সময়েই মোড় ঘুরছে—আর জন্তুটাকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্যে চেঁচাচ্ছে। ওরা এবার ওকে ধরে ফেলবার চেষ্টা করলে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। হাত বাড়িয়ে চেপে ধরতে গিয়ে বার বার ওরা হাওয়াই জাপটে ধরল। যদি পেটউলী না হোত, ওকে আর ধরতেই পারত না।

ওরা হাঁফাচ্ছিল, এমন সময় গালাগাল শুনে পিছন ফিরে তাকাল। আবার সেই খেলুড়ে দলের মুখোমুখি এসে পড়েছে। জাচারি তো প্রায় তার ভাইয়ের মাথার খুলিটা ভেঙেই ফেলেছিল আর কি! খেলোয়াড়দের এবার চতুর্থ পালা। পালিয়ো খামার থেকে ওরা কোয়াদ্রে-সেমিতে গেছে, সেখান থেকে মতোয়ের-এ; এখন চলেছে—প্রি-দ্য-ভাচে। দু'লীগ পথ আধঘণ্টায় ঘোরা হয়ে গেল। তবে এর মধ্যে দুটো ভাটিখানায় হাজরে দিয়ে গলাও ভিজিয়ে নিয়েছে। এখন মোকেই জিতছে। আর একবার ব্যাট হাঁকড়াবে, তাহলেই জয় তার সুনিশ্চিত। কিন্তু জাচারি তার দাবি জানিয়ে দিলে। বল এমন জোরে মারলে যে সেটা গিয়ে একটা গভীর গর্তে ঠিকরে পড়ল। মোকের দলের খেলোয়াড়েরা বলটা গর্ত থেকে বার করতে পারলে না। এ এক মহা বিপত্তি। চারজনেই চেঁচিয়ে উঠল; সবাই উত্তেজিত। দু'দলই প্রায় সমান-সমান। এবার তাহলে আবার ফিরে-ফিরতি শুরু করতে হয়। আর তো পাঁচবার বল মারবার ওয়াস্তা—দু' কিলোমিটার মাত্র বাকি আছে। তারপরে তো আছে লেনার্দ্যার সরাইখানা।

জাঁলিনের মগজে একটা ফন্দি গজাল। খেলোয়াড়রা চলে যাচ্ছে। সে পকেট থেকে একটা তার বার করে পোল্যান্ডের পেছনের বাঁ পায়ে বেঁধে দিলে। ভারি মজা! তিনটে খুদে শয়তানের আগে আগে ছুটে চলল খরগোশটা, এমন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে যে, ওরা হেসেই কুটিপাটি। এমন হাসি বুঝি জীবনে হাসে নি। এবার তার গলায় বেঁধে দিলে, তারপর দিলে ছুটতে। খরগোশটা ক্লান্ত হয়ে পড়তেই ওরা তাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলল। যেন গাড়ি টেনে নিয়ে চলেছে। এক ঘণ্টার উপর এমনি আমোদ চলল। খরগোশটা কাতরাচ্ছে। এমনি করে ওরা এসে পড়ল ক্রচোটের বনের ধারে। খেলোয়াড়দের সাড়া পেয়েই আবার ওরা খরগোশটাকে ঝুড়িতে পুরে ফেলল। আবার ওদের সামনা-সামনি এসে পড়েছে তারা।

জাচারি, মোকে আর আর-দুজন আবার বলের পিছনে পিছনে ছুটছে। শুধু মাঝে মাঝে পথের ভাটিখানাগুলোতে জিরিয়ে নিচ্ছে। হার্ভে রুসে থেকে বুসিতে ওরা যায়, তার পরে সেখান থেকে ক্রোয়াদ্য পিয়ের-এ, সেখান থেকে আবার সাঁবলেতে। ওরা লাফিয়ে চলেছে, পায়ের নীচের মাটি বেজে

বেজে উঠছে। আর বলটা ছুটছে বরফের উপর লাফাতে-লাফাতে। দিনটা ভাল, পিছলে পড়বার ভয় নেই, হাত-পাও ভাঙবে না। ব্যাট-হাঁকড়ানো তো নয় যেন গুলীর শব্দ। ওদের রোদে-পোড়া তামাটে রঙের মজবুত হাতে ব্যাটের তার-জড়ানো বাঁট চেপে ধরে আছে। ওরা ছুটে চলেছে খানাডোবা, ঝোপঝাড়, বাঁধ আর নীচু বেড়া টপকে। এ খেলায় বুকে চাই হাঁপর, আর পায়ে চাই লোহার কব্জা। এমনি করে মাল-কাটা মজুররা খনির মরচে গুলো ঘসে ঘসে তুলে ফেলে পরম উৎসাহে। ওদের মধ্যে এমনও ছোকরা দেখা যায়, যারা অনায়াসে দশ লীগ ছুটতে পারে। চল্লিশ বছর বয়েস হ'লে আর এ খেলা চলে না; তখন শরীরটা ভারী হয়ে যায়।

পাঁচটা বাজল। গোধূলির আলো এর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। রাত হয়ে এল। ভান্দামের বনের বাঁকটা ঘুরলেই হারজিতের মীমাংসা হয়ে যাবে। কে পাবে টুপি আর রেশমী রুমাল তারও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এইবারেই হয়ে যাবে। জাচারি রাজনীতির ব্যাপারে উদাসীন, আবার বিদ্রূপ করতেও ছাড়ে না। তবু সাথীদের সঙ্গে দেখা হলে মজা মন্দ হয় না এমনি তার ভাবটা। আর জাঁলিনের কথাই ধরা যাক। ধাওড়া থেকে বেরিয়ে সোজা তারা বনের দিকেও রওনা হয়েছিল—যদিও মাঠঘাট ঘুরে ঘুরেই যাচ্ছিল। লিদিটা অনুশোচনায় আর ভয়ে সারা হয়ে যাচ্ছে, তার নাকি ভোরোয় ফিরে সালাদ পাতা না তুললেই নয়। তাহলে বৈঠকটা আর দেখা হয় না। সে জানতে চায় বুড়োরা কি বলে। সে বেবেত'কে ধাক্কা মারলে। বাকি পথটাও অমনি পোল্যান্ডকে ছেড়ে দিয়ে ওর পিছনে ছুটতে-ছুটতে যাওয়া যাক! ওর গায়ে ঢিল ছুঁড়ে মজা দেখা যাক। ওর আসল উদ্দেশ্য, খরগোশটাকে মেরে ফেলা। তারপরে তাকে রিকুইলারে নিজের গর্তে নিয়ে গিয়ে খাবে। খরগোশটা ছুটে চলল। নাক তুলে ছুটছে, কান ঝুলে পড়েছে। একটা ঢিলে ওর পিঠটা ছড়ে গেল, আর একটা লাগল এসে লেজে। অন্ধকারেও ওদের অব্যর্থ সন্ধান। হয় তো ওকে সাবাড় করেই ফেলত, কিন্তু খুদে বদমায়েসগুলো এতিয়েঁ আর মেয়ুকে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থেমে গেল। তাড়াতাড়ি জন্তুটিকে আবার ঝুড়িতে পুরে ফেললে। ঠিক এই সময়েই জাচারি, মোকে আর আর দুজন শেষবারের মতো ব্যাট হাঁকড়ে বলটাকে ফাঁকা জায়গার কাছে নিয়ে গিয়ে ফেললে। সবাই একেবারে জমায়েতের মাঝখানে এসে গেছে।

গোধূলি হতেই সারা তল্লাট থেকে সদর সড়ক, অলিগলি, মাঠঘাট ভেঙে আসছে নিঃশব্দ ছায়ামিছিল। হয় একা আসছে, নয়তো আসছে দল বেঁধে। এসে জমা হচ্ছে গোধূলির আলো-আঁধারিতে। বনের এই ফাঁকা জমিতে। প্রতিটি ধাওড়া এখন শূন্য; মেয়েরা ছেলেপুলে নিয়ে রওনা হয়েছে। উপরে পরিষ্কার আকাশ। যেন তারা চলেছে পরব দিনের আনন্দ উপভোগ করতে। পথঘাট প্রায় আঁধার হয়ে এল। ভ্রাম্যমান জনতা এবার একটি মাত্র গন্তব্যে ছুটে চলেছে। তাদের আর দেখা যায় না। কিন্তু অনুভব করা যায়। এলোমেলো পদশব্দে মালুম হয় ওরা চলেছে একাত্ম হয়ে। ঝোপেঝাড়ে ক্ষীণ খসখসানি উঠছে—এ যেন রাতের আঁধারে অস্পষ্ট স্বরের মতোই ক্ষীণ।

মঁসিয়ে হানাবু এই সময়ে ঘোড়সওয়ার হয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। অস্পষ্ট শব্দ তিনি কান পেতে শুনলেন। এমন চমৎকার রাতে পথে আসতে-আসতে

তিনি জোড় গাঁথা প্রেমিক-প্রেমিকাদের দেখেছেন, আর মানুষের শ্লথ গতি মিছিল। আরো প্রেমিক-প্রেমিকা তাঁর চোখের সামনে দেখা দিয়েছে। তারা দেয়ালের আড়ালেই ঠোঁটে ঠোঁটে লাগিয়ে স্ফূর্তি লুটবার জন্যে তৈরী হয়ে আছে। এগুলি চিরাচরিত দৃশ্যঃ খাদে খাদে মেয়েরা চিতিয়ে শুয়ে আছে, ভিক্ষুকের দল নিঃখরচায় একমাত্র আনন্দ উপভোগ করে চলেছে। ওরা নির্বোধ—জীবনের সেরা আনন্দ—ভালবাসা—প্রচুর পরিমাণে সেই ভালবাসা পেয়েও ওরা অভিযোগে ফুঁসে উঠছে। হায়! তিনি যদি আবার কোন মেয়েকে নিয়ে নতুন করে সংসার পাততে পারতেন, তাহলে ওদের মতো উপবাস করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হোত! সে মেয়ে নিজেকে এমনি করে মাটিতে এলিয়ে দিয়ে সমস্ত দেহমন নিয়ে তাঁর কাছে নিজেকে সঁপে দিত। তাঁর দুর্ভাগ্যের তো কোন সান্ত্বনা নেই। তাই ওদের উপর তাঁর ঈর্ষা—এই হতভাগ্যদের উপর ঈর্ষা। মাথা নুইয়ে তিনি ধীরে ধীরে ফিরে চললেন। অন্ধকারে শুধু চুম্বনেরই সংকেত তাঁর কাছে ব্যক্ত হ'ল।

সাত

প্লাঁ-দ্য-দাম ময়দান। সদ্যসদ্য গাছ কেটে তৈরী। ঢালু হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে ময়দান। চারদিকে বড় বড় গাছ ঘেরা। সাদা বীচ গাছও আছে। সোজা হয়ে উঠে গেছে গাছের গুঁড়িগুলো—সবুজ শ্যাওলা জড়িয়ে আছে—মনে হয় ময়দানকে যেন ঘিরে আছে বড় বড় সাদা থাম। কয়েকটি বনস্পতি এখনো ঘাসে শয়ান, বাঁ দিকে জ্যামিতিক ত্রিভুজের মতো পড়ে আছে গাদা গাদা করাত-কাটা গাছ। আঁধার ঘনিয়ে আসতেই শীত বেড়ে গেছে, বরফ-জমাট শ্যাওলা পায়ের নীচে ভেঙে-গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। মাটির উপরে এখন কালো আঁধার চেপে আছে, কিন্তু গাছের শাখা এখনো বিবর্ণ আকাশের পটভূমিতে দেখা যায়। আকাশে আর কিছুক্ষণ পরেই উঠবে পূর্ণিমার চাঁদ। তারাদল নিষ্প্রভ হয়ে যাবে।

প্রায় তিন হাজার খনির মজুর এসেছে জমায়েতে। একেবারে পুরুষ, মেয়ে আর ছেলেমেয়ের গিসগিসে ভিড়। ক্রমে ক্রমে ময়দান ভরে গেল, এবার ছড়িয়ে পড়ছে দূর-দূর গাছতলায়। এখনো লোক আসার কামাই নেই—ছায়ায় ঢাকা মুখের সাগর ছড়িয়ে পড়ছে বীচগাছের সার অবধি। কথার গুনগুনানি উঠছে। এ যেন তুষার ঢাকা নিস্পন্দ বনে ঝোড়ো হাওয়ার গোঙানি

এতিয়েঁ উঁচু জায়গায় মেয়ু আর রাসেনারের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ঢালের দিকে তাকিয়ে ছিল। তর্ক শুরু হয়ে গেছে, ওদের স্বর হঠাৎ জোরালো হয়েই কানে বাজে। যারা কাছে দাঁড়িয়ে, তারা শুনছে। লেভাকের হাত ঘুষি-পাকানো। পিয়েরোঁ পিছন ফিরে আছে। সে বড়ই উদ্বিগ্ন, আর অসুখের দোহাই দেওয়ারও উপায় নেই। বুড়ো দাদু বনেমোরও এসেছে, আর বুড়ো মোকে। ওরা বসেছে পাশাপাশি কাঠের উপর। একেবারে তন্ময় হয়ে আছে নিজেদের ভাবনায়। তাদের পিছনেই রঙ্গ দেখতে এসেছে আর একদল। জাচারি, মোকে আর

ক'জনও আছে। কিন্তু উলটো ব্যাপারও দেখা যায়। মেয়েরা একেবারে ধীর, গম্ভীর—যেন গির্জায় এসেছে এমনি ভাবখানা। লেভাক-বৌ বিড়বিড় করে গাল দিলে, মেয়ু-বৌ শুধু মাথা নাড়লে। ফিলোমেন কাশছে। শীত এসেছে আর সর্দি-কাশিতে ধরেছে। শুধু দাঁত বার করে হাসছে মোকে-ছুঁড়ি। বুড়ী ব্রুল তার মেয়েকে বকছে আর তাই শুনে মেয়েটার কি রঙ্গ! বুড়ীটা তার নিজের মেয়েকে বেজম্মা বলে গাল দিচ্ছে—ও তো মাকে ফাঁকি দিয়ে নিজে খরগোশের মাংস গেলে; আবার স্বামী মিনমিনে ধাতের বলে নিজেকে বিকিয়েও দেয়। জাঁলিনও কাঠের গাদার উপর চড়ে বসেছে, লিদিকে সে তুলে নিয়েছে, বেবের্ত'ও উঠে এসেছে। ওরা তিনজন এখন সবার চেয়ে ঢের উঁচুতে।

রাসেনারের জন্যই ঝগড়া বেঁধেছে। সে চায় নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রথমে সমিতির কর্মসচিব নির্বাচন। বোঁ জ্যোর পরাজয়ের ধকলটা সে এখনো সামলে উঠতে পারে নি। তাই প্রতিশোধ সে চায়—খনির মজুরদের মধ্যে তার আগেকার প্রতিপত্তিও ফিরে পেতে সে চায়—প্রতিনিধিদের মধ্যে পসার-প্রতিপত্তিও তার কাম্য। এতিয়েঁ বিরক্তই হ'ল। এই বনের মধ্যে কর্মসচিব নির্বাচনী তো হাসি-তামাশারই ব্যাপার। ওদের এখন বিপ্লবীর মতো ব্যবহার করতে হবে, ওরা হবে বর্বর। ওদের তো নেকড়ের মতো তাড়া করছে মালিক।

ঝগড়া বেড়েই চলল, এবার এতিয়েঁ কাটা গাছের একটা গুঁড়ির উপর লাফিয়ে উঠে জনতাকে শান্ত করলে—

সাথীরা......আমার সাথীরা,

গোলমালের গুঞ্জন উঠেছিল, এবার যেন দীর্ঘনিশ্বাসের মতো থেমে গেল। মেয়ু রাসেনারকে থামিয়ে দিলে। এতিয়েঁ এবার জোর গলায় বললে,

ভাইসব, আমাদের বাত-চিতের উপর বসেছে কড়া পাহারা, চোরের মতো ওরা আমাদের পিছনে পুলিস লেলিয়ে দিয়েছে। তাই আমরা এখানে বাত-চিত করতে এসে জমায়েত হয়েছি। এ আজাদ এলাকা ভাইসব, এখানে আমরা আজাদী পেয়েছি—কেউ এসে আমাদের জবান বন্ধ করে দিতে পারবে না—পাখী আর জীবজন্তুদের যেমন মানুষ রাঙা চোখ দেখিয়ে জবান বন্ধ করে দিতে পারে না, আমরাও এখানে তাদেরই শামিল।

তার কথার প্রতিধ্বনি উঠল হর্ষধ্বনিতে, চীৎকারেঃ

হাঁ, হাঁ, এ বন আমাদের, এখানে মোদের দাবি আছে......মোদের জবান কেউ বন্ধ করে দিতে পারবে না। বলে যাও সাঙ্গাৎ—বলে যাও!

এতিয়েঁ গুঁড়ির উপর চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। এখনো দিগন্তরেখায় চাঁদ বড় নীচে—শুধু গাছের মগ্ ডালপালায় তার ঝিকিমিকি। নিস্তব্ধ হয়ে এল জনতা। এখন সম্পূর্ণ নীরবতা। কিন্তু তারা ছায়ায় ডুবে আছে। তাকেও কালো দেখাচ্ছে, জমায়েতের উপরে সে দাঁড়িয়ে আছে যেন এক কালো স্তম্ভ।

ধীরে ধীরে ও একখানা হাত তুলে শুরু করল। কিন্তু স্বরে আর সেই বজ্র গর্জন নেই—জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে সে নীরস স্বরে পেশ করছে বিবরণী। পুলিস যে বক্তৃতা শেষ করতে দেয়নি, সেই বক্তৃতাই আবার সে শুরু করলে। ধর্মঘটের একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সে বলে গেল—ঢঙটা তার সম্পূর্ণ

বিজ্ঞানসম্মত—শুধু কাজের কথা—আর কিছু নয়। নিজে যে ধর্মঘট-বিরোধী ছিল—সেকথাও বাদ পড়ল না। খনির মজুররাও এ ধর্মঘট চায় নি।

রোলার কাজে নয়া রেট বেঁধে দিয়ে মালিকরাই এই ধর্মঘটের উস্‌কানি দিয়েছে। মনে করিয়ে দিলে, ম্যানেজারের কাছে প্রতিনিধিদলই প্রথম আপসের প্রস্তাব নিয়ে যান। কিন্তু ডিরেক্টর সভার দুর্বুদ্ধিতেই কোন ফল ফলে নি। তার পরে দ্বিতীয়বার আপস করার চেষ্টায় প্রতিনিধিদল যান, উপরওয়ালারা তাদের কিছুটা সুবিধেও দিতে রাজি হন। কিন্তু তখন বড় দেরি হয়ে গেছে। দু'সেণ্ট (এখানে মূল সংস্করণে জোলা দশ সেণ্ট বলেছেন; কিন্তু আগে দু'সেন্টের উল্লেখ বহুবার আছে বলে দু'সেন্টই রাখা হ'ল—অনু) চুরি করবার চেষ্টা করে আবার ফিরিয়ে দিতেই রাজি হয়। তাই আজ এই হাল তাদের হয়েছে। টাকার অংক বলে সে জানিয়ে দিলে, আখেরী-তহবিলের পুঁজি নিঃশেষিত, সাহায্যের বিস্তারিত বিবরণ দিলে—দু-এক কথায় আন্তর্জাতিক সংস্থা, প্লুচার্ত এবং অন্যান্য সংগঠনগুলি যে তাদের জন্যে বেশি কিছু করতে পারেন নি, সেকথাও জানালে। দুনিয়া বিজয়ের অভিযান চলেছে, তাই নিয়েই তাঁরা ব্যস্ত—তাই তাঁরা বেশী কিছু করতে পারেন নি। তাই পরিস্থিতি দিন দিনই ঘোরাল হয়ে উঠছে; কোম্পানি কার্ড ফেরত দিচ্ছে, বেলজিয়াম থেকে মজুর আমদানি করবার হুমকি দেখাচ্ছে; তাছাড়া যে সব সাথীরা ভীরু, তারা ভয় পেয়ে গেছেন। কেউ কেউ খনির কাজে ভিড়ে গেছেন। একঘেয়ে স্বর বজায় রাখলে এতিয়েঁ বক্তৃতায়—যেন এমনি ঘ্যানঘ্যান করেই সে মন্দ খবরগুলো সবাইকে জানিয়ে দিতে চায়। সে বলে চলল ঃ আকাল জয়ী হয়েছে, আশার অপমৃত্যু ঘটেছে—সংগ্রাম এখন এসে পৌঁছেছে চরম ধাপে—এখন শেষ শক্তিটুকু নিয়ে ফুঁসে উঠতে হবে। তারপরে গলার স্বর না তুলেই সে হঠাৎ এই বলে শেষ করলে ঃ—

ভাইসব, এই তো ব্যাপার! এখন আপনাদের আজকের রাতেই একটা এর ফয়সালা করে ফেলতে হবে—নিতে হবে শপথ। বলুন—আপনারা কি ধর্মঘট চালু রাখতে চান—বলুন? যদি তাই-ই হয়, তাহলে কোম্পানিকে টিট করে দেবার জন্য আপনারা কি করবেন বলুন?

নক্ষত্রখচিত আকাশ থেকে নেমে এল গভীর নিস্তব্ধতা। রাতের অন্ধকারে অদৃশ্য জনতা এখনো স্তব্ধ। ওর কথায় যেন তাদের বুক ভেঙে গেছে, নিঃশ্বাস ফুরিয়ে আসছে। এখন শুধু গাছপালার ভিতর দিয়ে শোনা যায় হতাশার দীর্ঘশ্বাস।

এতিয়েঁ আবার শুরু করল—স্বরে তর পরিবর্তন এসেছে। সমিতির সম্পাদক এবার আর বলছেন না; দলের দলপতি যেন বলছেন, বলছেন যেন সত্যদ্রষ্টা ঋষি—সত্যধর্মের নির্দেশ দিচ্ছেন। তাদের মধ্যে কি এমন ভীরু কেউ আছে, যে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবে? কেন! একমাস ধরে তারা কি শুধু-শুধু সইল দুর্দশা—এবার কি হেঁট মাথায় ফিরে যেতে হবে খনিতে—আবার কি শুরু হবে সেই চিরন্তন দারিদ্র্য? তার চেয়ে পুঁজিবাদের এই অত্যাচার দূর করবার প্রচেষ্টায় এখুনি মৃত্যু বরণ করা কি ভাল নয়? পুঁজিবাদ তো অনাহারে শুকিয়ে মারছে। তারা তো বহু সয়েছে এই অত্যাচার, চিরদিন উপবাসের তাড়না সহ্য করেছে, আর তারই ফলে সবচেয়ে যে নিরীহ সেও ফুঁসে

উঠেছে বিদ্রোহে। আবার তারই পুনরাবৃত্তি—একি নিছক বোকামি নয়? এ তো চিরদিন চলতে পারে না। সে বলে গেল, কি করে মজুররা শোষিত হচ্ছে, কি করে মহা সংকট এলে তারাই সব চেয়ে বেশি দুর্দশাগ্রস্ত হয়—যখন প্রতিযোগিতার খাতিরে মালের দাম কমিয়ে দিতে হয়—তখন তারাই বরণ করে নেয় উপবাস। না! রোলার কাজের এই হার তারা মানতে পারে না—এ তো কোম্পানির অর্থনীতি নামে শোষণের আর এক দফা চাল। তারা প্রতি মজুররের এক ঘণ্টার কাজ কেড়ে নিচ্ছে। এবারে তো এ শোষণ গিয়ে ঠেকেছে চরমে। আর দলিত পিষ্ট হতভাগ্যদের আসছে সময়। তারা বিচার দাবি করছে। এতিয়েঁ থেমে পড়ল, হাত দুখানা সে ছড়িয়ে দিয়েছে। বিচার কথাটায় জনতা যেন নড়ে নড়ে উঠল, হর্ষধ্বনি বিস্ফূর্ত হ'ল, শুকনো পাতার খসখসানির মতো বয়ে-বয়ে গেল।

বিচার চাই......হাঁ, এখুনি বিচার চাই?

ধীরে ধীরে এতিয়েঁও আবেগে অধীর হয়ে উঠছে, রক্ত তার চঞ্চল। রাসেনারের সহজ স্বচ্ছন্দ আবেগময় ভাষা তার নেই। বহু সময়েই ঠিক কথা যোগায় না, সে ঘাবড়ে যায়, ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বক্তব্য বলে যায়—তার পরে নিজেই এই শব্দের গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে আসে। কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে আবার বলতে শুরু করে। শুধু যখন আবেগের ধাক্কা এসে লাগে, তখনি এমনি সহজ সুন্দর ছবি সে খুঁজে পায়। শ্রোতাদেরও ভাল লাগে, তারা কথার নেশায় মেতে ওঠে। মজুর-সুলভ অঙ্গভঙ্গীই ও করে; কখনো হাত দু'খানা গুটিয়ে রাখে—কখনো বা বাড়িয়ে দেয়—মুঠো পাকিয়ে আঘাত হানতে চায়। হঠাৎ চোয়াল হাঁ হয়ে যায়—মনে হয় যেন কামড়াবে। সাথীরা অভিভূত হয়ে পড়ে। ওর কথা এক অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে।

আবার আরো জোরে ও শুরু করে দিলে, এই যে মজুরির রেট—এতো নয়া কিসিমের গোলামি। খনির মালিক হবে মজুররা—যেমন সমুদ্দুরের মালিক জেলেরা—আর মাটির মালিক চাষীরা। তোমরা বুঝতে পারছ না ভাই সব? খনি তোমাদের—তোমাদের সবার—তোমরাই একশো বছর ধরে ওর জন্যে নিজের খুন ঢেলে দিয়েছ—নিজেরা দুঃখ মেনে নিয়েছ।

আইনের জটিল অরণ্যে এবার সে ঢুকে পড়ল, খনির বিশিষ্ট নিয়মকানুনের ভিতরে সে নিজেকে হারিয়ে ফেললে। মাটি যদি জাতির সম্পত্তি হয়, তাহলে এই যে মাটির আড়ালের স্তর—এও তো তাই হবে। কিন্তু কোম্পানিগুলোই তার মালিক। একি অন্যায় সুযোগ, এ কি ঘৃণ্য প্রথা! আবার মঁতসুর ক্ষেত্রে তো সে অন্যায় আরো ভয়ানক হয়ে উঠেছে। সেখানে খনির আইনগত অধিকার সাবেক আমলের জমিদারদের সঙ্গে বহুদিন আগে বোঝাপড়া হয়ে ঠিক হয়েছিল। এ তো আইন নয়—পুরানো দিনের জমিদারী প্রথার এক শর্তমাত্র। খনির মজুররা এই পচা-গলা শর্ত মানবে না। তারা তাদের ঐ সম্পত্তি আবার দখল করে নেবে। সে হাত বাড়িয়ে বনের সীমানার বাইরে বিস্তীর্ণ অঞ্চল দেখিয়ে দিলে। এবার উঠল চাঁদ। দিগন্তরেখার উপরে উঠে এসেছে, আলো গাছের উঁচু ডালপালার ভিতর দিয়ে বয়ে এল—তাকে আলোয় আলো করে দিলে। জনতা এখনো ছায়ায় অদৃশ্য—তারা তাকিয়ে তাকে দেখছে।

আলোয় আলোময় তার মূর্তি, দীপ্তিমান শুভ্রতা ছেয়ে আছে—সে যেন দু'হাতে বিলিয়ে দিচ্ছে ধনসম্পদ। আবার তারা ফেটে পড়ল হর্ষধ্বনিতে।

বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা! বাঃ!

এতিয়েং আবার তার প্রিয় বিষয়ে চলে গেল। উৎপাদনের উপায় হবে সমষ্টিগত। পাণ্ডিত্যপূর্ণ বড় বড় বুলি সে বলে গেল, তার নিজেরই ভাল লাগছে। তার ক্রমবিকাশ তো এখন সম্পূর্ণ। আবেগময় ভ্রাতৃত্বের আবেদন দিয়েই সে শুরু করেছিল—মজুরি প্রথার সংস্কারই ছিল তার কাম্য—কিন্তু এখন সে তার ঊর্ধ্বেই চলে গেছে—সে এসে পেঁছেছে মজুরি প্রথা বিলোপের রাজনীতিক মতবাদে। ব্যোঁ জোর সভায় তার এই সমষ্টিবাদ ছিল মানবতাবোধেরই নামান্তর; তার কোন পন্থা নির্ধারণ করতে সে পারেনি—কিন্তু এখন জটিল পরিকল্পনায় তার সেই নীতি নিয়ন্ত্রিত। তার প্রতিটি শর্ত নিয়ে সে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তর্ক করতে পারে। প্রথমেই সে নিজের যুক্তির জোরদার সমর্থন করে জানালে, রাষ্ট্রের ধ্বংস হলেই আজাদী মিলবে, নচেৎ নয়। তার-পরে জনগণ যখন হবে সরকারের নিয়ামক, তখন শুরু হবে সংস্কার। তারা সেই আদিম যুগের গোষ্ঠিগত সংস্থায় ফিরে যাবে। নীতিবাদী অত্যাচারী পরিবারের পরিবর্তে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে স্বাধীন পরিবার—সম অধিকারে মহিমান্বিত পরিবার। সেখানে পূর্ণ সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে—পারিবারিক, রাজনীতিক, আর্থিক সাম্যই হবে তার ভিত্তি। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পূর্ণ প্রতিশ্রুতি থাকবে—আর সেটা বজায় থাকবে উৎপাদনের হাতিয়ার আর উৎপন্ন-দ্রব্যের সমান অধিকারে। এবার তাদের সমষ্টিগত তহবিল থেকে দিতে হবে বিনা খরচায় পেশাদারী বৃত্তির শিক্ষা। এতে এই পুরানো, পচা-গলা সমাজকে আবার ঢেলে সাজানো হবে। এতিয়েং এবার আক্রমণ শুরু করল। বিবাহ-প্রথা, উত্তরাধিকার কিছুই বাদ পড়ল না। প্রতিজনের ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিয়ম বেঁধে দিলে। মৃত শতাব্দীর পর শতাব্দী যে অন্যায়ের স্তম্ভ গড়ে তুলেছে, তাকে সে তার দৃঢ় মুষ্টিতে ধসিয়ে চুরমার করে দিতে চাইছে। এ যেন এক চাষী—কাস্তের চোপে কাটছে পাকা ফসল। আবার অন্য হাত দিয়ে সে ইঙ্গিত করছে গড়ার পালার। সে গড়ে তুলল ভবিষ্যৎ মানব সমাজ, সে তো সত্যের প্রাকার, ন্যায়ের প্রাকার—বিংশশতকের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তার আবির্ভাব হয়েছে। মানসিক উত্তেজনায়—যুক্তি টলমল করে উঠছে, শুধু রয়েছে উগ্র মতবাদীর প্রচণ্ড আবেগ। মানবতাবোধ এখন অন্তর্হিত, সাধারণ জ্ঞানও আর নেই—এই নয়া দুনিয়া—জঙ্গী দুনিয়ার পূর্ণ রূপায়ণ বুঝি এখন তাঁর কাছে সব চেয়ে সহজ। সে যেন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা—তাই সে একে একটা যন্ত্রের মতোই বর্ণনা করে যাচ্ছে। সে যেমন অংশগুলো জুড়ে জুড়ে দুঘণ্টার ভিতরেই যন্ত্রটাকে খাড়া করে তুলতে পারে—এই নয়া দুনিয়াও যেন তাই। এখানে অগ্নিদাহন বা রক্ত-পাতে ভয় পেলে চলবে না।

উচ্চগ্রামে উঠে এল স্বর, সে চীৎকার করে উঠল, এবার আমাদের পালা! আমরা পাব ধন, আমরা পাব ক্ষমতা।

অরণ্যের গভীর থেকে ধ্বনিত হ'ল সমর্থন—জিগিরে-জিগিরে। এরই মধ্যে চাঁদ সমস্ত ময়দান আলো করে তুলেছে। মানুষের মাথার সাগরে এখানে-ওখানে দু-একখানি মুখ আলোর ঢেউয়ে আলো হয়ে গেছে। ঢেউ বয়ে বয়ে চলেছে

আলো-আঁধারি ভরা ময়দানে—বড় বড় গাছের গুঁড়ির ধূসরতায় আটক হয়ে আছে। এই তুষারময় শীতের রাতে শুধু আছে অগ্নিময় মুখের সার, জ্বলন্ত চোখ, আর উন্মুক্ত ঠোঁট বুভুক্ষুর—নরনারী, শিশুর দল—যুগার্জিত ধনসম্পদ লুট করবার জন্য যেন ওদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এ ধনসম্পদ তো তাদেরই, এরই মালিকানা থেকে বিচ্যুত হয়েছিল মাত্র। আর ঠান্ডা তারা অনুভব করছে না, জ্বলন্ত বাণী তাদের অন্ত্রে অন্ত্রে ঢেলে দিয়েছে উত্তাপ। ধর্মোন্মাদনায় তারা উন্মাদ। এ যেন পুরাকালের খৃষ্টানদের অধীর আশাময় প্রতীক্ষা—ন্যায়ের রাজ্য আবির্ভূত হবে ধরায় তারই জন্য উন্মুখতা। কত কথা ওরা এড়িয়ে গেল, কত সূক্ষ্ম যুক্তি ওরা সঠিক বুঝতে পারল না; কিন্তু এই অস্পষ্টতা আর সূক্ষ্মতা যেন আরো উন্মুক্ত করে দিলে প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্র—ওদের এক উজ্জ্বল মহত্বে উন্নীত করে দিলে। কি—এক স্বপ্ন! মালিক হবে তারা, তারা সইবে না দুঃখ দুর্দশা—তারা অবশেষে পাবে উপভোগের অধিকার!

হাঁ, হাঁ, এই সাচ্চা জবান! মোদের পালা এল! পুঁজিবাদী ধ্বংস হোক! মৃত্যু হোক মুনাফাখোর মালিকের!

মেয়েরা তো উন্মাদ—প্রলাপে প্রগলভা। মেয়ু-বৌ অবধি তার চিরাচরিত স্থৈর্য হারিয়ে ফেলেছে, সেও বুভুক্ষার ঘূর্ণিতে এখন ঘূর্ণিত। লেভাক-বৌও চীৎকার করে উঠছে; অভিভূত সে, ডাইনীর মতো হাত দুখানা নাড়ছে উত্তেজনায়। ফিলোমেনের উঠেছে কাশির দমক। মোকে-ছুঁড়িও উত্তেজনায় অধীর—সে বক্তার দিকে প্রিয় সম্ভাষণ ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে। আর পুরুষদের মধ্যে মেয়ু তো সম্পূর্ণ বশীভূত। সে চীৎকার করে উঠছে, তার এক পাশে পিয়েরোঁ কাঁপছে আবেগে, আর এক পাশে লেভাক বক্‌বক্ করে চলেছে। রঙ্গপ্রিয় জাচারি আর মোকে তাদের সাঙাৎ এক চুমুক মদ না খেয়েই এত বকবক করছে দেখে অবাক বনে গেছে। এই কথা বলে হাসির হর্‌রা তুলতে চাইছে—কিন্তু তবু তাদেরও যেন স্বস্তি নেই। কাঠের গাদার উপর থেকে ভেসে আসছে জোর চীৎকার। জাঁলিন চেঁচাচ্ছে—লিদি আর বেবের্তকে সে ঠেলছে—ঝুড়িটা দিয়ে। ঝুড়িটার ভিতরে আছে পোল্যান্ড। আবার সোরগোল উঠল। এতিয়েঁ জনপ্রিয়তার উগ্রসুরার স্বাদ পেয়েছে। তার হাতে এখন ক্ষমতার রাশ—তিন হাজার মানুষ যেন তারই ক্ষমতার স্বীকৃতি—তাদের বুক স্পন্দিত তার হুকুমে। সুভেরিন যদি আসতো, সেও তার আদর্শের ব্যাখ্যা শুনে সোল্লাসে চীৎকার করে উঠত; তার শিষ্যের সন্ত্রাসবাদের পথে অগ্রগতি দেখে সেও খুশী হোত। এই কার্যসূচীতে তারও থাকতো অনুমোদন, শুধু শিক্ষার ব্যাপারেই হোত ঘোর অমিল। শিক্ষা তো ভ্যাপসা অবেগের অবশেষ মাত্র; মানুষকে অজ্ঞানতার পূত ধারায় স্নান করে শুদ্ধি হতে হবে এই তার মত। আর রাসেনার? সে সক্রোধে কাঁধে ঝাঁকুনি দিলে।

এতিয়েঁকে চীৎকার করে বললে, আমাকে বলতে দিতে হবে সাঙাৎ!

রাসেনার তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল তার জায়গায়, হাত নেড়ে সবাইকে চুপ করতে বললে। কিন্তু গোলমাল কমে গেল না, প্রথম সারিতে তার নাম মুখে উচ্চারিত হ'তে লাগল। যারা ঐ বীচগাছের তলায় রয়েছে—শেষ সারের তারা অবধি তাকে চিনল। ওর কথা তারা শুনবে না। সে এখন ভূপতিত দেবতা। তার পুরানো ভক্তরা তাকে দেখতে পেয়েই রাগে ফুঁসে উঠছে। তার

সরস বাগ্মিতা, কথার স্বচ্ছন্দ স্রোত—এতদিন ওদের মুগ্ধ করে রেখেছিল, এখন যেন তারা কুসুম-কুসুম চায়ের মতো—শুধু ভীরুদেরই সে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে পারে কথার ঘুমপাড়ানি শক্তিতে। সোরগোলের ভিতরে সে বৃথাই চীৎকার করে উঠল, আপস সম্বন্ধে তার ধরতাই বুলি আওড়াতে লাগল। দুনিয়াকে তো লোকসভার এক আইনের খোঁচায় বদলানো যাবে না, সামাজিক বিকাশের জন্য সময় দিতে হবে। কিন্তু ওরা হেসে উঠল, চীৎকার করে ওকে বসিয়ে দিতে চাইলে। বোঁ জ্যোতে তার পরাজয় হয়ে ছিল, কিন্তু আজ তা চিরতরে স্থিরীকৃত হয়ে গেল। ওরা এবার বরফে জমাট শ্যাওলা মুঠো মুঠো তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারতে লাগল তার দিকে। মেয়েরা চীৎকার করে উঠল তীক্ষ্ণ স্বরে ঃ—

দালাললোগ মুর্দাবাদ!

সে আবার ওদের বোঝাতে লাগল, খনির মজুররা মালিক হতে পারবে না, যেমন তাঁতী পারবে না তার কলের তাঁতের মালিক হতে। সে তাই মুনাফার বখরাদারি চায়। এতে মজুর হবে মালিকেরই পরিবারভুক্ত!

দালাললোগ মুর্দাবাদ! হাজার হাজার কণ্ঠে উচ্চারিত হ'ল, ঢিল চলেছে শিস দিতে দিতে।

রাসেনার বিবর্ণ; হতাশায় অশ্রুভরা চোখ। তার জীবনের সমস্ত প্রয়াস ধসে পড়ছে, বিশ বছর ধরে ভ্রাতৃত্বের যে বন্ধন গড়ে তুলেছিল, উচ্চাকাঙ্ক্ষার বনিয়াদ খাড়া হয়ে ছিল, আজ তা জনতার অকৃতজ্ঞতায় ভেঙেচুরে ধসে পড়ছে। গাছের গুঁড়ি থেকে সে নেমে এল। চলবার শক্তি নেই, বুকে তার ব্যথা।

বিজয়ী এতিয়েন্‌'র দিকে তাকিয়ে আমতা-আমতা করে বললে, তোমার তো হাসি পাচ্ছে সাঙাৎ! ভাল, ভাল! তবে বলে রাখি—তোমার পালাও আসবে। হাঁ, আসবে।

আবার ধিক্কার, ধিক্কার! বেড়াল-ডাকা শুরু হয়ে গেল। সবাই অবাক হয়ে গেল বুড়ো দাদু বনেমোরকে দেখে। গুঁড়ির উপর সটান দাঁড়িয়ে সে যেন এই সোরগোলের মধ্যে কি বলতে চাইছে। এতক্ষণ অবধি সে আর মোকে-বুড়ো তন্ময় হয়ে ছিল। যেন পুরানো দিনের জাবর কাটছিল বসে বসে। বোধহয় তারও এসে গেছে কথার হঠাৎ দমক। অতীত অনেক সময় এমন করে নাড়া দিয়ে যায়, এমন করে স্মৃতির সাগরে শুরু হয় মন্থন—ঠোঁট এক নাগাড়ে এক ঘন্টা ধরে বক্‌বক্‌ করে যায়। তেমনি এক দমক ওকে পেয়ে বসেছে, ও বলছে। আবার স্বব্ধতা ঘনিয়ে এল ভিড়ে, গভীর স্তব্ধতা। বুড়োর কথা তারা কান পেতে শুনছে। চাঁদের আলোয় তাকে যেন বিবর্ণ এক অশরীরী আত্মা বলে মনে হয়। সে পেড়ে বসেছে এমন কথা যার সঙ্গে আলোচনার পূর্বাপর কোন সম্বন্ধ নেই। সে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস—কেউ তা বুঝতে পারছে না—তাই বিস্ময় আরো বেড়ে গেছে। নিজের যৌবনের কথাই সে বলছে; বলছে তার দুই খুড়োর কথা, লা-ভোরোর নীচে ধস চাপা পড়ে তারা পিষে গেল; তারপরে এল নিউমনিয়ার কথায়—ওই রোগেই তো তার পরিবার মারা গেল। কিন্তু আসল বক্তব্য বজায় রইল; কখনো দিনকাল ভাল যায়নি, যাবেও না। তারই উদাহরণ দিলে! বনে পাঁচশো লোকের জমায়েত হয়েছিল সেদিন। দেশের রাজা মেহনতির ঘন্টা কমাতে নারাজ। থেমে গেল বুড়ো, আবার শুরু

হ'ল সাবেক আমলের এক ধর্মঘটের কথা। সে তো অমন বহু ধর্মঘট দেখেছে, বহু! আর সে ধর্মঘটগুলি আজকের এই প্লাঁ-দ্য-দামের গাছপালার আড়ালে, নয় তো চারবনেরি—নয় তো বহু দূরে সান্তে-দ্য ল্যুপের পথের ধারে শেষ হয়ে গেছে। কখনো বা জুড়িয়ে জমাট বেঁধে গেছে উত্তেজনা, কখনো বা টগবগ করে ফুটে উঠেছে। এক রাতে তো এমন জোর বৃষ্টি এল যে, ওরা বলতেই পেলে না—ফিরে গেল। তারপরে এল রাজার ফৌজ, গুলী গোলা ছুঁড়ে ঠান্ডা করে দিলে।

এমনি করেই হাত তুলে মোরা জিগির দিনু সাঙাৎ, এমনি করেই কসম খেনু—আর ফিরে যাবনি! হাঁ, আমিও কসম খেনু...হাঁ, আমিও...

বিস্ময়ে হতবাক জনতা। এতিয়েঁ এ দৃশ্য দেখছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। সে এবার লাফিয়ে বুড়োর পাশে এসে দাঁড়াল। প্রথম সারিতে সে সাথীদের মধ্যে সাভালকে দেখতে পেল। তার মনে হ'ল, নিশ্চয়ই ক্যাথেরিনও আছে। আবার নতুন উৎসাহে সে প্রদীপ্ত—সে চায় আবার সবাই তাকে বাহবা দিক ক্যাথেরিনের সুমুখে।

ভাইসব, তোমরা শুনলে! আমাদের একজন পুরানো মিতা বলে গেলেন তাঁর কথা। তিনি কত দুঃখ সয়েছেন তারই কথা। আমরা যদি এই কসাই, এই ডাকাতদের নিকেশ করে না দিই—তাহলে আমাদের কাচ্চাবাচ্চারাও তো এমনি দুঃখ সয়ে মরবে—তিলে তিলে মরবে।

ক্রোধে সে মারমূর্তি হয়ে উঠেছে, এমন তীব্র তীক্ষ্ণভাবে সে কখনো বক্তৃতা দেয়নি। এক হাত দিয়ে সে বুড়ো বনেমোরকে ধরে আছে, দুঃখ দুর্দশার ঝাণ্ডা হিসাবে সে তাকে দেখাচ্ছে—আর মুখে সে তুলছে প্রতিশোধের আহবান। কয়েকটা কথায় সে মেয়ু বংশের প্রথম পূর্বপুরুষের কথায় এসে গেল। সে দেখালে, গোটা পরিবারটাই পিটের গহবরে মৃত্যু বরণ করেছে—তারা হয়েছে কোম্পানির শিকার—তার বলি। একশো বছরের মেহনতির পর এখনো তাদের বুভুক্ষা তো মেটেইনি—বরং আরো বেড়ে উঠেছে। আর তারই উলটো পিঠের ছবি সে তুলে ধরলে। নাদা পেটা ডিরেক্টররা সোনার ঘাম ফেলছে—একশো বছর ধরে বখরাদারের ভিড়কে তাজা রাখছে বেশ্যার মতো। তারা তো কিছু করছে না—শুধু উপভোগে মত্ত হয়ে আছে। এ কি ভয়ানক নয়? এক দল মানুষ পিটের গহবরে ধুঁকে ধুঁকে মরছে, বাপদের পরে মরছে ছেলেরা। কেন মরছে? মন্ত্রীদের যে ঘুষের যোগান দিতে হবে আর মহামান্য আমীর আর বুর্জোয়াদের যে বিরাট ভোজের মজলিসের খরচ যোগাতে হবে—অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে তারা যে নধরকান্তি পুষ্ট করবে তারই যে রসদ যোগাতে হবে। খনির মজুরদের রোগের কথাও সে জানে, তার ভয়াবহ ফিরিস্তি সে দিয়ে বলল: রক্তহীনতা আছে, আছে গলগণ্ড, ভীষণ কাশি-সর্দি, হাঁপানি আর বাতব্যাধি। হতভাগ্য তারা—তারা তো যন্ত্রের খাদ্য মাত্র। কোনরকমে তারা খোঁয়াড়ে মাথা গুঁজে গোরু ভেড়ার মতো থাকে। বড় বড় কোম্পানিগুলোই তাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তাদের ক্রীতদাস করে রাখে। তারা চায় দেশের সমস্ত মজুরদের তাদের আওতায় টেনে আনতে—লাখো লাখো হাতের মেহনতি দিয়ে মাত্র হাজারখানেক অলস বিলাসীর ধন-সম্পদ বাড়িয়ে তুলতে। কিন্তু খনির মজুর তো আর সেই আদিম পশুত্বের পর্যায়ে নেই যে, মাটির গর্ভে চাপা পড়ে থাকবে—সে

দিন এখন গত। খনির গভীরে এক সেনাদল জেগে উঠছে, একদল অধিকার-বোধে উদ্দীপ্ত স্বাধীন মানুষ দেখা দিয়েছে—তাদের বীজ অংকুরিত হয়ে উঠবে, এক রোদেঝলা দিনে সেই অংকুর ঠেলে ফুঁড়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। তখন তারা বুঝতে পারবে—চল্লিশ বছর কাজের পর ষাটবছর বয়েসের এক বুড়োকে—যে কয়লা-কালো গয়ার ফেলছে, খাদের জলে যার পা সোঁতে ফুলে উঠেছে—তাকে কি করে ওরা মাত্র দেড়শো ফ্রাঁ ভাতা দিয়ে বিদায় দেয়! হাঁ, হাঁ, মেহনতি মজুর ঐ ধনবাদের কাছ থেকে কৈফিয়ৎ চাইবে! ধনবাদ তো এক নামপুরুষ দেবতা, মজুরদের কাছে সে অজ্ঞাত। কোথায় এক রহস্যময় মন্দিরে সে ওত পেতে বসে আছে আর সেখান থেকে হতভাগ্য, বুভুক্ষু মজুরের রক্ত চুষে শুষে খাচ্ছে—আর তরতাজা হয়ে উঠছে। তারা ছুটে যাবে—তাকে খুঁজে বার করবে—বহ্নি উৎসবের আলোয় দেখবে তার মুখ—তারপর তাকে রক্তস্রোতে দেবে ডুবিয়ে। ঐ বিকৃত দেবতা, ঐ ঘৃণ্য শূকর, ও তো নরমেদে স্ফীত—ওকে তারা দেখে নেবে—দেখে নেবে!

সে চুপ করে গেল, কিন্তু এখনো শূন্যে তার হাত উঠে আছে—ঐখানে ঐ শত্রুকে সে দেখিয়ে দিচ্ছে—দুনিয়ার যেখানেই থাকুক শত্রু—অভ্রান্ত তার নির্দেশ। এবার জনতার চীৎকার উঠল। কি জোরাল সে চীৎকার!—মঁতসুর পুঁজিবাদী মালিকেরা শুনল সে জিগির, ভান্দামের বনের দিকে তারা আতঙ্কিত হয়ে তাকিয়ে রইল। বুঝি এক ভয়ানক ধস নেমেছে।—নিশাচর পাখীর ঝাঁক ভয় পেয়ে বনের আড়াল থেকে উঠে এল জ্যোৎস্নাঝলা আকাশে।

সে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত চায়।

ভাইসব, কি ঠিক করলে? তোমরা কি ধর্মঘট চালু রাখার পক্ষে ভোট দেবে?

হাঁ, হাঁ, গর্জন উঠল ঘন জনতায়।

তাহলে কোন পথ নেবে তোমরা? যদি কোন দালাল কাল গিয়ে পিটে নামে, তখন তো আমরা হেরে যাব।

আবার ঝড়ের গর্জন উঠল স্বরে,

মার—মার—দালাললোগকো মার!

বহুৎ আচ্ছা! তোমরা তাহলে ইমান রাখবার কথাই বলছ? বেশ তো তাই-ই হবে—আমরা তাই-ই করব: আমরা পিটে পিটে যাব, আমরা গেলেই দালালরা আর নাবতে সাহস পাবে না। কোম্পানিকে আমরা বুঝিয়ে দেব—আমরা সবাই একমত—আমরা মরব, তবু হার মানব না!

সাচ্চা জবান—চল, পিটে চল—চল...!

এতিয়েঁ বলছিল আর ক্যাথেরিনের খোঁজ করছিল গর্জমান নিষ্প্রভ মুখের সারে। না, সে নেই। সাভালকে এখনো দেখা যাচ্ছে। সে ঠাট্টা করছে, ঘাড় নাড়ছে, কিন্তু ঈর্ষায় দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে—এই জনপ্রিয়তার এক ফোঁটা পাবার জন্যে সে নিজেকে বিকিয়েও দিতে পারে।

এতিয়েঁ বলে চলল, যদি আমাদের মধ্যে টিক্‌টিকি থেকে থাকে—তাহলে তারা হুঁশিয়ার। আমরা তাদের চিনি। হাঁ, ভান্দামের খনির কয়েকজনকে আমি দেখতে পাচ্ছি—ওরা এখনো পিট ছেড়ে আমাদের দলে ভেড়েনি।

সাভাল তার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে বলে উঠল—আমার কথা বলছ নাকি?

যে কোন লোকের কথাই হতে পারে। কিন্তু তুমি যখন বললে, তোমাকেই বলি। তোমার বোঝা উচিত—যারা খেতে পায় তাদের, যারা উপোস করে থাকে —তাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই। তুমি জাঁ-বার্তের মজুর।

বিদ্রূপে ওর কথায় ছেদ পড়ল

ও মেহন্নত করে নাকি! ওর মাগীটা ওর জন্যে মেহন্নত করে, ভাড়া খাটে!

সাভাল গাল দিলে, তার মুখ লাল।

হা ভগমান! এরা বলে কি! মোরা কামও করব নি!

না! এতিয়েঁ চীৎকার করে উঠল। না! যখন তোমার সাথীরা সবার ভালাইয়ের জন্যে দুঃখ সইছে—তখন কাজ করাও বারণ। আমরা চাইনা—মজুর বুকে হেঁটে মালিকের দলে গিয়ে ভিড়ুক—নিজেদের ভালাই তারা চাক। ধর্মঘট যদি সব জায়গায় হোত, তাহলে এতদিনে আমরাই মালিকানা পেতাম। মঁতসুর সবাই যখন বেরিয়ে এল, তখন কি ভান্দামের একজন মজুরেরও গিয়ে পিটে নামা উচিত? সমস্ত এলাকায় যদি কাজ বন্ধ হয়ে যেত—সেই তো ছিল তুরুপের তাস! মঁসিয়ে দেনেউলি'র ওখানেও মঁতসুর দশাই হওয়া উচিত। বুঝতে পারছ ভাইসব! জাঁ-বার্তে যারা কাজ করছে ওরা দালাল। ওরা বিশ্বাসঘাতক!

সার্ভালের চার পাশে জনতা এখন ক্ষেপে উঠেছে। মুষ্টিবদ্ধ হাত উঠছে আর চীৎকার—মার, মার! সাভাল ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু এতিয়েঁর উপরে এক হাত নেবে বলে তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। হঠাৎ তার মাথায় এক ফন্দি গজিয়ে উঠল।

তাহলে শোন ভাইসব। কাল তোমরা জাঁ-বার্তে চল। গিয়ে নিজের চোখে দেখবে—মোরা কাম করছি কিনা! আমরা সবাই তোমাদের দলে—আর সেই কথা বলতেই তো ওরা আমাকে পাঠিয়েছে। কিন্তু ফার্নেসগুলো তো নিবিয়ে দিতে হবে, ইঞ্জিনের মিস্ত্রীদেরও তো বেরিয়ে আসতে হবে। পাম্প যদি বিকল হয়ে যায়, তাহলে তো আচ্ছা হবে! জলের তোড় এসে খনি ভাসিয়ে দিয়ে যাবে, আর সব সাবাড় হয়ে যাবে।

দুশো বাহাবা পেল সাভাল, এতিয়েঁকে যেন ওরা ঠেলে দিলে পিছনে। এক-একজন করে বক্তা উঠে আসতে লাগল গাছের গুঁড়ির উপর। সোরগোলের ভিতরে হাত নেড়ে অসম্ভব সব প্রস্তাব পেশ করতে লাগল। এ যেন অন্ধ বিশ্বাসের বিস্ফোরণ, ধর্মসম্প্রদায়ের অসহিষ্ণু মতবাদ—গোঁড়ামি, খ্যাপামি। তারা অলৌকিক আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় থেকে থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে—তাই —তাই এবার নিজেদের হাতে নিয়েছে তাকে সম্ভব করার ভার। বুভুক্ষায় ক্লান্ত, অন্তসার শূন্য জনতা, ক্রোধে ওরা উন্মত্ত—অগ্নিদাহ আর রক্তের স্বপ্নে ওরা বিভোর। ওদের কামনা এক মহা ধ্বংসে সব ছারখার হয়ে যাক—আর তারপর তারই ভিতর থেকে উদ্ভূত হোক বিশ্বের শান্তি। স্বপ্নের সেই ঘোর ওদের চোখে লেগেছে। শান্ত জ্যোৎস্না এই উদ্বেল জনসমুদ্রকে স্নান করিয়ে দিচ্ছে—আর রক্তের জিগিরকে ঘিরে আছে অরণ্যের গভীর স্তব্ধতা। বরফে ঢাকা শ্যাওলা পায়ের নীচে যাচ্ছে গুঁড়িয়ে। উন্নত, সতেজ বীচগাছের সার দাঁড়িয়ে আছে স্তব্ধ হয়ে—মেলে দিয়েছে তাদের ডালপালার শুভ্র কারুকার্য

আকাশের শুভ্র পটভূমিতে। এই যে জনতা ব্যথায়, উত্তেজনায় অধীর হয়ে পা দাপাচ্ছে, ওরা তবু অন্ধ, তবু বধির।

ভিড়ে ঠেলাঠেলি পড়ে গেছে। মেয়ু-বৌ দেখলে সে তার স্বামীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। লেভাক চরমপন্থী। সে তার বক্তৃতায় ইঞ্জিনিয়ারদের সুদ্ধ দায়ী করে বসলে। তিলে তিলে হতাশায় দগ্ধ হয়েছে মেয়ু আর তার বৌ। তাদেরও ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে, জ্ঞান হারিয়ে পাগলের মতো সমর্থন জানাতে লাগল তারই কথায়। পিয়েরোঁ এরই মধ্যে উধাও; বনেমোর আর মোকে-বুড়ো-ও আলাপ করছে। সাংঘাতিক কথা বলছে ওরা, কিন্তু কেউ শুনতে পাচ্ছে না। জাচারি ঠাট্টা তামাশা করেই গির্জা ধ্বংস করার জন্য দাবি তুলেছে, আর মোকে হাতের ব্যাট দিয়ে জমির উপর ঘা মারছে। গোলমালটা আর একটু জমজমাট করে তোলাই তার উদ্দেশ্য। মেয়েরা তো একেবারে রেগে টং। লেভাক-বৌ পাছার উপর হাত রেখে ফিলোমেনকে তাড়া করেছে; সে তার কথায় হেসে উঠেছে এই তার অপরাধ। মোকে-ছুঁড়িটা এককাঠি সরেস; পুলিসদের বেজায়গায় এলোপাথাড়ি লাথি মেরে তাদের কাবু করে দিতে চায়। বুড়ী ব্রুল সালাদ পাতা, এমন কি ঝুড়িটা অবধি লিদির কাছে না দেখে এতক্ষণ তাকে ঘুষোঘাষা মারছিল, এবার সে শূন্যেই মালিকদের উদ্দেশ্য করে ঘুষি ছুঁড়তে শুরু করে দিলে। তাদের সে পেলে এমনি করেই নাস্তানাবুদ করে দেবে এই তার ইচ্ছে। জাঁলিন ভয় পেয়ে গেছে। একটা খালাসীর কাছ থেকে বেবের্ত খবর পেয়েছে, রাসেনার-গিন্নী নাকি তাদের পোল্যান্ডকে চুরি করা দেখে ফেলেছে। সে সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে ফেললে, খরগোশটাকে আঁভাতাসের দোরগোড়ায় ছেড়ে দিয়ে আসবে। ভয়ডর তার নেই। এখন সে আরো জোরে চেঁচাচ্ছে, নতুন ছুরিখানা বার করে বার বার ফলাখানা উচিঁয়ে ধরছে—ছুরির ফলার চকচকানি দেখিয়েই তার গর্ব।

ভাইসব, ভাইসব, এতিয়েঁ বার বার বলে উঠল। এক মুহূর্তে ওদের চুপ করিয়ে দেবার চেষ্টায় ওর গলা ভাঙা, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তই সে করে ফেলতে চায়।

অবশেষে ওরা চুপ করল, শুনলে কান পেতে ওর কথা।

ভাইসব কাল জাঁ-বার্তে সভা হবে—তোমরা রাজি ?

হাঁ, হাঁ, জাঁ-বার্তে সভা হোক! মার মার দালাললোগকো মার!

তিন হাজার কণ্ঠস্বর ঝড় তুলে উঠে এল আকাশে, চাঁদের শুভ্র ঔজ্জ্বল্যে মিলিয়ে গেল।